# বাংলা নাট্য : নির্মাণ ও নির্দেশনায় মেয়েরা (১৯৪৩–২০০৩)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের

অধীনে পি এইচ. ডি. উপাধির শর্তপূরণে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

**সুকৃতি লহরী (সিন্‌হা)**

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

**ড. অনন্যা বড়ুয়া**

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০১৬

**Certified that the Thesis entitled**

বাংলা নাট্য : নির্মাণ ও নির্দেশনায় মেয়েরা (১৯৪৩-২০০৩)
..........................................................................................................................................

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of........**Prof. Ananya Baruya**........And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

1. Supervisor :

Dated :

Candidate :

Dated:

# কথামুখ

'বাংলা নাট্য : নির্মাণ ও নির্দেশনায় মেয়েরা (১৯৪৩-২০০৩)' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি মূলত ব্যক্তিগত অনুরাগের সঙ্গে সন্ধিৎসু মনের মেলবন্ধন। গবেষণা এখানে তথ্যানুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে একজন নারী হিসেবে এক নাট্যকর্মীর আন্তর আবিষ্কারেরও প্রতিমুখ। বাংলা সাম্মানিকসহ স্নাতকস্তরে চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হওয়া ও ফল প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ে যোগাযোগ ঘটে 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থার সঙ্গে। নাট্যচর্চায় মনোনিবেশ থেকেই স্নাতকোত্তরস্তরে বিশেষ পত্র নির্বাচনে নাটক-ই অগ্রাধিকার পায়। পঠনপাঠন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নাটকের অধিকার ক্রমশ জোরালো হতে থাকে যার চূড়ান্ত পরিণতি গবেষণাপত্রের বিষয় নির্বাচনেও প্রতিফলিত হয়। গত কয়েক বছর (ডিসেম্বর, ২০১০ থেকে) কাজটি করতে করতে বহু মানুষের সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো অবশ্যই কর্তব্যকর্ম, একই সঙ্গে থাকে ঋণস্বীকারের দায়বদ্ধতাও। গবেষণাপত্রের সূচনাতেই তাই তাঁদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. অনন্যা বড়ুয়াকে। তাঁর সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি, সাহসী বিধিনিষেধ, আন্তরিক শাসনজারি এবং যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ আমাকে ঋদ্ধ করেছে প্রতিনিয়ত। আমি কৃতজ্ঞ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সমস্ত অধ্যাপকের কাছে। বাংলা বিভাগের নাট্যবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. শেখর সমাদ্দারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ— তাঁরই সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নির্মিত হয়েছিল গবেষণাপত্রের শিরোনামটি।

এই গবেষণাপত্রের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির চেয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, ই-মেল প্রেরিত জীবনপঞ্জি, তথ্যাদি, স্থিরচিত্র বিশেষ সহায়ক হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানটির সাহায্য ব্যতিরেকে গবেষণাপত্রটি প্রস্তুত করা ছিল অসম্ভব, সেই সংরক্ষণশালাটি হল 'নাট্যশোধ সংস্থান'। সংস্থার কর্ণধার ৮৫ বছর বয়সি শ্রীমতী প্রতিভা অগ্রবালের কর্মসংস্কৃতি আমাকে প্রাণিত করেছে। আমি কৃতজ্ঞ 'নাট্যশোধ সংস্থান'-এর প্রত্যেকটি বিভাগের (পত্রপত্রিকা, অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং; পুস্তক-পুস্তিকা, পেপার কাটিংস, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি) প্রতিটি মানুষের কাছে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাঁরা হাসিমুখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সব সময়। ঋণ স্বীকার করি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার, শ্রী অরবিন্দ ভবন লাইব্রেরিরও।

আমার কর্মক্ষেত্র ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (কলেজ)-এর অধ্যক্ষা ড. নিবেদিতা চক্রবর্তী ও আমার সমস্ত শুভানুধ্যায়ী সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোটা ধৃষ্টতা কারণ এতটাই সহযোগিতা, সাহায্য

ও ভালবাসা পেয়েছি তাঁদের কাছে। পরিবারের মানুষজনের সাহায্য ছাড়া গবেষণাপত্রের কাজ কি সম্পূর্ণ হত? সংকটে সংশয়ে পাশে থেকে নিরন্তর উদ্দীপ্ত করেছেন আমার পরিবার ও আত্মীয়জন। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ আমি।

প্রায় ত্রিশ বছর ধরে যে নাট্যসংস্থার সঙ্গে সুখে দুঃখে জড়িয়ে থেকেছি, আমার নাট্যভাবনার বিকাশের মূলে রয়েছে যে সংস্থা সেই 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থার অবদান আমার জীবনে পরিব্যাপ্ত। কৃতজ্ঞতা জানাই এতদিন ধরে নাট্যজগতের যত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, গবেষণাকর্মটি করতে গিয়ে আরও বহু বহু নাট্যজগতের মানুষকে পাশে পেয়েছি, বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁরা তাঁদের সাহায্যের হাত। শহর ছাড়িয়ে শহরতলি থেকেও। ছবি দিয়ে, তথ্য দিয়ে জেলা ও শহরের নাট্যদলগুলি যেভাবে সাহায্য করেছে তা বারবার বিস্মিত করেছে আমাকে। 'বহুরূপী', 'পিএলটি', 'নান্দীকার', 'পঞ্চম বৈদিক', 'চুপকথা', 'রঙরূপ', 'অনসম্বল', 'থিয়েট্রন' থেকে শুরু করে বহরমপুরের 'ঋত্বিক', শান্তিনিকেতনের 'ইলোরা', 'শান্তিপুর রঙ্গপীঠ', 'শান্তিপুর সাংস্কৃতিক', 'ইছাপুর আলেয়া', কাঁচরাপাড়ার 'ফিনিক্স', 'রাধানগর দর্পণ'— এই রকম বহু নাট্যদলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এমন একজন মানুষের কথা সর্বশেষে উল্লেখ করব যিনি আজ পৃথিবীতে নেই, গবেষণা শুরু হওয়ার আগেই তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে। তিনি হলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, অধ্যাপক, অভিনেতা কুমার রায়। তাঁর সাহচর্যে না এলে নাট্যসম্পর্কিত একটি শব্দও প্রকাশ করা অসম্ভব ছিল আমার কাছে। তাঁকে প্রণাম জানাই।

গবেষণাপত্রটি প্রকাশের প্রস্তুতিকরণে অবন বসুর অপরিসীম পরিশ্রম আমাকে ঋণী করেছে। অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণের কাজে প্রভূত সাহায্য করেছেন অর্ণব ভট্টাচার্য, আশিস রায় ও প্রণব নস্কর।

এ ছাড়া ধর ব্রাদার্স তাঁদের সুনাম বজায় রেখেছেন গবেষণাপত্রটি বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে। নির্দিষ্ট সময়ে কাজটি করে দেওয়ার জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

যথাসাধ্য চেষ্টা ছিল গবেষণাপত্রটিকে সার্থক রূপ দেওয়ার। যতটা আকাঙ্ক্ষা ছিল তা হয়তো পূরণ হল না। থেকে গেল ত্রুটি বিচ্যুতি— যার দায় সম্পূর্ণই আমার। সর্বোপরি স্বীকার করি বাংলা নাট্যের কাছে আমার ঋণ।

**সুকৃতি লহরী (সিন্‌হা)**
গবেষক
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা

# সূচিপত্র


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **ভূমিকা** | ১-৭ |
| **প্রথম অধ্যায়** | ৮-৬৫ |
| প্রতিবাদের ভাষা প্রতিরোধের আগুন<br>(মণিকুন্তলা সেন, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়,<br>সাধনা রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, নিবেদিতা দাস) | |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | ৬৬-১১৫ |
| অস্তিত্বের সংকটে তৃপ্তি মিত্রের নাট্যনির্মাণ: 'বহুরূপী' থেকে 'আরব্ধ' | |
| **তৃতীয় অধ্যায়** | ১১৬-১৬০ |
| অনন্য সংগঠক শোভা সেন | |
| **চতুর্থ অধ্যায়** | ১৬১-২০৭ |
| নির্মাণের সঙ্কল্পে নাট্য সংহতি<br>(কেয়া চক্রবর্তী ও স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত) | |
| **পঞ্চম অধ্যায়** | ২০৮-৩২৩ |
| নির্দেশনার নতুন ভাষ্য<br>(শাঁওলী মিত্র-উষা গঙ্গোপাধ্যায়-সোহাগ সেন) | |
| **ষষ্ঠ অধ্যায়** | ৩২৪-৩৬৯ |
| নির্মাণ ভাবনার ভিন্নমুখ<br>(জয়তী বসু, সীমা মুখোপাধ্যায়, ডলি বসু) | |

**সপ্তম অধ্যায়** ৩৭০-৪১২

থিয়েটারের উত্তরাধিকার
(ঈশিতা মুখোপাধ্যায়, সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত,
শাশ্বতী বিশ্বাস, অর্পিতা ঘোষ)

**অষ্টম অধ্যায়** ৪১৩-৪২৮

শহরতলির নাট্যনির্মাণে মেয়েরা

**নবম অধ্যায়** ৪২৯-৪৪৪

বাংলা ও সর্বভারতীয় মহিলা নির্দেশকদের
পারস্পরিক প্রভাব ও ভাবনার বিনিময়

**উপসংহার** ৪৪৫-৪৪৭

**গ্রন্থপঞ্জি** ৪৪৮-৪৫৫

# ভূমিকা

বাংলা নাট্যের ঐতিহ্য ও পরম্পরা সুদীর্ঘ ইতিহাসের পথ অতিক্রম করেনি। কারণ ১৭৯৫ সালে লেবেদফ প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলি থিয়েটার থেকে নাট্যের অভিযাত্রার সূচনা ধরলে এই পরিক্রমণের সময়কাল দুশো বছরের সামান্য কিছু বেশি। এই সময়পর্বে নাট্যের ভঙ্গিমা ও প্রকাশভাবনায় নানা বাঁক যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনই বাদ-প্রতিবাদ, সংকট-সাফল্যে, বিতর্ক-আন্দোলনে বাংলা নাট্য নিজেকে সজীব প্রমাণ করেছে বারবার। এমনই এক বিতর্কের ঘূর্ণাবর্ত থেকে বাংলা নাট্যে অভিনেত্রীদের আবির্ভাব। ১৮৭৩—বেঙ্গল থিয়েটার। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও পতিতালয়ের দেহোপজীবিনীরা দখল নিয়েছিলেন মঞ্চের অধিকার। সেই শুরু— দশক পর দশক, শতাব্দী পর শতাব্দী পেরিয়ে অভিনেত্রীকুলের সামাজিক অবস্থানের পটচিত্রটাও ক্রমশ পরিবর্তিত হতে হতে চলেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে, ১৯৪৩ সালে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'র প্রতিষ্ঠা, বাংলা নাট্যের পেশাদারি ছক ভেঙে এক নতুন দিশা দেখাল যা সমকালীন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য থেকেই রূপ নিল। ১৮৭৩ সাল থেকে শুরু করে প্রথম 'বি.এ' পাশ অভিনেত্রী কঙ্কাবতী সাহুর শিশিরকুমার ভাদুড়ীর থিয়েটারে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা মঞ্চকে শাসন করেছেন তথাকথিত অশিক্ষিত, সামাজিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক অভিনেত্রীর দল। শ্যামা, গোলাপসুন্দরী, জগত্তারিণী, এলোকেশী থেকে যার সূচনা—বিনোদিনী, তিনকড়ি, কুসুমকুমারী প্রমুখ অসংখ্য অভিনেত্রীর প্রতিভা, স্থৈর্য, থিয়েটারের প্রতি ভালবাসায় যার সমৃদ্ধি—আর কঙ্কাবতীর মতো শিক্ষিত 'ভদ্র পরিবার'-এর মেয়ের থিয়েটার যোগদানে যার পরিণতি। সেই বাংলা নাট্যের গতিমুখটাই বদলে গেল চল্লিশের দশক থেকে। আইপিটিএ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এ যে অভিনেত্রীরা অভিনয়ের জন্য আহূত হয়ে এলেন তাঁরা শিক্ষিত, বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শে আস্থিত। পরিবারের সমর্থনে থিয়েটারের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। অভিনয় তাঁদের জীবিকা নয়। বিশেষ দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। বাংলা নাট্যে অভিনেত্রীদের ইতিহাসে এ এক পালাবাদল। 'বাংলা নাট্য : নির্মাণ ও নির্দেশনায় মেয়েরা (১৯৪৩-২০০৩)'— মূল গবেষণা কর্মটির সময় সূচনাকাল এই ১৯৪৩ থেকেই।

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' থেকেই বেরিয়ে এসে গ্রুপ থিয়েটার নিজের পথ খুঁজে নিয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন শম্ভু মিত্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থাই গ্রুপ থিয়েটারের নির্দিষ্ট রেখচিত্র

তৈরি করল এবং তাঁর নির্দেশিত মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠা পেল আরও অসংখ্য নাট্যদল। গবেষণাপত্রটির মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে মূলত এই কলকাতা শহর ও অদূরবর্তী শহরতলির গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেত্রীদের কেন্দ্র করে, অভিনয় মূলত তাঁদের পেশা নয়। তাঁরাই একটা সময় নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন নাট্যনির্মাণ ও সর্বোপরি নির্দেশনার দায়িত্ব। অত্যন্ত আশ্চর্যের এই যে, যে-অভিনেত্রীদের একটা সময় মঞ্চে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়নি, সময়ের পথ পেরিয়ে তাঁরা হয়ে উঠলেন নির্দেশক—নাট্যের নিয়ন্ত্রক। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় এমন হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে ক্রমশ শিক্ষাক্ষেত্রে, পেশাগত ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক সংগঠনে, ক্রীড়ায় অসংখ্য নারীর অন্তর্ভুক্তি। মানবিক চেতনার স্তরে, নারীবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর-অতিক্রান্ত সময়ে, আধুনিক মননশীলতায় সর্বত্র ‘Second Sex’-এরই জয়যাত্রা। নাট্যনির্মাণ ও নির্দেশনায় মেয়েদের আলোচনা তাই শুধুমাত্র মঞ্চে নারীর নির্দেশক হয়ে ওঠার ইতিহাস রচনা নয়— বরং নারীর অধিকারে সামাজিক পালাবদলের ইতিহাস নির্মাণ। অভিনেত্রীদের অভিনয় জীবনকে কেন্দ্র করে বহু রচনা, গবেষণা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। সে ক্ষেত্রে মনে হয়েছে যে অভিনেত্রীরা নিজস্ব নাট্যদলে অভিনয় ছাড়াও দায়বদ্ধ থাকলেন নাট্যনির্মাণের নানা কাজে, সাংগঠনিক শক্তিতে নিজেদের প্রমাণ করলেন এবং নির্দেশক হয়ে ওঠার সাহস রাখলেন হাজারো প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে, পুরুষতন্ত্রের অধিকারে ভাগ বসানো তাঁদের জীবন-ইতিহাসের এই দিকগুলোকে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি— নাট্য সমাজে নারীর ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে।

‘নির্মাণ’ ও ‘নির্দেশনা’— শব্দ দুটি বিশ্লেষিত হতে পারে এইভাবে যে, নির্মাণ অর্থে একটি নাটক মূল পাঠ থেকে যখন মঞ্চ-উপযোগী নাট্যের রূপ নেয় এই যাত্রাপথে নানানভাবে যাঁরা সহায়ক হয়ে ওঠেন, যাঁরা সংগঠন চালনার কাজে নিজেদের সাধ্যমতো প্রয়াস চালিয়ে যান তাঁদের অবদানের কথাই নির্মাণ প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। আর নিদের্শনা প্রসঙ্গে থাকবে যাঁরা একটি নাট্যকে সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন— মঞ্চ, আলো, সঙ্গীত, অভিনয় শিক্ষা সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে গড়ে তোলেন সম্পূর্ণ নাটক (total theatre), বাংলা নাট্যে মেয়েদের নির্মাণ ও নির্দেশনা বিষয়ক পূর্বে অনালোচিত এই বিষয়টি গবেষণার জগতে একটি নতুন দিকে আলোকপাত করবে বলেই বিশ্বাস রাখি। এ ক্ষেত্রে যে নারীরা নির্দেশক তাঁদের নির্মাণকর্ম নির্দেশনার কাজের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়েছে বলে সে বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা স্থগিত রইল।

‘বাংলা নাট্য : নির্মাণ ও নির্দেশনায় মেয়েরা (১৯৪৩-২০০৩)’ শীর্ষক গবেষণাপত্রটি বিভিন্ন

দিকে আলোকপাত করার জন্য এবং ছ'টি দশক ধরে নাট্যনির্মাণ ও নাট্যনির্দেশনার গতিমুখ পরিবর্তনের কথা মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। শেষ দুটি অধ্যায়ে কলকাতা শহরের বাইরে শহরতলির মেয়েদের নাট্যচর্চা ও সর্বশেষ অধ্যায়ে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে মহিলা নাট্যকর্মীদের সংযোগ স্থাপনের, পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রগুলি তাঁদের মানসিকতা ও প্রযোজনার নিরিখে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র অভিনেত্রীদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, 'প্রতিবাদের ভাষা- প্রতিরোধের আগুন', শিরোনামে। গণনাট্য পর্বে কোনও অভিনেত্রীই নির্দেশনার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেননি কিন্তু নাট্যনির্মাণের কাজে তাঁরা ছিলেন অপরিহার্য। যে সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে তাঁরা নাট্যের মঞ্চে নিজেদের উপস্থাপিত করেছিলেন, তা ছিল পাটাতনের মতো। আগামী দিনের অভিনেত্রীদের নাট্যনির্দেশনার কাজে এগিয়ে আসার পথ তাঁরা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। যে প্রতিবাদী মনোভাব, প্রতিরোধ-আকাঙ্ক্ষায় নাট্যকর্মে যুক্ত হয়েছিলেন সেই লড়াই, সেই দৃঢ়তার প্রয়োজন হয় বহু মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে। নির্দেশনা দান এক অর্থে নেতৃত্ব দানও বটে। ভারতীয় গণনাট্যের নারী কর্মীরা শুধু আগামী প্রজন্মের নয় সমকালের কাছেও রেখে গেলেন সেই শিক্ষাটাই। গণনাট্যের পাঁচজন প্রতিনিধিস্থানীয় অভিনেত্রীকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন মণিকুন্তলা সেন, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী ও নিবেদিতা দাস। সেই সময়ে নাট্যআন্দোলনে তাঁদের সাহসী অংশগ্রহণ ও অবদান পরবর্তী সময়ে নারীনির্দেশকদের বলিষ্ঠ মনোভাব তৈরিতে সক্ষম হয়েছিল বলেই মনে করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে বিশিষ্ট অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের কথা— যাঁর অভিনয় জীবনের সূচনা গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'নবান্ন'-নাটকের মাধ্যমে হলেও তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটল বহুরূপী নাট্যসংস্থায় শম্ভু মিত্র পরিচালিত নাটকে একটির পর একটি মূল চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। তিনি তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন অভিনেত্রী জীবনের কাঠামো। একটা সময় 'বহুরূপী'র সংকটকালে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, শম্ভু মিত্রের সজীব উপস্থিতির অভাবজনিত সময়ে তিনি হাল ধরেছিলেন নাট্যপরিচালনার। নতুবা 'বহুরূপী' অস্তিত্বের সংকটে অবলুপ্তির পর্যায়ে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। শুধু পরিচালনা নয়, যথার্থ নেতৃত্বে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে মনোবল সঞ্চার করে, অভিনব ভাবনায় নাট্যপরিচালনার সম্ভাবনা জাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কতটা সাফল্য বা জনপ্রিয়তা এসেছিল তা বিতর্ক সাপেক্ষ কিন্তু তৃপ্তি মিত্রের নাট্যপ্রযোজনাগুলির মধ্য থেকে 'বহুরূপী' বেঁচে থাকার দিশা খুঁজে পেয়েছিল। ১৯৫৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটক

পরিচালনার মধ্য দিয়ে তাঁর পথচলা শুরু, কিন্তু ১৯৭০ থেকে তাঁর ধারাবাহিক পরিচালনার কাজ শুরু হল। বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রথম নাট্যনির্দেশক হিসাবে তাঁর কথাই উল্লেখ করা যায়। তাঁর নির্দেশনা হয়ত সর্বক্ষেত্রে 'বহুরূপী'র পূর্বের (শম্ভু মিত্রর পরিচালনাকালীন সময়খণ্ড) মান রক্ষা করতে পারেনি কিন্তু তাঁর একক অভিনয় সমৃদ্ধ 'অপরাজিতা' বাংলা থিয়েটারে মাইলস্টোন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়-প্রতিভার আলোচনা নয়, তাঁর পরিচালিত নাটকগুলি, পরিচালনার পদ্ধতি ও তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতার আলোচনাই 'দ্বিতীয় অধ্যায়'-এর মুখ্যবস্তু। যা 'বহুরূপী' এবং বাইরের কয়েকটি নাট্যদল ও তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত 'আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়'-এর মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'অনন্য সংগঠক শোভা সেন'। স্পষ্টতই এই অধ্যায়ে অভিনেত্রী শোভা সেন নন— সংগঠক শোভা সেনের কর্মভাবনার ও প্রয়োগের পর্যালোচনা করা হয়েছে। 'নবান্ন' নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জীবিত অভিনেত্রী তিনি। দীর্ঘসময় নাটকের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। উৎপল দত্ত যাতে তাঁর কাজটি নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে করতে পারেন তার জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন তিনি। প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থেকেছেন কিভাবে সংগঠনকে সঠিক পথে সুষ্ঠুভাবে চালনা করা যায়। তাঁর দীর্ঘ পথচলার ইতিহাসকে তাই চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। (১) মিনার্ভা-পূর্ব এল টি জি পর্ব; (২) মিনার্ভায় এল টি জি পর্ব; (৩) পি এল টি পর্ব; (৪) উৎপল দত্তের প্রয়াণের পরবর্তী পর্ব। মেয়েদের মধ্যে এই সাংগঠনিক শক্তির প্রকাশ বাংলা রঙ্গমঞ্চে খুব বেশি দেখা যায়নি। পরবর্তী কালে অনেকেই দলের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁদের পথপ্রদর্শক শোভা সেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে মূলত 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীর দুই পর্বের দুজন অভিনেত্রীকে নির্বাচন করা হয়েছে যাঁরা অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর যেমন রেখেছেন, তেমনই অভিনয় ছাড়া সংগঠনের নানা কাজে অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন। এঁরা হলেন কেয়া চক্রবর্তী ও স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। থিয়েটারের জন্য কেয়া চক্রবর্তীর আত্মত্যাগ কিংবদন্তি। নিশ্চিন্ত জীবন যাপন ও চাকরির নিরাপত্তার ঘেরাটোপের বাইরে বেরিয়ে এসে যিনি থিয়েটারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। কেয়া চক্রবর্তী নির্দেশনা সহায়ক হিসাবে 'নান্দীকার' প্রযোজিত তিনটি নাটকে কাজ করেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় নাটকের নির্দেশনা দেননি। কিন্তু সাংগঠনিক নানান কাজ নিজের দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন তা শুধু নারী হিসাবে নয়, একজন থিয়েটারকর্মী হিসাবে ঐতিহাসিক নজির হয়ে থাকবে। দলের ভাঙন রোধে বারবার তিনি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় অর্থের জোগান দিয়েছেন, সর্বতোভাবে

দলকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখার সঙ্কল্পে স্থির থেকেছেন। তাই তাঁর কথা ব্যতিরেকে 'নান্দীকার'ই শুধু নয়— বাংলা নাটকের আলোচনাও অসম্পূর্ণ। কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীতে অভিনেত্রী হিসাবে নিজেকে যিনি প্রতিষ্ঠা করলেন, তিনি স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। তাঁর নির্দেশনায় 'নান্দীকার' নাটক মঞ্চস্থ করার আগেই তিনি 'রঙরূপ' গোষ্ঠীর হয়ে পরিচালনার কাজ করেছেন। কিন্তু 'নান্দীকার' গোষ্ঠীতে তিনি নির্দেশক হিসেবে নন, পোশাক পরিকল্পনা, সঙ্গীত পরিচালনা এবং পরিচালনার সর্ববিধ কাজে নিজেকে যেভাবে ব্যস্ত রেখেছেন তা থিয়েটারের ছেলেমেয়েদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। তাই চতুর্থ অধ্যায়ে এই দুজন নাট্যকর্মীর আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বিংশ শতকের আশির দশকে তিনজন নারীনির্দেশক— শাঁওলী মিত্র, ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ও সোহাগ সেন এগিয়ে এসেছিলেন পরিচালনার কাজে। তৈরি করেছিলেন থিয়েটারের নতুন ভাষ্য। অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যজগতের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ রচিত হলেও তাঁদের পরিচিতি নাট্যনির্দেশক হিসাবেও। গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাঁদের পরিচালিত নাটকের সংখ্যা খুব কম নয়— সে কারণেই এই আলোচনাক্ষেত্রটি গবেষণাপত্রের দীর্ঘতম অধ্যায়। নিয়মিত নাট্যের কাজ করে গেছেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে একমাত্র শাঁওলী মিত্র ২০০৫ সালের পর নতুন করে কোনও পরিচালনার কাজ করেননি। কিন্তু সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তাঁর সম্পৃক্তি অবিচ্ছেদ্য। শাঁওলী মিত্র তাঁর পরিচালনার ক্ষেত্রে যেভাবে সফল হয়েছিলেন, কথকতার ভঙ্গিতে যে আধুনিক নাট্যভাবনার উপস্থাপনা করেছিলেন সেই 'নাথবতী অনাথবৎ' থেকে তাঁরই নাট্যপ্রযোজনাগুলির পর্যালোচনা এবং শাঁওলী মিত্রের নাট্যনির্দেশনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের থিয়েটারের মাধ্যম হিন্দি ভাষা— তবুও বিরাট সংখ্যক বাঙালী দর্শককে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। তাঁর কাজের ধরনটা আলাদা। বহু চরিত্রের সমাবেশে সামাজিক সমস্যা-সংকটের বাস্তব ছবি তুলে ধরে নাটক নির্মাণ করেন তিনি। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের এই স্বতন্ত্র নাট্যভাবনার আলোচনা পঞ্চম অধ্যায়ে যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনই তাঁর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনা কৌশল এই অধ্যায়ের আলোচনার উপজীব্য। সোহাগ সেন-ও একটা স্বতন্ত্র ধারাকে পরিচয় করালেন বাঙালি দর্শকের সঙ্গে। সেখানে পাশ্চাত্যরীতির অনুসরণ এবং প্রায়শই এমন নাটক বেছেছেন যার সন্ধান আগে বাঙালি দর্শকের কাছে পৌঁছয়নি। সোহাগ সেন সম্পর্কিত আলোচনায় তাই গুরুত্ব পেয়েছে নির্দেশনার পাশাপাশি তাঁর নির্বাচিত নাটকগুলির আলোচনাও। এই তিন নাট্যব্যক্তিত্বই নিজস্ব দল প্রতিষ্ঠা করার সাহস রেখেছেন। এই নাট্যদলগুলি হল 'পঞ্চম বৈদিক' (শাঁওলী মিত্র), 'রঙ্গকর্মী', (ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়),

এবং 'অনসম্বল' (সোহাগ সেন)। বাংলা থিয়েটারে যেখানে অভিনয় করার জন্য লড়াই করতে হয় মেয়েদের, সেখানে এই তিন নারীনির্দেশক তাঁদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে কীভাবে বাস্তব করে তুলেছেন নাট্যমঞ্চে—পঞ্চম অধ্যায়ে তারই অনুসন্ধান।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আরও নবীন কয়েকজন নাট্য নির্দেশক সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। 'নির্মাণ ভাবনার ভিন্নমুখ' তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন তাঁদের নাট্যপ্রযোজনার মধ্য দিয়ে। বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে কাজ করতে শুরু করেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে জয়তী বসু, সীমা মুখোপাধ্যায় এবং ডলি বসুর পরিচালনা সংক্রান্ত কাজের আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। তাঁরা শুধু পরিচালনা নয়, সংগঠনের দায়দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিয়েছেন স্বেচ্ছায়। জয়তী বসু যে নতুন ধারার থিয়েটার ফর্মকে বাংলার দর্শকের কাছে পৌঁছে দিলেন সেই গ্রিপস্ থিয়েটারের উৎসভূমি জার্মানি। কীভাবে তিনি পরিচিত হয়েছেন এই ফর্মটি সম্পর্কে— তাঁর অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁর কাজের ক্ষেত্রটিকে তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। তিনি নিজে প্রতিষ্ঠা করেন নাট্যদল 'সূত্রপাত'। বলিষ্ঠ এই অভিনেত্রী তাঁর নির্দেশনার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সাহসী ও দৃঢ়চেতা, তারই প্রমাণ তার প্রযোজনাগুলি। সীমা মুখোপাধ্যায় এই পর্বের নাট্যনির্দেশকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে কাজ করার রেকর্ড গড়েছেন বলা যেতে পারে। যত দিন গেছে তিনি নিজেকে পরিণত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর শুরুর সময়ের কাজের পর্যালোচনা ও পরবর্তী সময়ে তাঁর পরিণততর হয়ে ওঠার ইতিহাস ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনার মূলবস্তু। তিনি তাঁর শ্বশুরমশাই প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'রঙরূপ' এর হয়ে আজও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে হেঁটে চলেছেন। গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ধরা গেল না তাঁর পরিণততর কাজগুলির মূল্যায়ন, কিন্তু শুরুর সময় থেকেই 'রঙরূপ' এর হয়ে তিনি নাটক লিখেছেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন, তাঁর লেখা নাটকের অভিনয় হয়েছে এ রকম নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে সীমা মুখোপাধ্যায়ের পথ চলার ছবিটা ধরা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়েই। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ডলি বসুও বাঙালি না হয়েও বাংলার নাট্যমোদী মানুষের কাছের মানুষ। তিনি স্বেচ্ছায় নাট্য নির্দেশনায় আসেননি— কোন পরিস্থিতিতে তাঁকে তুলে নিতে হল এই দায়িত্ব, কীভাবে চালনা করলেন একটি নাট্যদল—ডলি বসুর পরিচিতির এই রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

আশি ও নব্বইয়ের দশকের ঊর্বরা ভূমিতে আরও বহু নারীনির্দেশক এসেছেন— ক্রমশ তাঁদের সংখ্যা বেড়েছে বই কমেনি। অর্থাৎ নির্দেশনা নারীর অধিকার অবলম্বনের একটা পথ তৈরি করেছে এটা প্রামাণ্য সত্য। পুরুষশাসিত নাট্যনির্দেশনার ক্ষেত্রে ক্রমশ নারীর চিন্তা-চেতনা-মনন ও পরিকল্পনা গভীর প্রভাব ফেলছে। সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, ঈশিতা মুখোপাধ্যায়, শাশ্বতী বিশ্বাস, অর্পিতা ঘোষ—

কাছাকাছি সময়ে এঁদের জন্ম এবং কীভাবে তাঁরা ক্রমশ দখল নিলেন নির্দেশনার, সেই আলোচনাই সপ্তম অধ্যায়ের উপজীব্য।

কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে যখন ক্রমবর্ধমান নারীনির্দেশকদের পরিসংখ্যান, তখন শহরতলির মেয়েদের নাট্যচর্চা, নাট্যনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা এবং নির্দেশনায় তাঁদের অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। এঁদের কৃতিত্ব এইখানেই যে তাঁরা শহরের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা ছাড়াই নাট্যনির্মাণ ও নাট্যনির্দেশনার কাজে যুক্ত থাকার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। দলের প্রতি এতটাই দায়বদ্ধ তাঁরা যে, অন্য কোনও সংস্থায় অভিনয় করতেও নারাজ। অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে শহরতলির মেয়েদের নাট্যচর্চা সম্পর্কে। 'গোবরডাঙা শিল্পায়ন' কাঁচড়াপাড়ার 'ফিনিক্স', 'রাধানগর দর্পণ', 'ইছাপুর আলেয়া' ইত্যাদি কয়েকটি দলের কয়েকজন অভিনেত্রীকে নির্বাচন করা হয়েছে যাঁরা দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং নাট্যনির্মাণ ও নির্দেশনায় তাঁদের অবদান রেখেছেন। নিজস্ব নাট্যদলে থেকেই তাঁরা কাজটি করে চলেছেন দীর্ঘসময় ধরে। তাঁদের এই অবদান ও নাট্যচর্চার কথাই অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এঁরা অনেকেই নাট্যনির্দেশনায় এসেছেন গবেষণাপত্রের সময়সীমা পেরিয়ে অর্থাৎ ২০০৩-এর পর। তাই অষ্টম অধ্যায়টি সুবিস্তৃত নয়।

নবম অধ্যায়েও স্বল্প পরিসরে ধরা হয়েছে বাংলা ও ভারতের মহিলা নাট্যনির্দেশকদের পারস্পরিক আদান-প্রদান ও প্রভাব সম্পর্কে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন ধরেই শুরু হয়েছে নারীদের নির্দেশনা ও নাট্যনির্মাণের কাজ। নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নাট্যকে দেখার প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই আলোচনা যেমন আলোচ্য অধ্যায়ে উঠে এসেছে, তেমনই উঠে এসেছে বিভিন্ন নাট্যোৎসবের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের নারীনির্দেশকরা পৌঁছে যাচ্ছেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে— সে আলোচনাও। শুধু মাত্র নারী নির্দেশকদের পরিচয় বা নারী সম্পর্কিত নাট্যোৎসবের পরিচয় তুলে ধরা হল এই অধ্যায়ে।

নির্দেশকরূপেই নিজেদের দেখতে চান এঁরা— নারী নির্দেশক তকমাটি অনেকেই গ্রহণ করতে নারাজ। কিন্তু দর্শকের কাছে তাঁদের প্রযোজনাগুলি যে আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়, তা অবশ্যই পুরুষ নির্দেশিত নাটকগুলির থেকে স্বতন্ত্র। বিষয় নির্বাচন, নির্মাণপদ্ধতি, প্রয়োগ কৌশল, অভিনয় ধারা সব দিক থেকেই। গবেষণাপত্রে নয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে তারই একটি রূপরেখা তৈরির প্রচেষ্টা করা হল মাত্র।

## প্রথম অধ্যায়

# প্রতিবাদের ভাষা প্রতিরোধের আগুন

### (মণিকুন্তলা সেন, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, নিবেদিতা দাস)

'বাংলা নাট্য : নির্মাণ ও নির্দেশনায় মেয়েরা'---- এই বিষয়টির প্রেক্ষিতে গণনাট্যের অভিনেত্রীদের প্রসঙ্গ উত্থাপনে 'নির্মাণ' ও 'নির্দেশনা'— শব্দ দুটির বিশ্লেষণ যেমন জরুরি তেমনই প্রতিবাদের ভাষা ও প্রতিরোধের আগুন হিসেবে তাঁরা যে নাট্যকে হাতিয়ার করলেন সেই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আলোচনাও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। 'নির্মাণ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল রচনা, গঠন বা প্রস্তুত করা আর নির্দেশনার অর্থ: নির্ধারণ, আজ্ঞা, উপদেশ। স্বভাবতই দুটি শব্দ ভিন্ন অর্থ বহন করে। গণনাট্যের যে অভিনেত্রীদের কথা প্রথম অধ্যায়ের উপজীব্য তাঁরা নাট্যকে গ্রহণ করেছিলেন প্রতিবাদ, প্রতিরোধের কারণে। তাঁরা কেউ-ই গণনাট্য পর্বে নাট্যনির্দেশনায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেননি। কিন্তু নাট্যনির্মাণে তাঁরা ক্রমশ হয়ে উঠেছিলেন অপরিহার্য অঙ্গ। একটি নাটকের প্রস্তুতিকরণে তাঁদের ভূমিকা শুধু অভিনেত্রী হিসেবে নয়, অভিনেতা ও নির্দেশকদের পাশাপাশি নাট্যের বিচিত্রমুখী কার্যে ও ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁদের সক্রিয় ভাবনা। গণনাট্যের অসংখ্য নাট্যকর্মিণীর মধ্য থেকে প্রতিনিধিস্থানীয় পাঁচজন অভিনেত্রীর 'নির্মাণ' কথা প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হল— কারণ অভিনয়ের বাইরে তাঁরা যে সচেতন ছিলেন নাট্যসম্পর্কিত নানাবিধ কাজে। অর্থ বা পেশাগত তাগিদে নয়, নাট্যাভিনয়ে তাঁদের অংশগ্রহণ ছিল প্রথমত সামাজিক দায়িত্ব বহনের প্রকাশ। বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রীরা যে ঐতিহ্য বা ধারাকে বহন করে নিয়ে চলছিলেন, গণনাট্যের অভিনেত্রীরা সেখানে সেই প্রবাহিত ধারাকে ভিন্ন খাতে বইয়ে দিলেন— কীভাবে এবং কেন, আলোচনার মাধ্যমে তা বিশ্লেষিত হবে।

শুরুর সময় থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। সরলরৈখিক নির্দ্বন্দ্বে প্রবাহিত হয়নি তাঁদের যাত্রাপথ। ১৮৭৩ সালে বেঙ্গলি থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণকেন্দ্রিক অস্থিরতা ও বিতর্কের কাঁটাজাল ছিঁড়ে এগিয়ে আসা শ্যামা-এলোকেশী- জগত্তারিণী-গোলাপসুন্দরী শুধু ইতিহাস-চিহ্নিত প্রতিমুখ নয় বরং উৎসমুখ। সেই উৎসমুখ থেকে ১৯৪৩ সালে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র জন্মকাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে বঙ্গ-রঙ্গ মঞ্চে কত শত অভিনেত্রীর আগমন ও সৃজনশীলতা। তাঁদের ভাবনা-চিন্তা, অভিনয়-সংগ্রাম যেভাবে

এগিয়ে চলেছে সে পথে কিন্তু অগ্রসর হলেন না গণনাট্যের অভিনেত্রীরা। ১৯৪৩-এর পর 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র সূত্রে যে সমস্ত অভিনেত্রী এলেন মঞ্চে, তাঁরা তৈরি করলেন বাংলা নাট্যমঞ্চের ভিন্ন ইতিহাস। প্রথাগত শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক বিশ্বাস, মতাদর্শগত ভাবনায় তাঁরা পূর্ববর্তী অভিনেত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও নিজেদের স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করলেন, কারণ গণনাট্যের মূল আদর্শ ও লক্ষ্যকেই তাঁরা অনুসরণ করায় স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কী ছিল সেই লক্ষ্য— 'It is a movement which seeks to make our arts the expression and organism of our people's struggles for freedom, economic justice and a democratic culture.'[১] পেশাদারি মঞ্চের বাইরে এসে একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তাঁরা 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র সঙ্গে যুক্ত হলেন। নাটক ও অভিনয়কে হাতিয়ার করলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাই মূলত এই প্রগতির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের সঙ্গে গণনাট্যের সংযোগসূত্রটা তৈরি হয়েছিল তাঁদেরই পরিবারের সমমনস্ক কোনও পুরুষ অভিভাবক বা আত্মীয়ের মাধ্যমে।

শুধু নাটক নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ পুরুষ অনুশাসনের বাইরে মেয়েদের স্বতন্ত্র জায়গা করে দিল। নেতৃত্বে পুরুষ সমাজ থাকলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করতে থাকে। ১৮৮৫-তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পর সমাজের উচ্চবিত্ত মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং ১৮৮৯ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে পাঁচজন মহিলা প্রতিনিধি— কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, পণ্ডিতা রামাবাঈ, বিদ্যা গৌরী নীলকণ্ঠ, শ্রীমতী নিকম্বা কংগ্রেসে যুক্ত হলে বিষয়টি আরও গুরুত্ব পায়। জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েদের যোগদান ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ১৯২১-এ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পর শুধু সমাজের উঁচুতলার মানুষ নয়— সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিক কৃষক সর্বস্তরের মানুষই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। বাংলায় তৈরি হয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি (MARS)— যা কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রভাবিত হলেও কংগ্রেস মহিলা সঙ্ঘ বা মুসলিম লিগের মহিলা নেত্রীরাও এই সংগঠনকে সমর্থন জানান। নারীশিক্ষার প্রসার, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, শরণার্থী সমস্যা— এই ঘটনাসমূহ রক্ষণশীল মূল্যবোধকে সরিয়ে মেয়েদের বাধ্য করল ঘরের বাইরে আসতে। শিক্ষা ও চাকরি— এই দুটি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নারীর প্রবেশ

ঘটল। রাজনৈতিক বিপর্যয়ে যখন বাঙালির অর্থনৈতিক এবং পারিবারিক কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটল, বাধ্য হয়েই মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠাতে হল আর শিক্ষা হয়ে উঠল জীবনধারণের অপরিহার্য অঙ্গ। শিক্ষার আলোয় সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে জীবনযাত্রার অনেকগুলো পথ উন্মুক্ত হল তাঁদের সামনে। শুধু সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, তার সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করল। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' তেমনই এক প্রতিষ্ঠান যা নৃত্য-সংগীত-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাল ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র প্রতিষ্ঠা তাই ভারতীয় সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এ শামিল হলেন যে নারীরা তাঁরাও নাট্যমঞ্চে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অগ্রণী সেনানী। নাটক নির্দেশনায় তাঁদের কাউকে গণনাট্যের পর্যায়ে পাওয়া যায়নি ঠিকই কিন্তু পরবর্তী সময়ে যে মেয়েরা বাংলা নাট্যজগতের নাট্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হলেন, হয়ে উঠলেন নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য অঙ্গ— তাঁদের আগমনের পথটি কি প্রস্তুত করে দিলেন না গণনাট্যের অভিনেত্রীরা? এই পর্বে নাট্যকর্মিণীরা যদি তাঁদের সাহসিকতা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, সামাজিক দায়বদ্ধতার জোরে পথ প্রস্তুত না করতেন তাহলে কি সম্ভব হত পরবর্তী সময়ে একাধিক মহিলা নাট্যনির্দেশকের নাট্যক্ষেত্রে নির্দেশনার কাজ করা? বাংলা নাট্যের নির্মাণকল্পে মেয়েদের নিজস্ব ভূমিকা চিহ্নিতকরণে গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়টির আলোচিত বিষয় তাই গণনাট্যের কর্মিণীদের মনন ও মানসিকতার বিশ্লেষণ। গণনাট্য পর্বে তাঁরা নির্দেশনায় অংশগ্রহণ না করলেও নাট্যনির্মাণে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সংযুক্তি, নেতৃত্বের দৃঢ়তা, ভিন্নধারার অভিনয় অভীপ্সার স্বাতন্ত্র্যে তাঁরা তৈরি করলেন আগামী প্রজন্মের নারীদের মধ্যে নাট্যনির্দেশনার সম্ভাব্য বীজমন্ত্র। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গণনাট্যের অগ্রণী নেত্রীরা উন্মোচিত করলেন বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যাভিনয়ের নতুন দিগন্ত।

যে গণনাট্য সংঘের সূত্র ধরে এই আলোচনার সূচনা বা গবেষণাপত্রের সূচনাকাল (১৯৪৩) সেই সংস্থা সম্পর্কে এবং তার প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী সময়কালের পর্যালোচনা এ ক্ষেত্রে অবশ্যই জরুরি। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র জন্ম সময় ১৯৪৩ সালের ২৫ মে। এক বিশেষ রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য থেকে জন্ম নেয় 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'। 'Indian People's Theatre Association' বা 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' বা সংক্ষেপে IPTA যা ভারতকে যুক্ত করে দিল সারা বিশ্বের গণ আন্দোলনের সঙ্গে। বৃহত্তর আন্দোলনের তাগিদে শিল্পী সাহিত্যিকরা তাঁদের একক সাধনার

নিভৃতচারিতা থেকে বেরিয়ে এসে গণভাবনার স্রোতে যুক্ত হলেন সমাজ পরিবর্তন, ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন ও পরাধীনতা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শিল্প সংস্কৃতি কত বড় ভূমিকা নিতে পারে তৈরি হল তারই প্রামাণ্য ইতিহাস।

কমিউনিজমের আদর্শে বিশ্বাসী মানুষজনের প্রচেষ্টায় 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠার পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রগতির সংস্কৃতি। সারা বিশ্ব জুড়ে চলেছে গণচেতনা সঞ্চারক সংস্কৃতির প্রবাহ। পরাধীন ভারতের মাটিতে ঔপনিবেশিক ভারতের অন্দরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যখন তীব্র আকার ধারণ করেছে, তখন বিশ্বের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকামিতা আছড়ে পড়বেই স্বাধীনতাকামী স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী সংবেদনশীল মানুষের ওপরে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বের পটভূমিতে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ঘটনাগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছাড়াও এ দেশে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে ওঠার পেছনে সারা বিশ্বের প্রগতিবাদী শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্য এবং ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন যে কত বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠার প্রায় তেইশ বছর আগে রাশিয়ার তাসখন্দে (১৯২০-র ১৭ অক্টোবর) কয়েকজন ভারতীয় উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করেন। 'It may certainly be taken for granted that the CPI was first set up at Tashkent in October or November 1920. This émigré CPI was affiliated to the Communist International in the first half of 1921 and therefore, concludes Muzaffar Ahamad, 'the date of the party's foundation if it was not 1920, could not have been later than early 1921.[২] তাঁদের মধ্যে ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, নলিনী গুপ্ত প্রমুখ সাত ভারতীয়। তাসখন্দে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর ভারতে ১৯২৫-এ মুজাফ্ফর আহমেদ, সিঙ্গারাভেলু প্রমুখের প্রচেষ্টায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ১৯৩১-এ তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সম্মেলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্বীকৃতি লাভ করে। বিংশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে বিশ্বরাজনীতিতে একে একে ঘটে চলল বিভিন্ন ঘটনার বিস্ফোরণ। উত্থান ঘটল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির। ১৯৩৩-এ হিটলার চ্যান্সেলার পদে আসীন হলে নাৎসি বাহিনী সরব হয়ে উঠল। ১৯৩৬-এ গায়ের জোরে আফ্রিকার আবিসিনিয়া দখল করলেন ইতালির মুসোলিনি। ১৯৩৬-র ১৮ জুলাই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে এবং হিটলারের মদতে স্পেনে ঘটল ফ্যাসিস্ত শক্তির অভ্যুত্থান। ১৯৩৬-র জুলাই থেকে ১৯৩৬-র মার্চ মাস পযন্ত স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারালেন প্রায় দেড় কোটি মানুষ। স্পেনের গোয়ের্নিকা শহর সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়

জার্মানির বোমা পরীক্ষায়। অবসান ঘটে ত্রিশ হাজার মানুষের জীবননাট্যের। পাবলো পিকাসো যন্ত্রণা আর প্রতিবাদে তৈরি করলেন ‘গোয়ের্নিকা’ চিত্র। ফ্যাসিজিমের আবহাওয়ায় যখন ঘনীভূত হয়ে উঠছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা; জার্মানি (হিটলার), ইতালি (মুসোলিনি), স্পেন (ফ্রাঙ্কো), জাপান (তোজো), গ্রিস— ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ করে গণতান্ত্রিক পথকে বিপন্ন করার নেশায় উন্মত্ত— তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে তৈরি হচ্ছে নানান সংগঠন। ১৯৩৩-এ প্যারিসে গঠিত হয়েছে ‘Anti Fascist Workers’ Congress’, ১৯৩৫-এর ২১ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত প্রেসের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সাহিত্যিক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা একত্রিত হচ্ছেন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে। প্যারিসের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর ব্রিটেনে কিছু ইংরেজ লেখক এবং ভারতের মুলকরাজ আনন্দ, রজনীপাম দত্ত একসঙ্গে মিলে গড়ে তুলছেন প্রগতি সাহিত্য সংঘ। সারা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ করেই ১৯৩৬ সালে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ‘Indian Progressive Writers Association’ বা ‘ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ’ মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কলকাতা, এলাহাবাদ, লখনউ, আলিগড়, দিল্লি, ঢাকা— গড়ে উঠছে প্রগতি লেখক সংঘের শাখা। বিশ্বের প্রগতিবাদী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ভারতে— বঙ্গে। স্পেন যখন বিপন্ন তখন পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে স্পেনের পপুলার ফ্রন্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক একই মতাদর্শে মিলিত হচ্ছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রঁমা রঁলা, আঁরি বারবুস, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, গার্সিয়া লোরকার মতো প্রখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিক। রমাঁ রলাঁর আহ্বান পৌঁছে যাচ্ছে ভারতের মানুষের কাছে। রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ১৯৩৭-এর মার্চ মাসে ‘লিগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজিম অ্যান্ড ওয়ার’ (League Against Fascism and War) গঠিত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের মানবাধিকারের জন্য শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত হওয়ার আন্তর্জাতিক আন্দোলনের শরিক হয়ে উঠল ভারত তথা বাংলা। ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’ প্রতিষ্ঠার পূর্বের প্রস্তুতিপথ নির্মিত হল, এই জাতীয় সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ রঁমা রঁলার থিয়েটার তত্ত্ব, যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে জনগণের কথা, তা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে পৃথিবীর শিল্পী সাহিত্যিকদের একত্রিত করতে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন রঁমা রঁলা তা সর্বজনবিদিত। ১৯০৩ সালে ফরাসী পত্রিকা ‘রেভ্যু’তে তিনি থিয়েটার সম্পর্কে যে ক’টি প্রবন্ধ লেখেন তা একত্রে ‘তেয়াতর দু পুপল’ তথা ‘জনগণের থিয়েটার’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। রঁমা রঁলার থিয়েটার তত্ত্ব প্রকাশিত হলেও ও ১৯১৮-তে এর ইংরেজি

অনুবাদ প্রকাশ পেলেও আরও কুড়ি বছর পর ১৯৩৮-এ বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্ব সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভারতীয় গণনাট্যের মূল জায়গাটা গড়ে ওঠে রঁমা রঁলার 'People's Theatre'কে কেন্দ্র করেই।

প্রগতির সংস্কৃতিতে ক্রমশ মিলে যাচ্ছিল শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণের জনজীবন। শুধু রঁমা রঁলার পিপল্স থিয়েটার নয় 'চাইনিজ পিপলস্ থিয়েটার' বা 'চাইনিজ রেড থিয়েটার'-ও জনগণের কাছে যাওয়ার কথাই বলেছে। মাও-ৎসে-তুঙ তাঁর ইয়েনান ফোরাম বক্তৃতায় বলেছেন— সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট হল সামারিক ফ্রন্টের মতোই শক্তিশালী।

এক দিকে যেমন থিয়েটার বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তুত হচ্ছে, অন্য দিকে ফ্যাসিজমও ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ— "On September 1st, however, Hitler marched across the Polish frontier. Two days later, after vainly demanding his withdrawal, Britain and France entered the fight. Another European war had started— and it developed into a second world War."[৩] এই বিশ্বযুদ্ধের সামগ্রিক চেহারাটা বদলে গেল যখন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করল— 'The whole outlook of the war was revolutionized when Hitler invaded Russia on June 22nd, 1941.'[৪]—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হল। বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি রুখে দাঁড়াল অক্ষশক্তি জার্মানি, ইতালি, জাপানের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পরের মাসেই ১৯৪১-র ২১ জুলাই ভারতে গড়ে ওঠে 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসুস্থ থাকলেও তিনি ছিলেন এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর যে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছিল তা তুলে নিল, কারণ সোভিয়েট রাশিয়া হিটলারের বিপক্ষে এবং ব্রিটিশ সরকার এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য থেকে একটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার সুযোগ পেয়ে গেল। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে ভারতেও। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি শাসক ইংরেজশক্তির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মীদের মনোভঙ্গিরও। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর এবং ১৯৪০ থেকে প্রগতি লেখক সংঘের কাজের তেমন তীব্রতা না থাকায় শিল্প সংস্কৃতির মাধ্যমে ফ্যাসিস্ত শক্তির মোকাবিলায় এবং জনগণের প্রচেষ্টায় ছাত্র ফেডারেশন বা ছাত্রসমাজ অনেকটা দায়িত্ব গ্রহণ করল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই Youth Cultural Institute বা YCI-র ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। বলা যায় যে মূলত YCI-র মধ্য দিয়ে গণনাট্য

সংঘের আগমন বার্তা খানিকটা ত্বরান্বিত হল গান-নাচ-অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে।

১৯৪০ সালের মাঝামাঝি মধ্য কলকাতার মিশন রো এক্সটেনশনে 'কেন্ট হাউস' নামের এক বাড়ির (পি-৩৩ বা পি-৩১) তিনতলায় গড়ে ওঠে Youth Cultural Institute বা YCI বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সেরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। নিজেদের মধ্যে এঁরা প্রচুর আড্ডা দিতেন। নাচগানের আসর জমাতেন, আবার অফুরন্ত আলোচনাও করতেন কবিতা, আর্ট, রাজনীতি ও নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। এদের মধ্যে ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, দেবব্রত বসু, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা ঘোষ, জলি কাউল, দিলীপ রায়, কমল বসু, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, সনৎ লাহিড়ী, তরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত সান্যাল, দিলীপ বসু, সুনীল বসু, চিন্মোহন সেহানবীশ, সরোজ দত্ত, উমা চক্রবর্তী (সেহানবীশ), সুনীল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল ছাত্রসমাজের মধ্যেই। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে YCI (Youth Cultural Institute) পরিচালিত নাটকগুলির মধ্যে থেকেই প্রতিবাদের সুর দানা বাঁধতে শুরু করে। যে নাট্য আন্দোলনের শরিক হবেন ভারতীয় গণনাট্য কর্মিণীরা সেই আন্দোলনের পূর্বেই YCI-এর ভূমিকার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তবে গণনাট্যের প্রসার ও ব্যাপকতা আরও গভীর ও বিস্তৃত। YCI-এর কর্মধারায় নারী-পুরুষের সম্মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে একটা সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়— যা পরবর্তী সময়ে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-য় দূরীভূত হয়। যেমন 'In the Heart of China' নাটক প্রসঙ্গে সুনীল চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, এই ইংরেজি নাটকটিতে মহিলা ও পুরুষ একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁরা কখনওই একই দৃশ্যে অবতীর্ণ হননি। গণনাট্য পর্বে অবশ্য এই ধরনের কোনও বাধানিষেধ ছিল না।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে নানান ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট। ১৯৪০-এ বোম্বাইয়ে তৈরি হল 'জননাট্য'— যার সম্পাদক অনিল. ডি. সিলভা। IPTA-এর প্রথম ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪১-এ ব্যাঙ্গালোর-এ। সারা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক বাতাবরণে প্রতিবাদ প্রতিরোধের সংগ্রাম। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' সর্বভারতীয় সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠার আগের বছরটি অত্যন্ত ঘটনাবহুল হয়ে উঠল। ১৯৪২-এর মার্চ থেকে আগস্টের শুরু পর্যন্ত গান্ধীজি 'হরিজন' পত্রিকায় ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারত জুড়ে শ্লোগান তুললেন আন্দোলনের সপক্ষে। সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠল আগস্ট বিপ্লবের আলোড়নে— ভারত ছাড়ো আন্দোলনে। এই আগস্ট বিপ্লবের (৯ আগস্ট, ১৯৪২) কয়েক মাস আগেই ঘটে গেল এক নৃশংস ঘটনা। ১৯৪২-এর ৮ মার্চ ঢাকায় নিহত হলেন কমিউনিস্ট কর্মী তরুণ মার্কসবাদী সাহিত্যিক সোমেন

চন্দ— ফ্যাসিস্ত ঘাতকদের হাতে। তারই প্রতিবাদে ২৮ মার্চ কলকাতায় সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত হল ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ (Anti Fascist Writers', and Artists' Association)। এই সংগঠন কতকগুলি 'সেল' তৈরি করে যেমন— গণনাট্য সেল, চিত্রশিল্পী সেল, লেখক ও সাংবাদিক সেল ইত্যাদি। গণনাট্য সংঘ ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করল, যদিও গণনাট্যের কাজ শুরু হয়ে গেছে এর আগেই। ১৯৪৩-এর ২৫ মে তৈরি হল 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র সর্বভারতীয় সংগঠন। উল্লেখ্য যে ১৯৪২-সালের ৮ মার্চ সোমেন চন্দের মৃত্যুর মাসখানেক পর ১৩ এপ্রিল কমিউনিস্ট মহিলা কর্মীদের নিজস্ব উদ্যোগে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরি হলে যে ফ্যাসিবিরোধী সভার আয়োজন হয় সেই সভায় কমিউনিস্ট সদস্য ভিন্ন অন্যান্য বহু দল থেকে মহিলারাও যোগ দেন। এখান থেকেই জন্ম হয় 'কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠন সমিতি' (Calcutta Women's Self Defence League)। সমিতির আহ্বায়িকা ছিলেন এলা রিড। জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, ফুলরেণু দত্ত (গুহ), সাকিনা বেগম প্রমুখ ছিলেন কার্যকরী সমিতির সদস্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র বহু সদস্য ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন, রিলিফ ও নানা ধরনের গঠনমূলক কাজে নিজেদের যুক্ত করেন। '... ১৯৪২ সালের মধ্যেই প্রাথমিক পর্যায়ে কলকাতা ও মফস্বল জেলাগুলির বিভিন্ন অঞ্চলে মহিলাদের মধ্যে ফ্যাসিবিরোধী প্রচারের মাধ্যমে, দেশরক্ষা, আত্মরক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে খাদ্য আন্দোলন ও রিলিফের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সূচনাপর্ব তৈরি হলো।'[৫] গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই ধরনের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নারীরা নিজেদের সামাজিক দায়বদ্ধতার যে প্রমাণ রেখেছিলেন তা তাঁদের আত্মবিশ্বাসী প্রত্যয়কে আরও সুদৃঢ় করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলন, ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনে মেয়েদের সরব অংশগ্রহণ নারী সমাজকে চেনা পরিচিত তথাকথিত ছকের বাইরে এনে ফেলল।

শুধু মাত্র ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে নয়, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিকে ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হল এই সময়েই। ১৯৪২-এর ১৬-১৭ অক্টোবর সাইক্লোনে বিধ্বস্ত হয় মেদিনীপুরের খেজুরি, ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার। সাইক্লোনের প্রকোপ এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কবলে পীড়িত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। গণনাট্যের প্রযোজনাতেও ছাপ ফেলল দুর্ভিক্ষের সংকট। বিজন ভট্টাচার্যের যে নাটক বাংলা মঞ্চের গতিপথটাই বদলে দিয়েছিল, সেই 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপটেও উঠে এল দুর্ভিক্ষের ছবি। গণনাট্যের কর্মিণীরাও দুর্ভিক্ষপীড়িত

মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁদের নৈতিক কর্তব্যবোধে। নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন গণনাট্যের শিল্পীরা। 'মন্বন্তরের সঙ্গে হয়তো বলা যায় যে, সবচেয়ে প্রচণ্ড পাঞ্জা লড়েছিল সদ্যপ্রতিষ্ঠিত গণনাট্য সংঘ (আই.পি.টি.এ)— যদি কেউ ভাবেন যে তোপের সামনে গান জুড়ে দেওয়াটা বিলকুল বাতুলতা তো নাচার, বরঞ্চ মনে রাখতে হবে যে অভাবনীয় দুর্দশার চাপে দেশবাসী যখন ম্রিয়মাণ তখন মানুষের নিজের ওপর আস্থা আর গোটা সমাজের বিবেক জাগিয়ে না তুলতে পারলে সর্বৈব ব্যর্থতা ছিল অবধারিত। কমিউনিস্ট পার্টি এ-ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিল; পার্টি সম্পাদক পুরণ্চন্দ জোশির আগ্রহ ছিল অপরিসীম; *Who lives if Bengal dies?* বলে মর্মস্পর্শী পুস্তিকা সে তখন লিখল; গণনাট্য সংঘের এক সমুজ্জ্বল দল ভারত-পরিক্রমা তখন করেছিল, বাংলার যন্ত্রণা আর জীবন-প্রতিভাকে একই সঙ্গে সারা দেশে পৌঁছে দিয়ে অগণিত ভারতবাসীর প্রাণকে আকুল করেছিল।'[৬] 'মহিলা আত্মরক্ষা বাহিনী'র কর্মকাণ্ডও বিশেষ করে উল্লেখ্য এ প্রসঙ্গে।— থিয়েটার মূলত Communcative Art form অর্থাৎ থিয়েটার এক সংযোগ মাধ্যম— যে সময়কালের কথা আলোচনার মুখ্য অংশে বা কেন্দ্রে, সেই সময়কালে থিয়েটার হয়ে উঠল সমাজসেবার, সামাজিক সঙ্কট-সমস্যার সমাধানের অন্যতম হাতিয়ার। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেই গণনাট্যের মহিলা শিল্পীরা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হলেন---- সমাজগঠনের স্বপ্নে তাঁরা এই Communicative Art Form-কে ব্যবহার করলেন। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র (বটুক), সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের পাশাপাশি গণনাট্যের মহিলা শিল্পীদের অবদান যে কতখানি তার মূল্যায়নও অত্যন্ত জরুরি। শোভা সেন, তৃপ্তি ভাদুড়ী (পরে মিত্র), কনক মুখোপাধ্যায়, প্রীতি সরকার (বন্দ্যোপাধ্যায়), অনু দাশগুপ্ত, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, আলপনা গুপ্ত, ঊষা দত্ত (সিং), বিভা সেনগুপ্ত, কল্যাণী কুমারমঙ্গলম, ললিতা বিশ্বাস, নিবেদিতা দাস, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গণনাট্যের কর্মিণীদের কর্মকাণ্ডে অঙ্কিত হল থিয়েটারের ইতিহাসের ভিন্ন ধারা।

গণনাট্যের প্রথম পর্বের 'নবান্ন' নাটকের দুই মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী শোভা সেন ও তৃপ্তি মিত্র সম্পর্কে পৃথক অধ্যায়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে বলে এই অধ্যায়ে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা না করে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হল গণনাট্যের প্রতিনিধিস্থানীয় পাঁচজন কর্মিণীর ওপর। তাঁরা হলেন— মণিকুন্তলা সেন, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী ও নিবেদিতা দাস। এঁরা কেউ-ই নাট্যনির্দেশনায় অংশগ্রহণ করেননি কিন্তু নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রে ভিন্নধারায়

যে নাট্যভাবনা শুরু হল সেই ধারার প্রথম পর্বের ইতিহাসে তাঁদের অবদান ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। নতুন সমাজ গঠনের অভীপ্সা, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের আগুন বুকে নিয়ে যে মহিলারা সামাজিক বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে যুক্ত হয়েছিলেন গণনাট্যের সঙ্গে, নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রকল্পনা, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সর্বোপরি সমাজগঠনের স্বপ্ন যাঁদের চালিত করেছিল— তাঁদের জীবনভাবনা, কর্মপ্রেরণার উৎস সন্ধান এই অধ্যায়ে। শিল্পী হওয়ার তাগিদে নয়, মঞ্চমায়ার আকর্ষণে নয়, এক অন্তর্গত উদ্দীপনায় তাঁরা কাজ করেছিলেন। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র সাংস্কৃতিক সেল-এ নৃত্য-সঙ্গীত-অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁদের সাহসী প্রত্যয়ী পদক্ষেপ নারীসমাজে একটা ভিন্ন স্বরের জন্ম দিল। আগামী দিনের নাট্যমনস্ক নারীদের সামনে খুলে গেল উন্মুক্ত প্রান্তর। পেশাদারি শিল্প সংস্কৃতির খড়ির গণ্ডি পেরিয়ে এঁরা নবজীবনের জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। গণনাট্যের পর্যায়ে নাট্যের ক্ষেত্রে মেয়েদের সাহসী সক্রিয় ভূমিকা যেন পাটাতনের মতো, নাট্যনির্মাণ ও নির্দেশনায় সেখানেই মেয়েদের সচেতন আত্মপ্রকাশ। হয়তো প্রত্যক্ষভাবে নয় কিন্তু পরোক্ষভাবে এবং আগামী দিনের নারী নির্দেশকদের কাছে তাঁদের কাজ কতটা অনুপ্রেরণার বা কতটা নতুন পথ উন্মোচনের তারই অনুসন্ধান এই অধ্যায়ে। কেন নাট্যনির্মাণ ও নির্দেশনা সংক্রান্ত গবেণষাকর্মে প্রথমেই গুরুত্ব পেল গণনাট্য সংঘের কর্মিণীদের কথা— তা কয়েকটি সূত্রে উপস্থাপিত করা হল— (১) তাঁরা নাট্যক্ষেত্রে একটা নতুন পথ তৈরি করলেন। নাটকে অভিনয় করাটা তাঁদের কাছে পেশা নয়— একটা নির্দিষ্ট আদর্শের তাগিদে অভিনয়-আকাঙ্ক্ষা তাঁদের আলাদা করে দিল পূর্ববর্তী অভিনেত্রীদের থেকে। (২) বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ গণনাট্যের মহিলাদের প্রাণিত করেছিল। বেশির ভাগ অভিনেত্রীই ছিলেন সাম্যবাদে দীক্ষিত। নতুন একটা সমাজ গঠনের স্বপ্ন বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের দাঁড় করিয়েছিল। ফ্যাসিবাদ ও ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধাচারণে তাঁরা হাতিয়ার করেছিলেন নাচ গান নাটককে। এই আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাবটাই তাদের স্বতন্ত্র জায়গা করে দিয়েছিল। (৩) এই গণনাট্যের কর্মিণীরা বাংলার জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মহিলাকে সংগঠিত করেছেন। নাটকের মাধ্যমে জনগণকে বিনোদনের স্রোতে না ভাসিয়ে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার শক্তি জুগিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের সাংগঠনিক শক্তি নাট্যের  ক্ষেত্রে ছিল প্রেরণাস্বরূপ। (৪) চারের দশকে নব সংস্কৃতির যে পথ মুক্ত হয়েছিল তার অংশীদার হতে দ্বিধা করেননি দায়বদ্ধ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের এই কর্মিণীরা। শুধু পুরুষের সহযোদ্ধা হিসেবে নয়— এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ছিল তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। (৫) বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে খুবই কঠিন ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়া। তবু এই কাজটা

তাঁরা করতে পেরেছিলেন তাঁদের আত্মপ্রত্যয়ে— বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয়ক্ষেত্রেই নারীস্বাধীনতার প্রতীক ছিলেন গণনাট্যের এই কর্মিণীরা— তাই তাঁদের কথা ব্যতিরেকে বাংলার মঞ্চের মহিলা নির্দেশক নির্মাণকারীদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

## মণিকুন্তলা সেন (১৯১০-১৯৮৭)

গণনাট্যের কর্মিণীদের মধ্যে যাঁরা ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে এবং ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অধীনতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে নাট্যআন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য মণিকুন্তলা সেন-এর নাম। স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের কিংবদন্তি এই কমিউনিস্ট নেত্রীর জন্ম ১৯১০-এর ১১ ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। শিক্ষিত সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে মণিকুন্তলা সেনের ছোটবেলা অতিবাহিত হয়েছে একই সঙ্গে ধর্মীয়, রাজনৈতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে। বৃহত্তর জনজীবনের সংস্পর্শে আসার তাগিদে তিনি বেছে নিলেন শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক জীবনই। বরিশালের বি.এম. কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর তিনি চলে আসনে কলকাতায় এবং ১৯৩৮-এ এম.এ. পাশ করে যোগ দেন স্কুলের চাকরিতে। কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমেদ, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ নেতার মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি হয়। ১৯৪৩ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে কাজ করতে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের অস্থির সময়ে মণিকুন্তলা সেনের বহুমুখী কর্মময় জীবন তাঁকে চিহ্নিত করেছে একজন দায়িত্ববোধসম্পন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে। গণআন্দোলন ও নারীজাগরণে তাঁর ভূমিকা বিস্ময় উদ্রেক করে। ১৯৪১ সালে হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করলে বিশ্বযুদ্ধ যখন জনযুদ্ধের আকার ধারণ করে, সেই সময়ে মণিকুন্তলা সেন পার্টির প্রচার আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময়ে তাঁকে কৃষক-শ্রমিক মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা জাগাতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তরফ থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় জেলায় ঘুরতে হয়েছে, বক্তৃতা দিতে হয়েছে মাঠে-ময়দানে। মণিকুন্তলা সেন মিটিং-এ আসছেন শুনলে গ্রামের মেয়েরা ছুটে আসত। সংগঠক ও বক্তা হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ! তাঁকে বলা হোত ‘She Bankim’. ‘‘জনসভায় মণিদির বক্তৃতা শুনে আমাদের তদানীন্তন পার্টি সম্পাদক কমরেড পি সি যোশী বলেছিলেন ‘Manikuntala is a She-Bankim’ (‘মণিকুন্তলা একজন মহিলা-বঙ্কিম’, উল্লেখ্য, তখন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির বজ্রকণ্ঠের বক্তৃতা ছিল অসামান্য জনপ্রিয়)।’’[৭] এইরকম তীক্ষ্ণধী, বাগ্মী এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা বিধায়ক মণিকুন্তলা সেন ১৯৬৪

সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজনের পর রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যান এবং শেষ জীবনে মণিকুন্তলা সেন ধর্মীয় প্রেরণার আশ্রয় নেন।  দীক্ষা নেন রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী ভূতেশ্বরানন্দের কাছে। তাঁর স্বামী কমিউনিস্ট জলি কাউল তাঁর আগেই ১৯৬২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৮৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয় কড়েয়া রোডে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে। যিনি ছিলেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে যাঁকে গোপন আস্তানায় দিন কাটাতে হয়েছে, ধরা পরার পর যাঁকে মেদিনীপুর ও প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি অবস্থায় থাকতে হয়েছে, সেই মণিকুন্তলা সেন কেন ছেড়ে গেলেন তাঁর জীবনযাপনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা পার্টির সাহচর্য— তা অন্যত্র আলোচনার বিষয়, কিন্তু কেন তাঁকে গণনাট্যের কর্মিণীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হল তার কতকগুলো কারণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, মণিকুন্তলা সেন অভিনয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষায় নাট্য আন্দোলনে যুক্ত হননি। তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং গণনাট্যের মতাদর্শ এক জায়গায় এসে মিলে গিয়েছিল বলেই তিনি গণনাট্য প্রযোজিত দু'-একটি নাটকে অংশগ্রহণ করলেন এবং গণনাট্যের কর্মী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর যে রাজনৈতিক বিশ্বাস— গণনাট্যের শিল্পীরাও সেই রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকেই নাট্যআন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন— এ কারণেও তিনি গণনাট্যের অন্যতম কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। যদি রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্য থাকত, তা হলে হয়তো মণিকুন্তলা সেন অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হতেন না। তৃতীয়ত, গণনাট্যের প্রয়োজনেই এই নেত্রী, বাগ্মী, সমাজকর্মী নিজেকে নাট্যআন্দোলনে যুক্ত করেছেন— তাঁদের আহ্বান উপেক্ষা করার মনোভঙ্গি তাঁর ছিল না। মূলত মণিকুন্তলা সেনের কাছে অভিনয় ছিল পার্টির নানান কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ— সেইভাবেই নাট্যাভিনয়কে তিনি দেখেছেন এবং গণনাট্যের প্রথম পর্বে দায়িত্বশীল কর্মীশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর জীবন ছিল বিচিত্রমুখী— কর্মব্যস্ত।

মণিকুন্তলা সেন

| কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী | সমাজসেবায় দক্ষ সংগঠক | বাগ্মী (দায়িত্ববোধ +জনপ্রিয়তা) | গণনাট্যের কর্মীশিল্পী |
|---|---|---|---|
| (১৯৪৩ সালে পার্টি সদস্য হওয়ার পর তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন) | | | |

মণিকুন্তলা সেনের কমিউন ছিল ৬ এইচ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড ও ১১ বি, ফার্ন রোড। তিনি নিজের জেলার বহু ‘ঘরছাড়া’, ‘দেশছাড়া’ ছেলেমেয়েদের স্থান দিয়েছেন নিজের কমিউনে। ছোটবেলায় দেশপ্রেমের যে বীজ তাঁর মধ্যে উপ্ত করেছিলেন তাঁর মা-তা ভবিষ্যতে বটবৃক্ষের মতো শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে বহু মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল। মা-র মধ্যে তিনি লক্ষ করেছিলেন কত নিরুচ্চার অথচ গভীর হতে পারে দেশ ও দেশপ্রেমীদের প্রতি সম্মান-আবেগ,— দেশসেবা, মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার— পীড়িত দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের পথ দেখাবার কাজটাই করতে চেয়েছিলেন মণিকুন্তলা সেন এবং জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেই কাজটাই করে গেছেন। ১৯৪৩-এর সংকটকালীন অবস্থায়, পঞ্চাশের মন্বন্তরে, কলকাতায় জাপানি বোমার আঘাতের সময়, বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরোধিতাকালে মণিকুন্তলা সেনের মতো নেত্রীরাই নারীসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে পথ দেখিয়েছিলেন, শিখিয়েছিলেন যে নারী আন্দোলন কোনও পৃথক আন্দোলন নয় তা গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনেরই আরেকটি দিক।

‘মহিলা আত্মরক্ষা-সমিতি’র প্রথম সম্মেলন (১৯৪৩) থেকে মণিকুন্তলা সেন ছিলেন এই সমিতির অগ্রণী নেত্রী। ১৯৪৯-৫১ সালে যখন তিনি প্রথম মেদিনীপুর ও পরে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি তখনও তিনি সেখানে বন্দিদের অভাব-অভিযোগ, সমস্যা-সঙ্কট নিয়ে সংগ্রাম-অনশন-লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা এম. এল. এ মণিকুন্তলা সেনের বক্তৃতা শুনতে উদগ্রীব হয়ে থাকত সাধারণ মানুষ থেকে শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত, সর্বস্তরের মানুষ। বেলা দত্তগুপ্ত মণিকুন্তলা সেন সম্পর্কে এক স্মৃতিচারণায় জানাচ্ছেন তাঁর বক্তৃতা শোনার অভিজ্ঞতা। ১৯৪১-৪৩ কলকাতার অনিশ্চিত জনজীবনে যখন তিনি হস্টেল-বন্দি তাঁর একান্ত সঙ্গী ছিল খবরের কাগজ। তিনি লিখছেন— ‘হঠাৎ একদিন খবরের কাগজের পাতায় আমার দেখা সেই অসাধারণ মহিলার ছবি। দক্ষিণ কলকাতার কোন এক পার্কের জনসমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন। নাম মণিকুন্তলা সেন। সেই হঠাৎ দেখা মহিলার নামটা জানা হল। তখনও তাঁর বক্তৃতা শুনিনি।... ১৯৪৫ সনে এম এ পরীক্ষা শেষ হল। কলকাতা তখন স্বাভাবিক। সেই সময়েই শুনেছি মণিকুন্তলা সেনের বক্তৃতা বিভিন্ন পার্কে। তাঁর কণ্ঠ ভুলে যাবার নয়। ভুলে যাবার নয় তাঁর বক্তব্য, তাঁর ওজস্বিনী কণ্ঠ।’[৮]— মণিকুন্তলা সেনের বক্তৃতা শোনার স্মৃতি এবং তাঁর দৃপ্ত ওজস্বী বক্তৃতা বহু মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। ১৯৫৫ সালে ৭-১০ জুলাই সুইজারল্যান্ডের সুসান শহরে যে বিশ্বমাতৃ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে উপস্থিত ছিলেন সারা বিশ্বের মধ্য থেকে ৬৯ দেশের প্রায় ২০০০ প্রতিনিধি। ভারতবর্ষ থেকে যে ৪৭জন বিশিষ্ট মহিলা

প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ‘জাতীয় মহিলা ফেডারেশন’ ও ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’র প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন, গীতা মুখার্জি প্রমুখ। বিশ্ব মাতৃসম্মেলনে উপস্থিত থেকে যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করলেন তার প্রতিফলন ঘটল তাঁর জীবনে। এই রকম দৃঢ় মানসিকতা ও রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে মণিকুন্তলা সেন যেমন সমাজসেবা করেছেন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে নানান সংগঠনে যুক্ত থেকে প্রচার ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে জনজাগরণ ও নারীজাগরণের আন্দোলন চালিয়ে গেছেন, সেই মানসিকতাই তাঁকে নাট্যাভিনয়ে প্রাণিত করেছে। মণিকুন্তলা সেনের জীবনে অভিনয় ছিল আন্দোলনেরই একটা দিক।

তিনি শুধু একজন কমিউনিস্ট নেত্রী বা সংগঠক বা সুবক্তা ছিলেন না, ছিলেন একজন অসামান্য অভিনেত্রীও। ‘গণনাট্য সংঘ’ প্রযোজিত বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র পরিচালিত ‘নবান্ন’ নাটকে পঞ্চাননীর চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের কথা সুবিদিত। কিন্তু তারও আগে তিনি অভিনয় করেছিলেন ‘শেষরক্ষা’ নাটকে। প্রেক্ষিত ছিল একেবারেই অন্য রকম।

১৯৪২ সালে বন্যায় মেদিনীপুরের জনজীবন বিধ্বস্ত হলে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে সাহায্য নিয়ে যেতে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করেন। শেষে এই শর্তে রাজি হন যে রিলিফ নিয়ে সেখানে যদি তাঁরা যেতে পারবেন ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের সংগ্রামীদের ধরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মণিকুন্তলা সেন সেই শর্ত মানতে রাজি হননি। তিনি প্রস্তাব দেন যে টাকা তুলে রিলিফ পাঠানো হবে— সেক্ষেত্রে অভিনয় করে টাকা তোলা হবে। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনীত হল রবীন্দ্রনাথের ‘শেষরক্ষা’। অভিনয়ে ছিলেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়— চন্দ্রমাধব, রেণু চক্রবর্তী— ক্ষান্তমণি, বিনতা রায়— ইন্দুমতী, বাণী দাশগুপ্ত— কমলমুখী আর ঝি-এর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন মণিকুন্তলা সেন। ম্যাজিস্ট্রেটের শর্ত না মেনে নিজেদের মনের জোরে অভিনয় করে সেই অভিনয় থেকে অর্জিত অর্থ মেদিনীপুরের বন্যা-কবলিত মানুষের রিলিফের কাজে গোপনে পাঠানো হয় ত্রাণের জন্য। দেশপ্রেমিকদের ধরিয়ে দেওয়ার শর্ত তারা মানেননি। মণিকুন্তলা সেনের জেদটাই বজায় ছিল।

চল্লিশের দশকে ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাঁরা নাচ গান অভিনয় করতেন তাঁদের কাছে বিষয়টা ছিল না শুধু Performing Art— তা ছিল আদর্শ আর আন্দোলনের অপর পথ। বাংলায় গণনাট্য সংঘ’-র যাত্রা শুরু হয় বিনয় ঘোষের ‘ল্যাবরেটরী’, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ‘হোমিওপ্যাথী’ ও বিজন ভট্টাচার্যের ‘জবানবন্দী’— এই ক’টি নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। ‘জবানবন্দী’ নাটকে

একটি ছোট্ট চরিত্রে মণিকুন্তলা সেন যে অভিনয় করেছিলেন দুটি সূত্রে সে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে— (১) মণিকুন্তলা সেন নিজেই জানিয়েছেন 'এর আগে 'জবানবন্দী' নামে ছোট্ট একটি একাঙ্ক নাটিকায় আমি ওদের সঙ্গে পার্ট করেছিলাম। এইটুকুই আমার অভিজ্ঞতা। এ নাটিকাও বিজনের লেখা।'[৯]

(২) কমিউনিস্ট নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায় তাঁর 'নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা' গ্রন্থে ১৯৪৪-র ৮ জুলাই-এর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র সাহায্যকল্পে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র বাংলা শাখা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে এই অনুষ্ঠানটি করে। সেখানে গণসঙ্গীত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নবজীবনের গান, শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে 'মধুবংশীর গলি' আবৃত্তির সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় 'জবানবন্দী' নাটক। সেখানে চরিত্রলিপির কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায় এবং বেন্দার মা-র ভূমিকায় মণিকুন্তলা সেনের নামটি পাওয়া যায়। 'এই জবানবন্দী নাটক হলো সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের দিনে গাঁয়ের চাষী পরাণ মণ্ডলের বিপ্লবী জীবনের নির্ভীক জবানবন্দী। এই অভিনয়ে পরাণ মণ্ডলের ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসু, বেন্দা : বিজন ভট্টাচার্য, পদা : শম্ভু মিত্র, বেন্দার মা : মণিকুন্তলা সেন, বেন্দার স্ত্রী : তৃপ্তি ভাদুড়ী,... প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।'[১০]

'জবানবন্দী' প্রথম অভিনীত হয় ১৯৪৪-এর ৩ জানুয়ারি। বিজন ভট্টাচার্য নাটকটি পরিচালনা করেন এবং মূল চরিত্র বেন্দার ভূমিকায় অভিনয় করেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন গঙ্গাপদ বসু (পরাণ মণ্ডল), সুধী প্রধান (পদা), জলদ চট্টোপাধ্যায় (রাইচরণ), অনু দাশগুপ্ত (বেন্দার মা), তৃপ্তি মিত্র (বেন্দার বউ) প্রমুখ। 'বহুরূপী' নাট্যপত্রিকা 'নবান্ন' স্মারক সংখ্যার দ্বিতীয় সংকলন জুন, ১৯৭০-এ 'জবানবন্দী' নাটকটি যখন পুনর্মুদ্রিত হয় তখন শিল্পী তালিকা প্রকাশিত হয়। লক্ষণীয় যে, এই শিল্পী তালিকায় মণিকুন্তলা সেনের নাম নেই। তবে উপরোক্ত দুটি সূত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে অন্তত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে কোনও না কোনও সময়ে মণিকুন্তলা সেন 'জবানবন্দী' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে হয়তো কখনও তিনি, কখনও অনু দাশগুপ্ত বেন্দার মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। যে জীবনটাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মণিকুন্তলারা, যে জীবনটার মধ্য দিয়ে পথ হাঁটছিলেন তাঁরা— সেই জীবনটাই উঠে এসেছে এই নাটকে। ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা গ্রামবাসী মানুষের হাহাকার যন্ত্রণার কাহিনি, কলকাতার দুর্ভিক্ষপীড়িত জীবনচিত্র— এ সবই 'জবানবন্দী' নাটকের বিষয়। গ্রামে খাবারের সংস্থান করতে না পেরে দলে দলে মানুষ নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে ভিড় করছে। আত্মকথায় মণিকুন্তলা সেন লিখছেন সেই অভিজ্ঞতারই কথা— 'গ্রামে একদানা চাল নেই। এমন অবস্থায় গ্রামকে গ্রাম উজাড়

করে মানুষগুলো শহরে ছুটল। এখানে এসে ওরা আস্তানা পাতল রাস্তায়। কলকাতা শহরে আরও একটি জিনিস ওই সময় থেকে শুরু। সেই যে মানুষরা ফুটপাথে বসতি স্থাপন করল তা আর উঠল না। বরং ফুটপাথের সংসার এখন আরও জমজমাট।'[১১]

প্রত্যক্ষ করা জীবন আর নাটক এক হয়ে যাচ্ছে। মণিকুন্তলা সেন এবং সেই সময়ের সচেতন কর্মীরা মিলে শুরু করে দিলেন জনসেবার কাজ। কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ করেছেন তাঁরা— খেয়ে, না খেয়ে। কিন্তু তার মধ্যে ছিল একটা আনন্দ।

এই সময় আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন 'ভিক্ষার চাল' (চালের দাম তখন মণ প্রতি ২৮ টাকায় উঠেছিল) আর ক্যান্টিনের খিচুড়ি খাইয়ে লোককে বাঁচানো যাবে না। তাই চালের দাম কমানোর জন্য তাঁরা আন্দোলনের পথে নেমেছিলেন। ফজলুল হকের মন্ত্রিত্ব তখন। মেয়েরা জমায়েত হল টাউন হলে। বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে মেয়েরা এসে এই আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। কয়েকজন মহিলা আইনসভায় ঢুকতে অনুমতি পেয়েছিলেন কারণ তাঁদের কার্ড ছিল। সেই কার্ড দেখাতে রক্ষীরা গেট খুলে দিলে তাঁদের পেছন পেছন প্রায় পাঁচ হাজার 'নারী-মিছিল' ঢুকে গিয়েছিল আইনসভার প্রাঙ্গণে। আদায় করে নিয়েছিলেন তাঁদের প্রাপ্য। মহিলা সংগঠনের নেতৃত্বে এই মিছিলের সার্থকতা ছিল সেখানেই। কিছু দিনের মধ্যেই কলকাতায় ১৬টা ন্যায্য চালের দোকান এবং বেশ কয়েকটি ক্যান্টিন চালু হয় যেখান থেকে পাড়ার ক্যান্টিনগুলোতে খিচুড়ি পাঠানো হত। এই সামান্য আহার্যের জন্য গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষগুলোর যে হাহাকার, লড়াই, তারই এক মর্মন্তুদ বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন বিজন ভট্টাচার্য তাঁর 'জবানবন্দী' নাটকে। 'জবানবন্দী' নাটকের প্রযোজনা ছিল সহজ সরল। যে 'নবান্ন' নাটক গণনাট্যের মাইলস্টোন তার চাইতে 'জবানবন্দী'র অভিনয়-সংখ্যা কিন্তু বেশি। এ ছাড়া এ কথাও বলা হয় যে, নাটক নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়া বলতে যা বোঝায় 'জবানবন্দী' নাটকের শিল্পীরা তাই করে গিয়েছেন। জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই মণিকুন্তলা সেনের মতো সমাজকর্মী, নেত্রীরা অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাটকের একটা ভিন্ন পথ তৈরি করেছিলেন।

'জবানবন্দী'র পর 'নবান্ন' নাটকে অভিনয় করেন মণিকুন্তলা সেন এবং এই নাটকে তাঁর অভিনয় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। 'নবান্ন' গণনাট্যের উল্লেখ্য প্রযোজনা শুধু নয়, বাংলার নবজাগ্রত সংস্কৃতির ধারক— একটা নতুন যুগের সূচকও। এ নাটকের মূল দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শোভা সেন

(রাধিকা) ও তৃপ্তি মিত্র (বিনোদিনী)। মণিকুন্তলা সেন এ নাটকে একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কেন তিনি 'নবান্ন' নাটকে অভিনয়ে সম্মতি দিলেন? এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট হয় কোথায় তাঁর নেত্রীসত্তা ও অভিনেত্রী সত্তা মিলে গিয়ে ভিন্ন অভিঘাত তৈরি করেছে— 'একদিন সুধী প্রধান ও বিজন ভট্টাচার্য পার্টি অফিসে আমাকে ধরলো, আপনাকে একটা পার্ট করতে হবে নবান্নে। নাটকের তখন রিহার্সাল চলছে। মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী দেবীর চরিত্রের ছায়া নিয়ে একটি চরিত্র রচনা হয়েছে নবান্নে ... সেটি নাকি আমাকে না হলে মানাবেই না।... মাতঙ্গিনী দেবীর অমিত সাহসের কাহিনীর প্রতি আমি এমনিতেই দুর্বল ছিলাম। তাঁরই ছায়া অবলম্বনে চরিত্র এবং পার্ট করবো আমি এটা ভাবতেই মনে কেমন উত্তেজনা অনুভব করলাম ও 'হ্যাঁ' বলে দিলাম।'[১২]

কেন মাতঙ্গিনী দেবীর প্রতি তাঁর এই দুর্বলতা? এ প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন— এই বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে, মেদিনীপুর জেলাই সম্মুখ সমরে অল্পদিনের জন্য হলেও অবতীর্ণ হয়েছিল। যে সব নিরস্ত্র গ্রামবাসী প্রাণ দিয়েছিলেন— তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। পুলিশ তাঁকে হত্যা না করে হাতের ত্রিবর্ণ পতাকাটি কেড়ে নিতে পারেনি। এই কারণেই মণিকুন্তলা সেন রাজি হলেন মাতঙ্গিনী হাজরার চরিত্রের আদলে তৈরি পঞ্চাননী চরিত্রে অভিনয় করতে। বাস্তব জীবনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ প্রকাশ করার একটা সাংঘাতিক হাতিয়ার হয়ে উঠল 'নবান্ন' নাটক। প্রশ্ন উঠতেই পারে বিজন ভট্টাচার্য কেন মণিকুন্তলা সেনকে নির্বাচন করলেন— তিনি তো সে অর্থে অভিনেত্রী নন! কিন্তু পঞ্চাননী চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন তা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন নাট্যকার— '...প্রথমে মণিদি অভিনয়ে আপত্তি করেন উনি কখনও অভিনয় করেননি বলে। কিন্তু আমি বলি— মণিদি, মাতঙ্গিনী চরিত্র একমাত্র আপনিই করতে পারেন। কারণ ও চরিত্র অভিনয় করতে হলে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন তা একজন রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে আপনারই থাকা সম্ভব— কোনও সাধারণ অভিনেত্রীর এ ক্ষমতা থাকা অসম্ভব। এবং মাতঙ্গিনীর চরিত্রে অনেকেই অভিনয় করেছেন— কিন্তু মণিদির অভিনয়ে যে গভীরতা ছিল তা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।'[১৩]

বক্তৃতার মতো অভিনয়েও ছিল তাঁর নজরকাড়া পারদর্শিতা। তাঁর অভিনয় সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্যে এর যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়— (১) 'তাঁর বর্ণময় চরিত্রের বা জীবনের আর একটি উদাহরণ হচ্ছে যে তিনি অসাধারণ অভিনেত্রী ছিলেন। *নবান্ন* নাটকে তাঁর পঞ্চাননীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়ের কথা সবাই জানে।'[১৪]

আনন্দবাজার পত্রিকা 'গণনাট্য সংঘের নবান্ন' শিরোনামে লিখল— (৩) 'প্রথম দৃশ্যের সংযোজনা খুব চমকপ্রদ হইয়াছিল।'[১৫] —আমরা পাঠকমাত্রই জানি যে প্রথম দৃশ্যেই ছিল পঞ্চাননীর বেশে মণিকুন্তলা সেনের প্রবেশ। প্রথম দৃশ্যের সংযোজনা চমকপ্রদ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ আমরা অনুমান করতে পারি পঞ্চাননী চরিত্রের যথাযথ রূপায়ণ। চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই বোধহয় তাঁর আদর্শের নারী মাতঙ্গিনী হাজরার বিদ্রোহী মনোভাবটি তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রথম দৃশ্যের সংযোজনার সার্থকতার কারণ পঞ্চাননীর ভূমিকায় মণিকুন্তলা সেনের মঞ্চে অবতরণ। 'নবান্ন'র কুশীলবদের মধ্যে মণিকুন্তলা সেনের অংশগ্রহণ যে প্রেরণা ও আদর্শের সঞ্চার করেছিল তার উল্লেখ করে শোভা সেন লিখছেন— 'বি.এ. পাশ করেই গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েছি থিয়েটারে। প্রথমেই নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করি *নবান্ন* নাটকে। রোজ মহলা দিতে যাই হ্যারিসন রোডের এক বিরাট বাড়ির তিনতলায়। একদিন দেখি মণিদি ও কমরেড গোপাল হালদার এসেছেন মহলায়। বিস্মিত হয়ে খবর পেলাম, ওঁরা নাকি আমাদের সঙ্গে এই নাটকে অভিনয় করবেন। মণিদি করবেন মাতঙ্গিনী হাজরার চরিত্রে—আর গোপালদা এক ভিখিরির চরিত্রে। পার্টির ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। মণিদি তো তখন বিরাট মহিলা নেত্রী। ওঁর সময় হল কী করে? তাই ভাবলাম পার্টি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর কতখানি গুরুত্ব দিয়ে ওঁদের এই কাজে নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমরাও তো এত বড়ো কর্মকাণ্ডের অংশীদার। প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অক্টোবর মাসে আমাদের নাটক অভিনীত হল শ্রীরঙ্গম মঞ্চে।'[১৬]

আর প্রথম দিনের অভিনয়ের উত্তেজনা তো ছিলই। মণিকুন্তলা সেন পরেছিলেন সাদা থান। আর বাকি কুশীলবরা ছেঁড়া জামাকাপড়-গায়ে কালিঝুলি মেখে সেজেছিলেন ভিখারির বেশে। প্রথম দৃশ্যেই ছিলেন মণিকুন্তলা সেন। শোভা সেনের বয়ান অনুযায়ী 'প্রথম দৃশ্যই ছিল চমকপ্রদ। '৪২-এর আন্দোলনের একটি জ্বলন্ত চিত্র। উঁচু প্ল্যাটফর্ম-এর ওপাশে কৃষকদের ছুটোছুটি, নিশান হাতে ছুটে এলেন মাতঙ্গিনী হাজরা, পেছনে আগুন, লুঠতরাজ। মাতঙ্গিনী এদিক ওদিক ছুটছেন, বুকে লাগল গুলি, লুটিয়ে পড়লেন।... দর্শক স্তম্ভিত। প্রথমেই দর্শকদের মধ্যে এক চমক সৃষ্টি করতে হয়েছিল নবান্ন-এ। ... আজ  তাই মনে পড়ছে, সেই স্মরণীয় ঐতিহাসিক দৃশ্যে মণিদিরও অবদান কম ছিল না।'[১৭] মণিকুন্তলা সেনও মনে করেন যে, এই যে প্রথম ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা কালিঝুলি মেখে ও ছেঁড়া জামাকাপড় পড়ে মঞ্চে অভিনয় করলেন তা এক নতুন পথের দিশা দেখাল। মহিলা শিল্পীদের সঙ্গে 'নবান্ন'-র মাধ্যমেই সংযোগ ঘটেছিল মহিলা সমাজকর্মীদের। মণিকুন্তলার মতে, 'গর্বের বিষয়,

যেসব মহিলা শিল্পীরা সেদিন মঞ্চে প্রথম পদার্পণ করেন এবং আজ যারা বিখ্যাত হয়েছেন, তাদের বেশিরভাগই ছিলেন নারী-আন্দোলনের কর্মী। আন্দোলনের সঙ্গে ওই সব শিল্পীদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল এবং ঘটনাগুলো চোখের উপরে ঘটতে দেখেছিলেন বলেই তাঁরা অমন জীবন্ত অভিনয় করতে পেরেছিলেন। '... এরকম একটি চরিত্রে অভিনয় করতে আমার খুব ভালো লাগত। ভালো লাগার কারণ বোধহয় মাতঙ্গিনীর ভূমিকায় নিজেকে ভাবতে পারা। অবশ্য আমার পক্ষে নাটকের সঙ্গে যুক্ত থাকা অল্পদিনই সম্ভব হয়েছিল।'[১৮] এভাবেই গণনাট্য আন্দোলন সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। মণিকুন্তলা সেনের কাছেও এই অভিনয়— তাঁর আন্দোলন মনোভঙ্গিরই আরেক দিক।

অভিনয় বন্ধ হলেও তাঁর আন্দোলন থেমে থাকেনি। পরপর দু'বার তিনি কালীঘাট কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন— দশ বছরের জন্য বিধায়ক হিসেবে কাজ করেছেন। তৃতীয়বার নানা কারণে তাঁর পরাজয় ঘটে। পঁচিশ বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য থাকলেও পার্টি বিভাজনের পর সরে দাঁড়ান। অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন— যে আদর্শ ও কর্মোদ্দীপনা নিয়ে রাজনীতির অঙ্গনে এসেছিলেন, সেখান থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন নাটকে অভিনয় করার। সেই মণিকুন্তলা সেনকে হয়তো আর পাওয়া গেল না তাঁর মতো করে— অভিনয়ে, বক্তৃতায়, সমাজসেবায় কিংবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। তীক্ষ্ণধী বাগ্মী এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা বিধায়ক মণিকুন্তলা সেন ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের পর পার্টির প্রতি কিছুটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যান। শেষ জীবনে দীক্ষা নেন রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী ভূতেশ্বরানন্দের কাছে। তবু তাঁর কর্মক্ষেত্রে তিনি হয়ে থাকলেন দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যক্তিত্ব, গণনাট্য সংঘ-র সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হারানো প্রাপ্তির শরিক, এবং পরবর্তী যুগের নাট্যকর্মিণী যাঁরা নির্দেশনার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবেন তাঁদের অনুপ্রেরণা স্বরূপ। কারণ যে অনমনীয় দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্ব, পরিচালন ক্ষমতার অধিকারী হলে একজন নাট্যনির্দেশক যথার্থভাবে কাজ করতে পারেন সেই গুণগুলো বা বৈশিষ্ট্যগুলি মণিকুন্তলা সেনের মধ্যে লক্ষ করা যায়। যদিও তা নাট্য নয়, ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। তবু যে সময়ে দাঁড়িয়ে মণিকুন্তলা সেনের মতো নারীরা গণনাট্যের হয়ে কাজ করেছেন নাট্যক্ষেত্রে, পরবর্তী সময়ে মেয়েদের তা প্রাণিত করল নির্ভীকতায়-সম্মানে-দৃঢ়তায়।

# করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০১)

আই পি টি এ বা নাটকের সঙ্গে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের পরিধি বা সময়কাল দীর্ঘ না হলেও যে অধ্যবসায় এবং সাহসের সঙ্গে ও রাজনৈতিক সংকটকালে অভিনয় করেছেন সেই দুরূহ অভিজ্ঞতালব্ধ নাট্যকর্মিণীর জীবনকথা ব্যতীত প্রথম অধ্যায় 'প্রতিবাদের ভাষা প্রতিরোধের আগুন'-এর আলোচনা অসম্পূর্ণ। বাংলাদেশের গণনাট্য সংঘ-র ইতিহাসের দুটি পর্বকে কেন্দ্র করেই আলোচনা বেশি হয়— (১) জবানবন্দী-নবান্ন-জীয়নকন্যা- শহীদের ডাক-এর সময়কাল অর্থাৎ ১৯৪৪-৪৭ আর (২) বিসর্জন-ভাঙাবন্দর-বাস্তুভিটা-দলিল-রাহুমুক্ত-বিশে জুন এর সময়কাল ১৯৫০-৫৫। কিন্তু আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব অনেক সময় অগোচরে থেকে যায়— সেই সময়কাল হল যখন কমিউনিস্ট পার্টি ও গণনাট্য সংঘ বেআইনি বলে ঘোষিত। এই সময়কালে সাহিত্যচর্চা চিত্রকলাচর্চা ইত্যাদি শিল্পচর্চার চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক ছিল নাট্যচর্চা। এই সময়কালের নাট্যচর্চার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র দক্ষিণ কলকাতা শাখার অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে ছিলেন— সজল রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই কঠিন সময়েই থিয়েটারের কাজ করেছেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্যের অন্যান্য শিল্পীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

এই সময়ে থিয়েটার করাটা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকির বিষয়। বিশেষ দায়বদ্ধতা না থাকলে এই ঝুঁকিটা নেওয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে যাঁরা জীবনের আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে থিয়েটারকে গ্রহণ করেছিলেন। এক ভিন্নতর শোষণ-শাসন মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা। এই স্বপ্নের পৃথিবীতে পৌঁছনোর রাস্তাটা বড় সহজ ছিল না। আর সেই কঠিন পথটাই বেছে নিয়েছিলেন গণনাট্যের কর্মীরা। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্য প্রযোজিত বহু নাটকে অভিনয় করেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর অভিনয় কাঠামো বা মানসিক গড়নে গণনাট্যের ভূমিকা ছিল সবথেকে বেশি। গণনাট্যেই তাঁর হাতেখড়ি। পরবর্তী সময়ে যিনি হয়ে উঠবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ছায়াছবি 'পথের পাঁচালি'র মুখ্য অভিনেত্রী, সেই 'সর্বজয়া'রূপী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের হাতেখড়ি কিন্তু গণনাট্য সংঘ-য়। কেন তিনি থিয়েটারে এলেন? তাঁর গণনাট্য সংঘ-এ যোগ দেওয়ার পূর্বেই তিনি বিবাহসূত্রে এমন একটি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়েন যেখানে তাঁর স্বামী শুধু নন— শ্বশুর-শাশুড়ি ও পরিবারের সদস্যরা সবাই মার্কসবাদে বিশ্বাসী এবং কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক। কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন তাঁর

আত্মজীবনীতে লিখেছেন— 'বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে থাকতেন সুনীতকুমার ব্যানার্জি সিটি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। তাঁর পুত্রবধূ করুণা ব্যানার্জি পথের পাঁচালীর শিল্পী। বাড়ির সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন। অধ্যাপক মহাশয়ের স্ত্রী আমাদের আর একজন মাসিমা। ... মাসিমার কাজ ছিল দেশের ও বিদেশের নানান গল্প বলে মেয়েদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ানো। সোভিয়েট দেশের মেয়েদের উন্নতির কথাই বেশি বলতেন, বলতেন যুদ্ধের কথা, ছবিও দেখাতেন। মেয়েরা কেউ না এলে তাঁদের খোঁজ করতেন।"[১৯] এই রকম একটি পরিবারে কিংবা বলা যেতে পারে এমনই সচেতন, শিক্ষিত, সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মানুষের পুত্রবধূ করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক জীবনপ্রবাহ গতানুগতিক খাতে রইল না। একই সঙ্গে স্বামীর রাজনৈতিক সচেতনতা, সক্রিয়তা তাঁর চলার পথ নির্দিষ্ট করল। এখানে উল্লেখ করা বোধহয় বাহুল্য হবে না— একালের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, প্রাবন্ধিক ও চিন্তাবিদ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-ই হলেন উপরোক্ত মাসিমা আর ওঁর অগ্রজপত্নী তথা বৌদি হলেন এই করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের বাড়িতে আসেন বৈবাহিক সূত্রে, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোযোগী দৃষ্টিভঙ্গিতে দুটি জিনিস ধরা দিয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন তাঁর বৌদিকে তাঁদের বাড়ির দুটি সংস্কারের সঙ্গে মিশে যেতে— (১) তাঁর পিতার বিদ্যাচর্চার সংস্কার এবং (২) তাঁর দাদার রাজনৈতিক সংস্কার। মা এবং বৌদি দুজনেই এই সংস্কারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গড়ে তুলেছিলেন পরবর্তী দুই ভাই সুমন্ত এবং শমীকের জীবনচর্যা। মায়ের কর্মক্ষেত্র ছিল কমিউনিস্ট পার্টির 'ফ্রন্ট' সংগঠন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি— আর বৌদি যুক্ত ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে। যাবতীয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে পঞ্চাশোর্ধ্ব মা রুশ ভাষা শিক্ষা করেছেন; সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছে অভিনয় করেছেন বিজন ভট্টাচার্য পরিচালিত 'দেবীগর্জন' ও 'গর্ভবতী জননী' নাটকে। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করার পর দীর্ঘদিন যুক্ত থেকেছেন কলকাতার চিনা দূতাবাসের কর্মীদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার কাজে— অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির পরিবেশে ছিল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক শিক্ষিত মুক্তমনের আবহাওয়া। বিবাহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী— বাড়ির এই সুস্থ, পরিশীলিত মনন, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং সমাজবোধ করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপ্রবাহে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল— গড়ে উঠেছিল তাঁর নিজস্ব জগৎ ও ব্যক্তিত্ব। পরবর্তী সময়ে এই স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়ে সর্বভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিরন্তন স্বীকৃতি লাভ করে। ব্যক্তি মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। রুশতী সেন তাঁর একটি লেখায় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হওয়ার এক অনুপম অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। স্বীকার করেছেন জীবনের আলোকবৃত্তের প্রান্তে এসে দাঁড়ানো মানুষটির 'ব্যক্তিত্ব, কণ্ঠস্বর, স্বরক্ষেপ, সৌন্দর্য— সবের

ভিতরেই অনায়াসে সম্ভ্রম জাগানোর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল।[২০] করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ-পূর্ববর্তী জীবনে তাঁদের বাড়ির রাজনৈতিক বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি ছিল 'গান্ধীবাদী' ও 'কংগ্রেসপন্থী'। এই রকম পরিবেশে মানুষ হওয়া করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৩-এ যখন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহ করলেন, তখন কিন্তু তিনি ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য এবং মার্কসবাদী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় একাধারে ছিলেন তাঁর বন্ধু ও তাঁর স্বামী— কাজেই তাঁদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার কোনও ফাঁক ছিল না। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবনের, ব্যক্তিত্ব গঠনের সূচনাতে ছিল গণনাট্য সংঘ। পার্টির নির্দেশে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেন সামরিক বাহিনীতে এবং যুদ্ধের সময় তাঁকে থাকতে হয় ইন্দোচিনে, বার্মায়। যুদ্ধশেষে নৌবিদ্রোহের পর তিনি সামরিক বাহিনী থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে বোম্বাইতে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'পিপলস এজ'-এ যোগ দেন আর করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র অফিসে সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করতে থাকেন। অবশ্য সন্তান সম্ভাবনার কারণে তাঁকে কয়েক মাসের মধ্যে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। বোম্বাইতে তাঁরা থাকতেন আন্ধেরির একটা কমিউনে। তখনও তিনি গণনাট্য সংঘ-য় যুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু এই সময় তাঁর মানসিক ক্ষেত্রটা প্রস্তুত হতে থাকে। বোম্বাইতে থাকাকালীন তিনি কাজ করেছেন শিল্পী চিত্তপ্রসাদের সঙ্গে। হয়তো চিত্তপ্রসাদ কোনও পোস্টারের আউটলাইন তৈরি করে দিয়েছেন— করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় তা রং দিয়ে ভরাট করেছেন। এ সব কাজ তাঁকে খুবই আনন্দ দিত। এর আগে দুর্ভিক্ষের সময় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য না হয়েও তাঁদের সঙ্গে কাজ করেছেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির হয়ে। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বিশেষ না থাকলেও পার্টির কাজ করেছেন হাতে-কলমে। এভাবেই গণনাট্য সংঘ-য় যোগদানের প্রেক্ষিতটা তৈরি হচ্ছিল ক্রমশ— (১) পার্টির কাজ করছেন স্বেচ্ছায়, (২) 'নবান্ন'-নাটক দেখে নতুন চিন্তাভাবনার প্রতি তাঁর ইতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, (৩) বোম্বাইতে থাকাকালীন গণনাট্য সংঘের নাচ, গান ও নানান কর্মকাণ্ডের প্রতি আকর্ষণবোধ ইত্যাদি নানান বিষয় তাঁর মনকে প্রস্তুত করছিল— এর পরেই তাঁর গণনাট্যে যোগদান নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনচর্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এর পরই পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। পার্টিকে বেআইনি করার জন্য সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোম্বাই শহরে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে হয়। কলকাতা তখন নানা আন্দোলনে সরব। ১৯৪৮-১৯৫০ পর্যন্ত স্বামী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জেলে, সে সময় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে মানসিক অবস্থা তাতে কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়াটা ছিল জরুরি। এই রকম সমস্যাদীর্ণ সঙ্কটকালীন এক

সময়াবর্তে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন গণনাট্য সংঘে। গণনাট্যের অন্যতম কর্মী সাধনা রায়চৌধুরীর বিশেষ উদ্যোগ ছিল এক্ষেত্রে। তখন তাঁরা গণনাট্য সংঘে সাউথ স্কোয়াডে নাটক করেন। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ও দক্ষিণ শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাধনা রায়চৌধুরী নিয়ে এলেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। স্বামী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বোম্বাই-এর জেলে। সাধনার মনে হয়েছিল এই সময় নাটকের মধ্য দিয়ে যদি এনগেজড রাখা যায় করুণাকে। সে সময় সলিল চৌধুরীর 'সংকেত' নাটকে অভিনয় করেছেন তাঁরা। 'নবান্ন' নাটক দেখে প্রাণিত করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আকর্ষণ গণনাট্য সংঘ সম্পর্কে অনুভব করেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায় গণনাট্যের কোনও শাখা না থাকায় তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি। তা ছাড়া এখন তাঁর ওপর শিশুকন্যাটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব। গণনাট্য সংঘের দক্ষিণ কলকাতা শাখা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানকার সভ্য হয়ে যান এবং সাধনা রায়চৌধুরীও তাঁকে ডেকে নেন। আড়াই বছর তিনি গণনাট্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ১৯৪৮- ১৯৫০ পর্যন্ত স্বামী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজয় ঘোষ বন্দি ছিলেন বোম্বাই-এর নাসিক জেলে। এই রকম জটিল রাজনৈতিক ও পারিবারিক পরিস্থিতির মধ্যেই কিন্তু করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন— দৃঢ়তা, সাহস এবং জনমানসের প্রতি দায়বদ্ধতার তাগিদে।

কী অবস্থার মধ্যে তাঁরা অভিনয় করতেন তা একইসঙ্গে বিস্ময়ের এবং প্রশংসার। পার্টি যখন বেআইনি তখন আই পি টি এ-এর হয়ে নাটকে অভিনয় করাটা যতটা সাহসের ততটাই অনিশ্চয়তার। একটা দৃঢ় বিশ্বাস তাঁদের অর্থাৎ গণনাট্য কর্মীদের প্রাণিত করত। স্বামী— কলকাতা থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরের জেলে বন্দি; কন্যার বয়স মাত্র দুই, জেলের ভিতরে কোনও খবর পৌঁছনো সরকারিভাবে আইনবিরুদ্ধ। এই অবস্থায় কোনও মানুষের পক্ষে কি সম্ভব ছিল অভিনয়- সম্ভাবনাকে লালিত করা? নাট্যাভিনয়কে এঁরা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তাই নিজেদের জীবনের সমস্ত দুঃখ হতাশা অভাব অনিশ্চয়তাকে ভেঙে শুধু আত্মপ্রত্যয়ের জোরেই তাঁরা আপামর জনসাধারণের চেতনার শুভবোধের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। পরে যখন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে আসেন, তখনও সেই সংঘের প্রতি তাঁর সম্মানবোধ অটুট ছিল যদিও নীতিগত পার্থক্য ও ব্যক্তিস্বার্থের সংঘাত তাঁকে ক্ষুণ্ণ করেছিল— ব্যথিত করেছিল।

গণনাট্য সংঘে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করলেন সলিল চৌধুরীর 'জনান্তিক' এবং 'সংকেত' নাটকে। নাট্যকার হিসেবে নন, সঙ্গীতজগতে তখন সলিল চৌধুরী বিশেষ খ্যাতিমান। তাঁরই লেখা নাটক অভিনীত হল গণনাট্য সংঘে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ কমিউনিস্ট

পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কংগ্রেস সরকার। এই সময় অনেকেই গণনাট্য সংঘ ছেড়ে চলে যান এবং ভিন্ন ভিন্ন নাট্যদল গঠন করে শিল্পচর্চার ওপর গুরুত্ব দেন। শম্ভু মিত্র 'বহুরূপী' গঠন করেন (১৯৪৮), বিজন ভট্টাচার্য 'ক্যালকাটা থিয়েটার' (১৯৫০), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'নাট্যচক্র' (১৯৫০) গড়ে তোলেন।

১৯৪৮ সালে সলিল চৌধুরীর লেখা 'জনান্তিক' নাটকে অভিনয় করেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতাজ আহমেদ, সুধীর চৌধুরী, সুরেশ হালদার, সাধনা রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী, ইন্দিরা কবিরাজ, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। 'জনান্তিক' নাটকের কেন্দ্রে আছেন এক লেখক। তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বকেই তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৫০ সালে অভিনীত হয় এক গরিব লেখকের স্বপ্নের এই কাহিনি। লেখকের লেখার একটি চরিত্রে অভিনয় করেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়— যে চরিত্র কাহিনিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং লেখককে বলে, তুমি যা লিখছ তা বাস্তবের নয়— তা আসল জীবন নয়। মাত্র একবারই মঞ্চে আসতেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর বিশেষ কিছুই করার ছিল না একটি স্বগতোক্তি ছাড়া। এই চরিত্রে অভিনয় করে খুব যে খুশি হয়েছিলেন তা নয়। এর পর দ্বিতীয় নাটক 'সংকেত'-এ অভিনয় করেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়— তারও লেখক ছিলেন সলিল চৌধুরী। এখানে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেন একজন 'Unsympathetic Sophisticated' মহিলার চরিত্রে। এই নাটকের নির্দেশনায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলেও তিনি প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন এখানে সবাই যে যার মতো অভিনয় করবে— কেউ ডিরেক্টর নয়। এ নাটকে অভিনয় সম্পর্কে বিশেষ কোনও উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য করেননি করুণা। তিনি যে নির্দেশনার দিক থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন এমন নয়। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ ইচ্ছে ছিল একটা 'Serious role'-এ অভিনয় করবেন। কিন্তু সে ধরনের চরিত্রে তিনি গণনাট্যে অভিনয়ের সুযোগ পাননি। তাঁকে সব সময়ই 'Society Girl' ধরনের চরিত্রে ভাবা হত। আসলে সলিল চৌধুরী সে সময় যে ধরনের চরিত্রে অভিনেতা বা অভিনেত্রী পাওয়া যাবে বলে জানতেন তাঁদের সামনে রেখেই নাটক লিখতেন।[২১] বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাধনা রায়চৌধুরী করতেন মায়ের চরিত্র— যার ওপর করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা আকর্ষণ ছিল।

গণনাট্যের সঙ্গে তিনি যখন অভিনয় করছেন তখন স্বামী নাসিকের জেলে। কলকাতা থেকে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় যেতেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। খুবই কষ্টে কাটত রাতগুলো। থাকতেন হয়তো স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমে। তিন দিনে তিন ঘন্টার সাক্ষাৎকার স্বামীর সঙ্গে। সেই স্মৃতি নিয়ে ফিরে আসা এবং বাকি দিনগুলো কাটানো। মেয়েকে নিয়ে যে বার দেখা করতে গিয়েছিলেন সেই অভিজ্ঞতা

খুবই কষ্টের— ছোট্ট মেয়ে রুনকি (পথের পাঁচালির ছোট্ট দুর্গার চরিত্রে অভিনয় করে পরে) বাবার কাছে গেলেই কাঁদতে শুরু করে। অনেক আদর দিয়ে, ভুলিয়ে, খেলনা দিয়েও মেয়েকে বাবার কাছে দিতে পারেননি। বাবাকে দেখলেই তার কান্না। অথচ এই ছোট্ট মেয়ে যে বাবাকে চেনে না অথচ বাবার সব গল্প জানে— বাবার ছবির সঙ্গে কথা বলে, ছবিতে চুমো খায়, সমবয়সি কাউকে বাবার কথা বলে। এই বিষয়টি অর্থাৎ নিজের জীবনের বাস্তব ছবিটি প্রতিফলিত হয়েছে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'কমিউনিস্টের মেয়ে'[২২] গল্পটিতেও। যে মানসিক কষ্ট, টানাপোড়েনের পথ পেরিয়েছিলেন তিনি যে সময়ে, তার প্রতিফলন যেমন গল্প বা লেখায় রূপায়িত হয়েছে, তার নিরসনের একটা পথও তৈরি করেছে গণনাট্য সংঘ।

গণনাট্যে অভিনয়ের দিনগুলো ছিল অনিশ্চয়তার। যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি তখন নিষিদ্ধ তাই গণনাট্যের অভিনয়ের ওপর ছিল সাংঘাতিক বাধা-নিষেধ। যে জায়গায় অভিনয় হবে বলে নির্দিষ্ট হয়েছে, খবর এসেছে সেই জায়গায় পুলিশ অ্যাটাক করতে পারে— তৎক্ষণাৎ সেই জায়গা ছেড়ে শিল্পীদের অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এই অবস্থার মধ্য দিয়ে অভিনয় করতে হয়েছে। একবার রামমোহন লাইব্রেরিতে অভিনয়— অভিনয় শুরুর আগে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়রা তখনও মেক-আপ রুমে বসে আছেন, মঞ্চে যাননি— হঠাৎ-ই শোনা গেল যে পুলিশ অ্যাটাক করেছে। তখনই শো বন্ধ করে দিয়ে যে যেখান দিয়ে পারল বেরিয়ে গেল। এমন অভিজ্ঞতার কথা অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন।[২৩] এই রকম নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অভিনয় করতে হয়েছে গণনাট্যের শিল্পীদের। তাই গণনাট্যের কর্মিণীরা যে সাহস-জেদ ও দায়বদ্ধতার কারণে এই রকম অনিশ্চিত জীবনকে নিজেরাই নির্বাচন করেছিলেন সে কারণেই তাঁরা পেশাদারি বা প্রথানুগ পথে চলা অভিনেত্রীদের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কিছু কারণে IPTA ছেড়ে দেন। কিন্তু আই পি টি এ-র বাইরেও তিনি বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেছেন। এই সমস্ত অভিনয়ের সময়কাল নিয়ে নানান সংশয় থাকলেও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে মূলত করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণী, লিট্‌ল থিয়েটার বা অন্যত্র যে অভিনয়গুলি করেছিলেন তার সময়কাল ১৯৫৩-৫৫-র মধ্যে। অর্থাৎ 'পথের পাঁচালি' চলচ্চিত্রের কাজ শেষ হওয়া থেকে শুরু করে 'পথের পাঁচালি' মুক্তির মধ্যের সময়। ১৯৫৫ সালে মুক্তি পায় সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' চলচ্চিত্রটি।

গণনাট্য সংঘের 'জনান্তিক' ও 'সংকেত' নাটক দুটিতে অভিনয় সম্পর্কে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। লিটল থিয়েটার বা উৎপল দত্তের পরিচালনা সম্পর্কে কোথায় যেন চাপা অসন্তোষ, অপছন্দ বা অভিমান ছিল।

এই নাট্য পর্বটাই মূলত ১৯৫৩-১৯৫৫-র মধ্যে। ১৯৫৫-তে পথের পাঁচালী মুক্তি পেল, তার পরের বছরই ১৯৫৬-তে 'অপরাজিত'। এর পর আর করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনভাবে নাটকের সঙ্গে থাকলেন না। গণনাট্য কর্মিণীর নাট্যচর্চার ইতি, চলচ্চিত্রের উজানে পথ বাওয়া। কিছু দিন পর দুটি জগৎ থেকেই ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। কেন তিনি নাটকের মতো শক্তিশালী মাধ্যম ছেড়ে চলে গেলেন এ প্রসঙ্গে নানান কথা বলেছেন বিভিন্ন সময়ে। তারই প্রেক্ষিতে কতকগুলো কারণ এখানে তুলে ধরা হল— (১) আই পি টি এ তাঁকে ছাড়তে হল কারণ ক্রমশ শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে অভিনয়ের ঝোঁক বাড়ল গণনাট্য সংঘের। মেয়ে তখন ছোট— তাই বাইরে বাইরে শো করাটা অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

(২) আই পি টি থেকে কেন তিনি সরে এলেন, ব্যক্তিদ্বন্দ্ব না কি স্বার্থের কারণে, সে সম্পর্কে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টত কিছু না বললেও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন 'সংঘের মধ্যে ব্যক্তিদ্বন্দ্বের (যার মধ্যে নীতিগত প্রশ্নের খুব একটা স্থান ছিল না) জটিলতা ও সংকীর্ণতাই বৌদির অসহনীয় হয়ে ওঠে।'[২৪]

(৩) মঞ্চ থেকে চলচ্চিত্রে অভিনয় করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি। মঞ্চ-উপযোগী কণ্ঠস্বর তাঁর ছিল না। সিনেমায় স্বাভাবিকভাবে কথা বলা যায়, শেষ সারির দর্শককে শোনানোর দায় থাকে না। চলচ্চিত্র- মাধ্যমে অভিনয় করে তিনি বেশি আনন্দ পেলেন।

(৪) মঞ্চের থেকেও সিনেমায় অনেক বেশি একাত্ম হতে পারতেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। দর্শকের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ অনেকেই পছন্দ করেন কিন্তু তাঁর অনুভূতিটা ছিল ভিন্ন। নাটকে মনঃসংযোগ করতে তাঁর অসুবিধা হত যখন তিনি আশেপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনায় বিভ্রান্ত হতেন। চলচ্চিত্রে নিজেকে তিনি অনেক স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে পারতেন।

(৫) সিনেমাতে পছন্দসই মনোমত চরিত্র ও পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থিয়েটারে ঘটেনি। মঞ্চে তেমন নির্দেশক তিনি পাননি যাঁকে নির্ভর করতে পারেন। অপর দিকে চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। উৎপল দত্তের

সঙ্গে যখন কাজ করেছেন তখন উৎপল দত্ত ডিরেক্টর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত নন এবং তাঁর সঙ্গে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোঝাপড়ার জায়গাটাতেও একটা অস্বস্তি ছিল। আই পি টি কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর অভিনয়ের স্থায়িত্ব বেশি দিনের নয় নানাবিধ কারণে। এর মধ্যে মূল কারণ ১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালি' ছায়াছবির মুক্তি তাঁকে সর্বজয়ার ভূমিকায় যে স্বীকৃতি দিল পরবর্তী সময়ে তা কিংবদন্তি হয়ে উঠল। তবে গণনাট্যের শিক্ষা ও মনস্কতা তাঁকে যেভাবে প্রাণিত করেছিল তার প্রভাব তিনি সারাজীবন বহন করেছেন। গণনাট্য এবং 'নবান্ন'র সমকালের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অটুট। এমনকী তাঁর চলচ্চিত্রে আগমনের মূলে ছিল নাটকে অভিনয়ের উৎস। মূলত করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনটাই ছিল পরিশীলিত— সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, শিক্ষা ও মনন-সমৃদ্ধ। তাঁরা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা ও পরিশীলনকে জারিত করতে পেরেছিলেন আগামী প্রজন্মের নাট্যকর্মিণীদের মধ্যে।

## সাধনা রায়চৌধুরী (১৯২৩-২০০৬)

যে শিক্ষিতা পার্টিকর্মীরা সাংস্কৃতিক জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সাধনা বসু— পরবর্তী জীবনে যিনি সাধনা রায়চৌধুরী হিসেবে পরিচিত হন। গণনাট্য সংঘ-র অভিনেত্রী সাধনা ছোটবেলা থেকেই ছিলেন নাচে-গানে পারদর্শী। ছোটবেলায় তাঁর ইচ্ছা ছিল নৃত্যশিল্পী হবেন— ঘুরে বেড়াবেন পৃথিবীর নানান দেশে— তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও হয়েছিল প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের। গণনাট্যে থাকাকালীন গান এবং নাচের স্কোয়াডেও অংশ নিয়েছিলেন। গণনাট্য সংঘের সাউথ স্কোয়াডের বিভিন্ন নাটকে ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয় করতে করতে হয়ে উঠলেন অভিনেত্রী। কেমন করে যেন একাত্ম হয়ে গেলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। মিশে গেলেন তাঁদের সঙ্গে। তার পর শুরু হল তাঁর জীবনের এক দীর্ঘ সংগ্রামের কাল। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নাট্যচর্চা গণনাট্যের এই কর্মীকে চিহ্নিত করল স্বতন্ত্র মর্যাদায়। 'আমাদের সমাজে অনেক কুসংস্কার ও অজ্ঞতার কুফল ভোগ করতে হয় মেয়েদেরই। তারা থিয়েটার, নাচ ইত্যাদি শিখে তা বাইরে দেখাতে গেলেই অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। গণনাট্য সংঘই প্রথম সংগঠিতভাবে মেয়েদের সৃজনীশক্তিকে মর্যাদা দেয়। তবুও আমরা যখন গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে শো করতে নানা জায়গায় যেতে শুরু করেছি, শো-এর শেষে বাড়ি ফিরতে রাত দুপুর হয়ে গেছে, কোনো মধ্যবিত্ত পরিবার বা পাড়াপড়শি তা সুনজরে দেখেনি। সেইসব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেই আমাদের এগোতে হয়েছে। সেই পথ অনুসরণ করেই যে আরো কয়েকজন শিক্ষিতা পার্টিকর্মী সংস্কৃতিজগতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সাধনা রায়চৌধুরী অন্যতম।'[২৫]

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিমনস্ক পরিবারের মেয়ে সাধনা বসুর বাবা সত্যসুন্দর বসু ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট, মা মৈত্রেয়ী দেবী। বাবা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। মেজ জ্যাঠামশাই প্রেমসুন্দর বসু রবীন্দ্র-আদর্শের অনুসারী। তিনি বেশ কিছু দিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন আচার্য হিসেবে। ছোটবেলায় সেই সূত্রেই সাধনা ও বোনেরা একসঙ্গে যেতেন শান্তিনিকেতন এবং লাভ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, সাহচর্য। তাঁদের ছোটবেলাটা ছিল মহাত্মাজির যুগ, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের গানের যুগ। বাবা-মা দু'জনেই দেশমাতৃকার পূজারি। তাই সাত আট বছরের সাধনার রক্তের মধ্যেই ঢুকে গিয়েছিল আন্দোলনের বীজ। পরবর্তী জীবনে তাই গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর কিংবা বলা যেতে পারে 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘে' যুক্ত হওয়ার পর তাঁর জীবনে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধতে থাকে।

বাড়িতে দিদিদের কাছে সাধনা ছিলেন 'রুড', 'ক্লামজি', 'রাফ'। সব ভাইবোনের থেকে একটু আলাদা। সবার অলক্ষ্যে একটু অবহেলায় বড় হয়ে ওঠা সাধনা ছোটবেলা থেকেই নিজস্ব দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন। বাড়ির ভারী কাজ একাই সামলে নিতে পারতেন। মেধাবী ছাত্রী সাধনার জনপ্রিয়তা ছিল শিক্ষিকা ও ছাত্রী মহলে। ছোটবেলা থেকেই সাধনা বসুর অভ্যেস ছিল একটা ছোট্ট কোণ বেছে নিয়ে আপনমনে সেখানে বসে বই পড়া, ছবি আঁকা, চিন্তা করা। বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। ম্যাট্রিকের আগেই পড়ে ফেলেছেন বার্নার্ড শ', টলস্টয়ের 'রেজারেকশন', ন্যুট হ্যামাসুনের 'হাঙ্গার'— এমন-ই সব বই। এই বই পড়ার অভ্যাস তাঁর মানসিক ক্ষেত্রটা যেমন তৈরি করেছিল, তেমনই খুলে যাচ্ছিল ভাবনা-চিন্তার দরজা জানলাগুলো— গড়ে উঠেছিল নিজস্ব মতামত। সমস্ত পরিবার যখন গিরিডিতে, সাধনা একা এলেন কলকাতায়, শ্যামবাজারে মেজমাসির বাড়িতে। কলকাতার মাসতুতো দাদা চিন্মোহন সেহানবিশের সংস্পর্শে এসে সাধনা বসুর সামনে উন্মোচিত হল এক নতুন পৃথিবী। তাঁর কাছে শুনতেন রাজনীতির কথা, দেশের পরিস্থিতির কথা। ক্রমশ রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। চিন্মোহন সেহানবিশের মাধ্যমেই সোভিয়েট সাহিত্যের সঙ্গে সাধনার যোগাযোগ তৈরি হয়। সাধনার সামনে তখন অনেক বড় এক জগতের হাতছানি। নতুন কিছু করবার প্রয়াস। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর এম.এ. পড়ার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি সাধনার। দাদা চিন্মোহন সেহানবিশ, সাধনার 'চিনুদা' ততদিনে তাঁকে টেনে নিয়েছেন পার্টির কাজে। তখন কমিউনিস্ট পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্ট চালু ছিল— সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন সাধনা বসু— সঙ্গে ছিলেন ছোট বোন নিবেদিতাও। তাঁরা বাড়িতে পোস্টার লিখতেন, কুরিয়ার হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় চিঠি পৌঁছে দিতেন, কেউ আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়িত্ব পড়ত অনেক সময় তাঁদের ওপর।

কমিউনিস্ট পার্টির কাজের সঙ্গে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়তে থাকেন সাধনা বসু। চিন্মোহন সেহানবিশের সূত্রে যোগাযোগ ঘটে যায় দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে। ১৯৪০ সাল নাগাদ সাধনার 'জর্জমামা'-র (দেবব্রত বিশ্বাস) নেতৃত্বে যখন গড়ে উঠল কমিউনিস্ট সিংগিং গ্রুপ, তখন সেই দলে শুধু যুক্ত হলেন না— গলার রেঞ্জ উঁচুতে পৌঁছে যাওয়ার দক্ষতায় সাধনা বসুকে গাইতে হত দেবব্রত বিশ্বাসের তৈরি করা হারমোনির ওপরের 'নোট'গুলি। একই সঙ্গে চলতে থাকে রাজনৈতিক শিক্ষা। ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য হচ্ছেন, কখনও ইউথ মিটিং-এ যাচ্ছেন, আবার কখনও সবাই মিলে গাইছেন 'মজদুর, মজদুর, মজদুর হ্যায় হাম, সারে দুনিয়াকো রাজা হ্যায় হাম', কখনও দ্রুত লয়ে গাইছেন 'বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও' কিংবা 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত' ইত্যাদি। জীবনের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করছে বিপ্লবের সুর, প্রতিবাদের সুর। গানে নেতৃত্ব দিতেন দেবব্রত বিশ্বাস। আবার কমিউনিটি সিংগিং গ্রুপ যখন ভেঙে গেল, তৈরি হল 'ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট' বা ওয়াই সি আই তখনও দেবব্রত বিশ্বাসের নেতৃত্বে গান গেয়েছেন সাধনা বসু। একইসঙ্গে চলেছে গান ও রাজনীতির দীক্ষা। কমরেড ক্ষিতীন রায়চৌধুরী সাধনা বসুদের রাজনীতির ক্লাস নিতেন। তাঁর সঙ্গেই বিবাহ হয় সাধনা বসুর। বিবাহ পরবর্তী জীবন সাধনা বসু পরিচিত হলেন সাধনা রায়চৌধুরী নামে। ১৯৪৩ সাল নাগাদ সাধনারা যখন আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্ট থেকে ওপেন পার্টিতে এলেন, সে সময় সাধনা বসুর ইচ্ছা ছিল বি.এ. পাশ করে এম.এ. পড়বেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূর্ণ হল না। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সখ্য— প্রেম। তাই শুনতে হল কমরেড ক্ষিতীনের কথা। পার্টি অফিসে কাজ শুরু করলেন সাধনা— আর 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার কাজে যুক্ত হলেন ক্ষিতীন রায়চৌধুরী। 'ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট' যুব সংগঠনের পরে 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ'-র গানের দলেও অংশগ্রহণ করেছিলেন সাধনা। পার্টির মিটিং মিছিলে গান গাইতেন। পার্টির মিটিং শেষে, বাংলা হিন্দি, উর্দুতে গাওয়া হত 'ইন্টারন্যাশনাল'। জর্জ বিশ্বাস, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, তুলসী লাহিড়ী, বিনয় রায়, সলিল চৌধুরীর মতো শিল্পীদের সঙ্গে কালচারাল স্কোয়াডে সক্রিয় ছিলেন সাধনা রায়চৌধুরী। রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক জগৎও তাঁর জীবনে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

গানের জগৎ থেকে অভিনয়ের ক্ষেত্রে পা বাড়ালেন সাধনা রায়চৌধুরী। বৃহত্তর মানবসমাজের কাছে পৌঁছনোর তাগিদে অভিনয়কে বেছে নিলেন। তাঁর অভিনীত প্রথম নাটক 'নবান্ন'—গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায়, ১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর 'শ্রীরঙ্গম' নাট্যমঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকে খুব ছোট্ট একটি চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন। 'আই.পি.টি.এ-র এক উজ্জ্বল স্মৃতি বিজন ভট্টাচার্য।

'নবান্ন' নাটক করাচ্ছেন বিজনদা। আমিও তাতে যুক্ত হয়েছিলাম। বিজনদা সবসময়ই হৈ হুল্লোড় করে জমিয়ে রাখতেন। অভিনয় শেখাতেনও খুব সুন্দরভাবে। ... যদিও 'নবান্ন'তে আমার চরিত্রটি ছিলো ছোটো— এক ভিখারিনীর'[২৬] 'নবান্ন'-য় অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গণনাট্যের নাটকে জয়যাত্রা যেমন শুরু হল, তেমনই 'নবান্ন' নাটকে অভিনয় সূত্রে গণনাট্য সংঘের অভিনেত্রীরূপে চিহ্নিত হলেন সাধনা রায়চৌধুরী। বহু বিচিত্র ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে সাধনা রায়চৌধুরীরা গণনাট্যের কাজ করেছেন! নাটক করার জন্য বহু গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছেন। কৃষক এলাকায় নাটক করতে গিয়ে হয়তো থাকতে হয়েছে কৃষকদের বাড়িতেই। সাত দিনের মধ্যে গান শিখিয়ে কখনও তৈরি করে নিয়েছেন গানের দল। 'নয়ানপুর' নাটকের অভিনয় করতে একবার গিয়েছিলেন কালনায়। সেখানেও থাকার ব্যবস্থা কোনও কৃষকের বাড়িতে। সেখানকার পার্টির দেওয়া জিনিসপত্র নিয়ে নিজেরাই হয়তো রান্না করে নিয়েছেন। উঠোনে বিরাট কড়াইতে রান্না হত। যৌথ আন্দোলন এবং যৌথ সহাবস্থানের এক সত্য উদাহরণ! নিজেদের সমস্ত সুবিধা-অসুবিধা ভুলে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করার আনন্দ উপভোগ করেছেন গণনাট্য সংঘের কর্মীরা। সেটা-ই ছিল গণনাট্যের শিক্ষা। স্টেজ তৈরি হত খুবই সাদামাটা পদ্ধতিতে। ধান কাটা জমির যে দিকটা উঁচু সেখানেই তৈরি হত স্টেজ। গোছা গোছা পাঁকাটি বেঁধে দু'দিকটা আটকে দেওয়া হত। দর্শকরা আসত চিঁড়ে মুড়ি বেঁধে। নাটক শুরুর আগে গণনাট্যের গান গেয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হত। তার পর শুরু হত নাটক। যেমন 'নয়ানপুর' নাটকে জমিদারের গুলিতে নিহত চাষির বৌ-কে (সাধনা রায়চৌধুরী এই চরিত্রে অভিনয় করতেন) কোলে নিয়ে যখন শপথ নিত তার স্বামী, তখন স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দর্শক, আদতে যারা গ্রামবাসী তারাও স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে সমস্ত বিদ্রোহ, আন্দোলন, শপথ, প্রতিজ্ঞার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। এইভাবে গ্রামে, বিভিন্ন অঞ্চলে নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে জনমানুষের কাছে এসেছেন গণনাট্যের কর্মিণীরা— নারীপুরুষের ব্যবধান ভুলে গিয়ে। সংসার-সুখ-স্বস্তি-আরাম ত্যাগ করে মানুষের উদ্বোধনের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়েছেন। পারিবারিক সংকটে ও নাটকের কাজে মগ্ন থেকেছেন। শুধু নিজের কথা নয়, সার্বিক তথা সামগ্রিকভাবে মেয়েদের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকেছেন। সমস্যা থেকে সমাধানের পথ তৈরি করেছেন। একটি ঘটনার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মুম্বাইতে জেলে, তখন সাধনা রায়চৌধুরী নিজে উদ্যোগ নিয়ে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গণনাট্যের দক্ষিণ শাখার সঙ্গে যুক্ত করে নেন। ভেবেছিলেন যদি একটু এনগেজড করে রাখা যায়। সহমর্মী থেকে সহকর্মী হয়ে উঠেছেন।

গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন নাটকে অভিনয়ের মূল ভিত্তিটা ছিল রাজনৈতিক মতাদর্শের বহিঃপ্রকাশ! কোন নাটকে কোন চরিত্রে অভিনয় করেছেন— চরিত্রের গুরুত্ব কতখানি তা বিচার্য ছিল না। বিচার্য ছিল যে-নাটকগুলোতে অভিনয় করছেন সেই নাটকগুলো মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছে কি না? মানুষকে সচেতন করতে পারছে কি না? পার্টি মেম্বারশিপ পান ১৯৪৪ সাল নাগাদ (সাধনা রায়চৌধুরীর স্মৃতি অনুসরণে)। লাল কার্ড পাওয়ার পর খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু পার্টি-মেম্বার হওয়ার আগে সাধনা 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'-তে কাজ করেছেন। সেখানে মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, কনক মুখোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে কাজ করতেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের একেবারে সাধারণ মানুষ মা-বৌদিদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগাবার জন্য কাজ করতেন সক্রিয়ভাবে। পার্টি কমিউনে যেতেন, সেখানে মুজাফ্‌ফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সোমনাথ লাহিড়ী, ভবানী সেনের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে পরিচিত হন। পার্টি মেম্বারশিপ যখন পান তখন পার্টির সম্পাদক পি.সি.যোশী। সাধনা বসু পূর্ণোদ্যমে পার্টির সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন আবার সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত থেকে সামাজিক সচেতনতা জাগাবার কাজেও নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। তিনি হয়ে উঠেছেন এক দৃষ্টান্তস্বরূপ— সমকালে এবং পরবর্তীকালেও। তবে এ কথা ঠিক যে, বিবাহ পূর্ববর্তী সময়ে বাবা-মায়ের অর্থাৎ পরিবারের দিক থেকে অভিনয় বা গানের জন্য বিশেষ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল, বিবাহ-পরবর্তী সময়ে ক্ষিতীন রায়চৌধুরীর মতো একজন দায়বদ্ধ পার্টি কর্মীর কাজ থেকে সেই সহযোগিতা পেলেন না সাধনা রায়চৌধুরী। প্রথম পরিচয়ের মুগ্ধতা বা আকর্ষণ বেশি দিন থাকেনি। ক্রমশ তিক্ত হয়েছে সম্পর্ক। দাম্পত্য জীবনে অশান্তি বেড়েছে, দূরত্ব বেড়েছে, বিচ্ছেদ ঘটেছে। অভিনেতা শেখর চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবনে এসেছেন, ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে, আবার নতুন সম্পর্কের ভিত তৈরি হয়েছে। আরও নিবিড় হয়েছে থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক। 'থিয়েটার ইউনিট' থেকে পরবর্তী সময়ে 'ইউনিটি থিয়েটার'— গড়ে উঠেছে। এই দলের অন্যতম প্রধান হিসেবে দলের সব দিকের কাজকর্ম অভিনয় সংগঠন চালিয়ে গেছেন। হয়তো অসন্তোষ ছিল, কাঙ্ক্ষিত চরিত্র না পাওয়ায় ক্ষোভ ছিল, কিন্তু নাটককে ছেড়ে যাননি কখনও। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে পেশাদার থিয়েটারে অভিনয় করেছেন কিন্তু তা ছিল জীবন সংগ্রামের অপর মুখ। যদিও জীবনের প্রথম পর্বে রাজনৈতিক জীবন ও অভিনয় জীবনের প্রতি তাঁর যে দায়বদ্ধতা, সামাজিক বিধিনিষেধ অতিক্রম করে নিজের মতাদর্শে স্থির থাকার সঙ্কল্প—তাই তাঁকে, তাঁদের মতো গণনাট্য কর্মিণীদের স্বতন্ত্র মর্যাদায় উন্নীত করেছে।

গণনাট্য সংঘের বাইরে জীবিকার প্রয়োজনে পেশাদারি মঞ্চেও সাধনা রায়চৌধুরী প্রচুর অভিনয় করেছেন। কর্মব্যস্ততা বাড়তে থাকায় তাঁকে স্কুলের চাকরি ছাড়তে হয়। অভিনয় হয়ে উঠেছে মূল লক্ষ্য। গণনাট্য পরবর্তী জীবনে তিনি সংসার চালানোর জন্য বেছে নিয়েছিলেন অফিস ক্লাব, পেশাদারি মঞ্চ কিংবা চলচ্চিত্র। এত নাটক এত উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও পেশাদারি মঞ্চ বা চলচ্চিত্র নয়, সাধনা রায়চৌধুরীর মনে চিরকাল অম্লান হয়ে ছিল গণনাট্য সংঘের স্মৃতি।

আত্মজীবনের সংগ্রামের কথা লিখতে গিয়ে যে স্মৃতিচারণা করেছেন সাধনা রায়চৌধুরী, তার শেষ কথাগুলোই হতে পারে ওঁর এক স্বীকারোক্তি— 'জীবন ও জীবিকার তাগিদে অফিস টিমগুলোতে অভিনয় করতে ঢুকলাম। যদিও মনের খিদে তাতে মিটত না, ছিলো বুকভরা অতৃপ্তি। ভালো নাটক করবো। ভালো পরিচালকের কাছে কাজ শিখবো। এ চিন্তায় কাজের মধ্যে মধ্যে আমাকে কুরে কুরে খেয়েছে। কিন্তু কতটুকু শিখতে পেরেছি? সমুদ্রের কিনারে নুড়ি কুড়িয়েছি মাত্র। আই পি টি এ ছিল আমার জীবনে ওয়েসিসের মতো। সেখানেই লুকোনো ছিল আমার যাবতীয় সুখ শান্তি।'[২৭]

যে অভিনেত্রীর ঝুলিতে একশোটির মতো নাটক এবং পঞ্চাশটির মতো চলচ্চিত্রে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মতো নাট্যাচার্যের কাছে অভিনয় শিক্ষার অভিজ্ঞতা, শেখর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নতুন নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা ও দলের প্রযোজনা, সম্পাদকের দায়িত্ব পালন, বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান, বিদেশ ভ্রমণ— ১৯৭৫-এ ফ্রান্স, লন্ডন, জার্মানি সফর, ১৯৮৬-তে হংকং-এ সপ্তম ব্রেখট ইন্টার ন্যাশনাল সেমিনারে যোগদান, ১৯৮৬ সালে 'বসুন্ধরা' সিনেমার প্রযোজক হিসেবে রৌপ্যকমল পুরস্কার লাভ করেছেন যিনি— সেই সাধনা রায়চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীর উপসংহারে পৌঁছে কিন্তু গণনাট্যের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকেই জাগরুক রাখলেন।

সাংগঠনিক কাজেও তিনি নিজেকে সক্রিয় রেখেছিলেন— যখন তৈরি করলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'থিয়েটার ইউনিট'— যেখানে ছিলেন নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের মতো সংগঠক, খালেদ চৌধুরীর মতো মঞ্চস্থাপত্য শিল্পী, তখন নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রধান চরিত্রের জন্য অভিনেত্রীর সন্ধান করেছেন, তাঁর নিজের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দিয়ে কোনও একটি নির্দিষ্ট চরিত্র মানাবে না বলে নির্দেশক শেখর চট্টোপাধ্যায় মনে করলে সাধনা রায়চৌধুরী কিন্তু অভিমানবশত দূরে সরে থাকেননি। নতুন অভিনেত্রীকে তিনি হাঁটাচলা শিখিয়েছেন— এবং সেই অভিনেত্রীও সফল হয়েছে। আবার যখন মহিলা শিল্পী মহল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মলিনাদেবীর নেতৃত্বে,

সেখানে সাধনা রায়চৌধুরী সম্পাদিকা হিসেবে কাজ করেছেন। এই সংগঠন করাটা তাঁর কাছে ছিল একটা প্রাপ্তি। মহিলা শিল্পী মহলের প্রায় সকলেই ছিলেন চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী। তাঁরা যখন মহিলা শিল্পীদের জন্য বৃদ্ধাবাসের পরিকল্পনা করেছেন, তার চাঁদা তোলা, নতুন সদস্য সংগ্রহ করা সমস্ত কাজে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন সাধনা রায়চৌধুরী। যখন মহিলা শিল্পী মহল নাটক করার উদ্যোগ নিয়েছে তখন রিহার্সাল কন্ডাক্ট করা, সেট ও পোশাকের ব্যবস্থা, চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীদের মঞ্চের উপযোগী করে তৈরি করা, পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করার জন্য তৈরি করা, বিজ্ঞাপন জোগাড় করা, সমস্ত দায়িত্ব বহন করেছেন তিনিই। এ সমস্ত কাজে পরিশ্রম করতে পিছপা হননি তিনি। আবার ব্যক্তিগত জীবনে যখন শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেন নানান ছবিতে কাজ করে, তখনও পাশে থেকেছেন সাধনা রায়চৌধুরী— স্ত্রী হিসেবে শুধু নয়, প্রেরণা ও পরামর্শদাত্রী হিসেবে। চিত্রনাট্যগুলি লেখার সময় শেখর চট্টোপাধ্যায়কে বিশেষ সাহায্য করতেন। এভাবেই অভিনেত্রী জীবনকে শুধুমাত্র অভিনয়ের ঘেরাটোপে বন্দি না রেখে নানান কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করে দিতে সক্ষম ছিলেন তিনি। তবে এ সব কিছুর মূলে ছিল তাঁর আই পি টি এ বা ভারতীয় গণনাট্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা। তাই তাঁর আত্মজীবনীর প্রান্তে পৌঁছে স্বীকার করলেন সেই কথা। তাঁর ঘরে ও বাইরের সংগ্রামী জীবনে কিন্তু ওয়েসিসের মতো বেঁচে রইল নাচ, গান, সিনেমা, দূরদর্শন নয়— নাটক। গণনাট্য সঙ্ঘ— আইপিটিএ-তে তাঁর সংগ্রামের দিনগুলো। সাধনা রায়চৌধুরীদের জীবনপথ — গণনাট্যের শৃঙ্খলাবদ্ধ আদর্শনিষ্ঠ যাত্রাপথই কি তৈরি করে দিল না আগামী দিনের নাট্যকর্মিণীদের থিয়েটারে স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রবণতা? শুধু অভিনয়ই নয় থিয়েটার সংক্রান্ত যাবতীয় কাজেও নিজেদের প্রকাশ করার সম্মান সাহস প্রকাশে গণনাট্যের অভিনেত্রীরা তৈরি করলেন এক নতুন পথ।

## রেবা রায়চৌধুরী (১৯২৫-২০০৭)

‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’-র আদিপর্বের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী রেবা রায়চৌধুরীর জীবন যেমন বর্ণময় তেমনই সংগ্রামসংকুল। নৃত্য-সংগীত-নাটকাভিনয়-চলচ্চিত্রাভিনয় সর্বক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিবাদী সত্তারই বিকাশ ঘটেছে। পরাধীন ভারতবর্ষের গ্লানি, তেভাগা আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিঘাত, দেশভাগ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জীবন অতিক্রম করেছেন। বলা যেতে পারে, এই কঠিন সময়ে পথ চলা এবং কঠিন সময়কে উত্তীর্ণ হওয়ার দীক্ষা তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনের কাঠামো নির্মাণ করেছে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে ১৯৪৪-এর এপ্রিল মাসে ছোড়দা বিনয়কৃষ্ণ রায়ের (বিনয় রায় নামে খ্যাত) সঙ্গে এক কাপড়ে পারিবারিক নিষেধাজ্ঞা

ভেঙে বেরিয়ে আসেন ভিন্নতর জীবনের টানে। শুরু হয় ভিন্ন এক জীবনোপাখ্যান।

অবিভক্ত বাংলার রংপুরের মেয়ে রেবা রায়চৌধুরীর জন্ম ১৯২৫-এ মামার বাড়ি রাজশাহীতে। বাবা অতুলকৃষ্ণ রায় প্রখ্যাত আইনজীবী, মা হেমলতা সংস্কৃতিমনস্ক, ব্যক্তিত্বময়ী। নাটকের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। কিন্তু খুব অল্প বয়সে মাকে হারান রেবা রায়চৌধুরী। পরিবারে ছিলেন বাবা, দিদি ইলা নন্দী, দুই দাদা— গোপেনকৃষ্ণ রায় ও বিনয়কৃষ্ণ রায়। দাদাদের কাছ থেকেই রেবা রায়চৌধুরীর সাম্যবাদে দীক্ষা গ্রহণ। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় রেবা প্রথম বিভাগে ইতিহাসে লেটার নিয়ে পাশ করেন এবং রংপুর কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ঝাঁপিয়ে পড়েন ছাত্র-রাজনীতিতে, যা তাঁর বাবা বা বাড়ির অন্যান্যরা মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁর শৈশব ও কৈশোরের প্রিয় রংপুর ছেড়ে তাঁকে চলে আসতে হয়। খুব ছোটবেলায় যখন তিনি তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী, তখন রংপুরের মন্থরার মাঠে এসেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। গান গেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করার মুহূর্তে ওই শিশুমনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে স্মৃতিকথায় তা ব্যক্ত করেছেন। সেই সম্মেলক গানের সুরের উদ্দীপনা কীভাবে যেন গেঁথে যায় ছোট্ট মেয়েটির মনে। অনুমান করা যায় সেই সময় থেকেই মাতৃহারা, সংসারের উদাসীনতায় বড়ো হওয়া রেবা রায়চৌধুরীর ভেতরে জন্ম নেয় স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা। দাদারা বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বড়দা গোপালকৃষ্ণ রায় স্বপ্ন দেখতেন স্বাধীন ভারতের, আর ছোড়দা বিনয়কৃষ্ণ বাবার অমতে চলে যান আহমেদাবাদে। ফিরে এসে আত্মনিয়োগ করেন চটকল শ্রমিকদের আন্দোলনে। ছোটবেলা থেকে এই ছোড়দার কাছেই রেবার গান শেখা— যে গান ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে তাঁর সংগ্রামের হাতিয়ার। বিনয় রায়ের ছিল সুন্দর সুরেলা কণ্ঠস্বর। গান না শিখেও অসাধারণ সুরেলা গলায় গান গাইতে পারতেন। ছোড়দা— বিনয় রায় পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘ-এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন গানের স্কোয়াডের, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছেন দুর্ভিক্ষ-আক্রান্ত ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য। ছোড়দার হাত ধরেই রেবা রায়চৌধুরী দেখলেন এক অন্য পৃথিবী। বৃহত্তর এক জীবনপ্রবাহ।

কলেজের ছাত্রী অবস্থায় রেবা রায়চৌধুরী ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন রিলিফের কাজে। এইভাবে তাঁরা পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলেছিলেন মহিলা সংগঠন। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল মহিলা সংগঠনের কাজ। রংপুরের গণতান্ত্রিক নারী-আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন সাধারণ ঘরের মেয়েরা— লীলা দে, উষা দাশগুপ্ত, সরলা রায়, সুশীলা রায়, সদ্য স্বামী হারানো লতাদি থেকে ঠাকুমা পর্যন্ত। যে ঠাকুমা ঠাকুরকে পুজো দিয়েই বেরিয়ে পড়তেন সবার সঙ্গে

বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাহায্য সংগ্রহের কাজে। বাড়ির বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও রক্ষণশীলতা ভুলে মেয়েরা সংগঠিত হয়েছিল দুর্ভিক্ষলাঞ্ছিত বাংলার পাশে। বদরগঞ্জে, রংপুরের মেয়েরা মজুতদারের আড়ত ঘেরাও করে চাল সংগ্রহ করে বিলি করেছিল। গণনাট্য সংঘ-র শিল্পী রেবা রায়চৌধুরীর যৌবনের সূচনাই হয়েছিল এই রকম আন্দোলনের পথ ধরে— যা জীবনের শেষ পর্যায়েও ভেঙে যায়নি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। মাত্র আঠারো বছর বয়সে রেবা রায়চৌধুরী লাভ করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। রেবা রায়চৌধুরী (তখন রেবা রায়)— তাঁর ছোড়দা বিনয়কৃষ্ণ রায়ের মাধ্যমেই যুক্ত হন গানের স্কোয়াডে। বিনয় রায়ের নেতৃত্বে গানের স্কোয়াডের জনপ্রিয়তা এবং আবেদন তখন মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠছে ক্রমশ। তারই একটা ছবি সুধী প্রধানের বিবৃতির মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। যে কথা জানিয়েছেন 'গণনাট্য কথা'য় সজল রায়চৌধুরীও। উনিশশো বিয়াল্লিশে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। এ উপলক্ষে টাউন হলে একটি জনসভা হয়। বিনয় রায়ের নেতৃত্বে সংগীত স্কোয়াড সেখানে সংগীত পরিবেশনা করে।— '...বিনয়ের গান এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে দর্শকদের অনেকেই কথা ও সুর জানতেন। গণসঙ্গীতের স্কোয়াডের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের অনেকেই গলা মিলিয়ে ছিলেন।'[২৮] এইভাবেই বিনয় রায় ক্রমশ তাঁর সংগীতের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর বিদ্রোহ, প্রতিবাদ। বিনয় রায় নিজের গান ছাড়াও হেমাঙ্গ বিশ্বাস, কনক মুখোপাধ্যায়, সুরথ পাল, সাধন দাশগুপ্ত, নিবারণ পণ্ডিত, দশরথ লালের গান গাইতেন। অসম্ভব সুরেলা এবং জোরালো ছিল তাঁর গানের গলা। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন গান গেয়ে। এই দাদা যখন রংপুরে আসতেন রেবা তাঁর কাছে শিখে নিতেন গান। গান তখন আর শুধু গান রইল না— হয়ে উঠল সংগ্রামের প্রেরণাস্বরূপ। রেবা রায়চৌধুরী প্রথম কলকাতার মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে আসেন ১৯৪৩ সালে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের সম্মেলন অনুষ্ঠানে। কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আর নাট্যভারতীতে যেখানে পানু পাল নির্দেশিত মহামারী নৃত্যে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তৎকালীন 'রেবা রায়'। পরবর্তীকালে যাঁর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন তিনি সেই গণনাট্য কর্মী সজল রায়চৌধুরী এ প্রসঙ্গটি তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন— '...সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি ও ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন উপলক্ষে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি সাংস্কৃতিক সমাবেশ আয়োজিত হয়েছিল। এই সমাবেশে অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে 'ম্যায় ভুখা হুঁ' অনুষ্ঠিত হয়। দর্শক মনে গভীরভাবে দাগ কাটে 'মহামারী নৃত্য'। পানু পাল ও বিনয় রায়ের বোন রেবা রায় (চৌধুরী) দর্শকদের সাধুবাদ অর্জন করেন। তাঁরা তখন এসেছিলেন রঙ্‌পুর থেকে।'[২৯]

অনেক দুঃখে নিজের জন্মভূমি, নিজের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র রংপুর ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। শুধু নিজের লক্ষ্যের প্রতি স্থির থাকতে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন চল্লিশের গোড়ার দিকে শহর কলকাতার বাইরে বেড়ে ওঠা এক সদ্য তরুণী। তাঁর নিজের কথায় এটা ছিল তাঁর জীবনের 'একটা টার্নিং পয়েন্ট।' ২০ এপ্রিল, ১৯৪৪ সাল— বোম্বাই-এর পথে রওনা দিলেন ছোড়দা বিনয় রায়ের সঙ্গে। থাকতেন পার্টি হেড কোয়ার্টার্স—রেড ফ্ল্যাগ হল-এ। তখন সেখানে জোরকদমে রিহার্সাল চলছে— শান্তি বর্ধন দুর্ভিক্ষের ওপর নাচের কোরিওগ্রাফি করছেন। 'ভয়েস অব বেঙ্গল' 'ভুখা বাঙ্গাল' নৃত্যনাট্য, বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'জবানবন্দী'-র হিন্দি অনুবাদ 'অন্তিম অভিলাষ'-এর মহড়া চলছে। রেবা রায় এই কর্মকাণ্ডে ছড়িয়ে পড়লেন— অংশ নিলেন ব্যালে পরিক্রমায়। বাংলার মন্বন্তরের ছবি তাঁদের এই নৃত্য-ভাবনার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে। গুজরাত, মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে বাংলার মন্বন্তরের জন্য অর্থসংগ্রহ করতেন তাঁরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পার্টির Cultural Squad খুব বড় একটা দায়িত্ব পালন করেছিল এবং এই দায়িত্বের ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পূরণচাঁদ যোশীর নেতৃত্বে নাটকে শম্ভু মিত্র, কল্যাণী কুমারমঙ্গলম, নেমিচাঁদ জৈন, উষা দত্ত, জয়া রায় প্রমুখ। নাচের স্কোয়াডে ছিলেন শান্তা গান্ধী, দীনা গান্ধী (পরে পাঠক), কর্ণাটকের নাগেশ, পঞ্জাবের প্রেম ধবন, মহারাষ্ট্রের লীলা সুন্দরাইয়া, উত্তরপ্রদেশের রেখা জৈন, অন্ধ্রপ্রদেশের রেড্ডি, বাংলার পানু পাল, বিনয় রায়, রেবা রায়, প্রীতি সরকার, রুবি দত্ত, সত্যজীবন ভট্টাচার্য, ভূপতি নন্দী প্রমুখ। 'The description of Dina Pathak and Reba Roychowdhury make it clear that the cultural activites of IPTA allotted equal space for both the genders, not making any special concession for any one. One has to also critically review the fact that the contents and focus of the dance themes never highlighted women's issues and neither were there any special space provided for the women's voices, instead focusing completely on becaming the 'people's' voice.'[৩০] বোম্বে-র কাওয়াসজি জাহাঙ্গির হলে 'ভয়েস অব বেঙ্গল'-র শো-তে 'সুনো হিন্দকে রহনেওয়ালোঁ' গান গেয়ে রেবা দর্শক-শ্রোতাদের বিপুল প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিলেন। এমনকি অনুষ্ঠান শুনতে আসা সরোজিনী নাইডুকে কাঁদিয়ে দিয়েছিলেন গান গেয়ে। তিনি বলেছিলেন 'এক্সেলেন্ট'। এই গানটির সঙ্গে রেবা রায়ের পরিচিতি ছড়িয়ে গিয়েছিল। এইভাবে বাংলার একটি মেয়ে প্রগতি- সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাদেশিকতার গণ্ডি ভেঙে পরিচিত হলেন সারা ভারতের সঙ্গে।

১৯৪৪ সালে পার্টির সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় ব্যালে ট্রুপ গঠিত হলে রেড ফ্ল্যাগ হল থেকে রেবারা

চলে আসেন আন্ধেরিতে। কেমন ছিল সেই দিনগুলো? সারা দিন কঠিন শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা, ঘড়ি ধরে নিয়মানুসারে কাজ, খাওয়া, গান বা নাচের চর্চা। রেবা, দীনা, শান্তা, শচীন, নরেন্দ্র শর্মা— যাঁদের বয়স ছিল কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে, সবাই নিয়ম করে নিজের অনুশীলন করতেন। বিনয় রায়, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়রা সাত-আট ঘন্টা গানের চর্চা করতেন। কারণ পি.সি.যোশীর মতে এটাই পার্টির কাজ। সে এক অসাধারণ জীবনগাথা। দেশের কাজের জন্য উদ্যমী তরুণ-তরুণীদের বিপুল এক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সেনানী হওয়ার কথা-কাহিনি। তাঁরা নিজেরাই পোশাক সেলাই করতেন, পেইন্টিং করতেন, ড্রেস বানাতেন। আই পি টি এ-এর প্রতীক 'কল অব দ্য ড্রাম' তৈরি হয়েছিল এই রকমই এক কমিউনে আন্ধেরির বাংলো বাড়িতে। রেবা রায় ছিলেন সেই অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষদর্শী— 'একদিন সন্ধ্যেবেলায় হলঘরে বসে সেলাই করছিলাম। একপাশে রাখা ছিল বিরাট নাকাড়াটা। হঠাৎ চিত্তপ্রসাদ বললেন, 'শান্তিদা, আপনি ওই ড্রামটার পিছন থেকে আস্তে আস্তে নাচের ভঙ্গিতে উঠে পোজ দিয়ে দাঁড়ান তো! শান্তিদা মহান শিল্পী। ড্রাম বাজাবার দুটো কাঠি নিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে ড্রামের পিছন থেকে উঠে এক বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ড্রাম বাজাবার মুভমেন্ট করতেই চিত্তদা হঠাৎ চিৎকার করে বললেন, শান্তিদা, দুমিনিট এই ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকুন, একদম নড়বেন না! চিত্তদার তুলি বিদ্যুৎগতিতে এঁকে চলল, বিশাল ড্রাম বাজাচ্ছেন এক শিল্পী। বলে উঠলেন, এটা হল 'কল অব দ্য ড্রাম'। ছোড়দা (বিনয়) বলল, 'চমৎকার! শান্তিদা! চিত্তদা! এটাই হোক আই পি টি এ-র প্রতীক।' পার্টি মেনে নিল। গণনাট্য সংঘের প্রতীকের জন্ম এইভাবে হয়েছিল।"[৩১]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন সাংস্কৃতিক দুর্গ সেন্ট্রাল স্কোয়াড। সেন্ট্রাল স্কোয়াডের 'ভারতের মর্মবাণী' বিশেষ জনপ্রিয় হয়— যার বিষয় ছিল পরাধীন ভারতের সুখ-দুঃখ, স্বদেশপ্রেম, কালোবাজারি, দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা। এরই সঙ্গে প্রদর্শিত হত মণিপুরী, ধোবি নাচ, জেলে নৃত্য, নৌকা নাচ, হোলি নাচ— বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংগীতের আধারে এবং গ্রামীণ প্রেক্ষিতে বিহারের গ্রাম্য ভাষায় লেখা রামসীতার কাহিনি নিয়ে 'রামলীলা'। দশরথ লালের ঢোল, রেড্ডির রাবণ চরিত্রাভিনয় আর 'সখী'র ভূমিকায় রেবা রায়ের নাচ ও গান অনুষ্ঠানটিকে অসামান্য জনপ্রিয় করে তোলে। 'রামলীলা'-র নৃত্য ভাবনা ছিল শচীন শঙ্করের— একেবারেই বিহারী ফোক স্টাইলভিত্তিক। রেবা রায় সেখানে সখীর ভূমিকায়— নিজস্ব একটা রূপসজ্জায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হলুদ ব্লাউজের সঙ্গে উঁচু করে পরতেন গাঢ় লাল আর সবুজ পাড়ের শাড়ি, পাট পাট করে চুলটা বাঁধতেন আর ক্রিম মেখে মুখটা তেল চকচকে

করে নিতেন। গানও গাইতেন। সমস্তটা মিলিয়ে একটা ভিন্ন আবেদন তৈরি হত। কলকাতায় তাঁরা ‘ভারতের মর্মবাণী’ এবং অন্যান্য ‘আইটেম’ নিয়ে যে অনুষ্ঠান করেছিলেন তা-ও দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিল। সমকালে গণনাট্য প্রযোজিত ‘নবান্ন’ সম্পর্কে যেমন উচ্ছ্বসিত ছিলেন রেবা রায়রা, তেমনই ‘নবান্ন’-র শিল্পীরাও সেন্ট্রাল স্কোয়াডের প্রযোজনায় মুগ্ধ ছিলেন। ‘নবান্ন’-র শিল্পী শোভা সেন লিখলেন— ‘নবান্ন’-এর সাফল্যের পরেই আমরা পেয়েছিলাম গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে ওই দুটি অপূর্ব প্রযোজনা— ‘স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া’ আর ‘ইন্ডিয়া ইম্‌মর্টাল’। সেদিন আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম এই অবর্ণনীয় ব্যালের অনুষ্ঠান দেখে। তার আগেই এর কথা অনেক শুনেছিলাম। সেই অনুষ্ঠানেই প্রথম রেবাকে দেখি। বিনয়দা তখন আমাদের হিরো। বিনয়দার গান শুনবার জন্য আমরা পাগল ছিলাম। যেমন গানের কথা ও সুর, তেমনই উদাত্ত গলা। মাতিয়ে দিলেন শ্রোতাদের। তাঁরই বোন রেবা। তখন কিন্তু ওর এত প্রতিভা ছিল জানতাম না। পরে নাচ, গান ও অভিনয়, তিনেই দেখেছি কত উঁচুদরের শিল্পী ও। রেবার সঙ্গে একসঙ্গে খুব বেশী কাজ করার সুযোগ হয়নি, তবে নানা অনুষ্ঠানে দেখা হত, গল্প হত। দুজনেই দুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম।”[৩২]

১৯৪৬-র শেষে সেন্ট্রাল স্কোয়াড ভাঙলে ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ পি.সি.যোশীর কথামতো প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় রায়, রেবা রায় চলে আসেন কলকাতায়। লক্ষ করার মতো ঘটনা গণনাট্যের সেন্ট্রাল স্কোয়াড কিংবা ‘ধরতি কে লাল’-এর মতো হিন্দি ছবিতেও বাংলার মেয়েরা জায়গা করে নিয়েছে। বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’, ‘অন্তিম অভিলাষ’, ‘জবানবন্দী’ এবং কিষান চন্দরের উপন্যাস ‘অন্নদাতা’, অবলম্বনে ‘ধরতি কে লাল’ ছায়াছবির নাচের দৃশ্যে রেবা রায় এবং একটি চরিত্রে প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছিলেন। তৃপ্তি মিত্র তো গুরুত্বপূর্ণ মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এই চলচ্চিত্রে।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক মাস আগে সারা ভারত জুড়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে ইংরেজ বিরোধিতা। ১৯৪৬ সালে ঘটে গেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে কলকাতায় চলে আসেন রেবা রায়রা। এখানে তাঁদের কাজ শুরু হয়।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ এবং স্বাধীনতা। স্বাধীন ভারত। রংপুরের যে মাটিতে রেবা রায়ের জন্ম, সেই জন্মভূমি হয়ে গেল বিদেশ। বাস্তুহারা স্বজনহারা মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা। আরেক নতুন যুদ্ধের সূচনা। রেবা রায়, সাধনা রায়চৌধুরী, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়রা নেতৃত্ব দিলেন

হরিপদ কুশারী, সজল রায়চৌধুরী, জীবন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে যখন কমিউনিস্ট পার্টি আবার নিষিদ্ধ, তখন নাচের অনুষ্ঠান প্রায় বন্ধ। গান আর ছোট ছোট নাটক নিয়ে গণনাট্যের শিল্পীরা ছড়িয়ে পড়তেন গ্রামে শহরে। গান বা অভিনয় পুরোটাই ঘটত অত্যন্ত গোপনে। এই সময়ে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন গণনাট্যের মহিলা কর্মীরা। পার্টি বেআইনি বলে ঘোষিত। লুকিয়ে ছোট ছোট স্কোয়াডে বিভক্ত হয়ে নাটক করতে হত গণনাট্য কর্মীদের। কিন্তু তাঁরা পিছিয়ে যাননি। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে অভিনীত কয়েকটি নাটক, নাটকের চরিত্র এবং বিষয়বস্তুর উল্লেখে বোঝা যাবে কতটা আত্মপ্রত্যয়ী, সাহসী এবং নিষ্ঠ ছিলেন গণনাট্যের কর্মীরা। পঞ্চাশের দশকেও গণনাট্য সংঘের মহিলা কর্মীরা নিজেদের জীবনের নিরাপত্তাকে তুচ্ছ করে, কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নানা বিধিনিষেধের ভয়-ভ্রান্তিকে তোয়াক্কা না করেই নাটকের কাজটা করে গেছেন।

১৯৪৯ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি— সজল রায়চৌধুরীর সঙ্গে রেবা রায়ের বিবাহ হয়। গণনাট্যের রঙ্গমঞ্চেই তাঁদের পরিচয়। বিবাহ-পরবর্তী সময় কোনও রোম্যান্টিক বিলাসে অতিবাহিত হয়নি তাঁদের জীবন। তখন গোপনে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নাটক করেছেন; এমনকী নাম লিখিয়েছেন সুইসাইড স্কোয়াডে। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত নাট্যশোধ সংস্থানের সৌজন্যে প্রাপ্ত রেবা রায়চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে যে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর— 'সব পেয়েছির দেশ', 'নয়ানপুর', 'জনান্তিক' —এই তিনটে নাটক দিয়েই রেবা রায়চৌধুরীর নাটকে হাতেখড়ি। এর আগে কখনও নাটক করেননি। ১৯৪৮-১৯৫০ সারা বাংলা জুড়ে তখন সংগ্রামের বাতাবরণ। তেভাগা আন্দোলন, জমি দখলের লড়াই, হরতাল, অনশন, বন্দি কর্মীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন। এরই মধ্যে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মিটিং মিছিল হয়, গণনাট্যের কর্মীরা সেখানে গান করেন, নাটকও করেন। এইসব লড়াইতে তাঁরা— গণনাট্যের কর্মীরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গ্রাম নগর বন্দরে নাটক করে বেড়াতেন। ধর্মঘটের নাটক, ধান ও জমিদখলের লড়াইয়ের গান। রেবা রায়চৌধুরী বিয়ের দুদিন আগেও হিন্দুস্তান পার্কে রাস্তার উপরে নাটক করেছেন 'সব পেয়েছির দেশে', দক্ষিণ কলকাতার স্কোয়াডের সঙ্গে। অভিনয়ের মাঝে পুলিশ এসে পুরো অডিটরিয়াম ঘিরে ফেলেছিল। তবু নাটক শেষ হল। দর্শকদের মিশে গিয়ে সুকৌশলে শিল্পীরাও চলে গেলেন। এমনি ছিল কমিউনিস্টদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা। কালী মুখোপাধ্যায়, জীবন মুখোপাধ্যায়, মমতাজ আমেদ খাঁ, সজল রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী প্রমুখ গণনাট্যের কর্মীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পথনাটক করেছেন। পার্টির নির্দেশে

বিকেল পাঁচটা বাজলে, শ্রমিকরা বেরিয়ে এলে তাদের মধ্যে গোপনে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে লিফলেট বিলি করেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে চৌমাথায় পথনাটক করেছেন আবার নাটক শেষে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মিশে গেছেন জনতার মধ্যে। এইভাবেই গণনাট্য কর্মীরা কাজ করেছেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। রেবা রায়চৌধুরীর মতো সদ্য বিবাহিতা তরুণী জীবনটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতে পিছপা হননি। সুখ-শান্তি-সংসার-নিরাপত্তার চিরাচরিত প্রথার ছক ভেঙে নাটক আর গানকে সঙ্গী করে নেমে পড়েছেন আরও বৃহৎ কোনও উদ্দেশ্যকে রূপ দেওয়ার অভিপ্রায়ে। এমনকী স্কুলের চাকরিটা পর্যন্ত খোয়াতে হয়েছে। কারাবাস করতে হয়েছে। প্রেসিডেন্সি জেলে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে থেকেছেন। এখানেই ছিলেন মণিকুন্তলা সেন, অলকা মজুমদার, কমলা চট্টোপাধ্যায় এবং আরও এর আরো আরো অনেকের সঙ্গে।

জেলের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দিরা অনশন ধর্মঘট করেছেন। শারীরিক মানসিক— দু'দিক থেকেই কষ্ট। এর আগে মিটিং-মিছিল করেছেন, বে-আইনি কাগজপত্র পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গোপন স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন, গান, নাটক করেছেন। কিন্তু অনশনের অভিজ্ঞতা তীব্র, প্রবল। তবে সেই ভয়ঙ্কর কষ্টও সহ্য করে নিয়েছেন, কারণ সঙ্গীরাও একই যন্ত্রণার একই লড়াইয়ের সহযোদ্ধা। তবু ভাল গান গাইতে পারতেন বলে অনশনের সময়েও কারাগৃহের প্রাচীর কাঁপিয়ে রেবা রায়চৌধুরীর দরাজ গলার গান প্রতিধ্বনিত হত— 'আর কতকাল বল কতকাল সইব এ মৃত্যু অপমান' কিম্বা 'হেই সামালো ধান হো কাস্তেটা দাও শান হো' কিংবা 'ফিরাইয়া দে দে দে মোদের কায়ূর বন্ধুরে'। প্রচণ্ড মানসিক জোর আর রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে জেলের মধ্যে কিংবা কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর চালিয়ে গেছেন প্রতিবাদের সোচ্চার আন্দোলন। জেলের বাইরে শহিদ হয়েছেন তাঁদেরই বন্ধুরা। ১৯৪৮ সালের ২৭ এপ্রিল মেডিক্যাল কলেজের সামনে বন্দিমুক্তির দাবিতে মহিলা মিছিলে শহিদ হন— লতিকা সেন, প্রতিভা গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয়া দত্ত ও গীতা সরকার— এঁদের কথা কখনও ভোলেননি রেবা রায়চৌধুরীরা। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান যেন বুকের মধ্যে আঁকড়ে নিয়ে পথ হেঁটেছেন— 'আমরা তো ভুলি নাই শহীদের সেকথা ভুলব না/তোমার কলিজার খুনে রাঙ্গাইল কে আন্ধার জেলখানা।'

জীবনের শেষ পর্যায়ে যত দিন পর্যন্ত পেরেছেন অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করে গেছেন— নাটকে, চলচ্চিত্রে। গণনাট্যের দক্ষিণ কলকাতা শাখার নাটকে রেবা রায়চৌধুরীর অবস্থান ছিল সর্বাগ্রে। তবে এ কথাও সত্য যে গণনাট্যের শিল্পীরা কোনওদিন নিজেরা প্রচারের আলোয়

নিজেদের মেলে ধরতে চাননি। তাঁদের মুখ ঢেকে যায়নি বিজ্ঞাপনের ঝলকানিতে। পরবর্তী প্রজন্মের ক'জন মানুষই বা জানতে পারলেন তাঁদের কথা? মৃণাল সেনের 'মৃগয়া', 'পরশুরাম', উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'ময়নাতদন্ত', গৌতম ঘোষের 'পার', 'দখল' ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে তাঁর অভিনয়কীর্তি খানিকটা ধরা থাকলেও তাঁর মূল যে মাধ্যম নাটক, তা শুধুই স্মৃতিনির্ভর। বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন'-এর 'গিরি', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' পালার 'পদ্ম' অথবা নীলদর্পণের 'আদুরী'-কে প্রত্যক্ষদর্শীরা হয়তো কেউ ভুলবেন না। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন তাঁর সম্পর্কে সেই ইতিহাসের সাক্ষ্যই বহন করে— 'সংগীতে, নৃত্যে, অভিনয়ে সমান পারদর্শিনী ও কীর্তিময়ী এমন আর কোনো শিল্পী বাংলার গণনাট্য আন্দোলনে আমরা পাইনি। 'দেবীগর্জন'-এ গিরির ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ে যে দুর্লভ ব্যাপ্তি দেখেছি তাতে ওই ত্রিমাত্রিক বৈভব ছিল, তাই কোনো এক শ্রেণী তথা সমাজের লক্ষণাশ্রিত বাস্তব অভিনয় বারবারই নৃত্য বা সংগীতের গভীর দ্যোতনার স্পর্শে এমন আবেগ ও আর্তির স্তরে পৌঁছে যেত— যেমন প্রগাঢ় আস্থায় বড়ো শান্ত, সংযত ভঙ্গি ও উচ্চারণে রামদা-খানা তুলে নিয়ে 'নিজমূর্তি' ধারণের দৃশ্যে কিংবা বিবাহের দৃশ্যে সর্দারের সঙ্গে খুনসুটির লীলায়— যে বাস্তবের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিত ধরা পড়ত।'[৩৩] কীভাবে রেবা রায়চৌধুরীরা গণনাট্যের কালে আবির্ভূত হয়ে সেই কাল অতিক্রম করে হয়ে উঠেছিলেন ভবিষ্যৎকালের অনন্য পথিকৃৎ, তারই ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে জয়া মিত্রের 'আবহপট'-এ। 'একজন দুজন নয় আমাদের পূর্বপ্রজন্মের মায়েরা তো অনেকেই নানাভাবে যুক্ত ছিলেন স্বাধীনতার যুদ্ধে। তাঁদের সেই স্বপ্নের, সেই আবেগের কোনো ছায়া কি পড়েনি আমাদের প্রজন্মের সাহসে, ভয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠার স্পর্ধায়! বয়ে আনেনি প্রতিরোধের কোনো ধারাবাহিকতা! রেবাদির কথা শুনতে শুনতে আরো বেশি করে মনে উঠেছে এসব প্রশ্ন। জীবনময় কঠিন সব দিনচর্যার পরও তাঁর, তাঁদের এই ফলন্ত লতার মত সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করা নম্র, জেদি অস্তিত্বই, মনে হয়, সিঞ্চন দিয়েছে আমাদের প্রজন্মের শিকড়ে। প্রচলিত প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে  প্রশ্ন করার সাহস, নিজেদের বাঁচাকে সমষ্টির বাঁচার সঙ্গে মিলিয়ে ডানা দেবার আনন্দ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে এই সব পূর্বমাতৃকাদের জীবনধারণ থেকে, জীবনধারণা থেকে।'[৩৪]

## নিবেদিতা দাস (১৯২৫-১৯৮০)

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র অন্যতম সাহসী অভিনেত্রী নিবেদিতা দাস। নাট্যক্ষেত্রে শুধু অভিনয় নয়, বিভিন্ন বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে গেছেন তিনি আজীবন। অভিনয়ের সঙ্গে

সঙ্গে নাটকের অনুবাদ, পোশাক পরিকল্পনা, নাটক রচনা, নির্দেশনা সহায়তা, রঙ্গমঞ্চ স্থাপন, সাংগঠনিক নানান কাজ এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যবিভাগে অধ্যাপনা— এই রকম নাট্য সম্পর্কিত বহুবিধ কাজে তাঁর অংশগ্রহণ তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদার স্থানে উন্নীত করেছে। গণনাট্য সংঘ, শৌভনিক নাট্য গোষ্ঠী, ইন্ডিয়ান থিয়েটার অ্যাকাডেমি ঘিরে তাঁর নাট্য পরিক্রমণের বৃত্তায়ন ঘটেছে। অভিনয় বা নাট্য তাঁর কাছে ছিল বিনোদন নয়, সমাজ বদলের সমাজ গঠনের মঞ্চ। নিবেদিতা দাস অভিনয়ের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দিয়েছেন সাংগঠনিক কাজকর্ম এবং মঞ্চ স্থাপনার ওপরও। এ বিষয়ে নিবেদিতা দাস প্রসঙ্গে আরেক গণনাট্য কর্মী, সংগঠক শোভা সেন ছিলেন উচ্ছ্বসিততাঁর মতে নিবেদিতা দাসও খুব ভাল অভিনেত্রী ও সংগঠক। তাঁর মধ্যেও নাট্যযোদ্ধার সব লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সে বেঁচে রইল না বেশিদিন। থাকলে হয়ত নাট্য আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে পারতেন তিনি। তাঁর সক্রিয়তা সহযোগিতা বিদ্রোহ প্রতিবাদ নাট্যজগতের নারীদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ। উল্লেখ্য যে গণনাট্যে থাকাকালীন তিনি গণনাট্য সংঘের জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন ১৯৫৪-১৯৫৫ সালে।

নিবেদিতা দাসের জন্ম ১৯২৫ সালের ১ জানুয়ারি পাটনা শহরে। বাবা সত্যসুন্দর বসু ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য এবং রবীন্দ্রসংগীতে পারদর্শী ও বাদ্যযন্ত্র বাদনে সুদক্ষ। মা-ও ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞা। এঁদের দুজনেরই বিশেষ প্রভাব ছিল নিবেদিতা-সহ ছয় বোন ও এক ভাইয়ের ওপর। পরবর্তী কালে কবিতা কল্পনা সাধনা নিবেদিতা বিনতা ও প্রণতা ছয় বোনের মধ্যে চারজন সাধনা রায়চৌধুরী, নিবেদিতা দাস, বিনতা রায় ও প্রণতা নন্দী স্বক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কল্পনা রায়, সাধনা রায়চৌধুরী ও নিবেদিতা দাস। প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন নিবেদিতা দাস। খুব ছোটবেলা থেকেই নির্ভুল সুরে গান গাইতে পারতেন। স্কুলেও নাচে গানে নানান সাংস্কৃতিক কাজে নিবেদিতার স্থান ছিল সর্বোচ্চ। এই প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটল কলকাতায় আসার পর। জর্জ বিশ্বাস অর্থাৎ দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে গান শেখা আর গণনাট্যের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় গান গাওয়া তাঁর জীবনের অন্যতম বাঁক। গণনাট্য সংঘ বা সেই সময়ে প্রগতিশীল শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে যে মহিলারা যুক্ত হতেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই পরিবারের কোনও না কোনও পুরুষ অভিভাবক বা আত্মীয় তাঁদের বাইরে নিয়ে আসার পথটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। নিবেদিতার ক্ষেত্রে এই অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিলেন মাসতুতো দাদা চিন্মোহন সেহানবিশ। নিবেদিতার ‘চিনুদা’র সঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাস আসতেন নিবেদিতাদের কলকাতার বাড়িতে।

পাটনা থেকে বাবার আনা অর্গ্যান বাজিয়ে গান শেখাতেন জর্জ বিশ্বাস। নিবেদিতা, বিনতা— তখন বেলতলা স্কুলের ছাত্রী। 'চিনুদা'র মাধ্যমেই পরিচয় হয় তাঁর ছাত্র অজয় দাসের সঙ্গে। চিন্মোহন সেহানবিশের ছাত্র অজয় দাস তখন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। এই পরিচয় তাঁদের দুজনকে রাজনীতিক বিশ্বাসের জায়গা থেকে পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ করে। বিবাহ-পরবর্তী জীবনে নিবেদিতা দাস কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং কার্যকলাপের সঙ্গে ক্রমশ জড়িয়ে পড়তে থাকেন। নিবেদিতার শ্বশুরের মৃত্যুর পর স্বামী অজয় দাস তাঁকে পার্টির কাজে যুক্ত করে দিলেন। সেই সময় পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্টেও সাধনা রায়চৌধুরী, নিবেদিতা দাস কাজ করতেন। বাড়িতে পোস্টার তৈরি করা, কুরিয়ার হিসেবে চিঠিপত্র পৌঁছে দেওয়া, পার্টির কেউ আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা— এই সব বিপজ্জনক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াটা যেমন নিঃসন্দেহে তাঁদের মানসিকতাকে দৃঢ় করল, তেমনই কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত ভাবধারাকে গ্রহণ করার পথ তৈরি করল। আর সেখান থেকেই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত হয়ে— বাঙালি মেয়েদের জীবনের অভিমুখ বদলের সূচনা হল। শুধুই সংসার-লেখাপড়া-চাকরি নয়— আরও কঠিন আরও বিপজ্জনক আরও প্রথাভাঙা পথে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। গণনাট্য পর্বে নিবেদিতা দাস অভিনীত নাটকগুলি ছিল—

| নাটক | সময় | অভিনয় ও প্রযোজনা | নাট্যকার/পরিচালক |
|---|---|---|---|
| ১. দলিল | ১৯৫২ | ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্য কলকাতা শাখা প্রথম মঞ্চস্থ করে। অভিনয়ে : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, নিবেদিতা দাস, গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ | ঋত্বিক ঘটক |
| ২. জনক | ১৯৫২ | অভিনয় : গোবিন্দ চক্রবর্তী জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, বীরু মুখোপাধ্যায়, বীরেশ মুখোপাধ্যায় নিবেদিতা দাস, সাধনা রায়চৌধুরী প্রমুখ | গোবিন্দ চক্রবর্তী |
| ৩. আবাদ | ১৯৫২ | অভিনয় : গোবিন্দ চক্রবর্তী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, অনিন্দ্য সেন, সাধনা রায়চৌধুরী, নিবেদিতা দাস প্রমুখ | মূলকাহিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নাট্যরূপ : গোবিন্দ চক্রবর্তী |
| ৪. রাহুমুক্ত | ১৯৫৪ ২০ অগস্ট শুক্রবার | অভিনয়: পদ্ম কৃষক রমণীর চরিত্রে নিবেদিতা দাস | পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় রচনা : বীরু মুখোপাধ্যায় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | সংগীত ও সুরারোপ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র |
| ৫. মরাকোটাল | ১৯৫৫, ২০ মার্চ | প্রযোজনা: রূপকার | পরিচালনা : তুলসী লাহিড়ী |
| ৬. বাংলার মাটি | ১৯৫৫ | প্রযোজনা- গণনাট্য সংঘের আনন্দম শাখা অভিনয়: তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার, মহঃ ইসরায়েল, সবিতাব্রত দত্ত, সাধনা রায়চৌধুরী, নিবেদিতা দাস প্রমুখ। | |
| ৭. তপতী | ১৯৫৫, ৭ অক্টোবর | ভা.গ.না.স সাউথ স্কোয়াড নিবেদিতা দাস, অভিনয় : সাধনা রায়চৌধুরী, সবিতাব্রত দত্ত প্রমুখ। | পরিচালনা: জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় রচনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। |
| ৮. মুক্তির উপায় | ১৯৫৬, ৮ জুন | ভা.গ.না.স দক্ষিণ কলকাতা শাখা, অভিনয়: নিবেদিতা দাস, সাধনা রায়চৌধুরী প্রমুখ সংগীত : দেবব্রত বিশ্বাস। | পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় রচনা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |

'বিশে জুন', 'গোর্কির মাদার' ইত্যাদি গণনাট্য সংঘ পরিচালিত বহু নাটকে তিনি অভিনয় করেননি ঠিকই, কিন্তু কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকে তাঁর অংশগ্রহণ ও অভিনয় তাঁকে অভিনেত্রী হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠা দিল, আবার অভিনয়ের মধ্য থেকে নিবেদিতা দাসের সমাজ সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে, শোষণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভঙ্গীও প্রকাশ পেল। গণনাট্যের দুটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার কথা এ প্রসঙ্গে অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। একটি ঋত্বিক ঘটকের লেখা 'দলিল' এবং অপরটি সেই সময়ের অত্যধিক জনপ্রিয় এবং উদ্দীপনাময় প্রয়োজনা 'রাহুমুক্ত'।

'দলিল' নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্য কলকাতা শাখা প্রথম অভিনয় করে। নাটকটি ১৯৫৩ সালে বোম্বাইতে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের সম্মেলনে নির্বাচিত হয় এবং প্রথম পুরস্কার লাভ করে। বোম্বাই সম্মেলনে ঋত্বিক ঘটক পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতু ঘোষের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নাটকের মূল বিষয়বস্তু ছিল দেশভাগ করে স্বাধীনতা—লাভের অর্থহীনতা, গ্লানি কীভাবে ভেঙে দিয়েছিল সাধারণ মানুষের মনোবল— তারই কাহিনি। দেশবিভাগের রক্তক্ষরণ উদ্বাস্তু সমস্যার যন্ত্রণা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মানুষকে যেমন সহ্য করতে হয়েছে তেমনই বাস্তব জীবনে— সাহিত্যে, নাটকে, চলচ্চিত্রে তার

প্রতিফলনও ঘটিয়েছেন। এই রকমই সময়োপযোগী মর্মস্পর্শী নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নিবেদিতা দাস। সুরমা ঘটক লিখিত 'ঋত্বিক': পদ্মা থেকে তিতাস' বইতে সুনীল দত্তের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যাচ্ছে 'দলিল'— হয়ে উঠেছিল এক দারুণ প্রযোজনা। সেন্ট্রাল স্কোয়াডের 'দলিল' যখন অভিনয় হয় ২০৬ লোয়ার সাকুর্লার রোডে ভূপতি নন্দীর বাড়ির ছাদে, তখন পদ্ম চরিত্রের অভিনয়ে ছিলেন তৃপ্তি মিত্র। 'দলিল' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতাজ, উৎপল দত্ত, শান্তনু ঘোষ, উমানাথ ভট্টাচার্য, ঋত্বিক, অমল কর, অনিল ঘোষ, শোভা সেন, এবং পরে সীতা মুখোপাধ্যায়। লোয়ার সার্কুলার রোডের অভিনয়ের মাস দুয়েক পর আবার 'দলিল' নাটকের শো হয়। তখন অবশ্য তৃপ্তি মিত্রের পরিবর্তে পদ্মর ভূমিকায় অভিনয় করেন মমতা চট্টোপাধ্যায়। এই পর্বের প্রথম শো হয় হাজরা পার্কের একটি শিক্ষক কনফারেন্সে। এই অভিনয় তেমন প্রশংসা পায়নি। কিন্তু তার পর যতবার অভিনয় হয়েছে 'দলিল' প্রশংসা পেয়েছে যুগপৎ এই নাটকের বিষয়গুণে ও অভিনয়গুণে। ১৯৫৩ সালে বোম্বাইতে প্রথম স্থানাধিকারের সুবাদে পুরস্কার অর্জন করেছিল 'দলিল' নাটক। নিবেদিতা দাস এই 'দলিল' নাটকেই পদ্মর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এবং একজন দক্ষ ও সচেতক অভিনেত্রী হিসেবে 'পদ্ম'র ভূমিকায় যে গভীর মনোযোগী অভিনয়ের ছাপ রাখবেন তা বলাই বাহুল্য। এই নাটকটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন দর্শন চৌধুরী তাঁর 'গণনাট্য আন্দোলন' বইতে। বিষয়বস্তু আলোচনান্তে তিনি অভিনয় প্রসঙ্গে লেখেন— 'অভিনয়ে: কালী ব্যানার্জী, শোভা সেন, নিবেদিতা দাস, মমতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই সম্মেলনে মমতা একটি প্রধান ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করেন), মমতাজ আহমেদ খাঁ, সাধনা রায়চৌধুরী, কেষ্ট মুখার্জী, উমানাথ ভট্টাচার্য, নির্মল সর্বজ্ঞ, সমীরণ দত্ত, অমলেশ চ্যাটার্জী, শান্তনু ঘোষ, গোবিন্দ গাঙ্গুলি, মাঃ জ্যোতি।'[৩৫]

এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট নয় বোম্বাই সম্মেলনে পদ্মর ভূমিকায় কে অভিনয় করেছিলেন। তবে এ কথা স্পষ্টতই স্বীকার করা যায় এই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পদ্মর ভূমিকায় কোনও না কোনও সময়ে নিবেদিতা দাস অভিনয় করেছিলেন। সুনীল দত্তের একটি উক্তি থেকে জানা যায় 'এই চরিত্রে প্রথমবার তৃপ্তি মিত্র, পরে নিবেদিতা দাসও অভিনয় করেছেন।'[৩৬]

গণনাট্যের আরেক অভিনেত্রী 'বহুরূপী' নাট্যদলের প্রাণপ্রতিমা তৃপ্তি মিত্র অবশ্য এই সময়কালেই নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করছেন (ডাকঘর-১৯৫৭) দলের প্রয়োজনে এবং শম্ভু মিত্রের ব্যস্ততার কারণে। পঞ্চাশের দশকের শেষ কয়েকটি বছর থিয়েটার কর্মিণীদের কর্ম-পরিধিতে অভিনয়

ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। ১৯৫৪ সালে রচিত বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' 'নবান্ন'-র পর গণনাট্যের সবচেয়ে দর্শক অনুগৃহীত পালা। এই যাত্রাপালাতেও প্রথম থেকে অভিনয় করতেন নিবেদিতা দাস কৃষক রমণী পদ্ম-র ভূমিকায়। জম্বুদ্বীপের রাণী অরুন্ধতী-র ভূমিকায় ছিলেন সাধনা রায়চৌধুরী। দুই বোন এইভাবে একই নাটকে একাধিকবার অবতীর্ণ হয়েছেন। 'রাহুমুক্ত'র প্রথম অভিনয় হয় দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে ৫৮/১ কাঁসারীপাড়া রোড-এ যুবক সম্প্রদায়ের মাঠে। দিনটি ছিল ২০ আগস্ট, শুক্রবার। সংগীত রচনা ও সুরারোপ করেছিলেন 'নবজীবনের গান'-এর স্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (জম্বুদ্বীপের রাজা), অতুল ভট্টাচার্য বা বীরু মুখোপাধ্যায় (জননেতা পুণ্ডরীক), ধীরেশ মুখোপাধ্যায় (কৃষক ভীম) প্রমুখ। বাংলা এবং বাংলার চৌহদ্দির বাইরে ছড়িয়ে পড়ে 'রাহুমুক্ত' পালার জনপ্রিয়তা। কিন্তু কেন যাত্রাপালার আকারে গণনাট্যের এই প্রযোজনার উপস্থাপনা, তার মূল কারণ হিসেবে বীরু মুখোপাধ্যায় নাটকের ভূমিকায় জানিয়েছেন যে বাঙালির জীবনে মঞ্চ-নাটক যেন অতিথি, তার সম্মান আলাদা। কিন্তু তাদের কাছে যাত্রাগান যেন নিজের ঘরের লোক যাকে পিঁড়ি পেতে ভাত বেড়ে দেওয়া যায়। বৃহত্তর বাঙালির জনজীবনের সঙ্গে যাত্রাগানের আত্মিক মিলনের বিষয়টি মাথায় রেখেই নাট্যকারকে বিশেষ উৎসাহিত করে গণনাট্যকর্মীরা লেখান 'রাহুমুক্ত' নামের এই যাত্রাধর্মী নাটকটি।

'মানুষের ভগবান'কে জাগানোর পালা 'রাহুমুক্ত'। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র 'রাহুমুক্ত'-র অভিনয় বাংলার নাট্যজগতে একটা নতুন ধারার জন্ম দিল। 'Unity' পত্রিকায় লেখা হল 'South Calcutta Branch : Staged on 20th August the long awaited Jatra (traditional drama form of Bengal) 'Rahumukta' on peace written by Biru Mukherjee. It was a great success and it has ushered in a new phase in I.P.T.A movement in Bengal.'[৩৭]— গণনাট্যের এই রকম একটি যুগান্তকারী প্রযোজনায় অভিনয় করতেন নিবেদিতা দাস। তাঁর অভিনয় এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে 'রাহুমুক্ত' অভিনয় শেষ হলে কৃষকদর্শকদের অভিনন্দনের প্লাবনে ভেসে যেতেন শিল্পীরা। মূল জায়গাটাকে নাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন কুশীলবরা, জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন 'মানুষের ভগবানকে'।---- 'মানুষের ভগবান জাগছে/মানুষের ভগবান জাগছে/দিকে দিকে আর্ত্তের হাহাকার/শিশুহারা, স্বামীহারা অনাথার।/ শ্মশানের চিতাধূমে, মরণের কালঘুমে/শপথ রাঙানো মন শেষবার/অভিশাপ হানছে।/মানুষের ভগবান জাগছে।' এই নাটকে অভিনয় করা শুধু একটি performance নয় বা চরিত্রচিত্রণের কারিগরী বহিঃপ্রকাশ নয়। যে জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণনাট্যের

কর্মীরা নাট্যাভিনয়ে মুক্ত হয়েছিলেন চরিত্র রূপায়ণের সূত্রে তাঁদের সেই আদর্শ যেন রূপায়িত হল। 'রাহুমুক্ত' পালায় নিবেদিতা দাসের অভিনয় সম্পর্কেও এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়— 'বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হলে প্রথমেই নাম করতে হয় শ্রীমতী নিবেদিতা দাসের। অপূর্ব অভিনয় করেছেন তিনি। তাঁর উচ্চারণে ও অঙ্গভঙ্গীতে এমন আশ্চর্য ব্যঞ্জনা আছে যে দর্শককে মুগ্ধ করে, দর্শক ও অভিনয়বস্তুর মধ্যে নিবিড় আত্মীকরণ ঘটায়। এখানে বিশেষ করে একটি দৃশ্যের উল্লেখ করছি শহরের রাস্তায় অন্ধ ও বিপর্যস্ত স্বামীর সঙ্গে প্রথম দেখা হবার মুহূর্তটিকে তিনি বিস্ময়-ত্রাস-আতঙ্ক রোষ ভরা কণ্ঠে এমন অমানুষিক চিৎকার করে উঠেছিলেন যে দর্শকদের শিউরে উঠতে হয়েছিল।'[৩৮]— নিবেদিতা দাসের মেজদিদি কল্পনা রায়ের বয়ান অনুসারে 'রাহুমুক্ত' যাত্রায় চাষি-বউ পদ্মর চরিত্রে 'নিবু' অর্থাৎ নিবেদিতা দাসের অভিনয় দেখার জন্য ভিড় জমে যেত এবং যাঁরা তাঁর অভিনয় দেখেছেন তাঁরা কোনও দিনও ভুলতেন না। 'নিবেদিতার 'রাহুমুক্ত' যাত্রায় চাষি বৌ 'পদ্ম'র ভূমিকা যে দেখেছে সে ভুলবে না। বহু শত রজনী এই যাত্রা যত্রতত্র হয়েছিল এবং 'পদ্মর' অভিনয় দেখার জন্য দর্শকের ভীড় জমে যেতো।'[৩৯]

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 'ইন্ডিয়ান থিয়েটার অ্যাকাডেমি' আয়োজিত নিবেদিতা দাসের স্মরণসভায় জানিয়েছিলেন যে, কিছু দিন আগে তিনি যাত্রাশিল্পীদের সঙ্গে বাসে চেপে চব্বিশ পরগনার এক গ্রামে গিয়েছিলেন যেখানে তিনি প্রায় হাজার সাতেক দর্শকের মধ্যে বসে দেখেন 'রাহুমুক্ত' যাত্রাপালাটি। তিনি লক্ষ করেছিলেন কীভাবে উদ্বেলিত হচ্ছিল গ্রামের সাধারণ দর্শক। এই সংবাদ বা প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ০৪.০৪.১৯৮০ তারিখে নিবেদিতা দাসের স্মরণ অনুষ্ঠানের রিপোর্ট হিসেবে। 'রাহুমুক্ত' পালায় পদ্মর ভূমিকায় নিবেদিতা দাস কোথায় যেন সম্পৃক্ত হয়ে গেছেন। পরবর্তী সময়ে আরও কেউ কেউ এ চরিত্রে অভিনয় করলেও সবার অস্তিত্বই যেন ম্লান হয়ে যায় নিবেদিতা দাসের অনন্য উপস্থিতির কাছে।

গণনাট্য সংঘ-র পর নিবেদিতা দাসের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় 'শৌভনিক' নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে। ১৯৫৭ সালের ১ মে গড়ে ওঠে 'শৌভনিক' নাট্যগোষ্ঠী, গণনাট্য সংঘ-র দক্ষিণ কলকাতার শাখা 'প্রান্তিক' নাট্যকর্মীদের উদ্যোগে। নিবেদিতা দাস, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে শৌভনিকের প্রতিষ্ঠা। শুধু নাট্যদল নয়, বছর তিনেকের মধ্যেই নিজেদের উদ্যোগে তাঁরা গড়ে তোলেন একটি রঙ্গমঞ্চ, ১৯৬০ সালের ২৭ নভেম্বর। নামকরণ করেন 'মুক্ত অঙ্গন'। একটি নাট্যগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে একটি রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলার ইতিহাস যেমন সাহসের, তেমনই দৃঢ় সঙ্কল্পের স্মারক। আর এই কর্মকাণ্ডের মূল হোতা ছিলেন নিবেদিতা দাস। রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের

জন্য জমি লিজ নেওয়ার টাকা তিনি জোগাড় করেছিলেন নিজের গয়না বিক্রি করে। 'নিবু আর ভীম উঠে পড়ে লাগল মুক্ত-অঙ্গন তৈরিতে। প্রমোদ লাহিড়ীর কাছ থেকে জমির লম্বা লিজ নেওয়া হল। টাকা এল নিবুর গয়না বিক্রি করে এবং ভীমের জমি বিক্রি করে। নিবুর দারুণ ইনিসিয়েটিভ ছিল।'[৪০]— নিবু মানে নিবেদিতা দাস আর ভীম হলেন বীরেশ মুখোপাধ্যায়। ১৯৬০ সালে একজন মহিলার অদম্য উৎসাহে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের সদিচ্ছা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উভয় দিক থেকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ। মেয়েদের থিয়েটারের লড়াইয়ের ভূমিকে শক্ত ভিত্তিভূমিতে স্থাপন করলেন নিবেদিতা দাস। কিন্তু তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'শৌভনিক' ছেড়ে 'মুক্ত অঙ্গন' ছেড়ে তাঁকেও চলে যেতে হয়েছে। বাংলার মানুষের মনের মধ্য থেকে ক্রমশ আবছা হলেন থিয়েটারের এক দক্ষ সংগঠক অভিনেত্রী শিক্ষিকা। যে কাজটা ষাটের দশকে নিবেদিতা দাস করলেন বা যা যা কাজ করার প্রচেষ্টা চালালেন, সেগুলি নিয়ে তেমন আলোড়ন উঠল না থিয়েটার মহলে। তবে 'শৌভনিক' নাট্যগোষ্ঠী ছেড়ে গেলেও তারা কিন্তু ভোলেননি তাঁদের প্রতিষ্ঠাতাকে। ১৯৯৩ সালের নাট্যোৎসবের স্মরণিকায় শৌভনিকের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ কুণ্ডু লেখেন— 'আজকের এই দিনটিতে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াতা নিবেদিতা দাস ও প্রয়াত বীরেশ মুখোপাধ্যায়কে।'[৪১] 'শৌভনিক' নাট্যসংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী নিবেদিতা দাসের নাট্যজীবনে এক বিশেষ বাঁক এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা। পরিচালনা অর্থে নাট্য পরিচালনা, সবার্থে দলকে পরিচালনা।

নিবেদিতা দাস শুধু অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। থিয়েটারের সমস্ত রকম কাজেই তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল আর পাঁচজনের থেকে অনেক বেশি। নাটক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচনাতেও তাঁর আগ্রহ লক্ষ করা যায়। তাঁর রচিত একটি বিশিষ্ট নাটক হল 'ল'ল'না'— যা শৌভনিকের প্রয়োজনায় মঞ্চস্থ হয় ১৯৬১-র ১৯ ডিসেম্বর। প্রায় ৪০ রজনী অভিনয় হয়েছিল এ নাটকের। বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এ নাটকে নিবেদিতা দাস ও বিনতা রায় দুই বোন-ই অভিনয় করেছিলেন। নাটকটি দর্শকদের প্রশংসা আদায় করে নেয় নতুন আঙ্গিক ও নতুন বিষয়বস্তুর জোরে। প্রহসন রচনায় সংলাপের বিশেষ গুরুত্ব থাকে— এ ক্ষেত্রে নাট্যকার কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তবে নাটকের নামকরণ নিয়ে সমালোচনা এড়াতে পারেননি নাট্যকার। 'পরিচয়' পত্রিকায় লেখা হল— '...বাংলা ভাষায় নাট্যকারের মনোমত নাম নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যেত, এই খিচুরী ভাষা ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। বংশ পরম্পরায় কোর্টঘর করে সর্বস্বান্ত হওয়ায়

মেজর বিনয়েন্দ্র রায় উকিল-ব্যারিস্টার-এটর্নীর নাম সহ্য করতে পারেন না। এদিকে তাঁর দুই শিক্ষিত ছেলেই বধূ হিসাবে নির্বাচন করে বসে আছেন এটর্নী আর ব্যারিস্টারকে। এই নিয়ে সমস্যা, আর এই সমস্যার সমাধানেই এই নাটক 'ল'ল'না'। ... পরস্পর বিপরীত আপাত উদ্ভট আলোচনা কক্ষকে পাশাপাশি সাজিয়ে সংলাপের মাধ্যমে হাস্যরস সঞ্চারিত করে দেওয়ার ব্যাপারে শ্রীমতী দাস ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।[৪২]

নিবেদিতা দাস রচিত নাটকের গুণগত মান যাই হোক— সংবাদপত্রের পাতায় তার প্রশংসা বা সমালোচনা যাই প্রকাশিত হোক না কেন, আলোচনার মূল লক্ষ্যবিন্দু তো সেখানে নয়। নিবেদিতা দাস নিজের নাট্যদলের অভিনয়-উপযোগী একটি নাটক রচনা করলেন এবং সেই নাটক চল্লিশটি রজনী ধরে অভিনীত হল— এটাই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। মহিলা নাট্যকারের সংখ্যা যেখানে হাতে গোনা, সেখানে নিবেদিতা দাসের নাটক রচনার স্পৃহা এবং রচিত নাটকের মঞ্চায়ন নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য সংবাদ। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার নজির মহিলা নাট্যকর্মীদের ক্ষেত্রে খুবই কম। অন্তত যে সময়ে তিনি এই কাজগুলো করেছেন। 'শৌভনিক'-এর 'ল' ল' না' দর্শকদেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। নতুন আঙ্গিকে রচিত অভিনব বিষয়বস্তু হ'ল নাটকটি ভাললাগার প্রধান কারণ।

১৯৬৩ সালে 'শৌভনিক' নিবেদিতা দাসের লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক 'ঝাঁসীর রাণী' মঞ্চস্থ করে নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ 'মুক্ত অঙ্গন'-এ। ১৯৬৩ সালের ১ মে। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন বীরেশ মুখোপাধ্যায়। আলোয় ছিলেন স্বরূপ মুখোপাধ্যায়, মঞ্চ বিন্যাসে বিমল চক্রবর্তী। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন নিবেদিতা দাস, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, নিমু ভৌমিক কৃষ্ণ কুণ্ডু প্রমুখ। 'ঝাঁসীর রাণী' প্রায় ৩২ রজনী অভিনয় হয়। সময়ের সঙ্গে ইতিহাসকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন নাট্যকার। তিনটি অঙ্কে বিন্যস্ত নাটকে ইতিহাসকে ক্ষুণ্ণ না করে, অপ্রয়োজনীয় কাহিনি ও চরিত্রের সংযোজন না ঘটিয়ে, একটি সম্পূর্ণ নাটক রচনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার হিসেবেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন তিনি। সমকালীন পত্রিকার পাতাতেও তাঁর নাটক রচনার এবং অভিনয়ের প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছে। 'যুগান্তর' পত্রিকায় ১৯৬৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার লেখা হয়— 'ঝাঁসির রাণী' শৌভনিক-এর সময়োপযোগী একটি নতুন উপহার। ... সব থেকে বড় কথা— এই নাটকের মুখ্যভাব যে দেশপ্রেম প্রতিটি দৃশ্যে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ... কিন্তু ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর ইতিহাস দীর্ঘ ঘটনাবহুল। নাটকের প্রয়োজনে তাকে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে নাটকটি কোন কোন স্থানে বিবরণধর্মী ও ঘটনার গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। 'ঝাঁসীর

রাণী' নাটকের প্রধান ত্রুটি বলতে এইটুকু। নচেৎ, ছোটর মধ্যেও একটি সম্পূর্ণ নাটক আস্বাদনের তৃপ্তি এনে দিতে পেরেছে শৌভনিকের এই নব উপহারটি।'[৪৩]

ঝাঁসির রাণি লক্ষ্মীবাঈ-এর চরিত্রে দৃপ্ত অভিনয়ে তিনি চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

যে দৃপ্ততা ও তেজস্বিতা ঝাঁসির রানির চরিত্রে প্রকাশ করলেন নিবেদিতা দাস, তার উৎসভূমি কিন্তু তাঁর ভেতরের প্রতিবাদী সত্তা। 'ঝাঁসির রাণী' নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং এই রকম এক দেশপ্রেমীর সঠিক চরিত্রায়ণ নিবেদিতা দাসের মতো অনমনীয়-দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-থিয়েটারের প্রতি উৎসর্গীকৃত অভিনেত্রীর পক্ষেই সম্ভব।

মৌলিক নাটক ছাড়াও কিছু কিছু নাটকের অনুবাদ-ও করেছেন নিবেদিতা দাস। রমেশ মেহতা-র লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটকের অনুবাদ করেন তিনি 'ফানুস' নামে। বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬০ সালের ১৩ জানুয়ারি ডি. এন. মিত্র স্কোয়ারে। পরে এই নাটকটির নাম পরিবর্তন করে হয় 'যা নয় তাই'। উল্লেখ্য, এই নাটকের অভিনয় দিয়ে 'শৌভনিক' নাট্যগোষ্ঠী 'মুক্ত অঙ্গন' মঞ্চের যাত্রা শুরু করে। ১৯৬২ সালে নিবেদিতা দাস রচনা করেন একটি একাঙ্ক নাটক 'তৈরি হও'। নাটকটি বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় শৌভনিক মঞ্চস্থ করে।

গণনাট্য সংঘ-র বিশিষ্ট শক্তিশালী অভিনেত্রী যিনি পরবর্তী কালে 'শৌভনিক' নাট্যগোষ্ঠী এবং 'মুক্ত অঙ্গন' মঞ্চ তৈরি করলেন, তিনি নাটকের পোশাক নিয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। 'শৌভনিক' প্রযোজিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটক মূল সংস্কৃত নাটক থেকে অনূদিত। 'Period piece' হিসেবে সংস্কৃত ক্লাসিক নাটকের পরিবেশ অনুযায়ী এ নাটকের পোশাক পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের পোশাক পরিকল্পনা করেছিলেন নিবেদিতা দাস। 'মৃচ্ছকটিক' ১৪ এপ্রিল, ১৯৫৮ সালে মঞ্চস্থ হয়। ১৯৭৯ সালে 'বহুরূপী'তে কুমার রায় পরিচালিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটক 'বহুরূপী'কে নতুন পথে প্রবল উদ্দীপনায় চলবার শক্তি জুগিয়েছিল— সেই নাটকের অভিনয় করাচ্ছে 'শৌভনিক' প্রায় ২০ বছর আগে। সংস্কৃত ক্লাসিক অনুবাদ-অভিনয়ের পর একেবারেই বিপরীত মেরুর নাটক ইবসেন-এর 'ঘোস্টস'। নির্বাচন করল শৌভনিক। প্রথম অভিনয় হয় ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর। নির্দেশনা ছিল বীরেশ মুখোপাধ্যায়। নাটকটি অনুবাদ করেছিলেন 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের মুখ্য চরিত্র নটী বসন্তসেনার চরিত্রাভিনেত্রী মমতা চট্টোপাধ্যায়। এই নামটিও উল্লেখের দাবি রাখে, কারণ মমতা চট্টোপাধ্যায়ও গণনাট্যের অভিনেত্রী এবং তাঁকেও অভিনয় ছাড়া নাটকের অন্য বিভাগের ক্ষেত্রে

দেখা গেল।— 'ঘোস্টস' নাটকের পোশাক পরিকল্পনায় ছিলেন নিবেদিতা দাস। দুটি নাটকের আলোক পরিকল্পনায় ছিলেন তাপস সেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের নাট্যরূপ যখন 'শৌভনিক'-এর ধীরেশ মুখোপাধ্যায়ের (নাট্যরূপ: ধীরেশ মুখোপাধ্যায়) নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৯ সালের ৮ মে তথা রবীন্দ্র জন্মদিবস ২৫ বৈশাখ, তখন এ নাটকেরও পোশাক পরিকল্পনায় ছিলেন নিবেদিতা দাস। প্রায় ৪০০ রজনী এ নাটকের অভিনয় হয়েছিল। ওই বছরেই শৌভনিক-এর উপস্থাপনায় বিশ্ববন্ধু সান্যাল রচিত 'কল্যাণী' নাটকের পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্ব ছিল নিবেদিতা দাসের। যদিও এই নাটক একবার মাত্র মঞ্চস্থ হয়। দেখা যাচ্ছে পর পর নাটকগুলিতে পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন নিবেদিতা দাস। এর কারণ হিসেবে কতকগুলো সূত্র উঠে আসে। (২) 'শৌভনিক'-এ শুধুই প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নয় তাঁর সক্রিয়তা দিয়ে নিজে একটা জায়গা তৈরি করে নিচ্ছেন। (২) দলের মধ্যে তাঁর প্রাধান্য স্বীকৃত হচ্ছে। (৩) পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে নাট্যদলগুলির মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। (৪) পোশাক পরিকল্পনায় মেয়েদের অভিজ্ঞতা স্বীকৃতি পাচ্ছে। (৫) শিক্ষিত নাট্যকর্মী হিসেবে নানান কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন তিনি। শিক্ষা মানে পুঁথিগত বা ডিগ্রিধারী শিক্ষা নয়, নাটকের বিভিন্ন বিভাগে হাতে-কলমে শিক্ষা। এই শিক্ষাই তো ধীরে ধীরে একজন নির্দেশক হওয়ার পথ প্রস্তুত করে দেয়।

'শৌভনিক' নাট্যসংস্থা'র উদ্দেশ্য ছিল শুধু নাট্য প্রযোজনা নয়— তার সঙ্গে স্থায়ী মঞ্চ, নাট্যশিক্ষা বিদ্যালয়, পাঠাগার, নাট্যপত্রিকা, রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্তের প্রদর্শনী ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন। ১৯৫৭ সালে নিবেদিতা দাস যে উদ্যোগ নিয়ে যে পরিকল্পনা নিয়ে 'শৌভনিক' নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই নাট্যগোষ্ঠীর নামটি তাঁরই দেওয়া। ১৯৬৪ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন 'শৌভনিক' নাট্যগোষ্ঠীর সম্পাদক। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে থিয়েটারকে এই রকম একটা জায়গায় স্থাপন করা তাঁর আগে আর কোনও মহিলা নাট্যকর্মী কি ভেবেছেন? থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করার জন্য যে বিষয়ের ওপর তিনি গুরুত্ব দিলেন তা অত্যন্ত জরুরি— (১) স্থায়ী মঞ্চ (২) নাট্যশিক্ষা বিদ্যালয় (৩) পাঠাগার (৪) নাট্যপত্রিকা (৫) রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্তের প্রদর্শনী ৫) গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিতও করলেন তিনি। ১৯৬০-এর ২৭ নভেম্বর অহীন্দ্র চৌধুরী 'মুক্ত অঙ্গন' রঙ্গালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন। এই স্থায়ী মঞ্চের জন্য জমি লিজ নেওয়া থেকে মঞ্চ-স্থাপনার ব্যয় নিজের গয়না বিক্রি করে জোগান দিয়েছিলেন নিবেদিতা দাস। এই সময়েই লড়াই চালিয়ে গেছেন গণনাট্যের আরেক অভিনেত্রী শোভা সেন। নিজেদের নাট্যদলের

প্রযোজনাগুলির মুখ্য অভিনেত্রী শুধু নন, উৎপল দত্তের সৃজনশীলতার নেপথ্যচারিণীও তিনি। গণনাট্যের আগুনে সময়ের মধ্য দিয়ে পথ চলা এই দুই অভিনেত্রী অভিনয়ের বাইরে থিয়েটারের সাংগঠনিক কাজে নিজেদের উৎসর্গ করে দিতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত নাট্যবিভাগের প্রথম দলের স্নাতক ছিলেন নিবেদিতা দাস। পরে এই বিভাগে তিনি অধ্যাপনাও করেন। নাট্য সম্পর্কে অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার তৈরি করেছেন যেমন, হাতে-কলমে নাটকের কাজ করেছেন তেমনই। তাই গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে শৌভনিক প্রতিষ্ঠা, 'মুক্ত অঙ্গনে'র ভাবনা ও স্বপ্নের নাট্যমঞ্চের বাস্তবায়ন, 'মুক্ত অঙ্গন' অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর নতুন করে আবার গড়ে তোলা, অন্তর্কলহে শৌভনিক থেকে বেরিয়ে এসে 'ইন্ডিয়ান থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন' (আই টি এ) প্রতিষ্ঠা— এই দীর্ঘ নাট্যপথ অতিক্রমণের ইতিহাসে গৌরব সম্মান প্রতিষ্ঠা যেমন পেয়েছেন তার সঙ্গে যন্ত্রণা দ্বন্দ্ব স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাসও রচিত হয়েছে তাঁর জীবনে। এই যন্ত্রণার ইতিহাস পিছু ছাড়েনি তাঁর মৃত্যুর পরেও। 'সপ্তাহ' নামের একটি পত্রিকা ২৭ মার্চ ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নিবেদিতা দাস স্মরণে' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, নিবেদিতা দাসের মৃত্যুর পর 'রসিকেষু' নামের একটি সংস্থা নিবেদিতা দাসের স্মরণে এক স্মরণ সন্ধ্যার আয়োজন করে। এই স্মরণ সন্ধ্যায় নিবেদিতা দাসের দুই বোন সাধনা রায়চৌধুরী ও কল্পনা রায়, নাট্যব্যক্তিত্ব সুধী প্রধান ও গণেশ মুখোপাধ্যায় সকলেই নাট্য আন্দোলনে নিবেদিতা দাসের কঠোর শ্রম, নিষ্ঠার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁদের আলোচনায় উঠে আসে নিবেদিতা দাসের মঞ্চ-সফল নাটক— তুলসী লাহিড়ীর 'নাট্যকার', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'তাসের দেশ', 'বিসর্জন', গোর্কির 'মা', নিজের লেখা নাটক ল'ল'না কিংবা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় 'মাইকেল' নাটকে রেবেকা চরিত্রে তাঁর অভিনয় দক্ষতার কথা। নিবেদিতা দাসের স্মরণ অনুষ্ঠানে গণেশ মুখোপাধ্যায় বলেন এই অভিনেত্রীর নাটক পরিচালনা করার যে দক্ষতা ও গুণগুলো আজও স্মরণ করে তিনি রোমাঞ্চিত হন। গণেশবাবুর বক্তব্য স্মরণে রাখলে মনে হতেই পারে নিবেদিতা দাস নাটক পরিচালনা করেছিলেন এবং সেই নাটকগুলি প্রশংসাও অর্জন করেছিল। কিন্তু অনুসন্ধান করেও তাঁর পরিচালিত কোনও নাটক পাওয়া যায়নি। এই অনুষ্ঠানেই একটি অপ্রীতিকর ঘটনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। প্রতিবেদক লিখছেন— 'গণেশবাবুর বক্তব্য চলাকালীন একশ্রেণীর দর্শকের অশোভন আচরণে এই স্মরণসভা মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে হয়। গণেশবাবু 'মুক্তাঙ্গন' রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতা দাস যে কতটা পরিশ্রম করেছিলেন সেই সব ঘটনা যখন উল্লেখ করেন তখনই ওই দর্শকদের অসন্তোষ চরম পর্যায়ে চলে

যায় ও তাদের কটূক্তিতে বাধ্য হয়েই গণেশবাবু বক্তব্য থামিয়ে দেন। স্মরণ-সভার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মুক্তাঙ্গন থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পেছনে নিবেদিতা দাস-এর অবদান ঐতিহাসিকভাবে সত্য। তাকে কোন কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রই মিথ্যায় পর্যবসিত করতে পারবে না। সত্যকে আড়াল করার এরকম ঘৃণ্য প্রয়াস নিন্দনীয় এবং সুস্থ নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে চরম ক্ষতিকারকও বটে।'[৪৪] এই প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের সামনে— (১) নিবেদিতা দাসের মুক্ত অঙ্গন স্থাপন সম্পর্কে এবং এই রঙ্গালয় গড়ে ওঠার পশ্চাতে নিবেদিতা দাসের অবদান সম্পর্কে দ্বিমত আছে। (২) যাঁরা নিবেদিতা দাসের বিপক্ষে ছিলেন তাঁরা নিবেদিতা দাসের স্মরণ সভার দিন উপস্থিত ছিলেন। (৩) নিবেদিতা দাসের প্রশংসা এই একাংশ দর্শকের পছন্দ হয়নি, তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং স্মরণ সভার কাজ বন্ধও করে দিয়েছিলেন।

নিজস্ব আত্মমর্যাদাকে সম্বল করেই নিবেদিতা দাস বেরিয়ে এসেছিলেন নিজেরই গড়া 'শৌভনিক' নাট্য গোষ্ঠী থেকে। আবার নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন 'ইন্ডিয়ান থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন', সংক্ষেপে আই টি এ।

১৯৬৫ সালে আবার নতুন করে যে গ্রুপ থিয়েটার গঠন করলেন নিবেদিতা দাস, সেই নাট্যদলের পথচলার সূচনার দিনটিও ১ মে। ১ মে ১৯৬৫ মঞ্চস্থ হয় নাটক মাক্সিম গোর্কির 'মা'। 'শৌভনিক'-ও এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিল। ১ মে তারিখটি আপামর শ্রমজীবী মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন আর দু'-দু'বারই নিবেদিতা দাস নতুন নাট্যদলের সূচনা করলেন এই ১ মে তারিখটি থেকেই। গণনাট্য সংঘের আদর্শ তাঁকে প্রভাবিত করেছে আজীবন। নিবেদিতা দাস যিনি নাট্যপথের যাত্রা শুরু করেছিলেন কমিউনিজমের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। তাঁর নেতৃত্বে যে দুটি নাট্যসংস্থা গড়ে উঠল পরবর্তী সময়ে, দুটিরই প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে শ্রমিক দিবসটি নির্বাচন করাই তো সংগত ও স্বাভাবিক।

পরবর্তী সময়ে আই টি এ মঞ্চস্থ করে নিবেদিতা দাস রচিত 'অক্টোবর বিপ্লব' ও 'লেনিন'। লেনিনের শতবর্ষে নাটক দুটি মঞ্চস্থ হয় বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়। ১ মে দিনটিকে প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে স্থির করা কিংবা লেনিনের শতবর্ষে তাঁকে নিয়ে নাটক বাঁধার প্রচেষ্টা ইত্যাদি ঘটনা নিবেদিতা দাসের নাট্য দর্শনের গতিপথকে চিনিয়ে দেয়। গণনাট্য সংঘের আদর্শ তাঁকে প্রভাবিত করেছে আজীবন। নিবেদিতা দাস যিনি নাট্যপথের যাত্রা শুরু করেছিলেন কমিউনিজমের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সারাজীবন সেই আদর্শকে বহন করেই পথ চললেন।

বাংলা নাট্যের নির্মাণ ও নির্দেশনায় মেয়েদের অবদান বিষয়ক গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে যাঁদের কথা আলোচনা করা হল, তাঁরা কেউ-ই নাট্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করেননি বা নাট্য নির্দেশক হিসেবে পরিচিতি পাননি। তাঁদের পরিচয় মূলত অভিনেত্রী হিসেবে কিংবা রাজনৈতিক কর্মী বা সামাজিক কর্মী হিসেবে। যে সময়কাল জুড়ে তাঁরা নাট্যজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছেন, সেই সময়পর্বে ভারতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কালকে তাঁরা নিজেদের বোধবুদ্ধি, বিচারক্ষমতা ও সূক্ষ্ম চিন্তাধারার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। শুধুমাত্র অভিনয় করবেন বলে নাট্যকে গ্রহণ করেননি। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের একটা ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন নাট্যাভিনয়কে। মণিকুন্তলা সেন যেমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থেকে নাটককে দেখেছেন— তেমনই করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পারিবারিক রাজনৈতিক দীক্ষা— স্বামীর বামপন্থী আন্দোলনে জড়িত হওয়ার কারণে কারাবরণ— এই সময়পর্বে নিজেকে নাট্যজগতের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছেন। তবে এই নাট্যজগৎ পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ নয়— তা গণনাট্য আন্দোলন। উপরোক্ত দুই গণনাট্যের অভিনেত্রী গণনাট্য সংঘ-র কাজকর্ম, নীতি-আদর্শ, লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থেকেই গণনাট্যে যুক্ত হতে সম্মত হয়েছিলেন। সেখানে কোনও দ্বিধা ছিল না। কিন্তু এঁরা দু'জনেই খুবই কম সময়ের জন্য গণনাট্য সংঘে-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যদিও বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি তাঁদের আস্থা ছিল অটুট। মণিকুন্তলা সেন অবশ্য জীবনের শেষ দিকে পার্টির বিভাজনে মানসিক অসন্তোষে নিজেকে এই ধরনের কাজকর্ম থেকে সরিয়ে নেন, কেননা তত দিনে তাঁর জীবনদর্শনটাই বদলে গেছে। গণনাট্যে আর অভিনয় না করা গণনাট্য সংঘ বা নাট্যজগতের প্রতি বিবিক্ত নয়--- নিজের জীবনের ধারারই বিবর্তন। 'সর্বজয়া'র চরিত্রে পরিচিত করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর সঙ্গে বিযুক্ত হওয়ার কারণ অবশ্য ভিন্ন। তিনি আর নাট্যবিষয়ে আগ্রহী হলেন না। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে তাঁর প্রবেশ এক ভিন্ন পথের সন্ধান দিল। অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ হলেন সিনেমার অভিনয়ে। গণনাট্য সংঘ নয়, গণনাট্য সংঘের বাইরে যেখানে তিনি অভিনয় করেছিলেন সেখানকার অভিজ্ঞতাও তাঁর সুখপ্রদ ছিল না। অতএব নাট্যজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেও মতাদর্শগত কোনও বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ তাঁর মধ্যে উঠে আসেনি। অভিনয় জগৎ থেকেই তিনি ক্রমশ দূরে সরে যান। সাধনা রায়চৌধুরী, রেবা রায়চৌধুরী— দুজনেই গণনাট্যের প্রতি প্রবল আস্থার কারণেই নাট্যজগতের সঙ্গে যুক্ত হন। জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত অভিনয় জগৎ ছিল তাঁদের অবলম্বন। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী গণনাট্যের কর্মী এই দুই অভিনেত্রী জীবিকার কারণে গণনাট্যের বাইরেও প্রচুর অভিনয় করেছেন। বহু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন কিন্তু মননে-বিশ্বাসে-জীবনচর্যায় ওয়েসিসের মতো উজ্জ্বল থেকেছে

গণনাট্যের স্মৃতি। নিবেদিতা দাস এই চারজনের মধ্যে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাঁর নাট্যাভিনয়ের সূচনা গণনাট্য সংঘে। গণনাট্যের শিক্ষার আলোকে নাট্যজগতে তিনি প্রসারিত করে দিতে সক্ষম হলেন। নাটক লেখা, পোশাক পরিকল্পনা করা, দল পরিচালনা করা, নাট্যবিভাগে অধ্যাপনা করা, নাট্যমঞ্চ গড়ে তোলা, নতুন নাট্যদলের নেতৃত্বদান— নাট্যের সর্ববিধ কাজে অগ্রগণ্যা নিবেদিতা দাস শেষ পর্যন্ত গণনাট্যের শিল্পী না থাকলেও জীবনমর্মে অনুভবে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন গণনাট্যের অভিজ্ঞান। তাঁর নেতৃত্বে যে দুটি নাট্যদলের জন্ম হয়েছিল দুটিরই প্রতিষ্ঠা দিবস ১ মে— শ্রমিক দিবস। তাঁর মৃত্যু তাঁকে বেশি দিন নাট্যজগতে স্থায়ী হতে দেয়নি, কিন্তু নাট্যজগতে তাঁর অবদান চিরস্থায়ী থাকবে। কোনও অর্থনৈতিক প্রলোভন বা পেশাদারি গ্ল্যামারের জৌলুস নয়, এই গণনাট্যের অভিনেত্রীরা— যাঁরা অভিনয় শুরু করেছিলেন গণনাট্যের মঞ্চ থেকে— তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্রই ছিল সমাজ পরিবর্তন—আর্ত মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অংশীদার হয়ে ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জানানো। নাট্য সেখানে খুব বড় একটা মাধ্যম হয়ে এসেছিল তাঁদের সামনে। শুধু মাত্র এই পাঁচজন নন— IPTA-এর অভিনেত্রীদের লক্ষ্যই হয়ে উঠেছিল এই সমাজ বদলের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা। এই IPTA-তে যোগদানের মাধ্যমে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া। এ যেন এক নতুন পথ তৈরি করলেন গণনাট্যের অভিনেত্রীরা, সেই পথেই আলো জ্বলে ওঠার ফলে উঠে এলেন কতশত অভিনেত্রী দল। নাট্যনির্মাণ ও নির্দেশনার পথ ক্রমশ বিস্তৃত ও সুগম হল। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'ই প্রথম লেখাপড়া জানা ঘরোয়া মেয়েদের সাধারণ মঞ্চে অভিনয়ের জন্য নিয়ে আসে। পরে অনেকেই সদস্যপদ লাভ করে পূর্ণোদ্যমে অভিনয়ে নিজেদের নিয়োজিত করেন এবং প্রথমশ্রেণির অভিনেত্রীর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।' গণনাট্যের অভিনেত্রীদের তৈরি ভিত্তি-প্রস্তরেই যেন শুরু হল আগামী দিনের নাট্যাভিনেত্রীদের নাট্যনির্দেশনার স্বপ্ন ভাবনা।

## তথ্যসূত্র


১. Indian People's Theatre Association Bulletin, 1 July, 1943;

২. Satyabrata Raichowdhuri, *Communism in India, Leftism in India 1917-1947*, Macmilan Publishers India Ltd., New Delhi, 2011, First Published in English, Palgrave Macmillan, P. 59

৩. B.H.Liddell Hart, *History of the Second World War*, Pan Macmillan, 2011, 1st Publication Cassel and Co. Ltd., 1970, p. 3

৪. তদেব, পৃ. ১৭৭

৫. কনক মুখোপাধ্যায়, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, একসাথে, কলকাতা, ২০০৫, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ৩৫

৬. মধুময় পাল (সম্পা.), *ক্ষুধার্ত বাংলা- রাষ্ট্র ও বেনিয়াতন্ত্রের গণহত্যার দলিল*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩; পৃ. ১৩০

৭. কনক মুখোপাধ্যায়, 'মণিকুন্তলা সেন', মণিকুন্তলা সেন, *জনজাগরণে নারী জাগরণে*, থীমা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩০২

৮. বেলা দত্তগুপ্ত, 'আমার দেখা আমার জানা মণিকুন্তলাদি', মণিকুন্তলা সেন, *জনজাগরণে নারী*, থীমা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩১০

৯. মণিকুন্তলা সেন, 'নবান্ন', উৎপল দত্ত (সম্পা.), *এপিক থিয়েটার, গণনাট্য সংঘ স্মৃতি সংখ্যা*, কলকাতা, মে, ১৯৭৭, পৃ. ২২

১০. কনক মুখোপাধ্যায়, 'সংগঠন গড়ে উঠল', *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, একসাথে, কলকাতা, ২০০৫, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ৫৫

১১. মণিকুন্তলা সেন, *জনজাগরণে নারী জাগরণে*, থীমা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৬৮

১২. মণিকুন্তলা সেন, 'নবান্ন', উৎপল দত্ত (সম্পা.), *এপিক থিয়েটার, গণনাট্য সংঘ স্মৃতি সংখ্যা*, কলকাতা, মে, ১৯৭৭, পৃ. ২২

১৩. বিজন ভট্টাচার্য, 'নবান্ন'-এর নাট্যকারের প্রতিবেদন, *নবান্ন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, মাঘ ১৪২০, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৪, পৃ, ১২১

১৪. বাণী দাশগুপ্ত, 'মণিকুন্তলা সেন', মণিকুন্তলা সেন, *জনজাগরণে নারীজাগরণে*, থীমা, কলকাতা পৃ. ৩০৫

১৫. 'গণনাট্য সংঘের নবান্ন', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৭.১০.১৯৪৪

১৬. শোভা সেন, 'কমরেড মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী', মণিকুন্তলা সেন, *জনজাগরণে নারীজাগরণে*, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৩১৪

১৭. তদেব, পৃ. ৩১৪ ও ৩১৭

১৮. মণিকুন্তলা সেন, *জনজাগরণে নারী জাগরণে*, থীমা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১০৯ ও ১১০

১৯. তদেব, পৃ. ৯৩

২০. রুশতী সেন, 'পুরনো কথা নতুন গল্প', *ফালতু লেখায় ফালতু কথা*, সূত্রধর, কলকাতা,জানুয়ারি

২০১১, পৃ. ১৮১

২১. ‘নাট্যশোধ সংস্থান’-র Transcription File No 69. এই সংস্থানের পক্ষ থেকে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতিভা অগ্রবাল কর্তৃক গৃহীত সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকারের লিখিত রূপ যা ‘নাট্যশোধ সংস্থান’-এর সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয় করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লির বাসভবনে ৩০.৮.১৯৯১-এ।

২২. করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কমিউনিস্টের মেয়ে, *সর্বজয়া*, থীমা, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১০৫, প্রথম প্রকাশ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত হাতে লেখা পারিবারিক পত্রিকা ‘অগ্নি’তে। আনুমানিক সাল ১৯৫২

২৩. কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, *আত্মকথা : আমার নিজের কথা*, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৯৪

২৪. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখবন্ধ, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, *সর্বজয়া*, থীমা, কলকাতা, ১৯৯৯;

২৫. শোভা সেন, ‘সাধনা রায়চৌধুরী’, *ওঁরা, আমরা, এরা*, থীমা, কলকাতা, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ২০০৮, ১ম সংস্করণ ২০০০, পৃ. ৭৮;

২৬. সাধনা রায়চৌধুরী, *সংগ্রাম : ঘরে বাইরে*, ইউনিট থিয়েটার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ৫৫

২৭. তদেব, পৃ. ৯৫

২৮. সজল রায়চৌধুরী, *গণনাট্য কথা*, গণমন প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯০, পৃ. ২৫-২৬;

২৯. তদেব, পৃ. ৩৪-৩৫;

৩০. Bishnupriya Dutt, Urmimala Sarkar Munsi, *Engendaring Performance-Indian Women Performers in Search of An Identilty,* SAGE Publication, New Delhi, 2010, p. 227

৩১. রেবা রায়চৌধুরী, *জীবনের টানে শিল্পের টানে*, থীমা, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৭

৩২. শোভা সেন, ‘রেবা রায়চৌধুরী’, *ওঁরা আমরা এরা*, থীমা, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, কলকাতা, থীমা, প্রথম সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ৫৯

৩৩. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মুখবন্ধ’, রেবা রায়চৌধুরী, *জীবনের টানে শিল্পের টানে*, থীমা, কলকাতা, ১৯৯৯;

৩৪. জয়া মিত্র, ‘আবহমান’, রেবা রায়চৌধুরী, *জীবনের টানে শিল্পের টানে*, থীমা, কলকাতা, ১৯৯৯;

৩৫. দর্শন চৌধুরী, *গণনাট্য আন্দোলন*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, অনুষ্টুপ,

কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৯, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৮২, পৃ. ৩২৮;

৩৬. সুরমা ঘটক, *পদ্মা থেকে তিতাস*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানু ১৯৯৫, পৃ.

৩৭. Unity, August 1954, পুনর্মুদ্রণ শম্পা ভট্টাচার্য, 'রাহুমুক্ত গণনাট্যের যুগান্তকারী প্রযোজনা', *থিয়েটারের রেখাচিত্র*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ রবীন্দ্র জয়ন্তী ২০১১, পৃ. ৫০

৩৮. নতুন সাহিত্য, চৈত্র ১৩৬১, পুনর্মুদ্রণ শম্পা ভট্টাচার্য, 'রাহুমুক্ত গণনাট্যের যুগান্তকারী প্রযোজনা', *থিয়েটারের রেখাচিত্র*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫০

৩৯. নিবেদিতা দাসের বড় দিদি কল্পনা রায়ের স্মৃতিচারণ; 'নাট্যশোধ সংস্থান'-এর সংরক্ষণশালায় রক্ষিত, ফাইল নম্বর ২৫৩;

৪০. সাধনা রায়চৌধুরী, *সংগ্রাম : ঘরে বাইরে*, ইউনিটি থিয়েটার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ৬৯

৪১. কৃষ্ণ কুণ্ডু, আমাদের কথা, *শৌভনিক স্মরণিকা*, ১মে, ১৯৯৩

৪২. *পরিচয়* পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩৬৮, বর্ষ ৩১, সংখ্যা ৮;

৪৩. *যুগান্তর* পত্রিকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪

৪৪. *সপ্তাহ* পত্রিকা, শিল্প সংস্কৃতি, নিবেদিতা দাস স্মরণে শীর্ষক প্রতিবেদন, কলকাতা, প্রতিবেদক শৌভিক পাণ্ডা, ২৭ মার্চ ১৯৯৫

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# অস্তিত্বের সংকটে তৃপ্তি মিত্রের নাট্যনির্মাণ: ‘বহুরূপী’ থেকে ‘আরব্ধ’

সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি যেমন নারীমুক্তি আন্দোলনের এক পথ অনুসন্ধান, তেমনই মঞ্চকে ব্যবহার করে নাট্যাভিনয় ও নাট্যনির্দেশনা নারীমুক্তি আন্দোলনের এক বিশেষ অধ্যায় সূচিত করে। বিশেষ করে সেই সময়ে যখন শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের ছাড়পত্র অধিগত হলেও জনসমক্ষে নাট্যাভিনয়ের স্বীকৃতি সহজসাধ্য ছিল না। তৃপ্তি মিত্র এলেন এমনই এক সময়ে। শুধু অভিনয় নয়, পরবর্তী সময়ে বাংলা মঞ্চে নাট্যনির্দেশনায় মেয়েদের ভূমিকাকে সুদৃঢ় ও সচল করলেন তিনিই। যে নাট্যগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে তাঁর অভিনয়-প্রতিভা ক্রমশ বিকশিত হয়েছে সেই ‘বহুরূপী’কে তিনি শুধু সমৃদ্ধ করেননি, সমগ্র বাংলা নাট্যমননকে জাগিয়ে তুলেছিলেন তাঁর অভিনয়ে নাট্যচিন্তায় এবং প্রযোজনায়। সংগঠক, নির্দেশক, অভিনেতা শম্ভু মিত্র সত্তরের দশক থেকে ‘বহুরূপী’তে অভিনয় ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন কিছুটা নিস্পৃহ, স্বাভাবিকভাবেই ‘বহুরূপী’ নাট্যগোষ্ঠী তাদের প্রতিষ্ঠাতার সক্রিয়তার অভাবে অনেকটাই সংকটের মুখোমুখি—সেই সময়ে এগিয়ে এসেছিলেন তৃপ্তি মিত্র— দলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গ্রহণ করেছিলেন নাট্যপরিচালনার দায়ভার।

‘বহুরূপী’তে নাট্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তৃপ্তি মিত্রের কার্যকালকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। ১ম পর্যায়— ‘ডাকঘর’ নাটক পরিচালনা— ১৯৫৭, ২য় পর্যায়— ‘কিংবদন্তি’ (১৯৭০) থেকে ‘পাখি’ (১৯৭৭) এবং ‘বলি’ (তৃপ্তি মিত্রের তত্ত্বাবধানে অরিজিৎ গুহর পরিচালনা ১৯৭৭) পর্যন্ত। মূলত অভিনেত্রী, সংগঠক ও নাট্যপরিচালক— এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল তৃপ্তি মিত্রের পরিচয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম মহিলা নাট্যনির্দেশকের স্বীকৃতি তাঁরই প্রাপ্য। শুধু ‘বহুরূপী’তে নয়, তাঁর নির্দেশনার ব্যাপ্তি ঘটেছে ‘বহুরূপী’র বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রেও।

১৯২৫ সালের ২৫ অক্টোবর তৃপ্তি মিত্রের জন্ম দিনাজপুরের ঠাকুর গাঁ মহকুমায়। বাবা আশুতোষ ভাদুড়ী যখন ওকালতি শুরু করেন, তখন সততার কারণে বিশেষ করে জ্ঞাতি-পরিজনদের সঙ্গে মামলা করতে পারবেন না বলে বিশেষ পসার জমাতে পারেননি এবং পাবনা ছেড়ে চলেও আসেন। মা শৈলবালা দেবী স্বদেশী চেতনায় প্রাণিত ছিলেন, তিনি থিয়েটার যাত্রা দেখতে বিশেষ ভালবাসতেন। পরবর্তী জীবনে অভিনেত্রী হওয়ার সলতে পাকানোর কাজটা শুরু হয়েছিল সেই

ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে যাত্রা দেখতে যাওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই। ‘মা-দিদিদের সঙ্গে থিয়েটারে গিয়ে ড্রপ সিন ওঠবার আগেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম, খেয়াল থাকতো না। তবু মা আমাকে নিয়ে যেতেন, কেননা আমার থিয়েটার দেখতে ভালো লাগতো, কান্নাকাটি করতাম। ... অবশ্য একথা বলার মানে এই নয় যে, নাটক করবার কোনো বাসনা মনে ছিল, আর তখনকার দিনে আমাদের মতো পরিবারের মেয়েদের মনে সে বাসনা আসা অসম্ভব ছিল।’[১] সে সময় মেয়েরা অভিনয় জগতের সঙ্গে তেমনভাবে যুক্ত হতেন না, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কিংবা সরস্বতী পুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থাকত নাচ, গান, অভিনয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে মেয়েরাই পুরুষদের ভূমিকায় অথবা পুরুষদের নাটক হলে পুরুষরাই মেয়েদের ভূমিকা অভিনয় করত। তৃপ্তি মিত্রের দিদি কমলা সিংহের জোরজবরদস্তিতে তৃপ্তি মিত্র অভিনয় করেছিলেন ‘সিরাজদৌল্লা’ নাটকে। ‘...আমি ওকে জোর করে নাবালাম, বইটার নাম ছিল ‘সিরাজদৌল্লা’।...মণি হয়েছিল সিরাজদৌল্লা ...।’[২] মণি অর্থাৎ তৃপ্তি মিত্র আর এই সিরাজদৌল্লার ভূমিকায় অভিনয়-ই ছিল তাঁর প্রথম অভিনয়।

অভিনয় দেখতে তিনি ভালবাসতেন। ছেলেবেলায় তাঁর গ্রাম ‘ঠাকুর গাঁ’তে তৈরি হওয়া নতুন হল ‘জজ করোনেশন’-এ কিশোরী তৃপ্তি ভাদুড়ী তাঁর মায়ের সঙ্গে নানান ধরনের যাত্রা থিয়েটার দেখেছেন— ওই বয়সেও লক্ষ রাখতেন কেমন করে লণ্ঠন বা হ্যাজাকের বাতিকে ডিমার বানানো যায়। সেই সময়ে তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি যা তাঁর পরবর্তী জীবনে অভিনেত্রীসত্তা ও পরিচালক হওয়ার মনোভাবকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বিস্মিত হতেন এটা দেখে যে, গ্রামের নানান মানুষ যাঁরা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত, তাঁরাই আবার বিভিন্ন নাটকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র হয়ে উঠতেন। অভিনয় তাঁদের পেশা নয় তবু তৃপ্তি মিত্রের মনের অবচেতনে ছাপ ফেলেছিল এঁদের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা। অভিনয় জগতের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা থাকলেও তিনি অভিনেত্রী হতে চাননি— চেয়েছিলেন ডাক্তার বা সমাজসেবী হতে। কিন্তু ভবিষ্যৎ তাঁকে অভিনেত্রী পরিচয়েই মনে রাখল। আর এই অভিনেত্রীসত্তা থেকে প্রকাশ হল তাঁর নির্দেশকসত্তার। পড়াশোনাসূত্রে তাঁর কলকাতায় আসা, কিন্তু এই কলকাতাকে কেন্দ্র করেই তৃপ্তি মিত্র জড়িয়ে পড়লেন এক বিরাট সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে।

তৃপ্তি মিত্র যখন ক্লাস সিক্সে পড়ছেন তখন মায়ের সঙ্গে চলে আসেন কলকাতায়। মামা প্রখ্যাত সাংবাদিক তথা আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে এসে ওঠেন। এই বাড়ির পরিবেশ তাঁর সাংস্কৃতিক মননকে তৈরি করে দিয়েছিল। যেখানে ছিলেন তার বড়দিদি শান্তি

দেবী ও জামাইবাবু কবি অরুণ মিত্র। বাড়ির আবহাওয়া ছিল অন্য রকম। নানান ক্ষেত্রের বিখ্যাত সব মানুষজন— গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য (তৃপ্তি মিত্রের মাসতুতো দাদা) প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষের সমাগমে, তাঁদের সমাজ রাজনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের আলোচনায়, তর্কে-বিতর্কে সরগরম থাকত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের আবাসগৃহ। চুপচাপ থেকে তাঁদের কথাবার্তা অনুধাবন করতেন তৃপ্তি মিত্র। আপাত শান্ত, নিরুত্তাপ, নির্বাক তৃপ্তির মধ্যে তখন এক ভিন্ন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেছে। ১৯৪৩ বাংলার ইতিহাসে যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় তেমনই তৃপ্তি ভাদুড়ীর জীবনেও। এই বছরেই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন। কিন্তু রেজাল্ট বেরোনোর আগেই বাবার মৃত্যু ঘটে। গ্রামের বাড়িতে মা ভাইবোনেদের চরম দারিদ্র্যের কারণে তাঁকে চাকরি নিতে হয় এ.আর.পি-তে। সেখানে কাজ ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের, অসহায় আর্ত মানুষের সেবা করার কাজ। যিনি শিক্ষক বা ডাক্তার বা সমাজসেবিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর পক্ষে উপযুক্ত ছিল এই চাকরি। কিন্তু এই সময়েই তাঁকে জোর করে অভিনয়ের জগতে নিয়ে এলেন বিজন ভট্টাচার্য। ১৯৪৩-এর মে-মাসে নাট্যভারতী প্রেক্ষাগৃহে ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংগঠনের হয়ে মঞ্চাবতরণ বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' নাটকে। অভিনেত্রীর সংকটে তাঁকে অভিনয় করতে হয় এই নাটকে— শুরু হয় জীবনের নতুন গতিপথ। বিজন ভট্টাচার্যই এ নাটকের নির্দেশক ছিলেন। শম্ভু মিত্র একটি সাক্ষাৎকারে চিত্তরঞ্জন ঘোষকে জানিয়েছিলেন— 'আগুন বোধহয় বিজনই ডিরেকশন দিয়েছিল। লেবরেটারী ইত্যাদি আমার দেওয়া।'[৩]

১৯৪৩ সালে তৃপ্তি মিত্রের বয়স তখন আঠারো বছর। জীবনে প্রথম যে নাটকটিতে অভিনয় করে তিনি দর্শক সমক্ষে এলেন সেই নাটকের বিষয়বস্তু বাস্তবে তাঁর চোখে দেখা এবং তাঁর মনোভূমিতে ইতিমধ্যেই ছাপ ফেলেছে— সমকালীন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের কবলে আতঙ্কিত মানুষের তীব্র হাহাকার। 'আগুন' নাটকটির পাঁচটি দৃশ্যে ধরা পড়েছে সেই বাংলারই মানুষের দুর্ভিক্ষপীড়িত জীবনছবি। '১৯৪৩ সাল। যখন মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে গ্রাম থেকে চলে আসা ক্ষুধার্ত কৃষকেরা কলকাতার রাস্তায়। সেই সময় আমি তখন সবে স্কুলের চৌকাঠ পার হয়েছি— হতভাগ্যদের জন্য গ্রুয়েল কিচেন খোলা হয়েছে— সেই গ্রুয়েল কিচেনে ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করি, তাঁদের জন্য চাঁদা তুলি। ... চোখের সামনে দেখি মৃত্যু। আমার হাতের ওপরেই একদিন এক কৃষক বধূ ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। ...সেই সময় এই হতভাগ্যদের সাহায্যের জন্য নাটক করতে শুরু করি। ফ্যাসীবিরোধী

লেখক শিল্পীদের সঙ্গে। ওই ওদের জীবন নিয়েই লেখা হল নাটক গান কবিতা। তবু ওদের জন্য ওদেরই একটি চরিত্র হয়ে মঞ্চে নামলাম। অলক্ষ্যে আমার কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেল নাটকের বিস্তৃত ক্ষেত্রের মাঝে।'[৪] এই নাটকে যে চরিত্রে তৃপ্তি ভাদুড়ী (বিবাহ পূর্ববর্তী জীবনে তখন তিনি তৃপ্তি ভাদুড়ী) অভিনয় করেন, সেই চরিত্রে আগে যে অভিনেত্রী অভিনয় করেছিলেন তাঁর হঠাৎ অনুপস্থিতির কারণেই বিজন ভট্টাচার্য তৃপ্তি ভাদুড়ীকে জোর করে অভিনয় করান। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল যে সামাজিক পরিস্থিতি, প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার কারণে তিনি ক্রমশ জড়িয়ে পড়লেন অভিনয় জগতের সঙ্গে। বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী' কিংবা বিজন ভট্টাচার্য লিখিত 'জবানবন্দী' নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ক্রমশ তাঁর আড়ষ্টতা, পুরুষদের সঙ্গে অভিনয়ের সংকোচ ধীরে ধীরে কাটতে থাকে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য সহানুভূতি মানবিকতা তাঁর অভিনয় শিল্পকে স্পর্শ করেছিল কোনও ভাবে। প্রথমবার স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার কাছাকাছি সময়ে পিতার মৃত্যুর কারণে তাঁকে ফিরে যেতে হয় ঠাকুর গাঁয়ে। পিতৃহারা ভাইবোনদের কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস তাঁকে চঞ্চল করেছে, ভেবেছেন স্কুলের একটা চাকরি নিয়ে ওখানেই থেকে যাবেন। কিন্তু আবারও তাঁকে 'নবান্ন' নাটকে অভিনয়ের জন্য ডেকে নিয়ে আসা হল এবং এই নাটকে অভিনয়সূত্রে বাংলা নাট্যমঞ্চের সঙ্গে তাঁর স্থায়ী সম্পর্ক সুদৃঢ় হল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও 'নবান্ন' তৈরি করল নির্দিষ্ট গতিপথ— ''নবান্ন' আমার উপলব্ধির একটা স্তর। চৌরাস্তার মোড়ে এসে কোন পথিককে যেমন ঠিক করতে হয় যে সে কোন্ রাস্তা ধরবে। তারপর তাকে সেই রাস্তায় চলতে হয়। 'নবান্ন' আমার সেই চৌরাস্তা। এইখানে এসে আমি ঠিক করলাম, নাটক করাটাই আমার কর্তব্য।'[৫] শুধু তৃপ্তি মিত্র (তখন ভাদুড়ী) নন, এই নাটকের আরেক অভিনেত্রী শোভা সেন— এঁরা দুজনেই দীর্ঘসময় জুড়ে বাংলার মঞ্চে নিজেদের আধিপত্য, দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। স্বতন্ত্র ধারার অভিনেত্রী হিসেবে চিহ্নিত করা হল তাঁদের। 'The male voice chalks out the difference while the subjects, two veteran actresses of the IPTA, remain silent onlooksers. It is agreed that they will nod their head in acquiescence and consent that they are different in relation to the older and other actresses. When time comes, trying to locate their own career trajectories and a journey to the 'modern' in many ways becomes a narrative of theatre's journey and the problematic routes such journeys entail'[৬]

'নবান্ন' নাটকের অভিনয় সূত্রে তৃপ্তি মিত্রের জীবনে আরও বড় একটা পরিবর্তন সূচিত হল।

এই সময় মুম্বই থেকে খাজা আহমদ আব্বাসের একটি হিন্দি ছবিতে কাজ করার জন্য আহ্বান আসে— গণনাট্যের দুই শিল্পী শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি ভাদুড়ীর কাছে। 'ধরতী কে লাল'-ছবির শ্যুটিং করতে গিয়ে খাজা আহমেদ আব্বাসের বাড়িতেই ১৯৪৫ সালের ১০ ডিসেম্বর তৃপ্তি ভাদুড়ীর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের বিবাহ হয় মুম্বাইতে। ১৯৪৫-১৯৪৭ এই সময়পর্বে তৃপ্তি মিত্র মহেশ কাউল-এর 'গোপীনাথ' ছবিতে কাজ করেছেন। তাঁদের দুজনেরই সামনে ছিল মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্রে অভিনয়ের আর্থিক প্রলোভন। কিন্তু সেই প্রলোভনকে জয় করতে পেরেছিলেন এই দম্পতি। তৃপ্তি মিত্র চেয়েছিলেন রাজনৈতিক কর্মী, চিকিৎসক বা সমাজসেবিকা হবেন, কিন্তু তার বদলে তিনি পুরোপুরি অভিনেত্রী হয়ে উঠলেন। তৃপ্তি ভাদুড়ী জনসমক্ষে তৃপ্তি মিত্র নামে পরিচিত হলেন।

মুম্বাইতে ছবির কাজ করার সময়ই ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ। কিন্তু কলকাতায় ফিরে আসার পর IPTA-এর কার্যপ্রণালী আশাহত করল মিত্র দম্পতিকে। শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র যেভাবে নাটক সম্পর্কে, প্রয়োজন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছিলেন, সেই ভাবনার পরিবেশ ছিল না তখন আই পি টি এ-তে। তৃপ্তি মিত্রের অভিমত—সমস্তটাই যেন, শ্রীহীন উদ্যানের চেহারা, অথচ কড়া মালীর তত্ত্বাবধানে রয়েছে। যত রকম করে নাটক করারই প্রস্তাব হল, সবই নাকচ হতে লাগল। সম্পর্ক শিথিল হচ্ছিলই, এইবার একেবারে ছেদ হল। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, কলিম শরাফী, মহঃ ইসরাইল প্রমুখ ব্যক্তিত্ব গণনাট্য সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এই ঘটনা ঘটে ১৯৪৮-এ গান্ধীজির মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পরে— এরপর 'বহুরূপী' তৈরি হল। তৃপ্তি মিত্রের নাট্যনির্মাণ ও পরিচালনা প্রসঙ্গে 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির ইতিহাস প্রাসঙ্গিকভাবে অবশ্যই পর্যালোচনার দাবি রাখে। অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রকে নিয়ে আলোচনার পরিসর যথেষ্ট থাকলেও তাঁর পরিচালক সত্তা সম্পর্কে আলোচনা তেমন গুরুত্ব পায়নি। তাঁর অভিনেত্রী জীবন নিঃসন্দেহে তাঁর পরিচালকের ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল, এবং দীর্ঘসময়ের অভিনয়-অভিজ্ঞতার কাঠামোতেই নির্মিত হয়েছিল তার নির্দেশক হয়ে ওঠার পূর্ণাবয়ব।— তাঁর পরিচালনার 'হাতেখড়ি'— 'বহুরূপীতেই রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটির সূত্রে, 'ডাকঘর'-এর প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭-র ২৪ ফেব্রুয়ারি নিউ এম্পায়ার মঞ্চে।

'ডাকঘর'— তৃপ্তি মিত্রের প্রথম নির্দেশিত এই নাটকের কুশীলব যাঁরা ছিলেন তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন দক্ষ অভিনেতা যেমন গঙ্গাপদ বসু (মাধব দত্ত), শম্ভু মিত্র (রাজকবিরাজ), অমর গঙ্গোপাধ্যায় (মোড়ল), কুমার রায় (ঠাকুর্দা), শোভেন মজুমদার (প্রহরী), মহম্মদ জ্যাকেরিয়া

(দইওয়ালা) প্রমুখ। কিন্তু তৃপ্তি মিত্রের সামনে চ্যালেঞ্জ তৈরি করল একঝাঁক কিশোর-কিশোরীর দল। নাটকের মূল চরিত্রে অভিনয় করলেন শাঁওলী মিত্র যখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বছর। এতজন অভিনেতাকে নিয়ে এত বড় একটি প্রযোজনার পরিকল্পনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি একটি তৈরি করা সাংগঠনিক ভিত পেয়েছিলেন। আলোক সম্পাতে ছিলেন তাপস সেন এবং মঞ্চ নির্মাণ করেন খালেদ চৌধুরী।

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' থেকে বেরিয়ে এসে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মূল প্রেরণায় এবং শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে তৃপ্তি মিত্র, কলিম শরাফী, মহঃ জ্যাকেরিয়া, অশোক মজুমদার, অমর গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখকে নিয়ে গড়ে উঠছিল নতুন দল 'বহুরূপী'। 'নবান্ন' নাটকের কয়েকটি (সম্ভবত তিনটি অভিনয় হয় 'রঙমহল'-এ) অভিনয়, 'পথিক' ও 'উলুখাগড়া'-র পর ১৯৫০-এ দলের নামকরণ হল 'বহুরূপী'। মুখ্য অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র। 'নবান্ন'-র রাধিকার চরিত্র থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেকটি নাটকের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রে তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় এক ঐতিহ্যময় ইতিহাস তৈরি করল বঙ্গরঙ্গমঞ্চে।

**'বহুরূপী'তে তৃপ্তি মিত্র অভিনীত নাটক ও চরিত্রের তালিকা**

| | নাটক/নাট্যকার | চরিত্র | নির্দেশক | প্রথম অভিনয় |
|---|---|---|---|---|
| ১. | নবান্ন/বিজন ভট্টাচার্য | রাধিকা | শম্ভু মিত্র | ১৩.০৯.১৯৪৮ |
| ২. | পথিক/তুলসী লাহিড়ী | সুমিত্রা | শম্ভু মিত্র | ১৬.১০.১৯৪৯ |
| ৩. | উলুখাগড়া/শ্রীসঞ্জীব (শম্ভু মিত্র) | করুণা | শম্ভু মিত্র | ১২.০৮.১৯৫০ |
| ৪. | ছেঁড়া তার/তুলসী লাহিড়ী | ফুলজান | ,, | ১৭.১২.১৯৫০ |
| | | | | নবপর্যায়ে ১২.২.৬৫ |
| ৫. | বিভাব | বৌদি | ,, | ১৯৫১ |
| ৬. | চার অধ্যায়/রবীন্দ্রনাথ | | | |
| | নাট্যরূপ-শম্ভু মিত্র | এলা | ,, | ২১.০৮.১৯৫১ |
| ৭. | দশচক্র/ইবসেন | হৈম | ,, | ০১.০৬.১৯৫২ |
| | অনুবাদ-শান্তি বসু | | | নবপর্যায়ে ২৮.১০.১৯৬২ |
| ৮. | স্বপ্ন/ইউজিন ওনিল | — | ,, | ১৮.০৪.১৯৫৩ |
| | অনু. শম্ভু মিত্র | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯. এইতো দুনিয়া/টেড উইলিস অনুঃ প্রণতি দে | — | ,, | ১৮.০৪.৫৩ |
| ১০. ধর্মঘট/মন্মথ রায় | মায়া | ,, | ০৯.১২.৫৩ |
| ১১. রক্তকরবী/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | নন্দিনী | ,, | ১০.০৫.১৯৫৪ |
| ১২. সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে/ চেকভ, অনুঃ অজিত গাঙ্গুলী | অণিমা<br>গীতা চক্রবর্তী | ,,<br>তৃপ্তি মিত্র | ০৮.১১.৫৪<br>নবপর্যায়ে ১৫.১১.৭৬ |

১৯৪৮-১৯৫৭— এই সময়পর্ব তৃপ্তি মিত্রের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন অভিনেত্রী— অভিনয় যাঁর পেশা নয়, যাঁকে সাংসারিক সমস্ত রকম দায়দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে, সদ্যোজাত কন্যার (শাঁওলী মিত্র : জন্ম ১৯৪৮) দায়ভার বহন করা, সংসারিক আর্থিক টানাপোড়েনের মোকাবিলা করা ইত্যাদি কাজগুলোর পাশাপাশি নির্মাণ করছেন ‘ছেঁড়াতার’-এর ফুলজান, ‘চার অধ্যায়’-এর এলা, ‘রক্তকরবী’র নন্দিনীর মতো চরিত্র। তাঁর অভিনেত্রী জীবন গড়ে ওঠার পশ্চাতে তিনটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে— (১) তাঁকে ‘বহুরূপী’র প্রযোজিত নাটকগুলির প্রধান বা বিশেষ চরিত্রে নির্বাচন। (২) শম্ভু মিত্রের মতো পরিচালকের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা। (৩) শম্ভু মিত্রের মতো অভিনেতার বিপরীতে অভিনয়ের সুযোগ— হয়তো এই তিনটি কারণ অনুল্লেখ্যই থেকে যেত, যদি না তৃপ্তি মিত্র এই সুযোগগুলির যথাযথ ব্যবহার করতে পারতেন।

‘নবান্ন’-নাটকের পরই তিনি অভিনয় করলেন শম্ভু মিত্র নির্দেশিত তুলসী লাহিড়ীর লেখা ‘পথিক’ নাটকে সুমিত্রা-র চরিত্রে। এ নাটকেও সুমিত্রার বিপরীতে পুরুষ চরিত্র অসীম রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন শম্ভু মিত্র। ‘পথিক’ নাটকে অভিনয়ের স্বাভাবিকতা এবং আবেগের সুরে যে পরিবেশ সৃষ্টি হত তা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তৃপ্তি মিত্র। এই নাটকে অভিনয়সূত্রে সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি। লেখা হয়েছিল যে নায়িকা সুমিত্রার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় শুধু আনন্দই দেয় না, পেশাদারি শিল্পীদের তাঁর অভিনয় থেকে অনেক কিছু শিখবার আছে। আবার ‘Hindusthan Standard’-এ লেখা হল— ‘Now we come to the real stars of the show— Sambhu Mitra and his wife Tripti—who infused into their characterizations a vital force that could not be distinguished from actual living.’[৭] অবশ্য শুধু প্রশংসা নয়, তাঁকে যে আরও পরিণত হতে হবে এমন মন্তব্যও জানিয়ে সংবাদ মাধ্যম বলে, নায়িকার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রকে মন্দ না লাগলেও অভিনয়ে

তাঁর আরও পরিণত হবার প্রয়োজন আছে। 'পথিক' নাটকের পর 'উলুখাগড়া'-তে তৃপ্তি মিত্র তাঁর মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে বড় বড় দুই সন্তানের (ছেলের ভূমিকায় শম্ভু মিত্র) মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'তৃপ্তি মিত্রের অল্প বয়সের করা এই চরিত্র। এতগুলো আবেগ এবং ক্ষণে ক্ষণে আবেগের পরিবর্তন কেমন করে সম্ভব হল সেই বয়সে। প্রতিভা? হ্যাঁ, তাই বলব।'[৮] খালেদ চৌধুরী— যিনি তৃপ্তি মিত্রের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বন্ধু হিসেবে কাছে থেকেছেন— খুব কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ করেছেন তার অভিনয় শিক্ষা কীরকম ভাবে ধীরে ধীরে পরিণততর হয়ে উঠেছে— খালেদ চৌধুরীর অভিমত 'নবান্ন'-পর্যন্ত তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়ে ছিল অনভূতিকেন্দ্রিক আবেগের প্রাধান্য আর 'বহুরূপী'-তে তাঁর অভিনয়ে আবেগের সঙ্গে যুক্ত হল বুদ্ধিমত্তা। আবেগকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় অভিনয়ের ক্ষেত্রে সেই শিক্ষারও প্রকাশ ঘটালেন তৃপ্তি মিত্র। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি 'বহুরূপীতে শুরু হল তাঁর আবেগ এবং বুদ্ধিসঞ্জাত অভিনয়ের প্রকাশ এবং তার নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা।'[৯] 'উলুখাগড়া' নাটকে করুণা চরিত্রে তাঁর 'সেই শিক্ষার যথাযথ প্রকাশ ঘটল এবং এই নাটক থেকেই অভিনয় ধারার পরিবর্তন ঘটে।

'উলুখাগড়া' এক অসহায় বয়স্ক নিঃসঙ্গ মহিলার নিঃসহায় হয়ে ওঠা। সেই কষ্টটাকে নানান ভঙ্গিতে প্রকাশ করতেন তৃপ্তি মিত্র। যে ভূমিকায় অভিনয় করতেন সেই করুণার বয়স কম করেও ৪২ থেকে ৪৪। কিন্তু তৃপ্তি মিত্রকে যখন মেকআপের সাহায্যেও ৪২-এর কাছেও আনা গেল না। তখন মহর্ষি বলছিলেন বেশি সাজতে গেলে উদ্ভট দেখাবে, তার চেয়ে প্রাণ দিয়ে অভিনয়টা করে ভাবটা আনতে। চলেছিল ভাব আনার পরিশ্রম, এবং সাধনা। অভিনয়কে তখন তিনি সাধনা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। প্রথম অভিনয়ের পর প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত। '...করুণা, যেন গাভীর চেয়েও অসহায়া। স্বামীর ওপর তার শ্রদ্ধা আছে, নির্ভরশীলতা আছে, ভালোবাসাও আছে; ছেলেমেয়েদের ওপরও প্রগাঢ় বাৎসল্য। কিন্তু সব থাকতেও এমন কিসের যেন অভাব রয়েছে, যার জন্য সংসারের কাউকেই সে আপন করে নিয়ে সত্যিকারের গৃহিণী, সত্যিকারের জননী হয়ে উঠতে পারেনি।'[১০] কেমন ছিল তাঁর মনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরগুলো— সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন অকপট। 'আসলে সেটা আমার অভিনয় জীবনের যত শুরুর দিকই হোক না কেন,— একটা জিনিস তখন আমার অনুভূতির সঙ্গে মিশে গেছে যে,— 'অভিনয় করবার সময় নতুন নতুন লোকের সঙ্গে নতুন নতুন সম্পর্ক হয় আর সেই সম্পর্কটাকে তখনকার মত খুব সত্যি করে তোলাই আমার কাজ। ... নতুন সম্পর্কটাকে দর্শকের সামনে সত্যি করে তোলাই আমার দায়িত্ব। ঠিক যেমন আমার দায়িত্ব

আমি যে ভূমিকাটিতে অভিনয় করছি সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা।’[১১] এই বিশ্বাস থেকেই তিনি একটির পর একটি চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শম্ভু মিত্রের উদ্ভাবনী পরিচালনা-শক্তি। ‘করুণা’র মতো জটিল চরিত্রের পরই একেবারেই ভিন্নতর চরিত্র ফুলজান-এর ভূমিকায় নিজেকে উজাড় করে দিলেন ‘ছেঁড়াতার’ নাটকে। এই চরিত্রের অবস্থান আমাদের দেখা শহুরে মানুষদের মতো নয়। কিন্তু গ্রাম্য মুসলিম অভাবক্লিষ্ট দাম্পত্যের চরিত্রায়ণে মাইলফলক তৈরি করলেন মিত্র দম্পতি। উত্তরবঙ্গের এক ‘বাহে চাষা’-র কাহিনি ‘ছেঁড়াতার’। যে নাটকটির প্রেক্ষাপট পঞ্চাশের মন্বন্তর। এই মন্বন্তরের দাপটে লণ্ডভণ্ড হয়েছে যাঁদের জীবন, দুর্ভিক্ষের দিন নিয়ে এমনই এক স্মৃতির কথা শোনান তুলসী লাহিড়ী। শম্ভু মিত্র তৃপ্তি মিত্রের ঘরোয়া আড্ডায়। রংপুরের এক চাষির জীবনের সত্যি বর্ণনা শুনতে শুনতে কেঁদে আকুল হয়েছিলেন তৃপ্তি মিত্র। তাঁরই অনুরোধে, শম্ভু মিত্রের সম্মতিতে ও দলের সদস্যদের মুর্হুমুর্হু তাগিদে লেখা হয়েছিল ‘ছেঁড়াতার’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানুষেরই তৈরি দুর্ভিক্ষ কত মর্মান্তিক পরিণতি ঘটাতে পারে মানুষের জীবনে— তারই ছবি উঠে এসেছে এ নাটকে। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক বাহে ভাষায় মুসলিম জীবনযাত্রার চলন বলন, দুঃখ-হতাশা, বিচ্ছেদ-তালাক-সামাজিক ধর্মীয় ধ্বজাধারীদের রক্তচক্ষুর অনুশাসন— সব কিছুই ‘ছেঁড়াতার’ নাটকে উঠে এসেছিল। এক ভিন্নগোত্রীয় নাটকে রহিমুদ্দি ও ফুলজানের ভূমিকায় শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্র তৈরি করেছিলেন অভিনয়ের নতুন পাঠ। এই নাটকেও ফুলজান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হন তৃপ্তি মিত্র। এক-একটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় প্রত্যেকবার, সেই দায় বহন করা এক দিকে যেমন কষ্টের, তেমনই আনন্দের। মঞ্চের ওপরের আকুলতা কখনও কখনও বিস্ফোরক হয়ে ফেটে পড়ত গ্রিনরুমে এসে। গ্রিনরুমে এসে যদি ঘরটি ফাঁকা থাকত ফুলজানের জন্যে কেঁদে আকুল হতেন তৃপ্তি মিত্র। এই অনুভূতি প্রকাশ করে চরিত্র চিত্রণের গভীরতায় পৌঁছে যেতেন। যে অনুভব, ভাবাবেগ একজন অভিনেত্রী বা অভিনেতার থাকতে পারে, কিন্তু নির্দেশককে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হয়। পরিচালককে নাটক সম্পাদনা করতে হয়, অভিনেতা অভিনেত্রীদের অবস্থান, হাঁটাচলার মাপজোক কষতে হয়, কিন্তু একজন অভিনেতা যখন নিজের মুখোমুখি হয়ে অভিনয়-অন্তে আবেগ আর অনুভবে দলিত মথিত হন, তখন তাঁর বহিরঙ্গের শিক্ষা অন্তরঙ্গে প্রবেশ করে রসায়িত হয়। তৃপ্তি মিত্রের ‘ফুলজান’— তেমনই এক চরিত্রায়ণ। শাঁওলী মিত্রের লেখার মধ্য দিয়ে সেই জায়গাটা অনেকখানি ধরা পড়েছে— দর্শককে মুগ্ধ করেছিল তাঁর নতুন জুতো পরার সলজ্জ অস্বস্তির দৃশ্য। ফুলজানকে তালাক দেওয়ার মুহূর্তটিও বিষাদঘন আবহ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ‘Tripti Mitra, as Phooljan, once again showed what a splendid actress she is.

Whether as the hopeful young woman trying out highheeled shoes for her coming life in the town, or as the desperate mother ready to obliterate herself to get food for her starving child or even as the devout woman of Islam unwilling to barter a particle of her faith for mere personal happiness she always excelled.[১২] মঞ্চস্থ হওয়ার চার বছর পর National Festival-এ 'বহুরূপী'র এই প্রযোজনা ও তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় সমালোচকদের এতটাই বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল। 'ছেঁড়াতার'-এর পর 'বিভাব' নাটকে একেবারেই সহজ স্বাভাবিক অনাড়ম্বর নাট্যভাবনা এবং তার পরই 'চার অধ্যায়'-এর এলা বাঙালি দর্শক তথা বাংলা নাটককে দিল রবীন্দ্র ভুবনের অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা। শম্ভু মিত্র তখন ছত্রিশ বছরের যুবক। তিনি একটির পর একটি চূড়া অতিক্রম করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু 'চার অধ্যায়'-এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রথম আবিষ্কার। 'এলা' চরিত্রটি নির্মাণেও তৃপ্তি মিত্র প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন। মহলা শুরু হত হয়তো সকাল দশটায়, চলত রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত। একটা দৃশ্যের হয়তো সামান্য অংশের মহলা তবু— নির্দেশকের মনের মতো হচ্ছে না। শম্ভু মিত্র যখন নির্দেশক তখন মহলার ধরনটাও এমন কঠোর। তুলনায় তৃপ্তি মিত্র অনেক সহজ, অনায়াসগম্য। কিন্তু প্রথম দিকের কষ্ট সবই সাফল্যের আনন্দে দূরীভূত হয়েছিল। 'চার অধ্যায়'— 'বহুরূপী'তে রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার দুঃসাহসিকতার সম্মান এনে দিয়েছিল— 'চার অধ্যায়'কে যে নাটকাকারে মঞ্চস্থ করা যায় এমনটা কল্পনা করেননি কেউ-ই। 'চার অধ্যায়'-এ খ্যাতি এল, কিন্তু ব্যবসায়িক সাফল্য তেমন পাওয়া যায়নি। সমকালকে অতিক্রম করে এ নাটক আরও কুড়ি বছর পরেও যখন অভিনীত হয়েছে— তখন প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাট্য অভিনয়ের প্রথম পাঠ তৃপ্তি মিত্রের 'বহুরূপী'তে এলা চরিত্রে। এলা সুন্দরী। তৃপ্তি মিত্রের ভয় ছিল সুন্দরী নন বলে। কিন্তু এলার ভূমিকায় কখনওই তৃপ্তি মিত্রকে সুন্দরী হিসেবে পরীক্ষা দিতে হয়নি। শাঁওলী মিত্রের কথায়, তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা দর্শকের অন্তরকে স্পর্শ করত। এমন একটা অনুরণন তৈরি করতেন নিজস্ব ভঙ্গিমায় তা দর্শককে ছুঁয়ে যেত। তাই ১৯৮১-১৯৮২-তে যখন ছেষট্টি বছরের শম্ভু মিত্র আর ছাপান্ন-সাতান্নর তৃপ্তি মিত্র পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে পর পর দশটি অভিনয় করেছিলেন 'চার অধ্যায়'-এর, তখনও দর্শক আপ্লুত হয়েছেন— বেমানান বা বিসদৃশ মনে হয়নি তাঁদের। এমনই ছিল তাঁদের চরিত্রায়ণের গভীরতা ও আত্মীকরণের নিবিড়তা।

'চার অধ্যায়' বহুরূপী অভিনীত প্রথম রবীন্দ্র নাটক 'এবং এই নাট্যাভিনয় থেকেই বহুরূপী রবীন্দ্র-নাট্য সম্পর্কে প্রয়াস শুরু করেছে ব'লেই আমরা 'চার অধ্যায়'কে ভালবাসি।'[১৩] পরবর্তী প্রযোজনা 'দশচক্র' নাটকে তৃপ্তি মিত্রের ভূমিকা ততটা গুরুত্ব না পেলেও শম্ভু মিত্র— ইবসেন-এর

'অ্যান এনিমি অফ দি পিপল'— অবলম্বনে 'দশচক্র' নাটকের মাধ্যমে বিদেশী নাট্যের ভুবনে বাংলার দর্শককে পৌঁছে দিলেন। তৃপ্তি মিত্র মূল নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন বহু নাটকেই, কিন্তু ইবসেন-এর 'অ্যান এনিমি অফ দ্য পিপল্'-এর প্রোটাগনিস্ট একজন পুরুষ এবং সেই চরিত্রে শম্ভু মিত্র-ই অভিনয় করবেন এমনটাই স্বাভাবিক। প্রথমে এ নাটকে তৃপ্তি মিত্রের কোনও ভূমিকা ছিল না, তবে প্রয়োজনে ডাক্তারের মেয়ের চরিত্রে দুটি অভিনয় করেন এবং পরে দলের প্রয়োজনেই শম্ভু মিত্রের স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেন।

১৯৫৪ সালে 'বহুরূপী'র প্রযোজনা 'রক্তকরবী' বাংলা মঞ্চের এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রযোজনা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যময় রূপকধর্মী এই নাটকের মঞ্চায়ন যে সম্ভব তা অভাবনীয় ছিল এত কাল। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই নাটকের মঞ্চায়ন ঘটাতে পারেননি মনের মতো নন্দিনী খুঁজে পাননি বলে। 'বহুরূপী' খুঁজে পেল— নির্দেশক শম্ভু মিত্র খুঁজে পেলেন নন্দিনীকে। তিনি— তৃপ্তি মিত্র! 'রক্তকরবী' আর শম্ভু মিত্র যেমন সমার্থক হয়ে গেছে— তেমনই নন্দিনী আর তৃপ্তি মিত্র সমার্থক হয়ে গেল। 'রক্তকরবী'র মধ্য দিয়ে শম্ভু মিত্র যেমন প্রযোজনাগত শৈল্পিক শিখরে উত্তীর্ণ হলেন— তেমনই তাঁর সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতে নিজেদের প্রমাণ করলেন খালেদ চৌধুরী (মঞ্চ ও আবহ), তাপস সেন (আলোক পরিকল্পনা) আর অভিনয়ে নন্দিনী তৃপ্তি মিত্র ও 'বহুরূপী'র একঝাঁক অভিনেতা অভিনেত্রী। ১৯৫৭ সালে এই 'নন্দিনী' এলেন নাট্য পরিচালনায়, প্রথম পরিচালনা তাঁর রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'। এ পর্যন্ত এতগুলি নাটকে অভিনয় করা এবং প্রযোজনাগুলির সঙ্গে পুরোপুরি যুক্ত থাকা নিঃসন্দেহে তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু কেন তিনি পরিচালনায় এলেন?

'বহুরূপী'-তে প্রথমাবধি শম্ভু মিত্রই নির্দেশক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং যোগ্য সম্মানের অধিকারী। কারণ তাঁকে ভরকেন্দ্রে রেখেই তৈরি হয়েছিল নাট্যদল। কিন্তু বহুরূপী-র নামকরণ এবং তার পূর্বেই দলের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন অভিনেতা ও সদস্য সবিতাব্রত দত্ত, মহম্মদ ইস্রাইল, তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার প্রমুখ দল ছেড়ে চলে যাওয়ায় দলের মধ্যে একটা সংকট উপস্থিত হয়। তবু সেই সংকটকালকে অতিক্রম করে বহুরূপী পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই বেশ কয়েকটি প্রযোজনা মঞ্চস্থ করে। যদিও সেই প্রযোজনাগুলির স্থায়িত্ব খুবই কম দিনের। ১৯৫৩ সালের প্রযোজনা:

১) স্বপ্ন— ইউজিন ওনীল— রূপান্তর ও নির্দেশনা- শম্ভু মিত্র।

২) এই তো দুনিয়া— টেড উইলিস— রূপান্তর প্রণতি দে, নির্দেশনা শম্ভু মিত্র।

৩) ধর্মঘট— মন্মথ রায়— নির্দেশনা শম্ভু মিত্র।

এই তিনটি নাটক শম্ভু মিত্রের নির্দেশনা সত্ত্বেও ব্যর্থ হল। যদি সাফল্য পেত, তা হলে এত স্বল্পকালীন স্থায়িত্ব হত না এই নাটকগুলির। এই সময়কালে অর্থাৎ এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৫৩-য় খুব কম সময়ের ব্যবধানে এই তিনটি নাটক যে বিশেষ দর্শক আনুকূল্য লাভ করেনি তা সহজেই অনুমেয়। 'স্বপ্ন' কিংবা 'এই তো দুনিয়া'— নাটক দুটির সময়সীমা আধঘন্টা করে এবং একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ। 'ধর্মঘট' নাটকের অভিনয়ে মহর্ষি নিজে পার্ট ভুল করে লজ্জায় জানিয়েছিলেন পরের শো আর হবে না। তবে যাবতীয় গ্লানি, অপারগতা, মহর্ষির মৃত্যুর শূন্যতা সহ্য করে 'রক্তকরবী'র উপস্থাপনা জাতীয় স্তরে মানুষের মনকে আলোড়িত করেছিল। 'রক্তকরবী'র তুমুল সাফল্যের পর 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে' কিছুটা নিষ্প্রভ, কিন্তু পঞ্চাশের দশকের ঠিক মধ্যপর্বে 'বহুরূপী' উপহার দিল দু'জন নবীন নাট্য পরিচালককে— কুমার রায় ও অমর গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁদের পরিচালিত নাটকগুলি হল 'স্বর্গীয় প্রহসন', 'অংশীদার' (পরিচালনা অমর গঙ্গোপাধ্যায়) এবং 'চৌর্যানন্দ', 'নাট্যকারের বিপত্তি' (পরিচালনা কুমার রায়)— নবীন নির্দেশকদের সঙ্গে বাংলার মঞ্চ পরিচিত হল ঠিকই, কিন্তু তাঁরা ওই আলোকিত বিস্তৃত ভাবনার কাছে ছিলেন নেহাতই নবীন ও স্বল্পালোকিত। ১৯৫৭-তে তৃপ্তি মিত্র-র নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'। '... 'অর্থাৎ সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই শম্ভু মিত্র চাইছিলেন নতুনতর নির্দেশক গড়ে উঠুক বহুরূপী'তে।'[১৪] এই মন্তব্য বা চিন্তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত হওয়া যায় না। কারণ যদি পঞ্চাশের দশক থেকে শম্ভু মিত্র নতুন নির্দেশক গড়ে তোলার প্রতি আগ্রহান্বিত ছিলেন তা হলে পরবর্তী সময়ে এঁদের মধ্যে কেউ কেন উঠে এলেন না নির্দেশনার কাজে। 'ডাকঘর' পরিচালনার প্রায় তেরো বছর পর তৃপ্তি মিত্রকে দায়িত্ব নিতে হয় পরিচালনার। অমর গঙ্গোপাধ্যায় বা কুমার রায় কেউ-ই আর পরিচালনায় আসেননি অন্তত যত দিন শম্ভু মিত্র বা তৃপ্তি মিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব বহন করেছেন। একেবারে ছয়ের দশকের শেষে— ১৯৬৭-তে বাদল সরকার (প্রলাপ), ১৯৬৯-তে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়কে (ত্রিংশ শতাব্দী) নাট্য পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা যায়। কুমার রায়ের নির্দেশনায় একটিমাত্র অভিনয় হয় 'গীতরত্ন' (২৫.০৪.১৯৭৬) নাটকের। তৃপ্তি মিত্রের নেতৃত্বে ১৯৭০ থেকে যখন 'বহুরূপী'র একটি পর একটি প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয়েছে সেই সত্তরের দশকের শেষ প্রান্তে এসে কয়েকজন তরুণ নাট্য পরিচালক— যেমন রমাপ্রসাদ বণিক (আততায়ী ১৯৭৭, কালবিহঙ্গ ১৯৭৯), শঙ্করপ্রসাদ ঘোষ (ওরা ১৯৭৮), তৃপ্তি মিত্রের তত্ত্বাবধানে অরিজিৎ গুহ (বলি ১৯৭৭) 'বহুরূপী'তে নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নেন। কিন্তু কেউ-ই তেমন সফল হতে পারেননি। যে মান তৈরি করে দিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র সেই মান রক্ষা করা সম্ভব হয়নি একেবারেই তরুণ প্রজন্মের কাছে। তবে 'বহুরূপী'র বাইরে রমাপ্রসাদ বণিক তাঁর নিজস্ব নাট্যদল 'চেনামুখ'-এর প্রযোজনাগুলিতে তাঁর

পরিচালন দক্ষতার প্রমাণ রেখেছিলেন। 'বহুরূপী'র শিক্ষা ও ঘরানা তাঁর প্রতিভাকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল। আর কুমার রায় ১৯৭৯ থেকে আমৃত্যু 'বহুরূপী'র পরিচালক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠ করেছেন। তবে পঞ্চাশের দশকে অমর গঙ্গোপাধ্যায়, কুমার রায় ও তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনার দায়িত্বলাভ তরুণ প্রজন্মকে সামনে আনার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল শম্ভু মিত্রের মুম্বই প্রবাসের কারণে কার্যধারাকে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টায় সার্থক হলেন তৃপ্তি মিত্র তাঁর প্রথম পরিচালনার কাজেই। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' হয়ে উঠল তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় এক কাব্যিক উপস্থাপনা।

**'বহুরূপী'তে তৃপ্তি মিত্রের নাট্যনির্দেশনা : ১ম পর্যায়**

'বহুরূপী'তে তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনার পর্যায় শুরু হয় 'ডাকঘর' (১৯৫৭) থেকে। তখনও পর্যন্ত বাংলা নাট্যমঞ্চে কোনও মহিলা নির্দেশকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে কেন তৃপ্তি মিত্রের ওপর বর্তাল নির্দেশনার দায়িত্ব? আসলে তৃপ্তি মিত্র-সহ শম্ভু মিত্রের নিজেরও অনুপস্থিতির কারণে পঞ্চাশের দশকে দুই তরুণ নাট্যকর্মী অমর গঙ্গোপাধ্যায় ও কুমার রায়-এর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন শম্ভু মিত্র। শম্ভু মিত্র বলাটাই যুক্তিযুক্ত কারণ সে সময়ে অর্থাৎ মধ্য পঞ্চাশের দশকে 'বহুরূপী'র সংবিধান তৈরি হলেও নাট্য প্রযোজনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্রের ভাবনা-চিন্তা, মতামতকেই প্রাধান্য দেওয়া হত। মহর্ষির (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য) প্রয়াণের পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্রের মতামতই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। ফলত কুমার রায় (নির্দেশনা 'চৌর্যানন্দ', 'নাট্যকারের বিপত্তি') এবং অমর গাঙ্গুলি ('স্বর্গীয় প্রহসন', 'অংশীদার')-র পর শম্ভু মিত্র দায়িত্ব দিলেন তৃপ্তি মিত্রকে—এমনটাই ধরে নেওয়া যেতে পারে। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা নাট্যনির্দেশকের দায়িত্ব গ্রহণ যতটা অনায়াস, সেই পঞ্চাশের দশকে দলের সর্বময় কর্তৃত্ব নির্বাচন করছেন যখন একজন মহিলা নির্দেশককে তখন শম্ভু মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি, দূরদর্শিতা এবং মুক্তদৃষ্টিকে ধন্যবাদ জানাতে হয়— কেননা তখনও পর্যন্ত কোনও মহিলা নাট্যনির্দেশককে বাংলা মঞ্চ উপহার দিতে পারেনি। শুধু অভিনব ভাবনার বহিঃপ্রকাশ নয়— একজন নাট্যনির্দেশকের যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা দরকার সেই বৈশিষ্ট্যগুলি তৃপ্তি মিত্রের মধ্যে ছিল বলেই তাঁকে এত বড় একটা দায়িত্ব অর্পণ করা যায় বলেই হয়ত মনে করেছিলেন শম্ভু মিত্র।

নাট্যনির্দেশকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। একজন সফল অভিনেতা বা অভিনেত্রী হলেই যে নির্দেশনার ক্ষেত্রে নিজেকে সফল প্রমাণ করতে পারবেন এমন নয়। অভিনয় সম্পর্কে সম্যক

জ্ঞান এবং মঞ্চে-অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নির্দেশকের বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হতে পারে, কিন্তু তা একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। নির্দেশকের নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা অত্যন্ত জরুরি। আর এ কারণেই সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সেই নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা প্রমাণ করতে হয় নির্দেশককে। তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় ক্ষমতা সম্পর্কে দ্বিমত ছিল না, একটির পর একটি নাটকে সেই দক্ষতাকে তিনি যথাসাধ্য প্রকাশ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব একটা নেতৃত্বদানের প্রকাশ ছিল। তৎকালীন 'বহুরূপী'র এক নিয়মিত সদস্য যিনি— তৃপ্তি মিত্রের আগেই নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব পান এবং বহুরূপী-তে ১৯৭৯-র পর থেকে ২০০৮ পর্যন্ত একটানা নাট্যনির্দেশনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন সেই কুমার রায় মন্তব্য করেছিলেন— তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনা প্রসঙ্গে— 'তৃপ্তি মিত্র তো শুধুই অভিনেত্রী ছিলেন না। 'বহুরূপী' সংগঠনের একজন অন্যতমা— সংগঠনের কাজেও তাঁর আগ্রহ ছিল। নিজেকে তৈরি করেছেন তিনি সংগঠনের একজন হিসেবে দাগ রেখে যেতে। শম্ভু মিত্র-র সঙ্গে কাজ করার সুবাদে তিনি নির্দেশনার কাজটিও সুচারুভাবে সম্পন্ন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। এই নতুন দায়িত্ব যে তাঁর অভিনেত্রী সত্তাকে গ্রাস করতে পারেনি এটা যেমন সত্যি, তেমনই তাঁর প্রতিভার অন্যান্য দিকও প্রকাশিত হয়েছে শেষের দিকে।'[১৫]

তৃপ্তি মিত্র অনেকগুলি নাটকের পরিচালনা করেছেন ১৯৭০-এর পর কিন্তু সে সময় বা পরবর্তী সময়ে শম্ভু মিত্র তাঁর নির্দেশনা বিষয়ে কোনও মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ করেননি কোথাও। তাঁর মূল্যায়ন বা মতামত নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ দর্শককে সমৃদ্ধ করত কিন্তু তিনি কিছুটা সচেতনভাবেই তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনা সম্পর্কে নীরব।

কুমার রায়ের এই সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে কয়েকটি তথ্য প্রকাশ পায়— (১) তৃপ্তি মিত্র ছিলেন বহুরূপী নাট্যদলের একজন অন্যতমা সংগঠক।

২) সংগঠনের কাজে তাঁর আগ্রহ ছিল।
৩) অভিনেত্রী হিসেবে শুধুমাত্র নয়— সাংগঠনিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।
৪) শম্ভু মিত্রের সঙ্গে দীর্ঘ ১২/১৩ বছর— ( 'নবান্ন' থেকে 'ডাকঘর' পর্যন্ত) কাজের অভিজ্ঞতা।
৫) নির্দেশক সত্তা ও অভিনেত্রী সত্তাকে বিভাজিত করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।
৬) 'বহুরূপী'-র সঙ্গে যুক্ত থাকার শেষ-পর্বে নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ দলের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার প্রকাশ।

তৃপ্তি মিত্রর যে নাট্য-জীবন অভিজ্ঞতা সেখানে স্বাভাবিকভাবেই ছিল শম্ভু মিত্রের প্রবল প্রভাব। তিনি

নিজে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও নাট্যজীবন তখন একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল। পরিচালক হিসেব তৃপ্তি মিত্র নিজেই তাঁর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিবৃত করেছেন— 'দু' ধরনের পরিচালক আছেন। প্রথম— যাঁরা অনেক চরিত্রের নাটক ধরেন, ক্যানভাসটা বড় করে নেন। অনেক গ্রুপকম্পোজিশন করে নাটকের একটা চেহারা আনেন। একটা গ্র্যানজর তৈরী করেন। অভিনয়ের জন্য নির্ভর করেন অল্পকয়েক জনের উপর। খুব ভাল উৎরে যায়। এটা কিন্তু সকলে পারেন না। এর জন্য ভীষণ মানসিক প্রস্তুতির দরকার হয়। শ্রী উৎপল দত্ত এটা পারেন, করেন। আলকাজী তরুণ রায় একটা সময়ে এটা করেছেন। দ্বিতীয় ধরনের পরিচালক আছেন, যাঁরা অভিনেতার উচ্চারণ 'ক' থেকে 'ঁ' পর্যন্ত নজর রাখেন।... ছোট ছোট চরিত্রের উপর ভীষণ গুরুত্ব দেন। এমনি যে কোন একটি শব্দ উচ্চারণে ভুল হলেও সেটিকে ছেড়ে দেন না, তাকেও খুব গুরুত্ব দেন। যেমন শ্রী শম্ভু মিত্র। শ্রী উৎপল দত্ত যে ছোট চরিত্রের দিকে কম নজর দেন তা নয় তবে তাঁর পরিচালনার ধরনটা অন্য, যেটা আগে বললাম। আমি দ্বিতীয় ধরনে কাজ করতে বেশি আগ্রহী।'[১৬] অর্থাৎ পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি শম্ভু মিত্রের পন্থাই অনুসরণ করেছেন প্রথমাবধি। কারণ কৃষ্টি পত্রিকায় নাট্য পরিচালনা নিয়ে যখন এই কথাগুলি বলছেন তখন ১৯৮৬ সালে তিনি তাঁর পরিচালনার কাজের অনেকগুলো দিন অতিক্রম করে এসেছেন। 'আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়' তৈরি করে এই পদ্ধতিতেই কাজ করবেন বলে স্থির। তাঁর পরিচালনার ধরন সম্পর্কে সূত্রাকারে কয়েকটি বিষয় উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

**তৃপ্তি মিত্রের পরিচালন পদ্ধতি :**

১. ছোট ছোট চরিত্রের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করেন ও গুরুত্ব দেন।

২. প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণে কোনও ফাঁক রাখেন না।

৩. কোনও ভুল বরদাস্ত করেন না।

৪. বেশি চরিত্র নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন না।

৫. অহেতুক গ্র্যাঞ্জর তৈরি করার প্রবণতা তাঁর মধ্যে নেই।

৬. চরিত্রদের মানসিক গঠনের প্রস্তুতিতেও— যতটা নাটকের প্রয়োজন, ততটাই শিক্ষাদান করেন।

শম্ভু মিত্র যখন ছবির কাজে মুম্বইতে তখন তৃপ্তি মিত্রের ওপর ন্যস্ত হল পরিচালনার দায়িত্ব। এর আগে কুমার রায় ও অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নিশ্চয়ই শম্ভু মিত্র খুশি হতে পারেননি—

এবং ওই প্রযোজনা দুটিও ‘বহুরূপী’র ইতিহাসে তেমন আলোচিত নয়। তবে এই তরুণ পরিচালকদের নাটকগুলিতে তিনি অভিনয় করেছিলেন ‘স্বর্গীয় প্রহসনে’ অশ্লেষা, ‘অংশীদার’-এ সবিতা এবং ‘চৌর্যানন্দ’-য় হরিভাবিনীর ভূমিকায়। শুধুমাত্র ‘স্বর্গীয় প্রহসন’-এর পোশাক পরিকল্পনা (খালেদ চৌধুরী কৃত) প্রভূত প্রশংসিত হয়। তৃপ্তি মিত্র নাট্যপরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে প্রথমেই নির্বাচন করলেন রবীন্দ্রনাটক ‘ডাকঘর’। কেন এই নাটকটি নির্বাচন করলেন তৃপ্তি মিত্র? তৃপ্তি মিত্রের সামগ্রিক নাট্য পরিচালনার জীবনে বিভিন্ন পর্বে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে ‘ডাকঘর’।

১৯৫৭— ডাকঘর (বহুরূপী প্রযোজনা)

১৯৭৩— ডাকঘর (পুনর্নির্মাণ- বহুরূপী প্রযোজনা)

১৯৭৫— ডাকঘর (কলকাতা দূরদর্শন)

— ডাকঘর (আকাশবাণীতেও সম্প্রচার হয়)।

১৯৮১— ডাকঘর (বিশ্বভারতী প্রযোজনা)

তাই তাঁর প্রিয় এই রবীন্দ্র-নাটকটি দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল পরিচালনার। তবে প্রযোজনার ক্ষেত্রে তিনি ঠাকুরবাড়ির ‘ডাকঘর’ উপস্থাপনার থেকে নিজেকে সচেতনভাবেই স্বতন্ত্র রাখতে চেয়েছিলেন। এই প্রযোজনায় আলোক পরিকল্পনায় তাপস সেন এবং মঞ্চভাবনায় খালেদ চৌধুরীর অংশগ্রহণ প্রযোজনাটির মান উন্নত করেছিল সন্দেহ নেই। মঞ্চকে দুটি ভাগে ভাগ করে খালেদ চৌধুরী অমলের স্বপ্ন কল্পনা বর্ণনার পাশাপাশি তারই চোখ দিয়ে দর্শকের দেখা জগৎকে রূপ দিয়েছিলেন। দেবাশিস রায়চৌধুরীকে দেওয়া ব্যক্তিগত একটি সাক্ষাৎকারে মঞ্চশিল্পী খালেদ চৌধুরী জানিয়েছেন ‘...মঞ্চের বাঁ-দিকে অমলের বর্ণনা অনুযায়ী গ্রামের পথ, তালগাছের সারি, পিছনে পাহাড়, সামনে সাঁকো এ সমস্তই সাজানো থাকত...। আর মঞ্চের ডানদিকে অমলের ঘর। যে ঘরের দেওয়ালগুলোর ক্ষেত্রে এই প্রথম পার্সপেকটিভ ব্যবহার করা হয়েছিল অর্থাৎ সামনে থেকে দেওয়াল যত পিছনের দিকে যাচ্ছে তত ছোটো হয়ে যাচ্ছে আর সামনে ঘরের আসবাবপত্র হিসেবে একটা খাট ছিল এবং পাশে জানলা যেখানে অমল বসে থাকত। মজার ব্যাপার হল এই দেওয়ালগুলোতে নেট এবং তার পিছনে চট লাগানো থাকত। ফলে অমলের পাশেই তার বর্ণনামতো দৃশ্য যখন রাজকবিরাজ এসে সমস্ত খুলে দিতে বলতেন, তখন সেই নেটের পিছনে চটের কাপড়গুলো সরে যেত আর চতুর্দিক থেকে আলো আসত। মনে হত অমলের ঘরটি কেমন শূন্যে ভাসছে।’[১৭]

শম্ভু মিত্র তখন ‘একদিন রাত্রে’ ছবির কাজে মুম্বইতে থাকলেও এ নাটকে তিনি অভিনয়

করেছিলেন রাজকবিরাজের ভূমিকায় এবং শাঁওলী মিত্রের স্মৃতিতে ধরা আছে যখন তিনি থাকতেন মহলায় প্রযোজনায় সাহায্য করতেন। অন্য নাটকের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কুমার রায় ও অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি প্রযোজনার কাজে শম্ভু মিত্র কতটা জড়িত ছিলেন, সে স্মৃতি শাঁওলী মিত্রের মনে না থাকলেও যেহেতু তিনি 'ডাকঘর' নাটকে অভিনয় করেছিলেন তাই সেই নাটকের কিছু কিছু কথা তাঁর মনে আছে। তার মনে আছে মাঝে মাঝে শম্ভু মিত্র কেমন করে অভিনয় দেখিয়ে দিতেন। অমলের চোখটা দূরে ভেসে আছে এই অভিব্যক্তি তাঁর মধ্যে আনবার জন্য তিনি কী কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। অবশ্য পরে বড়ো হয়ে বুঝতে পেরেছেন তৃপ্তি মিত্রও তখন একইসঙ্গে নির্দেশনার পদ্ধতি শিখেছিলেন। অন্য দিকগুলো, অর্থাৎ— মঞ্চ, মঞ্চভাবনার প্রেক্ষিতে অভিনেতাদের স্থাপনা— যেগুলো নির্দেশনার গুরুত্বপূর্ণ দিক। পত্রপত্রিকাগুলিও 'ডাকঘর' সম্পর্কে ছিল উচ্ছ্বসিত। 'Tripti Mitra's emergence as a director is the others notable Feature of this outstanding production.'[১৮] 'নিউ এম্পায়ার' মঞ্চে প্রথম দেখার 'ডাকঘর'-এর স্মৃতি পঁচাশি বছর বয়সের দেবতোষ ঘোষকে ২০১৬-তেও সমানভাবে প্রাণিত করে। '৫৭ সালে এই ডাকঘর যেই দেখলাম না— সেটা আমার কাছে মনে হল, আহা! এর কোনও জুড়ি নেই। এ কী ভালো কী ভালো! এবং তাতে খালেদ সাহেবের— রাজ কবিরাজ যখন বলেন এ কী! সব বন্ধ কেন, খুলে দাও, খুলে দাও— শম্ভুদা করতেন ওই পার্টটা— কি রকম হোত যেন চতুর্দিক থেকে ঝপ করে সব যেন, চতুর্দিক থেকে ঘরটা যেন মহাশূন্যেতে। রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় নাট্যকার তা আমার মনে হয়েছিল ওই 'ডাকঘর' দেখেই।'[১৯] 'ডাকঘর' নাটকে তৃপ্তি মিত্র একটি সুন্দর দৃশ্য তৈরি করেছিলেন একেবারে শেষে। যেখানে অমলের মৃত্যু হয়েছে। সকলে নিস্তব্ধ- নিথর। তখন আবার ফিরে আসত সুধা। একটা ছোট সাঁকো জাতীয় মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। অমলের মৃত্যুর ঘন নিস্তব্ধতার মধ্যে শোনা যেত দূর থেকে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে সুধার ঘুঙুরের শব্দ। নাটকের অন্তিম দৃশ্যের চমৎকার দৃশ্যায়নে ভিন্ন মাত্রা পেত তৃপ্তি মিত্রের 'ডাকঘর'। অমলের ভূমিকায় শাঁওলী মিত্রের অভিনয় বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। But it is Shaonli's play and she simply runs away with all the laurels. The delightful lighting scheme of Tapas Sen and the imaginative stage decor. In spite of their respective excellence, also pale into insignificance... Shaonli's heaut warming performance.[২০] নব পর্যায়ে আবারও 'ডাকঘর' অভিনীত হতে থাকে (১৯৭৩), তখন অমলের ভূমিকায় শাঁওলী মিত্রের পরিবর্তে চৈতালি ঘোষাল, ঠাকুর্দা-শম্ভু মিত্র, রাজকবিরাজ-কুমার রায়, মাধব দত্তের ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসুর স্থানে তারাপদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতারা অভিনয় করেন— দ্বিতীয় পর্বে অভিনয় করেছিলেন দেবতোষ ঘোষ। যদিও ১৯৭৩ সালের প্রযোজনা

তাঁর একেবারেই ভালো লাগেনি— 'আমার ভাল্লাগেনি এই অবধি বলতে পারি'।[২১] এই 'ডাকঘর' কলকাতা দূরদর্শনের সৌজন্যে মাঝে মাঝেই দেখা যায় দূরদর্শনের পর্দায়। যেখানে খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ বা তাপস সেনের আলোর জাদু থেকে বঞ্চিতই থাকেন দর্শকেরা। তবু প্রযোজনার আকর্ষণে কিছু কম পড়ে না।

পুনরায় যখন তৃপ্তি মিত্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, এই মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ ১৯৫৮-১৯৭০ পর্বে তাঁর অভিনয় ক্ষমতা পরিণততর হয়েছে বিবিধ জটিল চরিত্র রূপায়ণের পরম্পরায়। এই পর্বে তাঁর নির্মিত চরিত্রগুলির দিকে লক্ষ করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে কীভাবে তিনি নিজেকে ক্রমশ তৈরি করেছেন— বিভিন্ন চরিত্রে নিজেকে রূপান্তরিত করেছেন, তাঁর অভিনয় জীবনের মুকুটে যুক্ত হয়েছে একটির পর একটি পালক। এই পর্বে তৃপ্তি মিত্র অভিনীত নাটক:—

| **নাটক** | **চরিত্র** | **নাট্যকার** | **নির্দেশক** | **প্রথম অভিনয়** |
|---|---|---|---|---|
| পুতুল খেলা | বুলু | ইবসেন<br>অনুবাদ ও রূপান্তর :<br>শম্ভু মিত্র | শম্ভু মিত্র | ১৯৫৮ |
| মুক্তধারা | ফুলওয়ালী | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ,, | ১৯৫৯ |
| কাঞ্চনরঙ্গ | তরলা | অমিত মৈত্র | ,, | ১৯৬১ |
| বিসর্জন | গুণবতী | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ,, | ১৯৬১ |
| রাজা ওয়াদিপাউস | ইয়োকাস্তে | সফোক্লেস<br>অনু: শম্ভু মিত্র | ,, | ১৯৬৪ |
| রাজা | সুদর্শনা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ,, | ১৯৬৪ |
| বাকি ইতিহাস | বাসন্তী | বাদল সরকার | ,, | ১৯৬৭ |
| চোপ আদালত চলছে | বেনারেবাঈ | বিজয় তেণ্ডুলকর | ,, | ১৯৭১ |

১৯৫৭-র পর শম্ভু মিত্র নির্দেশিত বহুরূপী প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যে সাতটি নাটকেই মুখ্য অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র। কেবল 'মুক্তধারা' নাটকে তাঁর ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তৃপ্তি মিত্র অভিনয় করেননি শম্ভু মিত্র নির্দেশিত মাত্র দুটি নাটকে 'বর্বর বাঁশি' (১৯৬৯) ও 'পাগলা ঘোড়া' (১৯৭১) এছাড়া বাদল সরকার নির্দেশিত 'প্রলাপ' (১৯৬৭) ও হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'ত্রিংশ শতাব্দী'তে ও তাঁকে পাওয়া যায়নি। এই তালিকা প্রমাণ করে এই পর্বেও বহুরূপী-র প্রধান ভূমিকাভিনেত্রী তৃপ্তি

মিত্র। শুধু অভিনয় নয়, সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ভিন্ন পথে বাঁক নিল। তিনি বহুরূপী-র সভানেত্রী নির্বাচিত হলেন এবং সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ, পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে দলের কর্মপ্রবণতাকে অব্যাহত রাখলেন।

## তৃপ্তি মিত্রের নাট্যপরিচালনার ২য় পর্যায়

তৃপ্তি মিত্রের ১ম পর্বের নাট্যপরিচালনা অর্থাৎ 'ডাকঘর'-এর প্রযোজনাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই ধরা যেতে পারে, কেননা এর পর দীর্ঘ তেরো বছর আর কোনও নাট্যপরিচালনার দায়িত্ব বহন করতে হয়নি তাঁকে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল ১৯৭০ থেকে। এই সময়পর্বে (১৯৭০-১৯৭৭) তৃপ্তি মিত্র পরিচালনা করলেন— কিংবদন্তী (১৯৭০), অপরাজিতা (১৯৭১), টেরোড্যাকটিল (১৯৭২), গণ্ডার (১৯৭২), দুরাশা (১৯৭৩), ঘরে বাইরে (১৯৭৪), সুতরাং (১৯৭৫), বাঘ (১৯৭৫), যদি আর একবার (১৯৭৬), পাখি (১৯৭৭)— মোট ১০টি নাটক। তাঁর তত্ত্বধানে অরিজিৎ গুহ নির্দেশনা দেন 'বলি' (১৯৭৭) নাটকের। নতুন নাটকগুলির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৭৩-এ 'ডাকঘর' নবপর্যায়ে এবং ১৯৭৬-এ 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে'— পুনরায় তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রায় সাত বছর দশটি নাটকের প্রযোজনা ও পরিচালনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব। নির্দেশনার ক্ষেত্রে প্রথমেই যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল নাটক নির্বাচন। তৃপ্তি মিত্রের নাটক নির্বাচন কোন লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে গৃহীত হয়েছিল? এই সময়পর্ব পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নকশাল আন্দোলন এবং ১৯৭৭-এ কংগ্রেস সরকারের অবসান ঘটিয়ে যুক্তফ্রন্টের শাসনকালের সূচনা। এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পালাবদল ও যুবসমাজের ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আস্থা— তাঁর নির্বাচিত নাটকগুলিতে প্রতিফলিত হল না। তিনি শুধুমাত্র প্রত্যেক বর্ষের নির্দিষ্ট সংখ্যার পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে— সরকারি অনুদান যাতে বন্ধ না হয়ে যায় এবং সর্বোপরি বহুরূপী-কে সচল রাখার জন্যই প্রযোজনার গুণগত মানের প্রতি অধিক গুরুত্ব না দিয়ে একটির পর একটি নাটক প্রযোজনা করে গেছেন। 'বহুরূপী'র সঙ্গেও শম্ভু মিত্রের যোগাযোগ ক্রমশ শিথিল হতে থাকে এই সময় থেকেই। এই সময়পর্বে তৃপ্তি মিত্রের ২য় পর্যায়ের নাট্যপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের মূল কারণ ছিল—

১। শম্ভু মিত্রের নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির কাজে ব্যস্ততার কারণে 'বহুরূপী'র নতুন কোনও নাটক পরিচালনা না করার সিদ্ধান্ত।

২। শম্ভু মিত্রের পর তৃপ্তি মিত্রকেই 'বহুরূপী' নাট্যপরিচালক হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

৩। সরকারি অনুদান সচল রাখা।

৪। প্রত্যেক বছর নতুন নাটক করার বাধ্যবাধকতা।

৫। নাটক প্রযোজনার মধ্য দিয়ে 'বহুরূপী'কে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ।

১৯৬৭-তেই 'নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে যায় আর ১৯৬৮-তে ১২১-এ নাসিরুদ্দিন রোডে শম্ভু মিত্র-তৃপ্তি মিত্রের আবাসগৃহে শুরু হয়ে যায় কর্মযজ্ঞ। ঠিক কুড়ি বছর আগে কোনও এক বসন্তকালে এই ঠিকানায় শুরু হয়েছিল 'বহুরূপী'-র মতো নাট্যদলের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। যে উদ্যোগে ও অভিনব নাট্যভাবনায় গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে আসার পর শম্ভু মিত্র গড়ে তুলেছিলেন 'বহুরূপী নাট্যসংস্থা', ঠিক তেমনই আরও বৃহৎ কোনও নাট্যভাবনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাটককে আরও বড় জায়গায় উত্তীর্ণ করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনা করেছিলেন জাতীয় নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠার। যদি এই প্রচেষ্টা সফল হত নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যের গতিপথ আরও বৃহত্তর ভাবনার প্রকাশ ঘটাত। কারণ 'A Nation is known by its Theatre' এই কথাটির প্রতি শম্ভু মিত্রের ছিল অকপট বিশ্বাস। নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির কারণে ১৯৬৭-৬৮ থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। থিয়েটারের নবীন প্রবীণ মানুষদের নিয়ে 'বহুরূপী', 'নান্দীকার', 'রূপকার' ও অন্যান্য সংগঠন নিয়ে উদয়-অস্ত পরিশ্রম করতে থাকেন। নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত অভিনয় (কম্বিনেশন নাইট)-এর আয়োজন হয়।— প্রথমবার 'বহুরূপী'র অত্যন্ত সমাদৃত নাটক রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' অভিনীত হয় 'বহুরূপী', 'রূপকার', 'নান্দীকার'— নাট্য সংগঠনগুলির যৌথ অংশগ্রহণে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায়। 'বহুরূপী'র গণ্ডী ছাড়িয়ে আরও বৃহত্তর নাট্যের জগতে যখন শম্ভু মিত্র কর্মব্যস্ত— 'বহুরূপী'তে যখন সময় দিতে পারছেন না— কিংবা 'নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'র সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার পর শম্ভু মিত্রের যে অনীহা ও উদাসীনতা— এই সময়কাল 'বহুরূপী'র সংকটকাল হিসেবেই চিহ্নিত। কারণ স্থপতির সাহচর্য ছাড়া বহুরূপী-র অস্তিত্বের সংকট। সেই অস্তিত্বের সংকটকালীন অবস্থায় তৃপ্তি মিত্রের নিরন্তর কর্মপ্রয়াস 'বহুরূপী'-র কর্মধারাকে সচল রাখল। শম্ভু মিত্র নিজে চেয়েছিলেন তাঁর ব্যস্ততার সময়ে নতুন কোনও পরিচালক দায়িত্ব গ্রহণ করুক 'বহুরূপী'-র। এ কারণেই ১৯৬৯-এ বাদল সরকারের 'ত্রিংশ শতাব্দী' মঞ্চস্থ হয় হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়। হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের ওপর শম্ভু মিত্রের আস্থা ও নির্ভরতার জন্যই তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি 'বহুরূপী' ছেড়ে 'নান্দীকার'-এ চলে যাওয়ার কারণেই কি তৃপ্তি মিত্রকে নির্বাচন করা হল? এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে ১৯৭০-এ 'নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'র দ্বিতীয় নাট্যোৎসবে 'মুদ্রারাক্ষস'-এ 'বহুরূপী'র থেকে অভিনয় করেন দুই মুখ্য অভিনেতা শম্ভু মিত্র ও কুমার

রায়। এই নাট্যোৎসবে ‘চার অধ্যায়’ (‘বহুরূপী’ প্রযোজনা)-ও মঞ্চস্থ হয়।

১৯৭০-সালে তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনার ২য় পর্যায় শুরু হল কুমার রায় রচিত ‘কিংবদন্তী’ নাটকটির প্রযোজনার মাধ্যমে। ‘বহুরূপী’ পত্রিকায় মূল নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনি প্রকাশ পায়। প্রযোজনার সময় কুমার রায় নিজে প্রযোজনার উপযোগী করে পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপ দেন ‘কিংবদন্তী’-কে। মুখ্য নারী চরিত্রে অভিনয় করলেন শাঁওলী মিত্র ‘এই প্রথম মুখ্য চরিত্রে রূপদান করল এ— লেখক। সে-সময়েও সে লক্ষ করেছে, কেমন করে শম্ভু মিত্র কিছু কিছু সাহায্য করেছেন প্রযোজনায়। বিশেষত নির্দেশনার ক্ষেত্রে। যদিও দু’জনের সম্পর্কে তখন পূর্বের সহজতা নেই।’[২২] এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়— (১) তৃপ্তি মিত্র ও শম্ভু মিত্রের সহজ দাম্পত্য জীবনে কোথাও ভাঙনের সূচনা হয়েছে। (২) নির্দেশনায় ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনের ভাঙনের কোনও প্রভাব পড়েনি। (৩) দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনায় নাটকটিতে তৃপ্তি মিত্র কন্যা শাঁওলী মিত্রকেই মুখ্য চরিত্রে নির্বাচন করলেন। (৪) শম্ভু মিত্র ‘নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি’র ব্যস্ততা সত্ত্বেও ‘বহুরূপী’তে তৃপ্তি মিত্রকে সাহায্য করছেন।

‘ডাকঘর’-এর সময় মুখ্য চরিত্র অমল-এর ভূমিকায় যেমন নির্দেশক শাঁওলী মিত্রকে নির্বাচন করেছিলেন— এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হল না। তবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমকালীন সময়ের কোনও প্রতিফলন দেখা গেল না এ নাটকে। মূলত সহজ সরল লোকজীবন-নির্ভর কাহিনি— যার আনন্দের সুরটুকু দর্শকদের ভাল লেগেছিল। তত্ত্ব বা বক্তব্যের ভারহীন পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের কল্পনাভূমিতে এক কিংবদন্তিকে আশ্রয় করে লেখা এই নাটক। এ নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে এক ভালবাসার কাহিনি। কিন্তু ভালবাসাই সেখানে শেষ কথা নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সংকট। প্রাণের বিনাশে ও প্রাণের উন্মেষে সেই সংকট আরও ঘনীভূত হয়। প্রশ্ন ওঠে, বিপদের মুহূর্তে অন্যায়ের সঙ্গে মোকাবিলায় কাপুরুষতা আর হিংসাত্মক পথের মধ্যে কোনটি শ্রেয়। নাটকে এই প্রশ্ন হয়তো চিন্তার উদ্রেক করে কিন্তু পাশাপাশি মনে হয় সত্তরের দশকের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের কোনও প্রভাব কিন্তু এ নাটকে ছায়া ফেলল না। ‘কিংবদন্তী’ শুধুমাত্র ভালবাসার কাহিনি হিসেবে উপস্থাপিত হল। আনন্দবাজার পত্রিকাতেও নাটকটির সরলীকৃত সমাধান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ পায়— নাটকের পরিণতি সম্পর্কে এই পত্রিকা লেখে যে পরিণতি এসেছে আলগাভাবে, মনে হয় নাট্যসংকট তৈরি করার তাগিদেই এই সরলীকরণ। নাটক সম্পর্কে বিরূপতা প্রকাশ পেলেও মূল নাটকটির মধ্যে যে সত্য সন্ধানের অভীপ্সা আছে তা চিরকালের। অভিনয় ও আনুষঙ্গিক কলাকৌশলের প্রচেষ্টা সফল

হলেও প্রযোজনাটি মাত্র আট মাস ধরে মঞ্চস্থ হয়। ১৯৭০-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রথম অভিনয় আর শেষ অভিনয় হয় ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে। বিশেষ দর্শকানুগ্রহ যে লাভ করেছিল তা মনে হয় না। মূলত ১৯৬৯ থেকেই নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অভিনয় সংখ্যা কমতে থাকে এবং বিভিন্ন জায়গায় অভিনয়ের চেষ্টা চালায় 'বহুরূপী'। 'কিংবদন্তী' বেশি না চলার একটা কারণ অবশ্যই নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অভিনয়ের সুবিধা না পাওয়া। আরও কারণ ব্যাখ্যা করেছেন শাঁওলী মিত্র, এ নাটকের মুখ্য অভিনেত্রী— 'মনে পড়ে, অবন মহলে কিংবদন্তি নাটকের শেষ অভিনয়ের কথা। কিংবদন্তী-র উপস্থাপনা মুক্তাঙ্গনের মতো ছোটো মাপের মঞ্চে সম্ভব ছিল না। তাই যত ঘন ঘন অভিনয় হলে এ নাটকের গুণাগুণের বিচার দর্শক করতে পারতেন, তা সম্ভব হয়নি।'[২৩]

'কিংবদন্তী' নাটকের মূল কাহিনি গড়ে উঠেছে একটি কিংবদন্তী কাহিনিকে কেন্দ্র করে যার পটভূমিতে রয়েছে পূর্ববঙ্গের এমন এক অঞ্চল যেখানে প্রতিনিয়ত অত্যাচার চলে দুর্বলের প্রতি সবলের। দস্যুদলের সর্দার রঙ্গনের মাধ্যমেই অবশ্য তার সহযোগীদের হাত থেকে মুক্তি ঘটে কুলগুরু ও তাঁর যুবতী-কন্যা সুলভার। উদ্ধারকর্তা রঙ্গনকে কি ভালবাসতে পারবে সুলভা? 'বহুরূপী'র অভিনয়পত্রীতে লেখা হল 'আমাদের এ 'কিম্বদন্তী'র কাহিনী— অনেক অনেকদিন আগের এক ভালবাসার কাহিনী। পরস্পরকে ভালবাসাই যেখানে শেষ কথা নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আকাঙ্ক্ষা। এক দুর্লভ বাসনা। সেই আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার চরিতার্থতার পথে আছে সংকট। সে সংকট, প্রাণের বিনাশ এবং প্রাণের উন্মেষ, এই নিয়ে।'[২৪] এই ধরনের কাহিনিকে রূপদান করেছিলেন যিনি, তিনি বহুরূপীর দীর্ঘদিনের এক বিশ্বস্ত অভিনেতা কুমার রায় দায়িত্বশীলতার সঙ্গে 'বহুরূপী'র প্রায় শুরুর সময় থেকে নিরলস কাজ করেছেন নাটকের বিভিন্ন বিভাগে— কিন্তু নাট্যকার হিসেবে তাঁর প্রথম প্রকাশ এই নাটকে। তৃপ্তি মিত্রও সাহসের সঙ্গে নির্বাচন করলেন এই নবীন নাট্যকারকে। কোনও প্রথিতযশা নাট্যকারের নাটক তিনি নির্বাচন করলেন না এত দিন পর নির্দেশনার দায়িত্ব পেয়েও। তবে নাট্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে রঙ্গন যে সুলভাকে উদ্ধার করল তার সহযোগী দস্যুকে হত্যা করে এই বিষয়টি তাঁদের মনে হয়েছে বিপদের মুহূর্তে, অন্যায়ের সঙ্গে মোকাবিলায় কাপুরুষতা আর হিংসাত্মক পথের মধ্যে দ্বিতীয়টি শ্রেয় কি না, এই প্রশ্নটি এখানে এসেছে। এসেছে অবশ্য আলগাভাবে, মনে হয়, প্রধানত একটি নাট্য-সংকট রচনার তাগিদে। সমাধান পর্বও তাই সরলীকৃত। তবে নির্দেশকের ভাবনাচিন্তাকে প্রশংসার দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন সমালোচক 'শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের প্রথম নাট্য প্রযোজনা ''ডাকঘর'' সে প্রায় তের বছর আগের কথা। 'কিম্বদন্তী', তার দ্বিতীয় প্রয়াস। প্রযোজনা এবং নির্দেশনার দায়িত্ব তিনিই

বহন করেছেন। উপকথামূলক এই ঋজু কাহিনীর বিস্তারে তিনি কিছু মৌল সত্য আর সমস্যা তুলে ধরতে পেরেছেন। বিশেষত, প্রথম পর্বে ভয়ের সর্বগ্রাসী রূপ আর প্রায় সর্বস্তরে অসহায়তার চেহারা লক্ষ্য করার মত। আবেগ মুহূর্তগুলি সুগঠিত। মানবিক আবেদনের সঙ্গে কাব্য-সুষমার যোগটুকুও সুন্দর।'[২৫] পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার সমতা সব শিল্পী বজায় রাখতে পারেননি তবে অভিনয়ে সমবেত ও এককভাবে সকলেই ভাল। বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন— শাঁওলী মিত্র (সুলভা), অশোক চট্টোপাধ্যায় (রঙ্গন), গঙ্গাপদ বসু (কুলগুরু) এবং আরতি মৈত্র (কৃষ্ণদাসী)। এ নাটকের মঞ্চসজ্জা করেছিলেন খালেদ চৌধুরী। 'কিম্বদন্তী' কিংবা 'বর্বরবাঁশি' ও 'ত্রিংশ শতাব্দী' ইত্যাদি নাটকগুলির যথাযথ মূল্যায়ন হল না বা দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হল না, তার কারণ অভিনয় সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। কারণ ১৯৬৯ সালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চের মালিকানা বদল এবং নতুন মালিকের এই মঞ্চকে সিনেমা প্রদর্শনের কাজে লাগাবার পরিকল্পনা। মুক্তাঙ্গন মঞ্চ ব্যবহার করা হলেও 'কিম্বদন্তী' নাটকের জন্য তা যথোপযুক্ত ছিল না। অধিক সংখ্যায় অভিনয় না হওয়ার কারণে হয়তো অধিকসংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারেনি 'কিম্বদন্তী' কিংবা 'ত্রিংশ শতাব্দী' বা 'বর্বর বাঁশি'।

১৯৭১-র ২৮ ফেব্রুয়ারি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ মঞ্চস্থ হল শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বাদল সরকারের নাটক 'পাগলা ঘোড়া'— যে নাটকের অভিনয় হয়েছে প্রায় আট বছর (শেষ অভিনয় ১৯৭৯-এর ৯ আগস্ট বিজন মঞ্চে)। শম্ভু মিত্রের প্রচেষ্টায় 'বহুরূপী' এমন এক মঞ্চের সন্ধান দিল বাংলার নাট্যদর্শকের যা আজও গ্রুপ থিয়েটারের পীঠস্থান হয়ে রইল। প্রায় চুয়াল্লিশ বছর ধরে অসংখ্য নাট্যদলের অভিনয় সংগঠিত হয়েছে যে মঞ্চে। — তৃপ্তি মিত্রের ধারাবাহিক কাজের তালিকায় 'অপরাজিতা' তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত নাটকগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শুধু প্রযোজনাগত দিক থেকে নয়— জনপ্রিয়তা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জনের নিরিখে 'বহুরূপী'র অন্য প্রযোজনাগুলির থেকে 'অপরাজিতা' এগিয়ে ছিল। নিউ এম্পায়ার মঞ্চ বন্ধ হয়ে গেলে শম্ভু মিত্র নতুন কোনও মঞ্চের সন্ধান করছিলেন। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর মঞ্চটি নতুন করে তৈরি করে— সেখানে মঞ্চস্থ হয় উদয়শঙ্করের 'শঙ্করস্কোপ'— লেডি রাণু মুখার্জির সঙ্গে কথা বলে শম্ভু মিত্র মঞ্চটিতে নিয়মিত অভিনয় প্রথা শুরু করেন এবং আজও যেখানে অভিনয়ধারা অব্যাহত। তাঁর সেই দূরদর্শিতার সাক্ষ্য হয়ে থাকল অ্যাকাডেমি। শুধু মঞ্চ বদল নয়, ১৯৭০-এ বদল হল বহুরূপী-র মহলা স্থান। নতুন ঠিকানা হল ৭ লোয়ার রেঞ্জ। 'বর্বর বাঁশির' প্রায় দুবছর পর আবারও পরিচালনায় হাত দিলেন শম্ভু মিত্র। নাটক 'পাগলা

ঘোড়া'— 'বহুরূপী'র ঐতিহ্যকে আবারও ফিরিয়ে আনলেন। পত্রপত্রিকায় স্পষ্টতই লেখা হল, প্রযোজনার নিপুণতা আর অভিনয়ের উৎকর্ষে 'বহুরূপী'র সৃষ্টি হিসেবে শনাক্ত করতে অসুবিধা হয় না। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে নীতিশ সেনের লেখা নাটক 'অপরাজিতা'র একক অভিনয় নির্দেশনায় তৃপ্তি মিত্র প্রকাশিত হলেন অনন্য পরিচয়ে। এই বছরেই তিনি পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হলেন। নাট্যভাবনায়, চর্চায় সম্মানে ঔজ্জ্বল্যে সমৃদ্ধ হয়ে রইল এই বছরটি।

বাংলার নাট্য দর্শকের দরবারে এক স্মরণীয় অভিনয়ের সাক্ষর রেখে ছিল 'অপরাজিতা'। দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে তৃপ্তি মিত্র এই নাটকের অভিনয় করে গেছেন (১৯৭১-১৯৮৭)। অপরিবর্তিত দৃঢ়তায়-দক্ষতায়। বহুরূপীর হয়ে তাঁর শেষ অভিনয় ১৯৮০তে। এরপর 'চেনামুখ' এবং পরে 'আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়'-এর প্রযোজনায় ১৯৮৭ সালের ২৫ অক্টোবর, তাঁর জন্মদিনে শেষবারের মতো 'অপরাজিতা'য় অংশ নেন। 'অপরাজিতা' একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকে একজনই চরিত্র। এক সন্ধ্যায় এক নির্জন ঘরে বসে অপরাজিতা নামের এক নারী তার জীবনের গল্প বলে। আঠারোটি চরিত্রে তিনি রূপদান করেন একই সঙ্গে।

'বহুরূপী'র জন্মলগ্ন থেকেই তৃপ্তি মিত্র 'বহুরূপী'র বিবিধ প্রযোজনায় মুখ্য নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সত্তরের দশকের শুরুতেই তাঁর মনের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে কিছু করার একটা ইচ্ছা জাগছিল। ওঁর মনে হয়েছিল নিজে একা কিছু করবেন। ওঁরই আইডিয়া থেকে প্রধানত নাটক লিখলেন নীতিশ সেন। ''অপরাজিতা' লিখতে লিখতে একটা জিনিষ মনে হয়েছিল যে আমি একটা কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছি। এই ফর্মটা যে আমি ভেবে করেছি তা নয়, বৌদিও বলেছেন তাও নয়। কিন্তু এই ফর্মটায় লিখতে গিয়ে মনে হল যে আমি অনেক জিনিষ খুব ইনটিমেটলি বলতে পারছি। এটা বৌদির অভিনয়ের জন্যও হয়ত সুবিধে হচ্ছিল।'[২৬] এরপর তিনি ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন কীভাবে 'অপরাজিতা' নাটক মঞ্চস্থ করা যায়। এ কাজে ওঁকে সহায়তা করলেন ওঁর দিদি কমলা সিংহ।'[২৬] এছাড়াও তাঁর পাশে ছিলেন তাপস সেন, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দীপেন সেন। পুরো প্রচেষ্টাটাই ছিল তৃপ্তি মিত্রের একার। প্রথমদিকে সাংগঠনিক কোন সাহায্য নিতে চাননি 'বহুরূপী'র থেকে। পরে 'বহুরূপী' যখন প্রস্তাব দেয় তারাই প্রযোজনা করবেন তখন তৃপ্তি মিত্র রাজি হন। নিজের দায়িত্বেই খুব বড়ো একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন তিনি। কারণ এর আগে বাংলার মঞ্চে প্রায় ২ ঘন্টা ১৫/২০ মিনিট ধরে একক অভিনয়ের (প্রথমে 'অপরাজিতা'র সময় সীমা ছিল ৩ ঘন্টা পরে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়।) কোনও পূর্ব ইতিহাস ছিল না। শম্ভু মিত্রও কখনও একক অভিনয়ের কথা ভাবেননি

কিন্তু প্রাথমিক ভাবনাটা ছিল তাঁরই।[২৭] তৃপ্তি মিত্র শুনেছিলেন পি.এল.দেশপাণ্ডের একক অভিনয়ের কথা। একজন মহিলার নির্দেশনায় এবং একক অভিনয়ের ইতিহাস তৈরি হল বাংলার মঞ্চে। এই দিক থেকেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৯ সাল নাগাদ যখন 'বহুরূপী' মুম্বই থেকে ফিরে কলামন্দিরে 'রাজা' নাটকের অভিনয় করছে তখন সেই শো দেখতে গিয়ে নীতিশ সেন ('অপরাজিতা' নাটকের নাটককার) যখন 'বৌদি' (এই সম্বোধনেই তৃপ্তি মিত্র 'বহুরূপী' মহলে পরিচিত)-র সঙ্গে দেখা করতে যান তখনই তৃপ্তি মিত্র তাঁকে পি.এল.দেশপাণ্ডের একক অভিনয় প্রসঙ্গ বলেন এবং সেই আদলে একটি নাটক লিখে দেবার অনুরোধ জানান। কিছুদিন আগে ১৯৬৯ সালে নীতিশ সেন-এর 'বর্বর বাঁশী' মঞ্চস্থ হয়েছে। স্বভাবতই নাট্যকারের সঙ্গে 'বহুরূপী'র একটা যোগাযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। 'অপরাজিতা' নাটকটি নিয়ে নাট্যকার ও নির্দেশকের দীর্ঘসময় ধরে আলাপ আলোচনা হয়েছে। দেবতোষ ঘোষ-এর স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে 'অপরাজিতা' তৈরি হওয়ার ইতিকথা— '...বউদি নীতিশকে দিয়েই অত ব্যস্ততার মধ্যেও অনেক, অনেকবার ঘষা-মাজা, পরিবর্জন-পরিমার্জনার পর এই শেষ চেহারায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। বহুদিনই সকালে-বিকেলে নীতিশকে দেখেছি কাগজ-কলম হাতে মনোযোগী ছাত্রের মতো বউদির সামনে বসে থাকতে, আর 'বেচারা নীতিশ' বলে মনে মনে হেসেছিলাম। যাহোক, আমাদের সেই ব্যস্ততায়, অমনোযোগে, অযত্নে নয় যত্ন ব্যতিরেকেই, মহলা দিয়ে দিয়ে বউদি একাই বড়ো করে তুললেন 'অপরাজিতা'কে।'[২৮] ১৯৭১-র ৭ সেপ্টেম্বর কলামন্দির বেসমেন্টে প্রথম অভিনয় হয় এ নাটকের।— মনে রাখতে হবে যে এর কয়েকমাস আগেই ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ একটি নতুন জায়গায় তখন সদ্য অ্যাকাডেমি মঞ্চ নিয়েছে 'বহুরূপী' 'পাগলা ঘোড়া' প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছে এবং শুরুর সময় থেকে এই নাটক যেমন জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক সাফল্যও লাভ করেছে। এই বছরেই মঞ্চস্থ হয়েছে 'বহুরূপী' প্রযোজিত শম্ভু মিত্রের শেষ নির্দেশিত নাটক 'চোপ আদালত চলছে'। সেখানে তৃপ্তি মিত্র বেনারেবাঈ— প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। এরই মধ্যে 'অপরাজিতা'র মঞ্চায়ন। যেহেতু একটা চরিত্রেরই অভিনয় তাই মহলার ক্ষেত্রে একটা সুবিধা থেকেই যায় যে— একজন প্রম্পটের মানুষ পেলেই রিহার্সাল চালিয়ে নেওয়া যায়। 'প্রচণ্ড জনপ্রিয় এই প্রযোজনার প্রতিটি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ আবার সেই পুরোনো সত্যিটাকে প্রতিষ্ঠিত করত যে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প হয় না। কোনো বিরুদ্ধ প্রচারেই প্রতিভাকে আড়াল করা যায় না। 'অপরাজিতা'য় বউদির কৃতিত্বটার অতিরিক্ত মাত্রাটা হল যে অভিনয়ের পাশাপাশি নির্দেশনার দায়িত্বও তাঁর ছিল।'[২৯]

'অপরাজিতা' নাটকের অভিনয়পত্রীতে এই নাটকের মূল যে ভাবনা তার আভাস পাওয়া যায়, সেখানে লেখা হয়—

'অপরাজিতা'তে একটি মেয়ে নিঃসঙ্গ নির্জন ঘরে গল্প বলে। যে মেয়েটি মানুষজনদের (দর্শককে যেন) আহ্বান জানিয়েছেন তার একটি সংবাদ দেবার জন্য। কথকতার ভঙ্গিতে গল্প বলে যায় সেই মেয়েটি। একটি-ই চরিত্র মঞ্চের উপর কিন্তু মঞ্চসজ্জার আসবাবপত্র এই নাটকের চরিত্র হয়ে ওঠে। টেলিফোনটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যেন সেই টেলিফোনটিই এই নাটকের জ্যান্ত এই অস্তিত্ব। এক নিঃসঙ্গ মেয়েটির যার নাম ডাক অপু, ভালো নাম অপরাজিতা 'তারও সব আছে, কিংবা ছিল। যেমন আর সকলেরই থাকে। স্বামী, দাদা, বৌদি, বাবুনটু— এরা সবাই। কিন্তু তবুও এই মেয়েটি, যার ডাক নাম অপু, যার ভাল নাম অপরাজিতা, সে আজ সন্ধেয় এক্কারে একা তাই সে তার একার গল্প বলেছে।'[৩০] এই যে অপরাজিতার এক গল্প থেকে আরেক গল্পে চলে যাওয়া, একটি চরিত্র থেকে আর একটি চরিত্রে পৌঁছে যাওয়া যা কোনও মাপা, পরিকল্পিত পথ নয়— পথ ভেঙে স্মৃতির সড়ক বেয়ে নাটকটিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তৃপ্তি মিত্র অনায়াসে একটি চরিত্র থেকে বেরিয়ে আরেকটি চরিত্রে ঢুকে পড়েন। এ নাটকে নির্দেশক হিসাবে তার স্বীকৃতি বিভিন্ন মাত্রায় ধরা পড়ে— ক) তিনি একা হয়েও অনেক চরিত্র সৃজনের একটা পথ আবিষ্কার করতে পেরেছেন। খ) টেলিফোন, আসবাব, মঞ্চের নানাবিধ উপকরণকে ব্যবহার করে মঞ্চ উপস্থাপনার গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। গ) বাস্তব উপস্থিতি নেই অথচ অভিনয়ের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে অদেখা চরিত্রগুলিকে মঞ্চে বাস্তবায়িত করেছেন। (ঘ) ছোট ছোট শরীরী ভঙ্গিমা কিংবা সামান্য কিছু প্রপস ব্যবহার করে মুহূর্ত সৃষ্টি করার উদ্ভাবনী প্রতিভার স্ফূরণ দেখাতে পেরেছেন। যেমন পাইপ খাওয়ার ভঙ্গি ইত্যাদি। 'বহুরূপী'র অভিনয় পত্রী প্রথম অভিনয়ের সময় প্রস্তুত করা হয়নি। প্রযোজনাটি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় তারই প্রচার করে একটি সুন্দর ফোল্ডার ছাপিয়ে নিজেকে পাপমুক্ত করেছিলেন দলেরই এক সদস্য দেবতোষ ঘোষ।

বাংলা নাট্য জগতের ইতিহাসে 'অপরাজিতা' এই স্মরণীয় অভিনয়েরও স্বাক্ষর। দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে তৃপ্তি মিত্র 'বহুরূপী', 'চেনামুখ', 'আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়'-এর হয়ে এ নাটকের অভিনয় করে গেছেন। সমগ্র প্রযোজনাটির মূল্যায়ন করেন সাংবাদিক নির্মল ধর '...একটি জীবন, অনেক স্মৃতি কিছু বেদনা, কিছু হাসি, জ্বালা-যন্ত্রণা। আজকের সমাজের নগ্ন কিছু বাস্তব কথা। পারিপার্শ্বিক অসুস্থতার মধ্যেও সুস্থভাবে বাঁচবার সৎ ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং সবশেষে আত্মবিসর্জন। আত্মবিসর্জনই বলা কেন আত্মবিক্রয় বলা যেতে পারে। ... বক্তব্যের সরলতায় নয়, তৃপ্তি মিত্রের অপূর্ব নির্দেশনায় শুধুমাত্র তিনি নিজেই অনর্গল প্রায় তিনঘন্টা কথা বলেছেন তাই নয়; মঞ্চের আসবাবপত্র, টেলিফোন, জানালা

প্রতিটি জড়বস্তুকেও তিনি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন নিজের মত, .... বহু চরিত্রের মুখোস পড়েছেন তিনি, একক অভিনয়ের নজির-এর আগে ভারতীয় নাট্যজগতে সম্ভবতঃ দেখা যায়নি, এই প্রথম। ... এপার বাংলা নাট্যপ্রযোজনায় বহুরূপীর নাম 'রক্তকরবী' 'ছেঁড়াতার' বা 'রাজা অয়দিপাউস' দিয়ে যে পর্যায়ে এসেছিল 'অপরাজিতা' সেই গতিপথকে অন্যখাতে নিয়ে গেছে।'[৩১] তৃপ্তি মিত্রের অপরাজিতা শুধু শিল্পীর বা 'বহুরূপী'রই সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি করল না, 'বহুরূপী'কে দিল আর্থিক নিরাপত্তা এবং বাংলা নাটকের মঞ্চে জনপ্রিয়তর প্রযোজনারূপে স্থায়ী আসন লাভ করল।

'অপরাজিতা'র চরম সাফল্য এবং 'চোপ আদালত চলছে'-এর অভিনবত্ব 'বহুরূপী'র সামনে যে প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো, সেই পর্যায়ে উন্নীত হতে পারল না তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত পরবর্তী নাটক 'টেরোড্যাকটিল' (১৯৭২)। ইন্দ্র উপাধ্যায়ের লেখা মৌলিক এই নাটকটি বিষয় ও ভাবনার দিক থেকেও সমকালের কাছে বিশেষ কোন প্রভাব রাখতে পারেনি। ১৯৭১-৭২-এ পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অস্থিরতা, বিভ্রান্তকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, সেই মুহূর্তে 'বহুরূপী'র মতো সচেতন নাট্যগোষ্ঠীর কাছ থেকে সমকালের দাবি থাকে কিছু পাওয়ার। নতুন কোনো দিশার সন্ধান প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক নয়। সেক্ষেত্রে এই নাটকে মানব সমস্যার বা সভ্যতার সমস্যার সমাধান দেখানো হয়েছে প্রেমের পথে। এই পথে নিশ্চয় সমস্যার নিষ্পত্তি ঘটতে পারে— তবে যতখানি গভীরতার সঙ্গে, সচেতন চিন্তার মধ্য দিয়ে তা বলা দরকার— সেই গভীরতা বা সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়নি এই নাটকটির মধ্যে। নাটকটির প্রযোজনায় খুশি হতে পারেননি দর্শকও। 'দেশ' পত্রিকায় লেখা হয় 'বহুরূপীর কাছ থেকে বড়ো এখন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, সূচীপত্রে 'রাজা অয়দিপাউস'ই বোধহয় শেষ। পরের নাটকগুলি, বলা যেতে পারে, বহুরূপীর 'মাইনর প্রোডাকশনস্'।[৩২] তবে একথাও তাঁরা স্বীকার করেছিলেন যে— এর মধ্যে তবু 'টেরোড্যাকটিল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ এতে বহুরূপী একালের ভণ্ডামিকে আঘাত করতে পেরেছে সাহসের সঙ্গে। এই নাট্য প্রযোজনাটির বৈশিষ্ট্য ছিল একটি দৃশ্যেই পুরো নাটকটি বিন্যস্ত। আঙ্গিকের দিক থেকে পরিচালক গিমিক তৈরি না করে একটা অভিনবত্বের আস্বাদ তৈরি করতে পেরেছেন। নাটকটির গতি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও বিশেষ সচেতন ছিলেন তৃপ্তি মিত্র। এ নাটকে তিনি অভিনয় করেননি তবে শম্ভু মিত্রর ম্যাজিসিয়ানের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয়ে প্রযোজনাটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এছাড়া বহুরূপীর দলগত অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে তার মূল কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে কুশীলবদের এবং অবশ্যই পরিচালকের। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন— ম্যাজিসিয়ান শম্ভু মিত্র, বিনোদ-উদয় সিংহ,

মীনা- শাঁওলী মিত্র, বুজীবাবু- কালীপ্রসাদ ঘোষ, চঞ্চল সরকার-দেবতোষ ঘোষ, সাধন বোস- শান্তি দাস, দামোদর-তারাপদ মুখোপাধ্যায়, সম্প্রা-শুক্লা মুখার্জী, লালবিহারী কর- সুনীল সরকার, ছেলেটা-শঙ্কর লাহা। এ নাটকের মঞ্চ, আলো ও আবহ সংগীত প্রস্তুত করেছিলেন যাঁরা, তাঁরাও খুব পুরোনো সদস্য নন— এঁরা হলেন যথাক্রমে দীপেন সেন, দিলীপ ঘোষ ও অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। 'টেরোড্যাকটিল' নাটকের স্থায়িত্বও অল্পদিনের— মাত্র ছ মাসের। প্রথম অভিনয় হয় ১০ অক্টোবর ১৯৭২ আর শেষ অভিনয়— ১৪ এপ্রিল ১৯৭৩; পূর্ণাঙ্গ নাটক নয় বলেই টেরোড্যাকটিলের সঙ্গে 'বিভাব' অভিনীত হত। স্পষ্ট হয়ে যায় যে কেবলমাত্র প্রযোজনা করার তাগিদে এই নাটকগুলি মঞ্চস্থ হচ্ছে— প্রযোজনার মান সম্পর্কে নানান মতভেদ থাকলেও প্রযোজনা চালিয়ে যাওয়াটাই তখন সংগঠনের কাছে মস্ত বড় দায়িত্ব বলেই গণ্য হয়। সেই কাজটিই চলতি দশক জুড়ে করে চললেন তৃপ্তি মিত্র। 'টেরোড্যাকটিল' (প্রথম অভিনয় ১০.১০.১৯৭২)— মঞ্চস্থ হবার কয়েক মাসের মধ্যে আবারও নির্দেশনায় ব্যস্ত হলেন তৃপ্তি মিত্র। ১৯৭২-এর ডিসেম্বরে মঞ্চস্থ হয় 'গণ্ডার'। বিদেশি নাটকের সরাসরি অনুবাদের মঞ্চায়ন ঘটল। ইউজিন ইওনেস্কোর 'রাইনোসোরস' নাটকের শাঁওলী মিত্র কৃত অনুবাদ 'গণ্ডার' চিহ্নিত হয়— 'নবরূপে বহুরূপী : সাহসী উপহার— 'গণ্ডার' হিসেবে। আনন্দবাজার পত্রিকায় সন্তোষকুমার ঘোষ এই শিরোনামে 'গণ্ডার'-এর সমালোচনা করেন। নাটমঞ্চের সাহায্যার্থে আয়োজিত নাট্যোৎসবেও 'গণ্ডার'-এর অভিনয় হয়। এই নাট্যোৎসবেই অভিনীত 'তুঘলক'-এ নামভূমিকায় শম্ভু মিত্রের অভিনয় আবারও এক নজির সৃষ্টি করে। পাশাপাশি 'গণ্ডার'-এ অভিনয় করলেন যাঁরা তাঁরা অনেকেই 'বহুরূপী'র নবীন প্রজন্ম। মুখ্য ভূমিকায় শাঁওলী মিত্র। এ নাটকে শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র অভিনয় করেননি। তবু অভিনয় এবং বিষয়বস্তুর সমকালীনতার গুণে 'গণ্ডার' বিশেষ প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিল। 'টেরোড্যাকটিল'-এ যে অপ্রাপ্তি এই প্রযোজনাকে 'মাইনর প্রোডাকশন' রূপে চিহ্নিত করেছিল— 'গণ্ডার' প্রযোজনায় সেই প্রাপ্তি এই প্রযোজনাকে স্বীকার করল— 'সার্থক প্রয়াস' হিসেবে (যুগান্তর শুক্রবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩)। নির্দেশক হিসেবে তৃপ্তি মিত্রের বিশেষ খ্যাতি তাঁর পরিচালক সত্তাকে আরও সমৃদ্ধ করে। আনন্দবাজার পত্রিকা লেখে 'শিল্প-পরিবেশনের রীতি যে আলাদা, সেই নান্দনিক তত্ত্বটি, দেখা গেল, নির্দেশিকা, শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের সম্পূর্ণ আয়ত্ত আর অধিগত। এতদিন প্রধানত তাঁকে দেখেছি পাদপ্রদীপের মেধাবী আলোকে। এবার প্রমাণ পাওয়া গেল অন্তরালে নেপথ্যবিধানেও তিনি একইরকম অধিনেত্রীস্বরূপা।'[৩৩] তৃপ্তি মিত্রের প্রয়োগ পরিকল্পনা, ছিল অভিনব। শেষ দৃশ্যে নায়কের স্থিত ভঙ্গির সঙ্গে খ্রিষ্টের ছায়ামূর্তি মিলিয়ে দেবার বিষয়টি ছিল সুপরিকল্পিত। মঞ্চসজ্জাও (অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিল প্রশংসার। চারটি

দৃশ্যে কাহিনি বিবৃত এ নাটকের। আলোক ভাবনায় তাপস সেন তাঁর স্বভাবজ কৃতিত্ব বজায় রেখেছেন। সর্বোপরি তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায়— বিষয়, অভিনয়, মঞ্চ, আলো এবং আবহের সুসংঘবদ্ধতায় প্রযোজনাটি তৃপ্তি মিত্রকে বিশেষ জায়গা করে দেয়।- তবে সমালোচনাও যে হয়নি তা নয়— 'Frontier' 16 Dec 1972-এ লেখা হয়— 'Tripti Mitra's direction of the play does not either pose this dilemma or present the contrast between tragedy and comedy inherent in Ionesco's fable.'[৩৪] তবে 'গণ্ডার' যে জায়গাটা তৈরি করে দেয় তা সময়োচিত এবং দেশকালের সমাজজীবনের ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে বলেই। লক্ষ করার বিষয় যে 'বহুরূপী'র ২৫ বছর জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে অভিনীত নাটকগুলির বেশিরভাগই পুরোনো। এর মধ্যে তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত কোনও নাটক স্থান পায়নি। ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২৮ এপ্রিল-১ মে অ্যাকাডেমি আয়োজিত নাট্যোৎসবের নাটকের তালিকায় ছিল— 'দশচক্র', 'বাকি ইতিহাস', 'চার অধ্যায়' ও 'রক্তকরবী'। কিন্তু এই বছরেই ২৩-২৬ জুলাই উইলস কোম্পানির সৌজন্যে ও অরিজিৎ গুহ-র তত্ত্বাবধানে যে চারটি নাটক অভিনীত হয় তার মধ্যে 'পুতুল খেলা' ও 'রক্তকরবী'র সঙ্গে— তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত 'গণ্ডার' ও 'ডাকঘর'-এর অভিনয় হয়— এটিও ২৫ বছরের আরও একটি নাট্যোৎসব।

১৯৭৩ সাল থেকে 'ডাকঘর' নবনির্মিতরূপে অভিনীত হতে থাকে। অমলের ভূমিকায় শাঁওলী মিত্রের পরিবর্তে অভিনয় করে সদ্য আগত চৈতালি ঘোষাল পরবর্তীকালে যিনি চৈতী ঘোষাল নামে পরিচিত হন। নবপর্যায়ে 'ডাকঘর' নির্মাণের ক্ষেত্রে তৃপ্তি মিত্র বাধ্য হন অনেকগুলি চরিত্রের পরিবর্তন করতে। শাঁওলী মিত্রের অমল যে প্রশংসা অর্জন করেছিল চৈতী ঘোষাল সেই মান ধরে রাখতে পেরেছিল কিনা— তা বিতর্কের বিষয়, কিন্তু নির্বাচনের জন্য তৃপ্তি মিত্র প্রশংসিত হয়েছিলেন— 'সংলাপপ্রধান নাটকে অনুভূতিদীপ্ত অভিনয় ও সঠিক উচ্চারণই একমাত্র ভরসাস্থল। অমলের চরিত্রে  শিশুশিল্পী চৈতালি ঘোষাল কোন অভাবই রাখেনি। অভিনয় জানা নেই বলেই বোধহয় তার এত স্বাভাবিক অভিনয়। তার কথা কীরকমভাবে বললে দর্শকের মনে আঘাত করতে পারে, সে কৌশল শিল্পী শিখে নেয়নি বলেই হয়ত তার কথা, অমলের কথা বুকে বেজেছে। পরিচালিকার সব চাইতে বড় কৃতিত্ব বোধহয় অমল চরিত্রের ওই শিল্পী খুঁজে নেওয়া এবং শিল্পীর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ও ভঙ্গির মধ্য দিয়ে তাকে অমল করে তোলা।'[৩৫] 'ডাকঘর'-এর স্বল্প দৈর্ঘ্যের কারণে এই পাঠকের সঙ্গে বাড়তি পাওনা ছিল 'বিদায় অভিশাপ'।

নবপর্যায়ের 'ডাকঘর'— প্রথম প্রযোজনার সমমানে পৌঁছতে পারেনি। অনেকগুলি চরিত্রায়ণের

পরিবর্তন ঘটেছিল তার মধ্যে মুখ্য চরিত্র অমলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন চৈতালি ঘোষাল (চৈতী ঘোষাল), মাধব দত্তের চরিত্রে গঙ্গাপদ বসুর পরিবর্তে তারাপদ মুখোপাধ্যায়। এই পর্যায়ের 'ডাকঘর'-এ ঠাকুর্দা ও রাজকবিরাজের মধ্যে একটা অন্তবর্তী পরিবর্তন ঘটেছিল যথাক্রমে কুমার রায় ও শম্ভু মিত্রের মধ্যে। তার কারণ যাইহোক না কেন অভিনয়ে দুজনেই কতটা প্রাণস্পর্শী ছিলেন বিশেষ করে ঠাকুর্দার ভূমিকায় শম্ভু মিত্র তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে কলকাতা দূরদর্শনের সংরক্ষিত 'ডাকঘর' প্রযোজনার রেকর্ডিং-এ।

১৯৭৩-এ নবপর্যায়ে 'ডাকঘর' প্রযোজনার কাছাকাছি সময়ে পর পর দুটি রবীন্দ্রনাটক পরিচালনা করলেন তৃপ্তি মিত্র। দুটিই তাঁর নিজের দেওয়া নাট্যরূপ। 'দুরাশা'- রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের একাঙ্ক নাট্যরূপে (১৬ ডিসে, ১৯৭৩) এবং উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে'-এর পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপায়ণ (৯ জুন, ১৯৭৪)। তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' (নাট্যরূপ তৃপ্তি মিত্র) উপন্যাসের 'বহুরূপী'র কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করবেন এইরকম একটা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল— যখন 'বহুরূপী' ঘোষণা করেছিল তারা 'ঘরে-বাইরে'— অভিনয় করবে। কিন্তু সেই ধারণা যখন বাস্তবের সঙ্গে মিলল না স্বভাবতই দর্শক চিত্তে আঘাত লাগল। তৃপ্তি মিত্র নিজেই একজন নবীন নির্দেশক— তিনিও নির্বাচন করলেন নবীন শিল্পীদের। শাঁওলী মিত্র (বিমলা) কিম্বা কালীপ্রসাদ ঘোষ (সন্দীপ)-এর কথা বাদ রাখলে বাকি নবীন শিল্পীদের নিয়ে 'ঘরে বাইরে'র মতো প্রযোজনার পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে তৃপ্তি মিত্রের সাহসী মনের পরিচায়ক। এই সাহসিকতার যথার্থ মূল্য তিনি আদায় করে নিতে পেরেছিলেন দর্শক সাধারণের কাছ থেকে। নাট্য সমালোচনায় লেখা হয়— ''ঘরে-বাইরে' নাটকের পরিচালিকা তৃপ্তি মিত্র তথা বহুরূপীর এখানেই সার্থকতা। 'ঘরে-বাইরে'র যুগ আমরা অনেকদিন ডিঙিয়ে এসেছি— কিন্তু সেই যুগকে আজকের সর্বাধুনিক প্রকাশভঙ্গীতে অবিকৃতভাবে তুলে ধরে বহুরূপী শিল্পসৃষ্টি পথে যে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। নাট্যরূপে শ্রীমতী মিত্র রবীন্দ্র সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ দিয়েছেন। নাটকের ধর্মানুযায়ী বহির্মুখী নাট্য-সংঘাত এড়িয়ে গিয়ে অন্তর্মুখী বিশ্লেষণ ধর্মীতাতেই শ্রীমতী মিত্রের মুন্সীয়ানা ফুটে উঠেছে।''[৩৬] এর আগে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাটকগুলি (চার অধ্যায় ১৯৫১, রক্তকরবী ১৯৫৪, রাজা ১৯৬৪) যে মান তৈরি করে দিয়েছিল সেই মানকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন তৃপ্তি মিত্র তবে 'রক্তকরবী'র সমতুল আর কোনও রবীন্দ্রনাটক বহুরূপীতে অভিনীত হয়নি। তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনার শুরু রবীন্দ্রনাটক দিয়ে (ডাকঘর, ১৯৫৭) তাই আবারও রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ফিরে আসা নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক।

সুতরাং— (১৯৭৫, ডিসেম্বর)- স্টাইনবেকের ‘Of Mice and Men’ উপন্যাস থেকে তৃপ্তি মিত্র নিজে রূপান্তরিত করেন। দুটি রূপান্তর ঘটালেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ছিল পুরুষ আর নাটকে তা পরিবর্তিত হয়ে হল বাঙালি মেয়ে সুব্রতা, উপন্যাস থেকে নাট্যরূপায়ণের অনেক ঘটনা আছে কিন্তু একটি প্রধান চরিত্রের রূপান্তর পুরুষ থেকে নারীর আদলে যার মধ্য দিয়ে তৃপ্তি মিত্রের দৃপ্ত নারীচরিত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়ে। এর আগে তিনি যে চরিত্রগুলিতে অভিনয় করবেন, কিম্বা তাঁর নির্দেশিত নাটকের নারী চরিত্রগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় তারা সকলে পুরুষদের দ্বারা চালিত কিন্তু তাদের মধ্যে একটা সুদৃঢ় মনোবল রয়েছে— আত্মশক্তি রয়েছে যার সাহায্যে তারা পরিস্থিতিকে নিজেদের সপক্ষে আনতে পারে। তৃপ্তি মিত্র খুব সোচ্চারে নারীবাদের প্রচার না করে ও নারীর দৃপ্ততায়, আত্মবিশ্বস্ততায় বিশ্বাসী। এছাড়া এ নাটকের মধ্যে সমকালীন পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছেন। ‘সুতরাং’-এ তিনি নিজে অভিনয় করেছিলেন সুব্রতার ভূমিকায়। মঞ্চ নির্মাণের ভার অর্পিত হয়েছিল কুমার রায়ের ওপর। দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সদস্য নিজ দায়িত্বে মঞ্চ প্রস্তুত করলেন এবং তাপস সেন আলোর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তৃপ্তি মিত্রের কুশীলব তালিকায় প্রচুর নবীন শিল্পীদের নাম লক্ষ্য করা যাচ্ছে— যেমন অরিজিৎ গুহ, সমীর চ্যাটার্জী, শান্তি দাস, অসিত দাশগুপ্ত প্রমুখ। তবে এ নাটকে কুমার রায়, দেবতোষ ঘোষ-এর মতো অভিনেতারাও অভিনয় করেছিলেন। গীতা চক্রবর্তী (গোপালের মা/কুন্তলা/ চামেলী), দেবতোষ ঘোষ (মন্টু/ফটিক/দিনু), কুমার রায় (লক্ষ্মীবাবু/ অজিত/নারায়ণ)— তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেন। এ নাটকের স্থায়িত্ব অন্যান্য নাটকগুলির তুলনায় দীর্ঘ— প্রায় এক বছর ধরে অভিনয় হয়েছিল— (১৯৭৫, ডিসেম্বর-১৯৭৬ অক্টোবর)।

বাদল সরকারের ‘বাঘ’ (১৯৭৫, নভেম্বর-১৯৭৬ মার্চ), ‘যদি আর একবার’ (১৯৭৬ ফেব্রুয়ারি-১৯৭৯ নভেম্বর), মনোজ মিত্রের একাঙ্ক নাটক ‘পাখি’ (১৯৭৭ মার্চ-১৯৭৯ জুন), তৃপ্তি মিত্র রচিত ‘বলি’ তৃপ্তি মিত্রের তত্ত্বাবধানে একটিমাত্র অভিনয় (১৮.১২.১৯৭৭)। এ নাটকগুলি দীর্ঘসময় ধরে তাদের অভিনয় ক্রম সচল রাখতে পারেনি তার কারণ স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে দর্শকের নাট্যাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি— বিষয় ও উপস্থাপনা— উভয় দিক থেকেই কোথায় যেন দর্শকের কাছে পৌঁছতে পারছিল না এই পর্বের নাটকগুলি। শুধু দর্শক কেন— ‘বহুরূপী’র সদস্যের মধ্যেও অতৃপ্তির প্রকাশ ঘটেছে পরবর্তী সময়ে। তৎকালীন সম্পাদক কালীপ্রসাদ ঘোষ স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন— ‘ঐ রকম একটার পর একটা নাটক করতে যাওয়াতে তার quality সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট সচেতন হতে পারিনি।...আমরা একটা নাটক করেছিলাম ‘সুতরাং’, তৃপ্তি মিত্রের লেখা।

এমনি যদি আমরা conscious থাকতাম, ও নাটক আমরা কখনও করতাম না। বহুরূপী করবে এরকম নাটক? আমরা করতাম না। তখন মনে হ'ত activity থাক। যদি সচলও থাকে গ্রুপটা, তাহলে একদিন এটা কেটে যাবে। আমরা নতুন একটা দম পেয়ে যাব।'[৩৭] দলটাকে সচল রাখাটাই ছিল মূল লক্ষ্য— সেই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে 'বহুরূপী' কাজ করে গেছে কিন্তু এড়াতে পারেনি নাট্য সমালোচকদের বক্রোক্তি— আনন্দবাজার পত্রিকায় 'পাখি' নাটকটি সম্পর্কে এই মন্তব্য করা হয়— 'বহুরূপীর মতো নাট্যগোষ্ঠীর কাছ থেকে 'পাখি'র পরিবেশনা কি একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল?'[৩৮]

'পাখি' নাটক দেখতে এসেছিলেন শম্ভু মিত্র— স্বভাবতই তাঁর মতামতের প্রতি একটা বাড়তি আগ্রহ তৈরি হবে।— কিন্তু নাটক সম্পর্কে তাঁর কোনও অভিমত উল্লেখ করেননি শাঁওলী মিত্র। তবে কুশীলবদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যে ব্যক্ত করেছিলেন সেখানে তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনা সম্পর্কে কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নি। শাঁওলী মিত্র লিখছেন— '... যেদিন শম্ভু মিত্র দেখলেন সেদিন আমরা যাকে বলে বেশ সিঁটিয়ে ছিলুম। তিনি ভেতরে এসেই বললেন 'খুব ফ্রেশ লেগেছে তোদের সবাইকে। তোরা কি নিজেরা কিছু কিছু তৈরি করেছিস!' ঠিক বুঝতে পেরেছেন! বলেছেন, 'বেশ ভালো করেছিস!' আমরা তো আহ্লাদে আটখানা।''[৩৯]

লক্ষণীয় যে তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত নাটক দেখে সে নাটকের দোষগুণ আলোচনা না করে তিনি শুধু নবীন প্রজন্মের ফ্রেশনেস-এর দিকে দৃষ্টি দিলেন। এ কি সচেতনভাবে প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলার ভঙ্গি! তবে শাঁওলী মিত্রের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে যে কোন এক সময় শম্ভু মিত্র 'কিংবদন্তী', 'ডাকঘর', 'যদি আর একবার'— এই তিনটি প্রযোজনার উল্লেখ করে বলেছিলেন 'তৃপ্তির নির্দেশনায় অনেক কাব্য থাকে।'[৪০]

'ডাকঘর' ও 'কিংবদন্তী' পূর্বেই আলোচিত। তবে এই পর্বের অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বের প্রযোজনাগুলির মধ্যে 'অপরাজিতা' এবং 'ঘরে বাইরে' বাদ রাখলে-এ পর্বে একমাত্র 'যদি আর একবার' সফল প্রযোজনা হিসাবে স্বীকৃত। সফল অর্থে এই যে এক অভিনব ভাবনার অভিনব আস্বাদের মাধ্যমে দর্শককে আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন পরিচালক। এক্ষেত্রে বিশেষ প্রশংসিত হয় মঞ্চ নির্দেশনা ও কালীপ্রসাদ ঘোষের আলোক পরিকল্পনা। তার সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের সংগীত প্রয়োগ এবং সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃত্যভাবনা। তবে প্রশ্ন তুলেছিল সংবাদ মাধ্যমে—'বহুরূপী তার সাতাশ বছরের জীবনে সম্ভবতঃ এই প্রথম বাণিজ্যের দিকে তাকালেন। একে কি 'আপোষ' বলা যেতে পারে?'[৪১] একথা সত্যি যে তৃপ্তি মিত্র

বেশ কিছুদিন বাণিজ্যিক থিয়েটারের মঞ্চে কাজ করেছিলেন, থিয়েটারের বাণিজ্যিক সফলতা কিভাবে আসে, কিভাবে দর্শকদের মনোরঞ্জনের মাধ্যম করে তোলা যায় নাটককে এ তাঁর অজানা ছিল না, কিন্তু 'যদি আর একবার' কে নিতান্ত বাণিজ্যিক অপোষ বলাটা বোধহয় ঠিক নয়। প্রযোজনার অসফলতার পর্বে তৃপ্তি মিত্র পরীক্ষায় নেমে ছিলেন 'যদি আর একবার'-এ। তবে পরিচালনার ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্রের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এই কালপর্বে তিনি একটার পর একটা প্রযোজনার মাধ্যমে 'বহুরূপী'কে সচল ও সক্রিয় রেখেছিলেন এইটাই তাঁর কাছে থেকে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

'বহুরূপী'তে তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত নাটকগুলি যেভাবে দর্শক মনোগ্রাহী হতে না পারার কতকগুলি কারণ নির্দেশ করা যায়—

১. যে সময়ে তৃপ্তি মিত্র নির্দেশনার ক্ষেত্রে এলেন মূলত ২য় পর্যায়ে সে সময় 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাণকর্তা শম্ভু মিত্র নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির কাজে ব্যস্ততার কারণে সম্পূর্ণ সহযোগী হয়ে উঠতে পারেননি।

২. শম্ভু মিত্রের অনুপস্থিতি, ব্যস্ততা, বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করার প্রয়াস 'বহুরূপী' গোষ্ঠীর মনোবলকে খানিকটা দুর্বল করে দিয়েছিল তার প্রভাব পড়েছিল সমকালীন প্রযোজনাগুলিতে।

৩. তৃপ্তি মিত্র অভিনেত্রী হিসেবে যতটা দক্ষ— নির্দেশনার ক্ষেত্রে তাঁর সেই প্রতিভার স্ফূরণ ছিল না উপরন্তু খানিকটা বাধ্য হয়েই তাঁকে এই কাজটা করতে হয়েছিল দলগত স্বার্থে।

৪. তৃপ্তি মিত্র নির্বাচিত নাটকগুলির বেশিরভাগই স্বল্পদৈর্ঘ্যের একাঙ্ক নাটক, যার সঙ্গে আরও কোনও ছোট নাটক বা অনুষ্ঠান সংযুক্ত করে দেওয়া হত তার ফলে গভীর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া তৈরি হত না দর্শকমহলে।

৫. শম্ভু মিত্রের প্রতিভা ও দক্ষতার সঙ্গে তুলনা তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছিল। হয়ত 'বহুরূপী' ভিন্ন অন্যত্র তিনি কাজ শুরু করলে এই প্রতিতুলনার দায়ভার তাঁকে বহন করতে হত না।

৬. যদি শম্ভু মিত্র নির্দেশিত নাটকগুলির পাশাপাশি তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশিত নাটকগুলি রাখা যায়, তাহলে বোঝা যায় তৃপ্তি মিত্র বড়ো প্রেক্ষাপটে কাজ করতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। যেমন—

| **শম্ভু মিত্র নির্দেশিত নাটক** | **তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত নাটক** |
|---|---|
| **পঞ্চাশ ও ষাটের দশক** | **সত্তরের দশক** |
| ছেঁড়াতার (১৯৫০) | কিংবদন্তী (১৯৭০) |
| চার অধ্যায় (১৯৫১) | অপরাজিতা (১৯৭১) |
| দশচক্র (১৯৫২) | টেরোড্যাকটিল (১৯৭২) |
| স্বপ্ন, এই তো দুনিয়া, ধর্মঘট (১৯৫৩) | (স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক) |
| রক্তকরবী (১৯৫৪) | গণ্ডার (১৯৭২) |
| সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে (১৯৫৪) | দুরাশা (১৯৭৩) |
| পুতুলখেলা (১৯৫৮) | (একাঙ্ক) |
| কাঞ্চন রঙ্গ (১৯৬১) | ঘরে-বাইরে (১৯৭৫) |
| বিসর্জন (১৯৬১) | সুতরাং (১৯৭৫) |
| রাজা, রাজা অয়দিপাউস (১৯৬৪) | বাঘ (১৯৭৫) একাঙ্ক |
| বাকি ইতিহাস (১৯৬৭) | যদি আর একবার (১৯৭৬) |
| বর্বর বাঁশি (১৯৬৯) | পাখি (১৯৭৭) (স্বল্পদৈর্ঘ্য) |
| পাগলা ঘোড়া, চোপ আদালত চল্‌ছে (১৯৭১) | |

এই তালিকা থেকে স্পষ্ট যে শম্ভু মিত্র যত বড়ো ক্যানভ্যাসে নাটককে ধরেছেন সেখানে তৃপ্তি মিত্র নাটককে ধরতে পারেননি বা চাননি। স্বপ্ন, এই তো দুনিয়া, ধর্মঘট— ১৯৫৩ সালে এই তিনটি প্রযোজনার ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে শম্ভু মিত্র ঝাঁপিয়ে পড়েছেন 'রক্তকরবী'র মতো প্রযোজনায়।

৭. দর্শক মনও তৈরি হয়ে গিয়েছিল 'বহুরূপী'র নাটকের মান সম্পর্কে। ফলত বৃহৎ মাপের প্রযোজনার উচ্চতায় পৌঁছতে পারেননি তৃপ্তি মিত্র। ব্যতিক্রম 'অপরাজিতা' ও 'যদি আর একবার'। 'অপরাজিতা'- সফল হবার অন্যতম কারণ তাঁর নির্দেশক সত্তাকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল তাঁর অভিনেত্রীসত্তা।

৮. চার অধ্যায়, দশচক্র, রক্তকরবী, পুতুলখেলা, রাজা, রাজা অয়দিপাউস, পাগলা ঘোড়া— দেখার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দর্শকের খানিকটা অনীহা বা সমালোচনা জন্মেছিল— 'কিংবদন্তী', 'সুতরাং', 'পাখি'র— মতো প্রযোজনা দেখে— এমন কি তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত 'অপরাজিতা'ও তাঁর অন্যান্য নাটকগুলির প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছিল।

৯. শম্ভু মিত্র বৃহৎ প্রেক্ষাপটে, তাঁর গভীর মননের সাহায্যে যে কাজগুলি করেছিলেন তাঁর মধ্যে প্রখর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছিল। তৃপ্তি মিত্র বাস্তব জীবনে যেমন সহজ সরল অনাড়ম্বর অনুভূতি

ও আবেগপ্রবণ তাঁর প্রযোজনাগুলিতেও সেই মানসিক চিত্রটা ধরা পড়েছে।

১০. শম্ভু মিত্র কাজ করেছিলেন— যে সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে তাদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন তৃপ্তি মিত্র এবং বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রী যেমন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও গঙ্গাপদ বসু, কুমার রায়, অমর গাঙ্গুলী, শোভেন মজুমদার, আরতি মৈত্র, দেবতোষ ঘোষের মতো অভিনেতারা। কিন্তু তৃপ্তি মিত্রকে কাজ করতে হয়েছে একেবারেই নবীন প্রজন্মের সঙ্গে তাঁকে গড়ে নিতে হয়েছে। এছাড়াও সমকালের আরও অনেক দাবি থেকে যায় যা পাওয়া গেল না নির্দেশক তৃপ্তি মিত্রের মধ্যে। ‘দুরাশা’ (১৯৭৩, ডিসেম্বর)-র ক্ষেত্রে ‘অপরাজিতা’র সাফল্য হয়তো তৃপ্তি মিত্রকে প্রণোদিত করেছিল আবারও একক অভিনয়ের প্রতি। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি নিজের সুনামের প্রতি যে আস্থা তা পূর্ণ করতে পারেননি বরং ‘দুরাশা’ কিছুটা বদনাম কুড়িয়েছিল। মাত্র কয়েকমাসের জন্য এই নাটকটির অভিনয় হয়েছিল— ১৯৭৩-র ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৪-এর মে পর্যন্ত। কিন্তু শ্রুতি নাটক হিসাবে এ নাট্যরূপের যে সম্ভাবনা ছিল, মঞ্চাভিনয়ের পক্ষে তা আদৌ যথেষ্ট ছিলনা। স্বভাবতই ‘অপরাজিতা’র সঙ্গে ‘দুরাশা’র একটা প্রতিতুলনা এসে পড়েছিল।

## বহুরূপীর বাইরে তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনা

| নাটক/নাটককার | সংস্থা | অভিনয় |
|---|---|---|
| ➢ গুড়িয়া ঘর/হেনরিক ইবসেন রূপান্তর ঊষা গাঙ্গুলি | রঙ্গকর্মী | ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১ |
| ➢ সাঁঝ ঢলে/তৃপ্তি মিত্র রচিত ‘প্রহর শেষে’-র অনুবাদ : প্রতিভা অগ্রবাল | অনামিকা | ৫ অক্টোবর, ১৯৮৫ |
| ➢ ডাকঘর/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী কর্মী-অধ্যাপকদের পক্ষ থেকে | শান্তিনিকেতন | জানুয়ারি, ১৯৮২ |
| ➢ রক্তকরবী/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়, | ১৯৮৪ |
| ➢ হাজার চুরাশির মা/ রচনা : মহাশ্বেতা দেবী নাট্যরূপ : তৃপ্তি মিত্র | আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয় সহযোগী : নান্দীকার ও শূদ্রক | ১৯৮৪, ৩০ জুন |

| নাটক/নাটককার | সংস্থা | অভিনয় |
|---|---|---|
| ➢ দুরাশা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয় | ১০ মে, ১৯৮৬ |
| ➢ সরীসৃপ (একাঙ্ক)/ বিধায়ক ভট্টাচার্য | আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয় | ২৬ জানু, ১৯৮৭ |
| ➢ রাহুগ্রাস (একাঙ্ক)/ভবেশ সাইকিয়া নাট্যরূপ : তৃপ্তি মিত্র | ,, | ,, |

১৯৮০ সালে 'বহুরূপী'র সঙ্গে দীর্ঘ বত্রিশ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন হয় তৃপ্তি মিত্রের। 'বহুরূপী'তে থাকতে থাকতেই তাঁকে বাইরে নাটকে অভিনয় করতে হয়েছে আর্থিক কারণেই। পেশাদারী মঞ্চে এবং 'বহুরূপী'তে একই সঙ্গে অভিনয় চালিয়ে যেতে হয়েছে— একই দিনে প্রায় তিনটি অভিনয়-তাঁর শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার পরিচয় দেয়। ১৯৫৯ থেকে তিনি পেশাদারী মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত— 'সেতু' (১৯৫৯), 'হাসি' (১৯৬৬), 'দ্বিধা' (১৯৬৮), 'বিরাজ বৌ' (১৯৭০), 'সওদাগর' (১৯৭১), 'থানা থেকে আসছি' (১৯৭৯), 'গৃহলক্ষ্মী', 'গৃহিণী সচিব সখা', 'বিপ্রদাস' ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেন। মানসিকভাবে তিনি যেহেতু 'গ্রুপ থিয়েটার'-এর কর্মী তাই শুধু অভিনয় করে অর্থোপার্জনের জন্যই পেশাদারী মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হন।

বহুরূপীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর প্রথম যে নাট্যদলের নির্দেশক হিসেবে কাজ করলেন তাঁদের দলের নাম 'রঙ্গকর্মী' এবং তাঁরা হিন্দিভাষায় থিয়েটার করেন। এই নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বময়ী কর্ত্রী ঊষা গাঙ্গুলী গত ত্রিশ বছর ধরে কলকাতা তথা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন একজন সফল সংগঠক ও অভিনেত্রী হিসেবে শুধু নয় একজন সার্থক নির্দেশক হিসেবেও— সেই ঊষা গাঙ্গুলি তাঁর নাট্যদলের নির্দেশনার জন্য আহ্বান জানালেন তৃপ্তি মিত্রকে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিহাসে জায়গা করে নিল। তিনি তৃপ্তি মিত্রকে এ দায়িত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা সম্মান জ্ঞাপন যেমন করলেন তেমনি তৃপ্তি মিত্রকে এ নাটক পরিচালনার মাধ্যমে জাতীয় স্তরের নাট্য পরিচালক হিসেবে তুলে ধরলেন। যেহেতু এ নাটকটি ছিল হিন্দি ভাষার নাটক। অবশ্য সেই সময় 'বহুরূপী' ভিন্ন প্রদেশে এবং বিদেশেও নাটকাভিনয় করেছে।

রঙ্গকর্মীর 'গুড়িয়া ঘর'— ইবসেন-এর 'A Doll's House'-এর হিন্দি অনুবাদ। এর আগে 'বহুরূপী' এ নাটকের শম্ভু মিত্র কৃত বাংলা রূপান্তর 'পুতুলখেলা' দীর্ঘসময় ধরে অভিনয় করেছে এবং মুখ্য ভূমিকাভিনেত্রী ছিলেন তৃপ্তি মিত্র। এ নাটকটি পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড়ো

কৃতিত্ব তিনি তাঁর পূর্বাভ্যাস ও পূর্বস্মৃতিকে সরিয়ে রেখে একটা নতুন মাত্রা দিতে চেয়েছেন নাট্য উপস্থাপনায়। দর্শক শুধু নয়, সমালোচকেরাও স্বীকার করেছিলেন— '...তৃপ্তি মিত্র নির্দেশনায় অনেক কিছুই নতুন আমেজ আনতে পেরেছেন— যে জন্য কখনও 'গুড়িয়া ঘর'কে 'পুতুলখেলা'র কার্বনকপি বলা যাবে না।'[৪২] কার্বন কপি বলতে না পারার অনেকগুলি কারণ ছিল—

| | |
|---|---|
| ১. শম্ভু মিত্র নির্দেশিত পুতুলখেলা (১৯৫৮) বাংলা, মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র (বুলু) | ১. তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত 'গুড়িয়া ঘর' (১৯৮১) হিন্দি, মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী উষা গাঙ্গুলি (মুনিয়া) |
| ২. খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ পরিকল্পনায় হলুদ চাদর, দরজার হলুদ পর্দা এবং জানলা দরজা ডিজাইনে আর্চের আদল— যা নারীর অধীনতার প্রকাশ। | ২. মঞ্চ পরিকল্পনায় ভিন্নতর ভাবনা খালেদ চৌধুরীর। মুনিয়া-মূল চরিত্রটিকে পুরুষের নিয়ন্ত্রিত দেখাতে খাঁচায় বন্দী দেখানোর জন্য মঞ্চকে ব্যবহার করেছেন। |
| ৩. বুলু কবিতা বলে, ঝুলন কবিতা আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে নাটকীয় ক্ল্যাইম্যাক্স তৈরি হয়। যেহেতু তৃপ্তি মিত্র ভালো আবৃত্তি জানতেন। | ৩. মুনিয়ার নাচের মধ্য দিয়ে ক্লাইম্যাক্স তৈরি হয়। যেহেতু উষা গাঙ্গুলি নৃত্য শিল্পী। |
| ৪. পরিচালক পুরুষ | ৪. পরিচালক নারী |

অভিনত্ব বা আলাদা করার ক্ষেত্রে শুধু পরিচালনা নয়— বুলুর প্রভাবকে সরিয়ে ঊষা গাঙ্গুলিকে মুনিয়া চরিত্রে সহজ স্বাভাবিক বাস্তব রূপায়ণে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। খালেদ চৌধুরী মঞ্চ পরিকল্পনায় মুনিয়াকে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজের খাঁচায় বন্দি দেখানোর জন্য মঞ্চকে ব্যবহার করলেন তেমনভাবে। 'পুতুলখেলা'য় শম্ভু মিত্রের নিয়ন্ত্রণ থাকত সমগ্র নাটকটি ঘিরে— আর তৃপ্তি মিত্র তাঁর চরিত্রটিকে ঘিরে গড়ে তুলতেন নিজস্ব জগত এবং শেষ দৃশ্যে ঘটত এক নিস্পৃহ কঠিন প্রতিরোধ।— ইবসেনের সময় থেকে (১৮২৮) যেমন ১৯৫৮-র সময়কাল বদলে গেছে তেমনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৮০ সময়কালও বদলে গেছে, অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে গেছে মেয়েদের জীবনে তাদের মনোজগতেও। তাই এক নারীর নির্দেশনায় এক নারী যখন এইরকম একটি প্রতিস্পর্ধী নারীর রূপায়ণ ঘটায় তখন তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে এক অন্য অন্তর্লোক। একটি চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়।

'বহুরূপী'র পুতুলখেলা

নাট্যকার ইবসেন পুরুষ → অনুবাদ শম্ভু মিত্র পুরুষ → নির্দেশনা শম্ভু মিত্র পুরুষ —— বহিঃপ্রকাশ

মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী নারীর সামগ্রিক জীবনাচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এই পুরুষ লেখক, নির্দেশক এবং যিনি আবার তাঁর স্বামীও।

একজন পুরুষের চোখ দিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরো নাটক অভিনীত

অপরদিকে

‘রঙ্গকর্মী’র গুড়িয়া ঘর

নাট্যকার
ইবসেন
পুরুষ

অনুবাদ
পুরুষ

নারী

নির্দেশক নারী, মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী নারী।

একজন নারীর চোখ দিয়ে পুরো নাটকটি ব্যাখ্যাত।

স্বভাবতই নির্দেশক যখন নিয়ন্ত্রণ করেন সমগ্র নাটকটিকে তখন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় নাটকের মূল্যায়নের তারতম্য ঘটে যায়। ‘বহুরূপী’র প্রযোজনায় তাই শেষ দৃশ্যে তপনের অসহায় ভেঙে পড়া দর্শকের কাছ থেকে যে সহানুভূতি অনুকম্পা আদায় করে— ‘রঙ্গকর্মীর ‘গুড়িয়া ঘর’-এ ততোধিক সহমর্মিতা পায় না মুনিয়ার স্বামী। সমাজ ও দর্শক মুনিয়ার প্রতিরোধেই ঋদ্ধ হয়। ‘গুড়িয়া ঘর’ আরও পঁচিশ-ত্রিশ বছর পেরিয়ে অন্য বুলুর-বুলুদের গল্প হয়ে ওঠে।

আশ্চর্যজনকভাবে— ‘বহুরূপী’র বাইরে এসে পর পর যে দুটি নাটকে তৃপ্তি মিত্র পরিচালনার কাজ করলেন— সেই দুটি সংস্থাই দুজন মহিলার প্রতিষ্ঠিত ও প্রাধান্যে তৈরি। দুটি ক্ষেত্রেই তৃপ্তি মিত্র হিন্দি ভাষার মাধ্যমে নাট্যপরিচালনা করলেন এবং আমন্ত্রিত হয়ে তিনি এ কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথমটি ঊষা গাঙ্গুলির ‘রঙ্গকর্মী’ এবং দ্বিতীয়টি প্রতিভা অগ্রবাল পরিচালিত ‘অনামিকা’ নাট্যসংস্থা। এই প্রথম কেউ ‘বহুরূপী’র বাইরে হিন্দি নাটকের পরিচালনার কাজে যুক্ত হলেন।

‘অনামিকা’ নাট্যসংস্থার কর্ণধার প্রতিভা অগ্রবালের আহ্বানে তৃপ্তি মিত্র তাঁরই ‘প্রহর শেষে’ (প্রতিভা অগ্রবালের অনুবাদে যা ‘সাঁঝ চলে’) নাটকটির হিন্দি অনুবাদটি নির্বাচন করেন। যাঁরা অভিনেতা বা নাট্যকর্মী তাঁদের সঙ্গে নাট্যকারদের একটা মূলগত পার্থক্য থাকে নাটক রচনার ক্ষেত্রে। তৃপ্তি মিত্রের নাটক সমগ্রর ভূমিকা লিখতে গিয়ে পবিত্র সরকার এমনটাই মন্তব্য করেছেন যে— ‘এই ধরনের নাট্যকর্মীরা নাটক লেখার সময় পুরো নাটকটার একটা অভিনীত চেহারা মনের সামনে দাঁড় করান, ফলে কোথায় তার গতি শ্লথ হয়ে পড়ছে, কোথায় অবান্তর ঘটনা শূন্যে ঝুলে থাকছে, কোথায় বাগ্‌বিস্তার নাটককে থামিয়ে রাখছে— এ সবই তাঁদের চোখে পড়ে। তাঁদের নাটক লেখা একই সঙ্গে রচনা ও সম্পাদনা— নাট্যনির্দেশকের কাটছাঁট করার কাজটিও তাঁরা লেখার সঙ্গে সঙ্গেই

সেরে ফ্যালেন। ফলে তাঁদের নাটক, আর যাইহোক, চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় না কোথাও।' তৃপ্তি মিত্রের সবগুলি নাটকেই এই অবিশ্রান্ত গতির উত্তেজনা লক্ষ্য করি আমরা।[৪৩]

শুধু গতি নয় 'প্রহর শেষে' নাটকের বিষয়বস্তু ও পরিণতির সত্যতা দর্শকের ওপর সমাজের ওপর তীব্র আঘাত তৈরি করে। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের মর্মান্তিক পরিণতির কাহিনি নাট্যকার সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বয়ন করেছেন। ষাটের দশকের সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছিল এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে উত্তরবঙ্গের নদীতে দড়িবাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। এই নিদারুণ পরিণতির কাহিনিকে নাটকের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন তৃপ্তি মিত্র। নাটক শেষ হয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মৃত্যুর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে কারণ এই পৃথিবীতে তাদের কোনও প্রয়োজন নেই—।

"বুড়ি— ভগবান সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

বুড়ো— নিজে নিজে গলায় দড়ি দিতে কষ্ট হত।

বুড়ি— আমার ভয় করছিল দড়িটা দেখে—

বুড়ো— এখন করছে না?

বুড়ি— না, আমাদের শেষ কথাটা বুবাইকে জানান হল না।

বুড়ো— হল না! মহাকালের রাস্তায় কত কথাই তো হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা তো সামান্য প্রাণী—

বুড়ি— চল রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি

বুড়ো— তার আগে এস। এই দড়িটা দিয়ে আমাদের হাত-পাগুলো একসঙ্গে কষে বেঁধে নিই। যাতে খুব দূরে দূরে চলে যেতে না হয়।

(বৃদ্ধা হাত বাড়িয়ে দেয়, বৃদ্ধ বাঁধতে থাকে, জল এগিয়ে আসবার প্রচণ্ড শব্দ, আর্তনাদ ইত্যাদির মাঝে পর্দা নেমে আসে।)"[৪৪]

এ নাটকটি শুনেই প্রতিভা অগ্রবালের ভালো লাগে।— তাঁর খুব রেলেভ্যান্ট মনে হয়েছিল এ নাটকে সমাজের নানাস্তরের একেবারে আজকের মানসিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু নাটককে ভালবেসে নির্বাচন করা নয়— নির্দেশকের প্রতি ছিল তাঁদের গভীর আস্থা এবং তাঁকে নিজেদের মধ্যে এনে ফেলবার আনন্দ। সদস্যরাও খুশি হয়েছিলেন তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনাধীনে কাজ করতে পেরে। আর মঞ্চ পরিকল্পনাতেও খালেদ চৌধুরী যতটা সম্ভব আধুনিক ভাবনা প্রয়োগ করেছিলেন যদি কোথাও তাঁর নাম প্রকাশ করা হয়নি। একতলা, ওপরতলা, কিংবা মেজানাইন ফ্লোর এবং দেওয়ালে নেটের ব্যবহার করে— একই মঞ্চে বিভিন্ন ঘটনা এবং বিভিন্ন স্থানের ব্যবহার দেখানো সম্ভব হয়েছিল। তৃপ্তি

মিত্রের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই খালেদ চৌধুরির যে সমঝোতা আবারও তার প্রতিফলন ঘটেছিল 'সাঁঝ চলে'-র প্রযোজনায়।

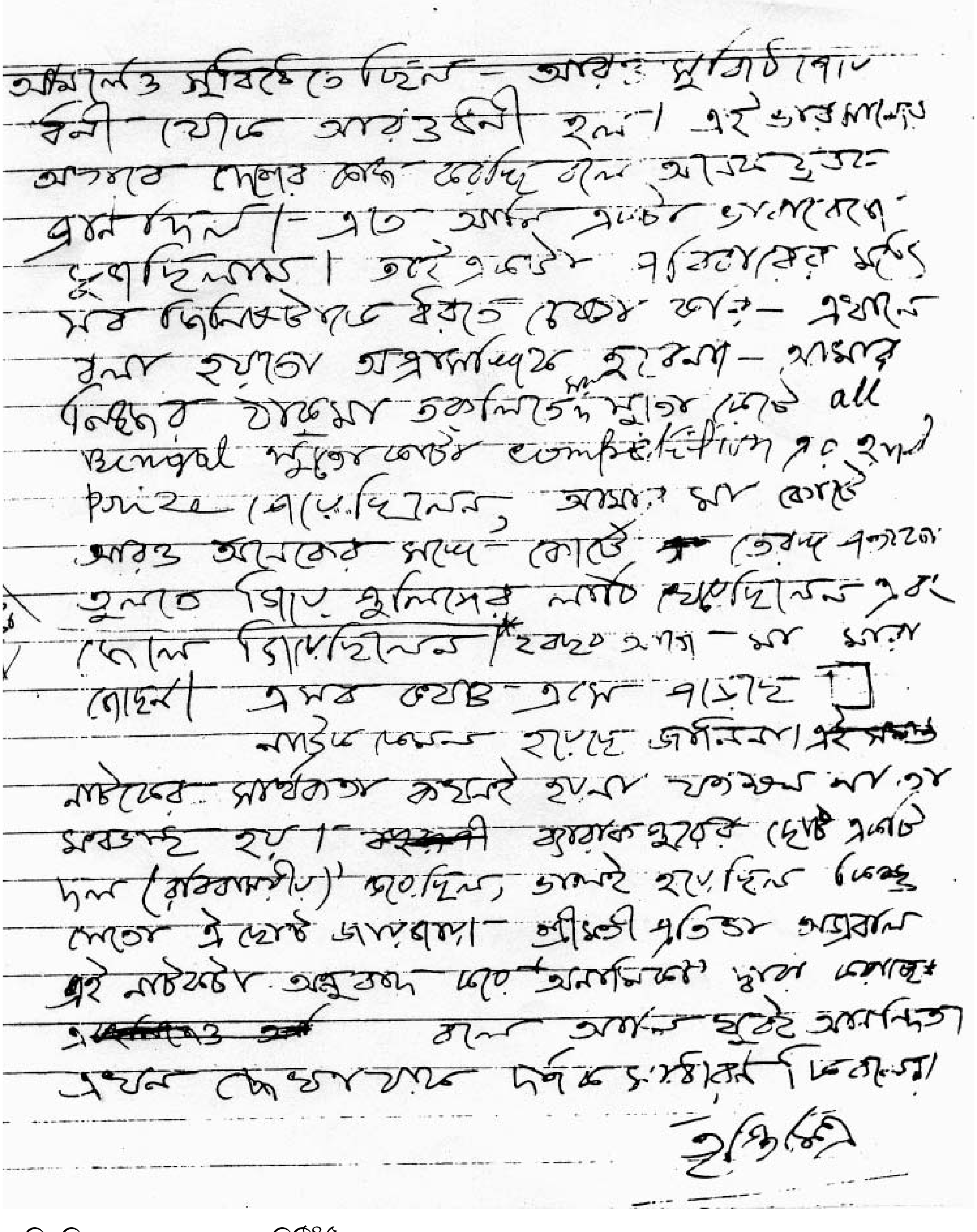

*তৃপ্তি মিত্রের স্বহস্তে লেখা চিঠি*[৪৫]

রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'-নাটকটি নিয়ে তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনার যাত্রা শুরু। কতবার তিনি এই নাটকটির কাছে ফিরে ফিরে এসেছেন। 'বহুরূপী'-তে ১৯৫৭, ১৯৭৩, শান্তিনিকেতনে, কলকাতা দূরদর্শন ও বেতারে। মাধ্যম বদলে বদলে গেছে। 'ডাকঘর' অভিনয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনীহা

অসহযোগিতা দেখে তিনি কর্মী ও অধ্যাপকদের দিয়ে অভিনয় করান। কুশল চৌধুরী, শান্তিকেতনের তৃপ্তি মিত্রের থাকাকালীন এবং প্রযোজনা সংক্রান্ত কাজে সাহায্যের জন্য নির্মিত কমিটিতে ছিলেন। তিনি উপস্থিত থাকতেন 'ডাকঘর'-এর মহলায় এবং তিনি দেখেছিলেন কিভাবে তৃপ্তি মিত্র তৈরি করছেন একেবারেই নাট্য অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীদের। 'ডাকঘর' নাটকটি প্রধানত কাব্যধর্মী। সেইজন্যেই তিনি প্রথমে সংলাপ বলার ওপর জোর দিয়েছিলেন। কোনো চরিত্রই বাদ ছিল না। মঞ্চে নাটকের দাবি অনুযায়ী বিভিন্ন চরিত্রের অবস্থান, প্রবেশ প্রস্থান এবং সমস্ত করণীয় সবই তিনি নিজে তৈরি করে দেখিয়ে দিতেন ও যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে দিতেন। এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমরা তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনার একটা ধরন লক্ষ করলাম।

ক) সংলাপ বলার ওপর গুরুত্ব।

খ) সব চরিত্রের প্রতি সজাগ দৃষ্টি

গ) কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ, Composition (যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিচালকের)

ঘ) নিজে করে দেখিয়ে দিতেন কারণ সময় কম ছিল।

ঙ) যুক্তিসহ নিজের করণীয় কাজের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ।

'বহুরূপী'তে দুটি পর্যায়ে 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ হয়েছে এবং যথেষ্ট প্রশংসিত হয় এ নাটক। কিন্তু ১৯৮২ সালে তৃপ্তি মিত্র যখন শান্তিনিকেতনে যান বিশ্বভারতীর ভিজিটিং ফেলো হিসেবে সেখানে তিনি সংগীত ভবনে 'ডাকঘর' পাঠ করেন এবং এ নাটক মঞ্চায়নের পরিকল্পনা করেন কিন্তু মহলার ক্ষেত্রে সময় ও নিয়ম না মানতে পারার কারণে সেই প্রযোজনা সম্ভব হয়নি। তখন তিনি বিশ্বভারতীর কর্মী ও অধ্যাপকদের নিয়ে 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ করেন এবং নাটকটি একই দিনে দুবার অভিনীত হয় দর্শকের চাহিদায়। তবে 'ডাকঘর'-এর প্রয়োগ পরিকল্পনা নিয়ে শান্তিদেব ঘোষ বিশেষ আপত্তি জানিয়ে ছিলেন।[৪৬] তবে একেবারে অনভিজ্ঞ অভিনেতাদের নিয়ে 'ডাকঘর' প্রযোজনা তৃপ্তি মিত্রের পরিচালন ক্ষমতার পরিচায়ক নিঃসন্দেহে।

**আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়** : ১৯৮২ সালে তৈরি হয় 'আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়'। তৃপ্তি মিত্রের কাছে কিছু উৎসাহী ছেলেমেয়ে উপস্থিত হয়েছিল নাটক শেখার জন্য। তৃপ্তি মিত্রের বাসগৃহ ১১-এ নাসিরুদ্দিন রোডে গড়ে ওঠে নাট্যবিদ্যালয় যাকে তৃপ্তি মিত্র বলতেন তাঁর 'কুটির শিল্প'। সেই ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে উৎসাহে এবং তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনায় ১৯৮০ সালে মে মাসের শেষের দিকে 'রক্তকরবী' নাটক পাঠের আয়োজন করা হয়। নাটক পাঠের সাফল্যের কারণে এবং শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধে

'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয় ১৯৮৪ সালে। আশ্চর্য হতে হয় যে নাটক শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায়, অমর গাঙ্গুলি, শোভেন মজুমদার প্রমুখ শক্তিশালী অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয়ে সমৃদ্ধ হয়ে মঞ্চস্থ হয়েছিল সেই মিথ হয়ে যাওয়া নাটককে একবারে আনকোরা একঝাঁক যুবক-যুবতীকে তৈরি করে মঞ্চস্থ করার সাহস দেখালেন তৃপ্তি মিত্র। এখানেই তাঁর পরিচালক সত্তার সাহসিকতা। আলো এবং মঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন তাপস সেন ও খালেদ চৌধুরী। সামান্য কিছু পরিবর্তন এবং মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে কিছু সরলীকরণ ছাড়া 'রক্তকরবী'র সামগ্রিক নির্মিতি কাঠামো শম্ভু মিত্র নির্দেশিত পথে চালিত হয়েছিল। তবে যে যে কারণে 'আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়' প্রযোজিত 'রক্তকরবী' তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনা গুণে দর্শককে আকৃষ্ট করেছিল তা হল—

১) নতুন নতুন ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ;
২) নবীন প্রজন্মের মধ্যে নাট্য সম্পর্কে সচেতনতা, নিষ্ঠা জাগানো;
৩) নিয়মানুবর্তিতা— শৃঙ্খলাবোধ;
৪) বহুরূপীর ঘরানা বজায় রেখেও নিজস্বতা প্রকাশ;
৫) তৃপ্তি মিত্রের অসাধারণ বাচন, স্বরক্ষেপন, শরীরী অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটানো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে;

এইরকম নানাবিধ কারণে 'রক্তকরবী' দর্শক আনুকূল্য লাভ করে। তাপস সেন জানিয়েছেন— 'নাট্যবিদ্যালয়ের নামকরণের আগে ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিয়মিত ক্লাস করা শুরু হয়েছিল। দু'একটা ছোট ঘরোয়া আসরে চলত নাট্য-পাঠ। আরব্ধ নাট্য-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে 'রক্তকরবী' নাটকটি নতুনভাবে মঞ্চ-প্রয়োগ করলেন তৃপ্তি মিত্র। সেই প্রযোজনায় মঞ্চ ও আলোর দায়িত্বে ছিলেন খালেদ ও আমি। বহুরূপীতে শম্ভু মিত্রের নির্দেশিত নাট্য-প্রয়োগ থেকে এইসব প্রয়োজনা অনেকখানি স্বতন্ত্র। অনেক সহজ সরল সামগ্রিক ভাবনা, প্রায় সমস্ত কৃতিত্বই তৃপ্তি মিত্রের। সাহস নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় ছিল নবীন শিল্পীদের অভিনয় প্রচেষ্টায়।'[৪৭]—শুধু তো নাটক নয় পরিচালকের সামগ্রিক জীবনচর্যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এই শিক্ষার্থীরা। ১৯৮৭-তে যখন তিনি অসুস্থ— একা তখন তাঁর প্রতিদিনের সঙ্গী ছিল এই আরব্ধ-র নাট্যশিশিক্ষুর দল— আর তাঁরও নাট্যস্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার বৃত্তের কেন্দ্র ছিল 'আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়'। ফলত 'আরব্ধ' প্রযোজিত 'রক্তকরবী' কতটা সাফল্য বা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার বিচারের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছিল 'রক্তকরবী'র মতো একটি বৃহৎ

মাপের প্রযোজনা জনসমক্ষে স্থাপনের দুর্বার স্পৃহা। সেখানে কোনও একজন দুজন নয় সামগ্রিকভাবে দলবদ্ধ অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। তবে অনেক সমালোচক ‘আরব্ধ’ নাট্যবিদ্যালয়’-এর প্রযোজনাটি ‘বহুরূপী’র আদলে নির্মিত হয়েছে বলে সমালোচনাও করেছেন— ‘...বহুরূপীর প্রথম অভিনয়ের তিরিশ বছর পরও যদি তার প্রায় হুবহু অনুকরণ দেখি তাহলে আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ে এগোলাম বা পিছোলাম? তৃপ্তির সঙ্গে তাই খানিকটা অতৃপ্তিও থেকে গেল।’[৪৮] সমালোচনা যাইহোক নতুন একঝাঁক শিক্ষার্থীর সতেজ সজীব সক্রিয়তায় সহায়তায় তৃপ্তি মিত্র ‘রক্তকরবী’ নাটকে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন।

‘আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়’-এর হয়ে ‘রক্তকরবী’ প্রযোজনা তৃপ্তি মিত্রের প্রাপ্তির ভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছিল— সেখানে অপ্রাপ্তি হতাশা সঞ্চিত হল ‘হাজার চুরাশির মা’ প্রযোজনাটি কেন্দ্র করে। ১৯৮৪ সালে ৩০ জুন ‘নান্দীকার’ আয়োজিত জাতীয় নাট্যমেলায় মঞ্চস্থ হয় ‘হাজার চুরাশির মা’। ‘আরব্ধ’-এর সঙ্গে সহযোগী হয়েছিল ‘নান্দীকার’ ও ‘শূদ্রক’ নাট্যগোষ্ঠী। কিন্তু নানাবিধ কারণে এই প্রযোজনা ব্যর্থ হয়। প্রথম কারণ-ই ছিল অনেক চরিত্রের সমাবেশ এবং তারা সবাই ‘আরব্ধ’-এর শিক্ষার্থী নয়। অন্যদলের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ঐক্য বা টিম স্পিরিট তৈরি করা সম্ভব হয়নি; যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়নি প্রযোজনাটি সম্পূর্ণ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে, রিহার্শালের জায়গার অভাব, জাতীয় নাট্যমেলায় অন্যান্য প্রদেশের একাধিক অভিনয় হয়ে যাওয়া নাটকগুলির সঙ্গে প্রতিতুলনা— এ সব কারণে ‘হাজার চুরাশির মা’র একটিমাত্র অভিনয় হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। তাপস সেন তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় জীবনের দীর্ঘদিনের আলোর সঙ্গী বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে— ‘অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ ‘হাজার চুরাশির মা’ অভিনয় করবেন। অনেক চেষ্টার পর ওই নাটক অভিনয়ও হল— খুব পরিশ্রম করেছিলেন অভিনয়ের জন্য। সারা কলকাতা ঘুরে কত জায়গায় রিহার্সালের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কিন্তু একরাত্রের বেশি অভিনয় সম্ভব হয়নি। খাটলে নিশ্চয় আরো ভাল হত। কিন্তু সেই সময় লোকের কথায় উনি হতাশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। শরীরটাও তখন বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না।’[৪৯] সমালোচনার ধাক্কাটা যেমন সামলাতে পারেননি তেমনি একথাও ঠিক যে পরিচালক সবসময় সর্ববিধ কাজে সফল হবেন এমন যুক্তি অস্বাভাবিক। তবে অসুস্থ অবস্থায় কম সময়ে একেবারে নতুন ছেলে মেয়েদের নিয়ে এত প্রিয় উপন্যাসটির মঞ্চ রূপায়ণের পরিকল্পনা না করলেই বোধহয় তাঁর পক্ষে ভাল ছিল। তবে তিনি চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত ছিলেন তাই জানিয়েছেন— হয় নাটকটি ভাল হবে, না হয় খারাপ হবে তার বেশি তো কিছু হবে না।— জীবন ও নাটকের প্রতি

তাঁর এই দৃঢ় মনোভঙ্গিই জীবনের শেষ কয়েকটা বছরেও নাটক করে যেতে সাহস জুগিয়েছিল। দৃঢ় মনোভঙ্গি তার আজীবনের সঙ্গী। 'বহুরূপী'তেও তিনি ছিলেন দৃঢ়মনের শক্তিতে ঋজু। তার শারীরিক গঠনেও তা প্রকাশ পেত। ক্রমশ একটা ক্লান্তি ঘিরে ধরেছিল তাঁকে। ঘরে-বাইরে অনিয়ম, বিশৃঙ্খলতা আর তিনি দেখতে পারছিলেন না ।

'আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়'-এর প্রযোজনায় তৃপ্তি মিত্রের প্রায় একক অভিনয় সমৃদ্ধ 'দুরাশা'— (লেখকের ভূমিকায় আলো গুপ্ত) নাটকের তেমন সফলতা পাননি তৃপ্তি মিত্র। কেননা এই নাটক একক অভিনয় হলেও এই নাটকে সংলাপ অংশ বেশি এবং নাটকীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তেমন লক্ষ করা যায় না। যত না দৃশ্যময়তা তার থেকে বেশি শ্রব্য। 'অপরাজিতা' নাটকে তিনি যে স্বতঃস্ফূর্ততায়, গতিময় সক্রিয়তায় প্রায় দু/আড়াই ঘন্টা দর্শককুলকে মোহিত করে রাখতেন 'দুরাশা' 'একাঙ্ক হলেও দর্শকের কাছে এই নাটকের ব্যর্থ প্রেমকাহিনী কোনও স্থায়ী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই 'অপরাজিতা'র সঙ্গে একটা প্রতিতুলনা এসে গিয়েছিল। এ নাটকের অভিনয়ও বেশি হয়নি।

তৃপ্তি মিত্রের শেষ দুটি পরিচালনার কাজ 'সরীসৃপ' ও 'রাহুগ্রাস'—মঞ্চস্থ হয় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ ১৯৮৭ সালের ২৬ জানুয়ারি মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ৯৮-তম জন্মদিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে। বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'সরীসৃপ'-এ তৃপ্তি মিত্র অভিনয় করেছিলেন এরপর অভিনয় করেননি আর কোনও নতুন নাটকে। মনোমোহন থিয়েটারের ভগ্নপ্রায় অবস্থার যে ছবি বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁর নাটকে তুলে এনেছিলেন তার-ই বাস্তব নিখুঁত মঞ্চায়ন ঘটেছিল 'আরব্ধ'র 'সরীসৃপ' প্রযোজনায়। তৃপ্তি মিত্র নিজে অভিনয় করতেন ম্যাডাম-সারদাসুন্দরীর-চরিত্রে। নিকুঞ্জ ও সারদাসুন্দরীর সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রায় ভেঙে পড়া দারিদ্রদীর্ণ থিয়েটারের ছবিটা জলজ্যান্ত হয়ে উঠত। খালেদ চৌধুরী শুধু মঞ্চ নয়— আলোর পরিকল্পনাও করেছিলেন। সামগ্রিকভাবে একাঙ্ক নাটকটি পুরোনো থিয়েটারের দলিল হয়ে ওঠে পুরোনো চরিত্রদের সংলাপ ও স্মৃতিচারণায়। ১৯৮৭-তেই অভিনয় হয় ভবেন্দ্রনাথ সইকিয়ার গল্প অবলম্বনে 'রাহুগ্রাস'। এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের নিঃসঙ্গতা ও সমাজবিচ্ছিন্নতার কাহিনি। বিষয়ের দিক থেকে এই নাটকের আবেদন মর্মস্পর্শী এবং পরিচালকের মুন্সিয়ানায় নাট্যপ্রয়োগও দর্শককে ছুঁয়ে যায় কিন্তু মুখ্য চরিত্র— নিঃসঙ্গ নীরেনকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারেননি তুলনায় অল্পবয়সী আলো গুপ্ত।

পরের বছর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন তৃপ্তি মিত্র। 'অপরাজিতা'য় অভিনয় করেছেন যতক্ষণ পেরেছেন কিন্তু তিনি পরিচালনায় আর ফেরেননি। শারীরিক অসুস্থতা-ই তার প্রধান কারণ। 'আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়' ছিল তাঁর স্বপ্নের ভূমি। ১৯৪৮ সালের বসন্ত শেষ থেকে যেমন কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিল ১১-এ নাসিরুদ্দিন রোডে তৃপ্তি মিত্র শম্ভু মিত্রের আবাসগৃহ। যেখানে জন্ম হয়েছিল 'বহুরূপী'র সেইখানে তৈরি হল 'আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়' অবশ্য তখন তিনি নিঃসঙ্গ। 'আরব্ধ'-এর শিক্ষার্থীরাই তাঁর বন্ধু, সহকর্মী। তাদের শিক্ষার কাজের একটা পরিণতি দেবার জন্য পরিচালনার পরিকল্পনা— যা তাঁর জীবনে শেষ কয়েকটি বছরকে কর্মমুখর উদ্দীপনাময় তারুণ্যের রোদ্দুর দিয়েছিল। আলো গুপ্ত তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী— তার ও তাদের 'জেঠিমা'কে (এই সম্বোধন করত 'আরব্ধ'র সদস্যরা) সম্মানে শ্রদ্ধায় মাথার ওপর রেখেছিল কিন্তু মঞ্চে অভিনয়ের জন্য যে প্রতিভা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সদ্য শিক্ষিত নাট্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে তখনও তার স্ফূরণ ঘটেনি। যে তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র-গঙ্গাপদ বসু- অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-কুমার রায়-অমর গাঙ্গুলি-দেবতোষ ঘোষ-শাঁওলী মিত্রের সঙ্গে মঞ্চভাগ করে নিয়েছেন— তাঁকে সীমাবদ্ধ হতে হল ক্রমশ নবীন শিল্পীদের গণ্ডীতে। ফলত তাঁর প্রযোজনাগুলি প্রতিভার সীমাবদ্ধতা গ্রাস করেছে। আর বড়ো কোনও কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি— করতেও পারেননি ত্রিবিধ কারণে (ক) আর্থিক (খ) শারীরিক (গ) পরিবর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির কারণে। বদলে যাওয়া সময়টাকে তিনি ধরতে পারলেন না। তাই 'হাজার চুরাশির মা'— ব্যর্থ হল। পুরোনো প্রযোজনাই একমাত্র অবলম্বন হয়ে রইল।

জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি শম্ভু মিত্রের পথই অনুসরণ করেছিলেন। সেইজন্যই তিনি 'আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়' তৈরি করেছিলেন। মনে করতেন হয়তো ভবিষ্যতে পরিচালনার কাজে 'আরব্ধ' থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত কেউ হয়ত আসবেন? 'হঠাৎ দল খুলে কিছু বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পরিচালক হবার থেকে কিছু শিক্ষা নিয়ে এই কাজে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। 'পরিচালক যখন নিজে প্রধান চরিত্র থেকে ছোট চরিত্র পর্যন্ত সবাইকে তৈরি করতে পারবেন তখনই প্রযোজনা সার্থক হবে।'[৫০] অভিনয় জীবনের শুরু থেকে যে পরিচালকের নির্দেশে প্রায় সমস্ত নাটকে অভিনয় করেছেন সেই পরিচালকের অর্থাৎ শম্ভু মিত্রের শিক্ষা ও পরিচালন পন্থাকেই অনুসরণ করতে চেয়েছেন তৃপ্তি মিত্র। সেখানে অভিনেতা- অভিনেত্রীদের শৃঙ্খলা-নিষ্ঠা-পরিশ্রম সর্বাগ্রে বিবেচ্য। দীর্ঘসময় অনুশীলন নাট্যপ্রযোজনার মানকে উন্নত করবে এমনটাই প্রার্থিত তাঁদের কাছে। স্বরক্ষেপন, মঞ্চে হাঁটাচলা, ওঠা-বসা সমস্ত বিষয়ে পরিচালককে বেশি সচেতন থাকতে হবে— তিনি না জানলে অভিনেতাকে

শেখাবেন কি করে? শম্ভু মিত্রর প্রদর্শিত পরিচালনপন্থাকে গ্রহণ করেই ‘বহুরূপী’ ও ‘আরব্ধ’-এ নির্দেশনার কাজটি করে গেছেন তৃপ্তি মিত্র। — সেখানে মনন-মেধা-প্রতিভার তারতম্য থাকেই কিন্তু প্রযোজনায় পরিশ্রম ও নিষ্ঠার, শৃঙ্খলা ও মগ্নতার অভাব ঘটতে দেননি। আগামী দিনে তাঁর শিক্ষার্থী কেউ পরিচালনার কাজে এগিয়ে আসেননি তেমন করে কিন্তু যে শাঁওলী মিত্র ‘বহুরূপী’ পর্বে তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলির অধিকাংশ নাটকে মুখ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁর নাট্যশিক্ষার মূলে ছিলেন তৃপ্তি মিত্র। তৃপ্তি মিত্র ছিলেন অভিনয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত পরিশ্রমী। নতুন নাটকের মহলার সময় তিনি প্রবল পরিশ্রম করতেন এবং তা করতেন আনন্দের সঙ্গে— কোনও চাপের মুখে জোর করে নয়। শাঁওলী মিত্র লিখছেন, ‘‘বাবা একদিন গল্প করে বলেছিল, ‘বাকি ইতিহাস’-এর মহলার সময়ে সারাদিন ধরে মহলা চলছিল, রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ কুমার শুয়ে পড়ল, তোর মা তখনো দাঁড়িয়ে ...’ আমার মনে পড়ল সেই সময়টায় আমি শয্যাশায়ী, বাড়িতে ভালো কাজের লোকও ছিল না। মাকে বাড়ির সব কাজ সেরে, অসুস্থ মেয়ের সুশ্রূষা সেরে মহলায় যেতে হত। ... মা যে কত পরিশ্রম করে ক্রমশ নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিল সে আজ যে কোনো অভিনেতার পক্ষেই শিক্ষণীয়। পড়াশোনা, রেওয়াজ, হাঁটা-চলা সব ক্ষেত্রেই এত পরিশ্রমী কাউকে খুঁজে পাওয়া শক্ত।’[৫১] শাঁওলী মিত্রের কথায় তাঁর মা ছিলেন অসম্ভব পরিশ্রমী অভিনয়ের ক্ষেত্রে। শম্ভু মিত্র যেমন তৃপ্তি মিত্রের মতো এবং তাঁর সমকালে পরিশ্রমী প্রতিভাবান অভিনেতাদের খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁদেরকে নিয়ে কাজ করতে পেরেছিলেন সেই তুলনায় তৃপ্তি মিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নতুন, তাদের জন্য অনেকবেশি শ্রম দিতে হয়েছে তাঁকে, হয়তো সে কারণেই প্রযোজনাগুলি সবসময় উচ্চমানে পৌঁছতে পারেনি। তাছাড়া ‘বহুরূপী’তে যে আর্থিক ও সাংগঠনিক চাপের মধ্যে কাজ করেছেন— কাজ করাই সেখানে ছিল একমাত্র লক্ষ্য, সেখানেও গুণগত মান বিচার্য হয়নি। সর্বোপরি এ কথা বলা যায় যে তৃপ্তি মিত্র যে মাপের অভিনেত্রী, তাঁর প্রতিভা শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় যেভাবে বিকশিত হয়েছিল পরিচালক হিসেবে তিনি সেই জায়গায় পৌঁছতে পারেননি। তাই অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের নাম বাংলা নাট্যে সর্বাগ্রে উল্লিখিত হয়— পরিচালক তৃপ্তি মিত্র সেভাবে আলোচিত হন না। কিন্তু বর্তমানে সর্বস্তরে মেয়েদের অধিকার, কর্তৃত্ব, পরিচালন ক্ষমতা যেভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে তারই প্রেক্ষিতে গোটা সত্তরের দশক এবং আশির দশক তাঁর নাট্য পরিচালনা শক্তির বিকাশ তাঁর সমকালে এবং পরবর্তীকালে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাঁকে-ই নারী নির্দেশকদের মধ্যে বাংলামঞ্চের অগ্রণী সেনানী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

## তথ্যসূত্র


১. তৃপ্তি মিত্র, ‘আমার ছেলেবেলা’, রবিবাসরীয়, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৬ চৈত্র, ১৩৯২;

২. কমলা সিংহ, ‘মণি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’, কুমার রায় (সম্পা.), *বহুরূপী পত্রিকা*, ৭২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৩২

৩. শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার, গ্রহণ করেছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ, নবান্ন স্মারক সংখ্যা (দ্বিতীয় সংকলন), চিত্তরঞ্জন ঘোষ (সম্পা.), *বহুরূপী পত্রিকা*, জুন, ১৯৭০, পৃ. ৭১

৪. সৌম্যদেব বসু, ‘তৃপ্তি মিত্র’, দেবাশিস সেনগুপ্ত (সম্পা), *প্রগতির চেতনা প্রগতির পথিকেরা* বাংলা সংস্কৃতিতে প্রগতি চেতনা ১৯৩৬-১৯৫০, একুশে সংসদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৫২৩

৫. তৃপ্তি মিত্র, ফ্ল্যাশ-ব্যাক, দেবাশিস মজুমদার (সম্পা.), *তৃপ্তি মিত্র*, দীপ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৫, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১৮

৬. Bishnupriya Dutta and Urmimala Sarkar Munsi, ‘The People’s : Actress A Journey to Modernity’, *Engendering Performance Indian Women Performers in Search of An Indentity*, SAGE Publications, New Delhi, 2010, p. 87

৭. ‘Bohurupee’s Pathik— An Exquisite Dramatic Treat’, *Hindusthan Standard*; Kol, Oct. 1949

৮. কুমার রায়, ‘জীবনের শিল্পী’, দেবাশিস মজুমদার (সম্পা.), *তৃপ্তি মিত্র*, দীপ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৫, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১৫১

৯. খালেদ চৌধুরী, ‘অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র’, কুমার রায় (সম্পা.), *বহুরূপী পত্রিকা*, সংখ্যা ৭২, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৪

১০. শচীন সেনগুপ্ত, ‘বহুরূপী’র ‘উলুখাগড়া’, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৫ অক্টোবর, ১৯৫০;

১১. তৃপ্তি মিত্র, ‘ফ্ল্যাশ-ব্যাক’, দেবাশিস মজুমদার (সম্পা), *তৃপ্তি মিত্র*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৩।

১২. By a staff correspondent, ‘Splendid Teamwork in “Chhenra Tar”. Second Bengali Play in National Festival, Hindusthan Standard, Dec. 1954

১৩. ‘চার অধ্যায়’- ‘বহুরূপী’ প্রযোজিত নাটকের অভিনয়পত্রী। এই অভিনয়পত্রীর লেখাটি অস্বাক্ষরিত। কিন্তু সেটি শম্ভু মিত্রের লেখা। একথা জানাচ্ছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ— শম্ভু মিত্রের সঙ্গে একটি কথোপকথনে।

‘রবীন্দ্রনাথের নাট্য-চিন্তা’, ভাষ্যকার : শম্ভু মিত্র, লিপিকার : চিত্তরঞ্জন ঘোষ; প্রভাতকুমার দাস (সম্পা.), *বহুরূপী পত্রিকা*, শম্ভু মিত্র জন্মশতবর্ষ সংখ্যা; সংখ্যা ১২২, অক্টোবর ২০১৪; পৃ. ১৫৪

১৪. শাঁওলী মিত্র, ‘বহুরূপী-র নতুন নির্দেশকেরা’, *শম্ভু মিত্র : বিচিত্র-জীবন পরিক্রমা ১৯১৫-১৯৯৭*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২০১১, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৮৪

১৫. কুমার রায়, ‘ভূমিকা’, দেবাশিস রায়চৌধুরী, *তৃপ্তি মিত্র শিল্পে ও জীবনে*, রত্নাবলী, কলকাতা, মার্চ ২০১০

১৬. তৃপ্তি মিত্র, ‘নাটকে পরিচালনা’, *কৃষ্টি পত্রিকা*, ১৯৮৬, পৃ. ৫০

১৭. দেবাশিস রায়চৌধুরী, *তৃপ্তি মিত্র শিল্পে ও জীবনে*; পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৬৫

১৮. Thoughts on the Theatre Bahurupee’s “Dakghar” ; *Hindusthan Standard*; 24 May 1957

১৯. দেবতোষ ঘোষ-এর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক : গবেষক ১০.০৩.২০১৬

২০. Thoughts on the Theatre Bahurupee’s “Dakghar”; *Hindusthan Standard*, 24th May 1957

২১. দেবতোষ ঘোষ-এর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক ১০.০৩.১৬

২২. শাঁওলী মিত্র, ‘কিংবদন্তী- ১৯৭০’, *শম্ভু মিত্র : বিচিত্র-জীবন পরিক্রমা ১৯১৫-১৯৯৭*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ২০১১, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ২৩৪

২৩. তদেব।

২৪. ‘বহুরূপী’ প্রযোজিত কিংবদন্তী নাটকের অভিনয়পত্রী।

২৫. নাট্যসমালোচক, ‘বহুরূপীর কিংবদন্তী’, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৬ মার্চ, ১৯৮০

২৬. নীতিশ সেন, ‘অপরাজিতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’, *আরব্ধ নাট্য বিষয়ক পত্রিকা*, ১৯৮৬

২৭. ‘‘বঙ্গরঙ্গমঞ্চে কোনো অভিনেতা একা অভিনয় করছেন একথা ‘অপরাজিতা’ নাটক হবার আগে ভাবা যায়নি। পরে একটি চিঠি দেখেছিলাম যেখানে শম্ভু মিত্র বিদেশ থেকে এমন একটি নাটক করবার প্রেরণা দিচ্ছেন স্ত্রীকে। সেটা কোন সময়ে? ১৯৬৫ অথবা ১৯৬৭ হবে। আর ‘অপরাজিতা’ অভিনীত হয়েছিল ১৯৭১-তে।”

শাঁওলী মিত্র, *মা-মণি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৩৫-৩৬

২৮. দেবতোষ ঘোষ, ‘একটি আধুনিক পটকথা : তৃপ্তি মিত্র’, *আত্মীয়স্বজন*, প্রতিভাস, কলকাতা, জুন ২০০৯, পৃ. ৬২-৬৩

২৯. তদেব, পৃ. ৬৩

৩০. ‘বহুরূপী’ প্রযোজিত ‘অপরাজিতা’ নাটকের অভিনয়পত্রী।

৩১. নির্মল ধর, বহুরূপীর ‘অপরাজিতা’, *চিত্রালী* (ঢাকা), ১৪ জুলাই ১৯৭২, শুক্রবার

৩২. ‘টেরোড্যাকটিল’, দেশ, শনিবার, ২ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯, ১০ নভেম্বর, ১৯৭২

৩৩. সন্তোষকুমার ঘোষ, ‘‘নবরূপে বহুরূপী : সাহসী উপহার— ‘গণ্ডার’’, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩

৩৪. Hiten Ghose, ‘Going Absurd’, *Frontier*, 16 Dec, 1972

৩৫. *দেশ*, ২৬ শ্রাবণ, ১৩৮০, পুনর্মুদ্রণ : স্বপন মজুমদার (সম্পা.), *বহুরূপী ১৯৪৮-১৯৮৮*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৯

৩৬. মঞ্চাভিনয় ঘরে বাইরে, *অমৃত*, ১৪ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা শুক্রবার, ১০ ভাদ্র, ১৩৮১, পুনর্মুদ্রণ: কুমার রায় (সম্পা.), বিশেষ বহুরূপী প্রযোজনা-২, সংখ্যা ৭০, অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ২২৮

৩৭. কালীপ্রসাদ ঘোষের সাক্ষাৎকার, নাট্যশোধ সংস্থানে সংরক্ষিত, পুনর্মুদ্রণ : *বহুরূপী ১৯৪৮-৮৮*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮৩

৩৮. নাট্য সমালোচক, ‘বহুরূপীর দুটি একাঙ্ক’, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮, কুমার রায় (সম্পা.), বিশেষ বহুরূপী প্রযোজনা-২, সংখ্যা ৭০, অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ২৭৬

৩৯. শাঁওলী মিত্র, ‘পাখি-মার্চ ১৯৭৭’, *শম্ভু মিত্র : বিচিত্র জীবন-পরিক্রমা ১৯১৫-১৯৯৭*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৪১

৪০. তদেব, পৃ. ৩১৮

৪১. যদি আর একবার, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৬ মার্চ, ১৯৭৬, পুনর্মুদ্রণ, কুমার রায় (সম্পা.), বিশেষ বহুরূপী প্রযোজনা-২, সংখ্যা ৭০, অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ২৬৪

৪২. দেশ পত্রিকা, ১৯৮১, ২৬ ডিসেম্বর।

৪৩. পবিত্র সরকার, ‘ভূমিকা’, *তৃপ্তি মিত্র নাটক সমগ্র*, চতুর্থ মুদ্রণ আষাঢ় ১৪২১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ,১৩৯৭, পৃ. ২

৪৪. তৃপ্তি মিত্র, ‘প্রহর শেষে’, *তৃপ্তি মিত্র নাটক সমগ্র*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৪৫

৪৫. তৃপ্তি মিত্রের স্বহস্তে লেখা চিঠি

৪৬. আজকাল পত্রিকা, ১০ মার্চ, ১৯৮৫

৪৭. তাপস সেন, ‘তৃপ্তি মিত্র স্মরণ’, *দেশ পত্রিকা*, ২৭.০৭.১৯৮৯, পৃ. ৬৭-৬৮

৪৮. ‘তৃপ্তি অতৃপ্তি’, *যুগান্তর*, কলকাতা, ১৪মে ১৯৮৪

৪৯. তাপস সেন, ‘তৃপ্তি মিত্র স্মরণ’, *দেশ পত্রিকা*, ২৭.০৭.১৯৮৯, পৃ. ৬৮

৫০. তৃপ্তি মিত্র, ‘নাটকে পরিচালনা’, *কৃষ্টি পত্রিকা*, ১৯৮৬, পৃ. ৫০

৫১. শাঁওলী মিত্র, *মা-মণি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ১০-১১

তৃতীয় অধ্যায়

# অনন্য সংগঠক শোভা সেন

(১৯২৩)

'থিয়েটার ছাড়া বাঁচব না। থিয়েটার অভিনয় করাই শুধু আমার কাজ নয়; গ্রুপকে বাঁচিয়ে রাখা, সভ্যদের মনোবল বজায় রাখা, নিয়মানুবর্তিতায় তাঁদের সজাগ রাখাও আমার কাজ।'

বাংলা নাট্য আন্দোলনের অন্যতম শিল্পী শোভা সেনের জীবনে এই ছিল মূল অভিব্যক্তি। শুধু নাটক নয়, যে কোনও শিল্পমাধ্যমে একজন নারীর অবস্থান এবং সংগ্রাম কতটা জরুরি তা তিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-র পথ দিয়ে তাঁর নাট্যজগতে প্রবেশ। ফলত তাঁর নাট্যচিন্তা এবং নাট্যকর্মে একটা বিশেষ আদর্শবোধ জাগরূক ছিল প্রথমাবধি। নিরলস থিয়েটারের কাজে ব্রতী থাকা শিল্পী শোভা সেন শুধু অভিনয় নয়, নাট্যনির্মাণ এবং বিশেষ করে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টান্তস্বরূপ অবদানের জন্যই স্মরণীয়। উৎপল দত্তের মতো একজন সফল নাট্যনির্দেশকের পাশাপাশি থেকে থিয়েটারে যাবতীয় দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে নাট্যদলকে (প্রথমে লিটল থিয়েটার গ্রুপ বা *LTG* এবং পরে পিপলস থিয়েটার গ্রুপ বা *PLT)* যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তা বাংলা থিয়েটারে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। যে সময়ে মেয়েরা থিয়েটারের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র অভিনয় শিল্পের প্রতি মনোযোগী ছিলেন, সেই সময় শোভা সেন সাংগঠনিক কাজে যেভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন তা অবশ্যই এক জরুরি আলোচনার বিষয়। শুধু অভিনয় বা শুধু সাংগঠনিক কাজ নয়— থিয়েটারের এই দুটি দিক-ই তিনি সমানভাবে সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর অভিনয় সম্পর্কে বহু আলোচনা ইতিমধ্যেই হয়েছে, কিন্তু সাংগঠনিক শোভা সেন সম্পর্কিত আলোচনা তেমন গুরুত্ব সহকারে পাঠকের সামনে আসেনি। এই নিবন্ধে এই বিষয়টিই আছে আলোচনার কেন্দ্রে। অবশ্য উপেক্ষিত হবে না তাঁর অভিনেত্রী জীবনের প্রসঙ্গও।

সংগঠক শোভা সেন সম্পর্কে উৎপল দত্তের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু হতে পারে এই আলোচনা। 'স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লালদুর্গ' বইটির ভূমিকাংশে উৎপল দত্ত লিখেছিলেন '...আমাদের নাট্য-আন্দোলনে শক্তিমান নট-নটী অনেক আছেন, কিন্তু প্রকৃত সংগঠক নেই বললেই চলে। এবং নেই বলেই এত দল ভেঙে যায়, এত মান-অভিমান-রাগ-বিদ্বেষের প্রাদুর্ভাব হয়। ভাঙন কি লিটল থিয়েটার বা পীপল্‌স্ লিটল থিয়েটারে আসেনি? এসেছে বই কি : কিন্তু সাংগঠনিক প্রতিভার জোরে সংগঠকরা তার পরিণামকে সীমিত রাখতে পেরেছেন। এক ভেঙে দুই

হয়নি কখনই, দলত্যাগী যে কজন ভাঙন আনতে চেয়েছিলেন, তাঁরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় জনারণ্যে হারিয়ে গেছেন, পাল্টা সংগঠন গড়ে তুলতে পারেননি কেউই। লিটল থিয়েটার বা পীপল্স্ লিটল থিয়েটার যেমন চলছিল তেমনই চলতে থেকেছে। এর পিছনে শ্রীমতী শোভা সেনেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সংগঠক হিসেবে এবং মঞ্চের ওপর তাঁর যে খ্যাতি গড়ে উঠেছে, তার চেয়ে নাট্য-আন্দোলনের সফল সম্পাদক হিসেবে তাঁর যশের দাবি কম নয়।’[১]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শিক্ষায় শিক্ষিত এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী যোগ দিয়েছিলেন পেশাদারি থিয়েটারের সমান্তরাল থিয়েটারে। তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে— সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে হাতিয়ার করে। শোভা সেন ছিলেন এই দলে। তখন নানান ঘটনায় উত্তাল চল্লিশের দশক। শুরুতেই ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২), বাংলার মন্বন্তর (১৯৪৩), দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশভাগ ও স্বাধীনতা (১৯৪৭), গান্ধীজির মৃত্যু (১৯৪৮) ইত্যাদি। এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে ‘প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ’ (১৯৩৬), ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’ (১৯৪৩), লেখা হচ্ছে ‘নবান্ন’ (১৯৪৪)। আর এই ‘নবান্ন’ নাটকে অভিনয়ের সূত্রে শোভা সেন যুক্ত হয়ে পড়েছেন ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’-র সঙ্গে। রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকেই তিনি অনুপ্রাণিত হন আইপিটিএ-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়। শোভা সেন যখন গণনাট্য সংঘ-এ যোগ দেন তখন ‘নবান্ন’ নাটকের প্রস্তুতি চলছে। ১৯৪৪ সাল। নাটকের ব্যবস্থাপনার ভার ছিল সুধী প্রধান ও তৎকালীন সম্পাদক চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। সুধী প্রধানই বিজন ভট্টাচার্যের কাছে নিয়ে যান। শোভা সেনের ননদাই, অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের মাধ্যমে ‘নবান্ন’ নাটকের একটা যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। অধ্যাপক শান্তিময় রায়, শোভা সেনের স্বামী দেবপ্রসাদ সেন এবং সুধী প্রধান ছিলেন পরস্পরের বন্ধু। বেথুন কলেজে পড়ার সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গে বিবাহ হয় শোভা সেনের। শ্বশুরবাড়ির রাজনৈতিক পরিবেশ শোভা সেনকেও উদীপ্ত করেছে সমাজতন্ত্র কমিউনিজমের দীক্ষায়। সাময়িক অসুস্থতার পর শোভা সেন ভাবছিলেন কী করবেন— অনার্স না থাকার দরুন এম.এ. পড়ার সুযোগও নেই। তাঁর বহুদিনের শখ ডাক্তারি পড়বেন, কিন্তু সে ইচ্ছেও পূরণ হওয়ার নয় নানাবিধ অসুবিধার কারণে। কিন্তু অভিনয় জগতের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে শোভা সেনের জীবনের মানচিত্রটাই বদলে গেল।

অভিনয় নিয়ে যে খুব বেশি অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল তা নয়। স্কুল কলেজে আরও পাঁচজনের মতো অভিনয় করেছেন যেমন সবাই করে। স্কুল ও কলেজ জীবনে তাঁর অভিনয়ের একটা তালিকা দেওয়া হল—

| | নাটক | অভিনীত চরিত্র | প্রথম অভিনয় | সংস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | অভিমন্যু বধ | সখী | ১৯৩৪ | বীণাপাণি পর্দা হাইস্কুল |
| ২. | শেষ রক্ষা | শিবচরণ | ১৯৩৯ | বেথুন কলেজ |
| ৩. | কাঠুরিয়া | নায়ক | ১৯৩৯ | বেথুন কলেজ |
| ৪. | সীতা | বাল্মীকি | ১৯৩৯ | বেথুন কলেজ |
| ৫. | রাজা ও রানী | শংকর | ১৯৪২ | বেথুন কলেজ |

এই তালিকা থেকে দেখা যাবে তাঁর অভিনয়ের প্রাথমিক পর্ব শুরু হচ্ছে ১৯৩৪ সাল থেকে— তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো। স্কুল জীবনে ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে অভিনীত 'অভিমন্যু বধ' নাটকে ছোট্ট একটি ভূমিকায় সখীর চরিত্রে অভিনয় করেন। চুপচাপ একপাশে বসে মহলা দেখতেন আর সব পার্ট ছিল তাঁর মুখস্থ। আমাদের মনে পড়ে যাবে অভিনেত্রী নটী বিনোদিনীর কথা— নটসম্রাজ্ঞী তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন বারো বছর বয়সে দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকায় ছোট্ট একটি চরিত্রে অভিনয় করে। এক লাইনের একটি ডায়ালগের জন্য ভয়ে অস্থির হয়ে থাকতেন শোভা সেন। ওই বয়সে তাঁর মনোযোগ কতটা গভীর ছিল তিনি কতটা গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখেছিলেন তাঁর প্রমাণ মেলে। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, স্কুলে ও কলেজে তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলি ছিল প্রত্যেকটিই প্রায় পুরুষ চরিত্র, প্রথমটি ছাড়া। যেমন— শিবচরণ, নায়ক, বাল্মীকি, শংকর। একটা দৃপ্ত ভঙ্গি বা দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে ছিল নিশ্চয়ই সেই বয়স থেকেই। এই স্কুলে থাকতেই একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যায় উল্লেখ এখানে অবশ্যই করা উচিত। তিনি লিখেছেন— 'উঁচু ক্লাসে উঠে আমি একটি গীতিনাটিকা পরিচালনা করি। সেটি খুবই প্রশংসা লাভ করে। উৎসবটি ছিল ম্যাট্রিক ছাত্রীদের ফেয়ারওয়েল উপলক্ষে। উৎসাহ বোধ করলাম।'[২] এই উদ্ধৃতিটির মধ্য থেকে উন্মোচিত হয় কতকগুলি বিষয়— (১) তিনি গীতিনাটক পরিচালনা করলেন, (২) গীতিনাটকটি প্রশংসিত হয়, (৩) তিনি উৎসাহ বোধ করেছিলেন, (৪) স্কুল জীবনেই তিনি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তবে স্কুল ও কলেজ জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে নাটকের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেও আর কখনও পরিচালনার কথা ভাবেননি।

বেথুন কলেজে পড়বার সময় থেকে তাঁর অভিনয় সম্পর্কে আগ্রহ বাড়তে থাকে। কলেজে যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন সেই সময় ঘোষিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ— ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯।

ইকনমিক্সের ছাত্রী শোভা সেন বুঝতে পারছিলেন অন্ধকারের দিনগুলো এগিয়ে আসছে। সমস্ত পৃথিবী বিপদের মুখোমুখি। ভারতও তার আঁচ থেকে রক্ষা পাবে না। বেথুন কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করেন। বুঝতে পারছিলেন কেমন করে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে জীবনপ্রবাহ। সন্ধের পর থেকে জনজীবন স্তব্ধ— ব্ল্যাকআউট। তরুণী শিক্ষিত শোভা সেনরা ক্রমশ এক আতঙ্কের বাতাবরণে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন। কলেজেও নাটক করেছেন— 'শেষরক্ষা', 'কাঠুরিয়া', 'সীতা', 'রাজা ও রাণী'— কিন্তু এইসব নাটকের মধ্যে তো বদলে যাওয়া সময় বা পরিস্থিতির কোনও ছাপ নেই— থাকা সম্ভবও নয়।

১৯৪৪-এ গণনাট্য সংঘ-র আয়োজনে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে রাধিকা চরিত্রে অভিনয়সূত্রে তাঁর সামনে খুলে গেল একটা নতুন পথ— রাজনৈতিক আদর্শে প্রাণিত নাট্যের বৃহত্তর ক্ষেত্র। তখন তিনি বিবাহিত কিন্তু সাংসারিক বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে বন্দি নন। চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রেও মুক্ত স্বাধীন। সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন গণনাট্যের কাজে— পর পর অভিনয় করেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা', 'তরঙ্গ', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' ইত্যাদি নাটকে। তাঁর শিক্ষক বিজন ভট্টাচার্য শম্ভু মিত্রের মতো মানুষেরা। তাঁর সঙ্গী তখন তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র), মণিকুন্তলা সেন, কল্যাণী মুখোপাধ্যায় (পরে কুমার মঙ্গলম), বিভা সেন, ললিতা বিশ্বাস, সজল রায়চৌধুরী, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ এক ঝাঁক শিক্ষিত রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী তরুণ তরুণী। জীবন-বিশ্বাস-নাটক এর মধ্যে কোনও দেওয়াল নেই। 'গণনাট্য সংঘ'-য় তাঁর শেষ অভিনয় 'দলিল' নাটকে। ১৯৫৩ সালে যাঁরা গণনাট্য ছেড়ে বাইরে এসে নতুন দল গড়লেন 'নাট্যচক্র' নাম দিয়ে, তাঁদের সঙ্গে শোভা সেনও অভিনয় করলেন 'নীলদর্পণ' নাটকে সাবিত্রীর ভূমিকায়। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন জ্ঞান মজুমদার, বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধী প্রধান প্রমুখ। 'নীলদর্পণ'-এর পর অভিনীত হয় 'কলঙ্ক'। বিজন ভট্টাচার্যের লেখা 'কলঙ্ক' নাটকে অভিনয়ের সময় পেশাদারি মঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেত্রী প্রভা দেবীর সাহচর্য পান তিনি এবং তাঁর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় তাঁর। প্রভা দেবীকে শোভা সেন যেমন শ্রদ্ধা করতেন তেমনই তাঁর অভিনয় কুশলতার প্রতি ছিলেন গুণমুগ্ধ।

নাটকের পাশাপাশি চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ধারাবাহিকতাও তৈরি হয়। নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবিতে অভিনয় করতে করতেই ডাক আসে 'পরিবর্তন'-এ অভিনয়ের জন্য। 'বামুনের মেয়ে' ছবিতে জ্ঞানদার ভূমিকায় অভিনয় শোভা সেনকে চলচ্চিত্র জগতে প্রতিষ্ঠা দেয়। কিন্তু সিনেমা নয়— সেলুলয়েডের বাক্সে বন্দি থাকা নয়— তাঁর মূল ক্ষেত্র হল থিয়েটার। চলচ্চিত্র তাঁর

অর্থোপার্জনের মাধ্যম মাত্র, কিন্তু থিয়েটারকে ঘিরেই তাঁর স্বপ্ন-শ্রম-সার্থকতা।— তাঁর সাংগঠনিক শক্তির প্রকাশও এই থিয়েটারকে কেন্দ্র করে। মূলত গণনাট্য, গণনাট্য পরবর্তী পর্যায়ের পর উৎপল দত্তের সঙ্গে লিটল থিয়েটার গ্রুপ *(LTG)* ও পিপলস থিয়েটার গ্রুপ *(PLT)*-কে কেন্দ্র করেই তাঁর অভিনয় প্রতিভার ক্রমবর্ধমান সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে জোরালো হতে থাকে তাঁর সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা-দায়বদ্ধতা।

উৎপল দত্ত শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শোভা সেনকে ডেকে পাঠান। সুনীল রায় যিনি ছিলেন এল টি জি-র কোষাধ্যক্ষ তাঁর স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে শোভা সেন 'ম্যাকবেথ' নাটকে অভিনয় সম্পর্কে জানিয়েছেন— পঞ্চাশের গোড়ার দিকে যখন লিটল থিয়েটার গ্রুপ থেকে লেডি ম্যাকবেথ করার ডাক পান, সেদিন এই সুনীল রায়ই এসেছিলেন। উৎপল দত্তের বার্তা পৌঁছতে। 'আমাকে লেডি ম্যাকবেথ করতে হবে। এই সুযোগ পেয়ে আমিও খুশি। ...শুনেছি অভিনেত্রীদের জীবন যদি শেক্সপীয়রের নাটক দিয়ে শুরু হয় তবে তার আর সারাজীবন পেছন দিকে তাকাতে হয় না। বিশেষ করে লেডি ম্যাকবেথ-এর চরিত্র পৃথিবীর সব অভিনেত্রীদের কাম্য চরিত্র। এরকম চরিত্র পৃথিবীর নাট্যশালায় আর নেই। তাই আবেদন মঞ্জুর।'[৩]

লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রে অভিনয় করার সূত্রে উৎপল দত্তের সঙ্গে পথ চলা শুরু এবং পরবর্তী সময়ে জীবনেও তাঁকে গ্রহণ করলেন শোভা সেন প্রথম স্বামী দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর। মার্কসবাদী শোভা সেন ডায়ালেকটিক্স্-এ বিশ্বাসী। উৎপল দত্ত শুধু যে তাঁর স্বামী ছিলেন তা তো নয়— ছিলেন বন্ধু, ছিলেন কমরেড। সেই বন্ধু সেই কমরেড যাতে নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় কাজ করতে পারেন তার জন্য সব সময় তিনি সচেষ্ট থেকেছেন। রাজনৈতিক আদর্শই তাঁদের এতটা দৃঢ়বন্ধনে বেঁধে রাখতে পেরেছিল। 'আমারও একটা আদর্শ আছে, সঙ্গে রাজনীতিও আছে। ওই আদর্শই আমাকে রাজনীতির কাছে ও উৎপলের কাছে নিয়ে গেছে। যে মানুষের আদর্শ নেই সে উঠতে পারে না, বড়ো হতে পারে না। এই মিলটা হয়তো আমাদের পরস্পরকে কাছে এনেছে। উৎপলের সঙ্গে আমার এই আদর্শের জন্যই এত বন্ধন ছিল।'[৪]

উৎপল দত্ত পরিচালিত *LTG* ও *PLT* প্রযোজিত বহু নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে বছরের পর বছর অভিনয় করে গেছেন। অভিনয় দিয়ে তিনি সংস্থাকে যেমন ঋদ্ধ করেছেন, তেমনই তাঁর সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে দলকে সমৃদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি চলেছে চলচ্চিত্রে নিয়মিত অভিনয়। *LTG* কিংবা *PLT*-র অসংখ্য নাটকে তিনি মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। *LTG*-তে ২৪টি, ও

*PLT*-তে (লালদুর্গ পর্যন্ত) তাঁর অভিনীত নাটকের সংখ্যা প্রায় ২২টি; ১৯৪৯ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় সংখ্যা প্রায় ১৩৭টি। কিন্তু তাঁর অভিনয় সম্পর্কিত আলোচনা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। উৎপল দত্তকে নিরুপদ্রবে তিনি কাজ করে যাওয়ার পরিসরটি তৈরি করে দিতে চেয়েছিলেন। দৃঢ় মনোবল এবং অপরিসীম উৎসাহ নিয়ে দিনের পর দিন তিনি যে কাজ করে গেছেন তা নজিরবিহীন। এই নিবন্ধে তাঁর সেই সাংগঠনিক কাজ সম্পর্কিত আলোচনাই প্রাধান্য পাবে। হয়তো অত্যুক্তি মনে হতে পারে, তবে অনৃত নয় যে, *LTG* বা *PLT*-র মতো দলে যেখানে উৎপল দত্ত একটির পর একটি বৃহৎ মাপের প্রযোজনা করেছেন তা সম্ভব হত না যদি না শোভা সেনের মতো সহকর্মী সহযোদ্ধা তাঁর পাশে থাকতেন। উৎপল দত্ত তাঁর সৃষ্টির কাজে মগ্ন থেকেছেন— কিন্তু শিল্প বহির্ভূত অন্যান্য ক্ষেত্রে শোভা সেন ছিলেন কাণ্ডারির মতো। দু'হাতে সামলেছেন সংগঠনকে, আর্থিক সমস্যার মোকাবিলা করেছেন, অভিনেত্রীদের তৈরি করেছেন— নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি এই বিষয়গুলি নিজের হাতে সামলেছেন। একটি প্রযোজনাকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য যখনই অর্থের প্রয়োজন হয়েছে— সেই প্রয়োজন মেটানোর দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। রাজনৈতিক সংকটকালে নিজেদের মতাদর্শের প্রতি স্থির বিশ্বাস রেখে এগিয়ে গেছেন দৃপ্ত পদক্ষেপে। হয়তো মতবিরোধ হয়েছে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। উৎপল দত্তের পাশাপাশি থেকে লড়াইটা চালিয়ে গেছেন সমস্ত রকম প্রতিরোধের বিরুদ্ধে। নাটকের সঙ্গে সঙ্গে বহু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন— পেশাদারি মঞ্চেও তাঁর অভিনয়ের খ্যাতি যথেষ্ট ছিল এবং এই দুটি ক্ষেত্র থেকে যে অর্থ তিনি উপার্জন করেছেন তা তাঁর জীবনধারণের জন্য ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তিনি এই বিলাসিতার জীবনকে গ্রহণ করেননি। বরং বিপদসংকুল পথকেই বেছে নিয়েছেন থিয়েটারের স্বার্থে। ভারতীয় গণনাট্যের শিক্ষা তাঁর নাট্যজীবনকে চালিত করেছে। ফলত অর্থোপার্জন গুরুত্ব না পেয়ে— অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে দলের স্বার্থ। এই শিক্ষাই তাঁকে আজীবন চালিত করেছে। সেই শোভা সেন যখন গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে যুক্ত হলেন উৎপল দত্তের আহ্বানে তাঁর নাট্যদলে, সেখানেও তিনি তাঁর দায়বদ্ধতার কথায় বিস্মৃত হলেন না। তিনি নিজে কখনও নাটক পরিচালনার কথা ভাবেননি— বরং পরিচালক উৎপল দত্তকে সাহায্য করে গেছেন যাতে তিনি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারেন। 'আমরা কখনও বলিনি প্রোডাকশনটা তুমি কাটছাঁট করে পয়সা বাঁচাও। উৎপল সেটা কখনও করতে রাজি হত না— আমরা সেটা জানি। কারণ ও বলত নাটক যদি ভালো হয়— নাটক যদি লোকের ভালো লাগে তাহলে পয়সা আসবে।'[৫] উৎপল দত্তকে ছাপিয়ে নিজের প্রতিভাকে প্রচার করার কোনও তাগিদ দেখা যায় না তাঁর মধ্যে। কারণ তাঁরা ছিলেন বন্ধু। তাঁদের সম্পর্কটা তথাকথিত স্বামী-স্ত্রীর

সম্পর্কের অনুশাসনের মধ্যে বাঁধা ছিল না। কমরেডশিপ ছিল তাঁদের সম্পর্কের ভিত্তি। শোভা সেনকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছিলেন উৎপল দত্ত—

তোমার কাছে পাইনি ক্লীব বিশ্রাম
পাইনি নির্বোধ রাত্রের শান্তি
তুমি এক অবিরাম তাড়না
অশান্ত পথের হাতছানি,
গর্তভরা ভাঙা রাজপথে
তুমি এগিয়ে চলার দিশারী।[৬]

শোভা সেন শুধু অভিনয়ের মধ্যেই নিজেকে বন্দি রাখলেন না। স্বেচ্ছায় তুলে নিলেন সংগঠনের দায়িত্ব। অভিনয় ছাড়া নাটকের অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সপ্রতিভ নেত্রী। সাংগঠনিক কাজে তিনি বার বার নেতৃত্ব দিয়েছেন যখনই দল সমস্যায় পড়েছে। তাঁর আত্মত্যাগ, নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর শ্রম, দৃঢ় অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, অদম্য সাহস একটা প্রতিষ্ঠানকে সজীব সচল রাখতে সক্ষম হল।

১৯৪৪ সালে 'নবান্ন' নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শোভা সেনের নাট্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ আর তার দশ বছর পর উৎপল দত্তের আহ্বানে ১৯৫৪ সালে লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যোগ দিলেন এলটিজি-তে। ১৯৪৪-৫৪— এই সময়ের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে দেশভাগ থেকে ভারতের স্বাধীনতা, নিষিদ্ধ হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, কিন্তু কর্মভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে আর্থিক নিরাপত্তার প্রশ্ন। তবুও নাটকে অভিনয়ে সেই অর্থ উপার্জনের ভাবনা না রেখে শুধু মাত্র আদর্শগত কারণে কাজ করে যাওয়ার প্রবণতা মেয়েদের পক্ষে ছিল একাধারে সাহসের ও দায়বদ্ধতার। যে স্বল্প সংখ্যক বাঙালি মেয়েরা এই কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে শোভা সেন অগ্রণী। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। উৎপল দত্ত যাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন 'বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সংগঠক হিসেবে' কিংবা 'নাট্য আন্দোলনের সফল সম্পাদক' এই বিশ্লেষণে, আমরা সেই শোভা সেন সম্পর্কে বিশ্লেষণে প্রবেশ করব যে একজন সফল সম্পাদক ও সংগঠকের কী কী গুণ থাকতে পারে যার মাধ্যমে একটা দল সাংগঠনিক শৃঙ্খলায় সংঘবদ্ধভাবে চলতে পারে বা সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণা পায়। উৎপল দত্তের ব্যাখ্যা অনুসারে একজন দক্ষ সংগঠকের বিশেষত্ব হল— (১) সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখা। (২) বহু ধরনের মানুষকে একই সঙ্গে

শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখা। (৩) মঞ্চে অবতরণের লোভ সামলে নেপথ্যে থেকে যাবতীয় কাজ করে যাওয়া। (৪) টাকার জোগাড় করা। (৫) প্রয়োজনে নিজে ত্যাগ স্বীকার করে দলের আর্থিক সংকট মেটানো। (৬) সব সদস্যের ক্রোধ অভিমান সুবিধাবাদ স্বার্থপরতা সংকীর্ণতার কথা মাথায় রেখে প্রতিজনকে আলাদা আলাদা কায়দায় সহানুভূতি সহকারে বোঝানো বা প্রয়োজনে কঠোর শাস্তি প্রদান করা। এই বিশেষত্বগুলির সঙ্গে শোভা সেনের ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছিল আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। যেমন (৭) অভিনেত্রী জোগাড় করা, দলের মধ্যে মেয়েদের নানান সমস্যার মোকাবিলা করা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের বুঝিয়ে দলে নিয়ে আসা। (৮) দলের নিয়মানুবর্তিতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা ইত্যাদি। এই কাজগুলোয় শোভা সেন ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শোভা সেন মনে করেন মেয়েদের শুধু অভিনয় করলে চলবে না। থিয়েটারটা যাতে ভালভাবে করা যায় তার জন্য সংগঠন করা এবং সংগঠিত হয়ে চলাটা জরুরি। নৃপেন্দ্রনাথ সাহাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে[৭] জানাচ্ছেন যে ভাল সাংগঠনিক হতে গেলে ১. ইগোকে গুরুত্ব দিলে চলবে না। ২. সংগঠনকে সময় দিতে হবে। ৩. নিজেকে শাসন করতে হবে আবার সম্মানও দিতে হবে। ৪. নিষ্ঠার প্রমাণ দিতে ও নিতে হবে— নিজের বেলায় এবং অন্যের বেলায়। এই মনোভাব তাঁর মধ্যে কাজ করেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নাট্যের অভিমুখ গঠনে শুধু অভিনয় নয়, সংগঠনের দায়িত্ব বহনও মেয়েদের কর্তব্যের মধ্যেই বিবেচিত। দায়িত্ববোধ ও সচেতনতার জায়গাটা শোভা সেনের কাছে ছিল খুব স্পষ্ট। এই সাক্ষাৎকারেই জানালেন— ‘বিনোদিনীর আমল থেকে এ আমলটা অনেক এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সমাজটাকে বদলাতেই হবে। আমাদের দেশের অভিনেত্রীদেরও তাতে একটা বড়ো ভূমিকা আছে।’[৮] অর্থাৎ শুধু অভিনয় নয়, খ্যাতি যশ টাকাপয়সা উপার্জনের লক্ষ্য নয়— মঞ্চ শোভা সেনের কাছে সমাজ বদলের একটা মাধ্যম। তাঁর দীর্ঘ জীবনে যত দিন তিনি সক্ষম থেকেছেন অর্থাৎ প্রায় ৮০-৮৫ বছর ‘কল্লোল’-এ বসে পি এল টি-র যাবতীয় দায়দায়িত্ব সামলেছেন নিজের হাতে। শোভা সেনের এই সাংগঠনিক কর্মপ্রবাহকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে— (১) মিনার্ভা-পূর্ব এলটিজি *(LTG)* পর্ব (২) মিনার্ভায় এলটিজি *(LTG)* পর্ব (৩) পিএলটি *(PLT)* পর্ব (৪) উৎপল দত্তের প্রয়াণের পরবর্তী সময়।

### মিনার্ভা পূর্ব এল টি জি *(LTG)* পর্ব

মিনার্ভা অধিগ্রহণের পূর্বে *LTG* বা লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের কর্মকাণ্ডে শোভা সেনের অবদান সম্পর্কিত আলোচনা এই পর্বের অবলম্বন। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের সূচনা হয়। যদিও এই নাট্য দল প্রথমে ইংরেজি নাটকের অভিনয় করত। সিমানোভোর ‘দ্য রাশিয়ান

কোয়েশ্চন'-এর অনুবাদ 'সাংবাদিক' দিয়ে *LTG*-র বাংলা নাটকের শুরু। অনুবাদ করেছিলেন সরোজ দত্ত। শোভা সেন *LTG*-তে যুক্ত হওয়ার আগে বেশ কয়েকটি নাটকের অভিনয় হয়েছে এখানে–

| | নাটক | অভিনয়ের সময়কাল | অনুবাদ/রচনা |
|---|---|---|---|
| ১. | সাংবাদিক | ১৯৫২ | অনু: সরোজ দত্ত |
| ২. | পুতুলের সরকার | ১৯৫৩ | অনু: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় |
| ৩. | দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস (নির্বাচিত দৃশ্য) | ১৯৫৩ | অনু : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় |
| ৪. | কেরানি | ১৯৫৩ | অনু : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় |
| ৫. | অচলায়তন | ১৯৫৩ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| ৬. | বিচারের বাণী, চাঁদির কৌটো | ১৯৫৩ | অনু : উৎপল দত্ত |
| ৭. | ম্যাকবেথ | ১৯৫৪ | অনু : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত |

এই 'ম্যাকবেথ' (১৯৫৪) নাটকের সূত্রে শোভা সেন হলেন *LTG*-র সঙ্গে। মিনার্ভা থিয়েটার অধিগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই পর্বে-ও তিনি একটির পর একটি নাটকে অভিনয় করলেন এবং ক্রমশ দলের সমস্ত রকম কাজের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে দিলেন। এই পর্বে শোভা সেন অভিনয় করলেন— বিচারের বাণী (মেনকা দাসী, ৫৩-৫৪), ম্যাকবেথ (লেডি ম্যাকবেথ, ১৭ নভেম্বর ১৯৫৪), দ্বাদশ রজনী (মারিয়া, এপ্রিল ১৯৫৬), সিরাজদৌল্লা (লুৎফা, ২৩ জুন ১৯৫৭), তপতী (সুমিত্রা, ১৮ জুলাই ১৯৫৭), নীচের মহল (অন্নদা, ১৭ জুলাই ১৯৫৭), অলীকবাবু (পিসনি, ১৯৫৮), শোধবোধ (বিধুমুখী, ১১ মে ১৯৫৮), ওথেলো (এমিলিয়া, ৮ ডিসেম্বর ১৯৫৮), ছায়ানট (সুচরিতা, ১০ ডিসেম্বর ১৯৫৮), বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ (যতি/পুঁটি, ১৯৫৯), একেই বলে সভ্যতা (পয়োধরী, ১৯৫৯)। ছ'বছরে প্রায় ১৩টি নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করার মধ্য দিয়ে তাঁর অভিনেত্রী জীবনের অভিজ্ঞতা যেমন বাড়ল, তেমনই শোভা সেন ক্রমশ হয়ে উঠলেন দলের অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব। তখন তাঁর বয়স ৩১, পাঁচটা বছর তাঁকে নানান সমস্যা ও সংকটের পথে চলতে হয়েছে। কঠিন সব চরিত্র রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সামলাতে হয়েছে সাংসারিক অশান্তি— স্বামী সন্তানের দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালে চলেছে সিনেমায় অভিনয়। প্রায় দেড়শোর বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন এই সময়। পরে অবশ্য মিনার্ভা থিয়েটার নেওয়ার পর সময়ের অভাবে

ফিল্মে অভিনয় কমিয়ে দেন। তাতে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে— থিয়েটারের দায়িত্ব বাড়তে থাকার দরুনই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। তিনি লিখেছেন— ‘মিনার্ভা থিয়েটার নেওয়ার আগে পর্যন্ত প্রচুর ছবি করেছি।... সবই সংসারের জন্য। মিনার্ভা থিয়েটার নেওয়ার পর যে দায়িত্ব আসে এবং ক্রমাগত যে এগারো বছর মিনার্ভায় অভিনয় করেছি তাতে ফিল্মে সময় দেওয়া সম্ভব হয়নি।’[৯] এই পর্বে তাঁর সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণের ভিতটা তৈরি হচ্ছে। তখন সংসারের দায়ভারও তাঁর ওপর। এই পর্বে মুক্তি পেয়েছে নদ ও নদী (চিত্ত বসু, ১৯৫৪) প্রফুল্ল (চিত্ত বসু, ১৯৫৪), মরণের পরে (সতীশ দাশগুপ্ত ’৫৪), অন্নপূর্ণার মন্দির (নরেশ মিত্র), চিরকুমার সভা (দেবকুমার বসু), মহাকবি গিরিশচন্দ্র (মধু বসু), ত্রিযামা (অগ্রদূত), সূর্যতোরণ (অগ্রদূত)— পর পর খ্যাতনামা পরিচালকদের সঙ্গে বড় বড় ব্যানারে চলচ্চিত্রে কাজ করার পরও তাঁর জীবনকে কিন্তু আকর্ষণ করেছে সিনেমার রুপোলি পর্দা নয়— থিয়েটারের মঞ্চ। এই সময়-পর্বে তাঁর চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পরিসংখ্যান লক্ষ করার মতো— ১৯৫৮-র অক্টোবর ডিসেম্বরের মধ্যে ২টি, ১৯৫৫ সালে ৭টি, ’৫৬ সালে ৯টি, ’৫৭ সালে ৮টি, ’৫৮ সালে ৪টি, ’৫৯-এ ৯টি। ক্রমাগত চলচ্চিত্রে অভিনয়ের চাপ বেড়েছে কিন্তু এই পরিসংখ্যান উল্লেখ করার দুটি মূল কারণ— (ক) এ থেকে বোঝা যাচ্ছে কতখানি ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁকে থিয়েটারের কাজটা করে যেতে হয়েছে আর (খ) থিয়েটারের প্রতি ভালবাসার কারণেই পরবর্তী সময়ে এই চলচ্চিত্রের প্রতি আকর্ষণ তিনি কমিয়ে আনছেন। মূলত চারটি ধারায় প্রবাহিত থেকেছে এক ত্রিশোর্ধ্ব-নারীর নিরন্তর কর্মপন্থা। (১) চলচ্চিত্রে পরিশ্রমসাধ্য অর্থোপার্জন (২) নাট্যকর্মে মনোনিবেশ এবং আয়াসসাধ্য শ্রম (৩) পারিবারিক কাঠামোগত জটিলতা (৪) একটি দলের সার্বিক উন্নয়ন ভাবনা।

চলচ্চিত্রে যে কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কাজ করেছেন তার প্রমাণ ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত এই কয় বছরে তাঁর চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সংখ্যা প্রায় ৪০টি।

নাট্যকর্মেও তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু। চরিত্রটির গঠনে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন। ভূমিকায় অভিনয় ইতিহাসের এই রকম জটিল চরিত্র এবং উৎপল দত্তের মতো অভিনেতার পাশে দাঁড়িয়ে এই রকম একটি চরিত্রে রূপায়ণ তাঁর কাছে ছিল চ্যালেঞ্জ। প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে গেছেন— রিহার্সাল দিয়েছেন অক্লান্তভাবে। সব সময় ঘুমে জাগরণে সংলাপ বলে গেছেন। বাসে ট্রামেও নিস্তার নেই। সংলাপ বলেছেন বিড়বিড় করে। যাত্রীরা ভেবেছেন পাগল— কিন্তু এভাবে পরিশ্রম করে চরিত্রটি মনের মতো করে তৈরি করেছেন, তার পর শুরু হয়েছে অভিনয়ের সৌকর্য। দলের মধ্যে একটা ভাবনা ছিল যে শেক্সপীয়রের নাটক— বিষয় ও ভাবনায় সাধারণ মানুষকে ছুঁতে পারবে কি না? কিন্তু দেখা গেল ম্যাকবেথ যথেষ্ট

সফলতা অর্জন করেছিল এবং গ্রামগঞ্জ, শহর এমনকী শ্রমিক অঞ্চলের মানুষেরাও এ নাটক গ্রহণ করেছিলেন। শোভা সেন-এর *LTG*-র শুরুর দিকের এই নাটক, তবু তিনি কীভাবে এই সময় থেকেই সংগঠন সম্পর্কে ভাবিত তা একটি ঘটনার উল্লেখে আরও স্পষ্ট হবে। ম্যাকবেথ নাটকের শো ছিল যাদবপুরে। নাটকের শেষে সেক্রেটারি উদ্যোক্তাদের কাছে টাকা চাইতে গেলে তারা বললেন এবং রসিদ দেখালেন যে টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। সেই টাকার অঙ্ক পঁচাত্তর টাকা। 'বুঝলাম, বহু আগে উৎপল পঁচাত্তর টাকায় ঐ শো হবে বলে সই করে টাকা নিয়েছে। এত কম টাকায় কী করে এই নাটক হয়? যা হোক তখন আর আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু আমরা বুঝে ফেললাম উৎপল দত্তের বৈষয়িক বুদ্ধির দৌড়। উৎপল আর জীবনে অর্থকরী ব্যাপারে দায়িত্ব নেয়নি। আমরা বুঝেছি, এসব দায়িত্ব ওর হাতে না রাখাই ভালো।'[১০] এইভাবেই অর্থকরী ব্যাপারে উৎপল দত্তের ওপর ভরসা না রেখে নিজেই এ ব্যাপারে আস্তে আস্তে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। শুরুটা হয়েছিল এইভাবেই।

একটি সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে সমঝোতা করেই চলতে হয়। মেয়েদের মধ্যেও অনেক সময় সম্পর্ক ও বাস্তব সমস্যাকেন্দ্রিক নানান জটিলতা সৃষ্টির অবকাশ থাকে এবং আছে আজও। অভিনেত্রীদের নিয়ে যাবতীয় সমস্যার সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন শোভা সেন সব সময়। কিন্তু প্রথম যখন তিনি এলেন এবং লেডি ম্যাকবেথ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করলেন সেই সময় চলচ্চিত্রের জগতেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি। কিন্তু দলের মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কখনও তিনি অহংকারী মনোভাব বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করেননি। ম্যাকবেথ নাটকে আরও দু'/তিন জন মেয়ে যাঁরা অভিনয় করতেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক বজায় ছিল। মূল অভিনেত্রীও অন্যান্য সহ-অভিনেত্রীদের মধ্যে সম্পর্ক ও সমঝোতার জায়গা সংগঠনে সুস্বাস্থ্যের পরিবেশ তৈরি করে। অন্যথায় সংগঠনে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়। শোভা সেন 'থিয়েটারে আমরা মেয়েরা' প্রসঙ্গে লিখেছেন— ''ম্যাকবেথ'-এ আমরা দুটি বা কখনো তিনটি মেয়ে অভিনয় করতাম। আমরা যখন সবাই মিলে আনন্দ করতে বাইরে যেতাম সে কী অনুভূতি তা থিয়েটারের মানুষই জানবে। আমাদের ছিল না কোনো অর্থকরী লেনদেন, ছিল না কোনো স্বার্থ। কেবল নাটকের নেশাই আমাদের টেনে নিয়ে বেড়াত।'[১১]

নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বা সাহচর্য শুধু নয়— কীভাবে অভিনেত্রীদের বাস্তব সমস্যা সমাধান করে পরিস্থিতি অনুকূল করা যায় সেই শিক্ষা শোভা সেনের ভেতরেই ছিল। বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে তার প্রকাশ ঘটেছে। 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ'-এ যুক্ত হওয়ার আগেই একটি

ঘটনার প্রসঙ্গ এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য— ‘লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ’-এ অভিনয়ের পূর্বে নাট্যচক্রের হয়ে ‘নীলদর্পণ’ নাটকে সাবিত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন শোভা সেন। সময়টা ১৯৫৩ সাল। ‘নীলদর্পণ’ নাটকের এক অভিনেত্রী সীতাদেবীকে নিয়ে এক সমস্যা তৈরি হয়। তাঁর পারিবারিক সমস্যার জেরে তিনি শো করতে এসেও শো করতে পারলেন না, কারণ তাঁর স্বামী পুলিশ নিয়ে আসছেন তাঁকে অ্যারেস্ট করতে। শো-র আগে একজন অভিনেত্রীর অনুপস্থিতি এক চরম অবস্থার সৃষ্টি করে। সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন শোভা সেন। তখন শো-র আগে কোনও অভিনেত্রী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন তখন শোভা সেনের মনে পড়ল ইন্দিরা কবিরাজের কথা। তাঁকে এনে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে, পাখি পড়ার মতো পার্ট পড়িয়ে, পার্ট কেটে ছেঁটে— কোনওমতে শো-টা উতরে দেওয়া হয়। দলের মধ্যে তৈরি হওয়া সমস্যার সমাধানে শোভা সেন অনেক আগে থেকেই ছিলেন সক্রিয়। এই গুণ বা quality র কতকগুলি কারণ নির্দেশ করা যায় এইভাবে— (১) তাঁর ব্যক্তিত্ব (২) উপস্থিত বুদ্ধি (৩) অভিনেত্রীকে তৈরি করে নেওয়ার ক্ষমতা (৪) দলের প্রতি আন্তরিকতা (যে দলে যখন-ই অভিনয় করেছেন) (৫) সর্বোপরি গণনাট্য সংঘের শিক্ষা। এই সমস্ত গুণের সমারোহে ক্রমশ তিনি হয়ে উঠলেন এক সুযোগ্য ও অপরিহার্য সংগঠক। মিনার্ভা অধিগ্রহণের পর তাঁর এই ভূমিকা আরও দৃঢ় ও পরিণত হল।

**মিনার্ভা-পর্ব**

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের মিনার্ভা থিয়েটার অধিগ্রহণ নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। শোভা সেনের জীবনেরও এক বিশেষ পর্ব। কেননা এই পর্ব নাট্য-ইতিহাসে যেমন গৌরবের সাক্ষ্য বহন করল— আবার তেমনই দলগত অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে *LTG*-ও ভেঙে পড়ল। এই পর্বে শোভা সেন হয়ে উঠলেন দলের মধ্যে অপরিহার্য নেতৃত্ব। যদিও এই সময়ে শোভা সেনের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনেও এক চরম সংকট। অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, দলের মধ্যের ও বাইরের রাজনীতি, উৎপল দত্তের গ্রেপ্তার ও কারাবাস, শোভা সেনের সাংসারিক চরম অশান্তি— এ সবের মধ্যেও এগারো বছর ধরে মিনার্ভায় থিয়েটার চালিয়ে যাওয়ার সাহস— সবটা মিলিয়ে বলা যেতে পারে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের মিনার্ভা পর্ব এক উত্তাল সময়ের স্মারক। ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে মিনার্ভার লিজ শুরু হয়। ১৯৫৯ সালের ৩ জুলাই লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভায় শুরু করে তাদের ব্যবসায়িক থিয়েটার। কিন্তু কেন এল.টি.জি-র সংগঠকেরা একটি থিয়েটার হল অধিগ্রহণ করে চরম আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে থিয়েটার করবার বাসনাকে প্রশ্রয় দিলেন? মিনার্ভা গ্রহণের পূর্বে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ অন্যান্য গ্রুপের মতো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মঞ্চে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করেছে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে এসে পরিচালক উৎপল দত্তের ক্রমশ মনে হতে থাকে

যে, একটা স্থায়ী মঞ্চ না পেলে নিজস্ব থিয়েটার গড়ে তুলতে না পারলে সত্যিকারের ভাল নাটক প্রযোজনা করা সম্ভব নয়। বলা হয় যে যাযাবরের সৃষ্টি কখনও উচ্চমানে পৌঁছতে পারে না। উৎপল দত্তের থিয়েটার সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা যেভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পথে এগোতে চাইছিল সেই প্রেক্ষাপটে একটি স্থায়ীমঞ্চের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন দলের সকলেই। শোভা সেন-সহ দলের সদস্যদের সদর্থক অভিলাষেই মিনার্ভা অধিগ্রহণের চেষ্টা করা হয়। যদিও একটা আশঙ্কা, ছিল কেননা এর আগে 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থার মতো প্রতিষ্ঠিত দল মিনার্ভায় তাদের নাট্যাভিনয়ে সাফল্য পায়নি এবং তারা ছেড়েও দেয় এই হল। লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েই উৎপল দত্তের সাহসে ভর রেখে শোভা সেনের আর্থিক সাহচর্যে মিনার্ভা থিয়েটার ৯৯ বছরের জন্য লিজ নেয়। 'বিশ্বরূপা'য় লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের নাট্যোৎসব চলাকালীন বিশ্বরূপার মালিক রাসবিহারী সরকার *LTG*-কে প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিশ্বরূপার ব্যাপারে, কিন্তু এই সময়ই নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় মিনার্ভা সম্পর্কিত প্রস্তাব আনেন এবং মিনার্ভার মালিক কস্তুরচাঁদ জৈনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক হয় কেষ্ট কুণ্ডু ও উৎপল দত্ত হবেন যৌথভাবে দায়বদ্ধ 'লেসি'। যেহেতু কোনও গ্রুপের নামে মামলা করা কঠিন, তাই ব্যক্তিগতভাবে উৎপল দত্তের নামে লিজ দেওয়া হলে ব্যক্তি হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা সহজ হবে। আইনজীবী সতীন সেন, দলের সদস্য চিত্ত চৌধুরী, উকিল সলিল গঙ্গোপাধ্যায়— সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বন্দোবস্ত করে, কাগজপত্র প্রস্তুত করে 'মিনার্ভা' থিয়েটার লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের অধীনে গ্রহণ করা হয়।

'মিনার্ভা' থিয়েটার লিজ নেওয়া এবং সে ক্ষেত্রে একটা বিরাট অঙ্কের অর্থের ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে এলেন শোভা সেন। তিনি তাঁর উপার্জনের টাকায় টালিগঞ্জ অঞ্চলে যে বাড়ি বানিয়েছিলেন সেই বাড়ি স্বেচ্ছায় বন্ধক দিয়ে সেই টাকা থিয়েটারের স্বার্থে এনে দিলেন। ১৯৫৯ সাল— শোভা সেন তখন ছত্রিশ বছরের তরুণী। তাঁর দাম্পত্যজীবনে চলছে এই সময়ে প্রবল অশান্তি। তবু থিয়েটারের জন্যই শোভা সেন অশান্তির ভয়েও থমকে যাননি। স্বামীকে লুকিয়ে তাঁর স্বোপার্জিত অর্থে তৈরি বাড়ির দলিল বন্ধক দিয়ে বাংলার নাট্য-ইতিহাসে তৈরি করলেন এক দৃষ্টান্ত। শোভা সেনের আত্মজীবনীর ভূমিকা লিখতে গিয়ে উৎপল দত্ত তাই অকপটে লিখলেন— '...শ্রীমতী শোভা সেনের ছিল টালিগঞ্জে একটি বাড়ি যা তিনি চলচ্চিত্রে প্রাণপাত পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছিলেন। মিনার্ভা গ্রহণের প্রাথমিক ব্যয় বহন করার জন্য তিনি অবলীলাক্রমে সে বাড়ি বন্ধক রেখে টাকা এনে দিলেন দলের কোষাগারে। স্মর্তব্য, কোনো নিশ্চয়তা ছিল না টাকা ফেরত পাবার, এবং ১৯৫৯ সালের শেষ দিনটি পর্যন্ত একের পর এক নাটক দর্শক টানতে ব্যর্থ হয়েছিল। তার পর 'অঙ্গার' নাটক থেকে আমরা উপার্জনে সক্ষম হই এবং ক্রমে ক্রমে শ্রীমতী সেনের টাকা শোধ

করে তাঁর বাড়িটাকে পাওনাদারের হাত থেকে মুক্ত করি।'[১২]

পরবর্তী সময়েও দলের নানান আর্থিক সংকটে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শোভা সেন, কিন্তু থিয়েটারের জন্য নিজের বাড়ি বন্ধক দেওয়ার সাহস ও প্রত্যয় তাঁকে নাট্যক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভূমিকায় স্থাপন করল যা পরবর্তী সময়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকল শুধু *LTG* বা *PLT*-র ইতিহাসে নয়— সমগ্র বাংলার থিয়েটারের ইতিহাসে। একজন নারী হিসেবেও নাট্য-ইতিহাসে তাঁর স্থান স্বতন্ত্র হয়ে রইল। যে বাড়িটি তিনি থিয়েটারের স্বার্থে বন্ধক দিলেন সেই বাড়িটি তৈরির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারব শোভা সেনের জীবনে এই জমিটি ও বাড়ির মূল্য কতখানি। ১৯৪৯ সালে তিনি মাসতুতো ভাই মহাবীর সেনের কাছ থেকে এই জমিটি কিনেছিলেন। সেই সময় তিনি সবে ছবিতে কাজ শুরু করেছেন এবং প্রচুর ছবিতে কাজ করছিলেন— সেই ছবিতে কাজ করার টাকাটা তিনি কাজে লাগালেন টালিগঞ্জে দশ কাঠা জমি কিনে।— ধারদেনা করেই তিনি বাড়িটি ধীরে ধীরে তৈরি করেছিলেন— এই সময় সংসারের প্রতিও তিনি দায়বদ্ধ কেননা শ্বশুরমশাই অসুস্থ, ছোট দেওয়ের দায়িত্ব তাঁর ওপর কারণ স্বামীর একার রোজগার যথেষ্ট নয়। তবু বহু কষ্টে 'বাবলা' ছবি হিট করার কারণে এর হিন্দি ভার্সান তৈরি হওয়ার সময় সুযোগ বুঝে ছবির প্রোডিউসারের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে ও নিজের পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করেন বাড়ির কাজ। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ করে বাড়ি তৈরি করা এবং তারও আগে জমি কেনা নিজের টাকায়— এবং পরে সেই বাড়িটিই থিয়েটারের জন্য বন্ধক দেওয়া ছিল অবশ্যই এক ধরনের রক্তক্ষরণ। অথচ তা করতেও পিছ-পা হননি শোভা সেন। এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে থিয়েটারের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা। দলের প্রতি তাঁর আনুগত্য, দলের সংকটকালে তাঁর দায়িত্বশীলতার একটা ছবি স্পষ্ট হল। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল বলেই তিনি স্বামীর মতামত অগ্রাহ্য করেই কাজটি করতে পেরেছিলেন। আত্মবিশ্বাস কতটা জোরালো থাকলে তবেই এত বড় স্বার্থত্যাগ সম্ভব। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা আমাদের বিস্মিত করে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শুধু সমাজে নয়— মেয়েদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

মিনার্ভা লিজ নেওয়ার সময় থেকেই শোভা সেন কিন্তু এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে লড়াই করে যাচ্ছেন। সেই লক্ষ্য অবশ্যই থিয়েটার। এই সময়ে তাঁর ব্যক্তিজীবনেও ঝড় বইছে— স্বামীর সঙ্গে প্রত্যেকটা মুহূর্তে সংঘাত বাধছে। স্বামীর মত 'হয় থিয়েটার ছাড়ো, নয় আমাকে ছাড়ো।'— শোভা সেনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত— থিয়েটার তিনি কোনওদিনই ছাড়তে পারবেন না। ১৯৫৯ সালের ৩ জুলাই সেদিন এল.টি.জি মিনার্ভা অধিগ্রহণ করে প্রথম অভিনয় শুরু করে— সে দিন

শোভা সেনের বাড়িতে যে চরম সংকট উপস্থিত হয় তাকে নিয়ন্ত্রণে এনে অভিনয়ে এবং নতুন একটি এত বড় কাজে মনঃসংযোগ করা কতটা কঠিন ছিল, যাঁরা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত বা যুক্ত নন তাঁরা সকলেই অনুধাবন করতে পারবেন। ৩ জুলাই মিনার্ভার উদ্বোধন আর তার ২/৩ দিন আগে অর্থাৎ ৩০ জুন শোভা সেনের স্বামী বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। তার আগে থেকেই শোভা সেনের ওপর চলেছে তাঁর স্বামীর অত্যাচার, নির্যাতন— কখনও রাত্রে মদ্যপান করে এসে মারধরও করেছেন স্ত্রীকে। কারণ হিসেবে শোভা সেন উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর স্বামীর 'লাম্পট্য' ও 'দ্বৈতজীবন'-এর কথা জানতে পেরে গেছেন। এই সময় উৎপল দত্ত পেইং গেস্ট হিসেবে তাঁদেরই বাড়িতে থাকছিলেন এবং এই থাকতে দেওয়ার ক্ষেত্রে দেবপ্রসাদ সেনের বিশেষ সম্মতি ছিল— তিনিই তাঁকে সাদরে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন। এই তীব্র মানসিক টানাপোড়েনের মধ্যে চলেছে 'মিনার্ভা' থিয়েটারের উদ্বোধন, অভিনয় ও কর্মপন্থার উদ্যোগ। শোভা সেনকে দ্বিমুখী যুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে— পরিবারের ভাঙন-অশান্তি এবং থিয়েটারের জন্য নেওয়া বিরাট চ্যালেঞ্জ। শোভা সেনের স্বামীর কী অভিমত, এই সময় কেন তিনি অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছেন, কিংবা উৎপল দত্তকে স্বেচ্ছায় ডেকে এনে *LTG*-র চরম সংকটের দিনে তাঁকে হেনস্থা করছেন— এর কোনও উত্তর আমরা পাই না। তবে এইটুকু অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আসে আমাদের সামনে যে, জীবনের কোনও অবস্থাতেই— সে যত অশান্তি, কষ্ট বা যন্ত্রণা-ই হোক না কেন— শোভা সেন নিজের মতাদর্শে, সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে থিয়েটার। তুহিন চট্টোপাধ্যায় শারদীয় 'আজকাল'-এর ১৪০৭ সংখ্যায় একটি রচনা লিখেছেন 'কল্লোলের জয়জয়ন্তী' শিরোনামে। সেখানে তিনি লিখছেন— 'প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, শোভা সেন যদি তাঁর প্রথম স্বামী পেশাগত দিক থেকে যিনি ছিলেন সি. এ. দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তর মধ্যবিত্ত গোঁড়ামি মেনে নিয়ে থিয়েটার ছাড়তেন বা স্বামীর নির্যাতনকে স্ত্রীর পরম প্রাপ্য ভাবতেন, তবে আমরা শোভা সেনের মধ্যে আর যাই থাক, আধুনিকতা খুঁজে পেতাম না। তাঁকে শ্রদ্ধা করার কোনও দায়ও থাকত না। কিন্তু তিনি অভিনয় ছাড়েননি, ছেড়েছেন অভিনয় ছাড়তে বলা স্বামীকেই।'[১৩]

শোভা সেন না তাঁর স্বামী দেবপ্রসাদ সেন— কে ঠিক ছিলেন, বা কার পক্ষের যুক্তি গ্রহণযোগ্য সেই বিতর্কে না গিয়ে একটা কথা আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সংগঠনের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন শোভা সেন এবং তা সক্ষম জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তিনি ছাড়তে পারেননি বা তার থেকে দূরে সরে যাওয়ার কথা কখনও ভাবেননি। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দর্শক কিন্তু জানতেও পারল না, কী সাংঘাতিক ঝড়ঝাপটা সামলে একজন অভিনেত্রীকে নাট্যনির্মাণের কারিগর হতে হল। নাট্যমঞ্চের নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের মধ্যেই অতিবাহিত হতে

পারত তাঁর জীবন। কিন্তু কেন তিনি বড় একটা ঝুঁকি নিতে গেলেন? তার কারণ থিয়েটার। বলতে দ্বিধা নেই যে *LTG*-র মিনার্ভা অধিগ্রহণ পর্বে শোভা সেনের মতো দক্ষ সংগঠক না থাকলে *LTG* একের পর এক সফল প্রযোজনা দর্শকদের দিতে পারত না। প্রখ্যাত আলোকশিল্পী তাপস সেন— যিনি এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনিও স্বীকার করছেন অকপটে— 'সংগঠনেও শোভাদির বিরাট ভূমিকা। মিনার্ভা-যুগে অর্থ সংগ্রহের গুরুদায়িত্ব ছিল শোভাদির ওপর। বন্ধু সুশীল করণের কাছে শুনেছি— শোভাদি কল্লোলের সেট বানাবার জন্য টাকা ধার করেছিলেন তাঁর কাছে। আবার শোধও করেছিলেন 'কল্লোল' সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ... উৎপল দত্তের অঙ্গার, কল্লোল, মানুষের অধিকারের পেছনে শোভাদির বড়ো ভূমিকা ছিল। ... হয়তো সৃষ্টিই হত না যদি না শোভাদি এল. টি. জি.-র সাংগঠনিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেন।'[১৪]

এই মিনার্ভা-পর্বে শোভা সেন নানান চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যেমন নিজেকে মঞ্চাভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনই সংগঠনকে দৃঢ় নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলায় বেঁধে রেখেছেন। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর অভিনয়ের খ্যাতি। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র যতি, 'অঙ্গার'-এ বিনুর মা, 'ফেরারী ফৌজ'-এ বঙ্গবাসী দেবী, 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ বাসন্তী, সর্বোপরি 'কল্লোল'-এ কৃষ্ণাবাঈ— তাঁর অনবদ্য চরিত্র সৃজন।

কিন্তু তাঁকে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্পূর্ণ ভিন্নক্ষেত্রে। এই মিনার্ভা পর্বেই ঘটে যাচ্ছে এমন কিছু ঘটনা যা এল. টি. জি-র কাছে হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, একেবারে সম্মুখভাগে রয়েছেন শোভা সেন। ১৯৭০ সালে মিনার্ভা ছেড়ে দেওয়ার আগেই উৎপল দত্ত ও লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ-এর নয়জন সদস্য মিলে গড়ে তোলেন 'বিবেকযাত্রা সমাজ'। উৎপল দত্ত জানাচ্ছেন— 'আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ টিকবে না। ওরা টিকতে দেবে না। ওরা চায় না যে Little Theatre Group থাকুক। কিন্তু আমাদেরকে তো নাট্য আন্দোলন করে যেতেই হবে। অভিনয় করেই যেতে হবে। তো লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ উঠে গেলে আমরা তখন কী করব? আমরা তখন ওই দল Organize করে ফেলি। লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ-এরই নয়জন সদস্য আমরা।'[১৫] ওই দল অর্থাৎ 'বিবেক যাত্রা সমাজ'। আর এই নয়জন সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই একজন শোভা সেন। লিট্‌ল থিয়েটার ভেঙে যাওয়ার পর তৈরি হয় পিপ্‌ল্‌স লিট্‌ল থিয়েটার।— ওই একই সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত জানাচ্ছেন— ''কিন্তু তারপর যখন লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে, ওরা মিনার্ভা থেকে চলে গেল, ...আমরা নামটা ক্লেম করলাম, এই তো ব্যাপার।'[১৬] এই সমস্ত অভিযানের সঙ্গী ছিলেন উৎপল দত্তের পাশে

শোভা সেন। ফলে গৌরবের দায়ভার যেমন বহন করেছেন— সমালোচনা, কুৎসা, দুর্ব্যবহারের বোঝাও কাঁধে নিতে হয়েছে তাঁকে। এক দিকে একটির পর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রূপদান ও সাফল্য, আবার তারই সঙ্গে সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে সাংগঠনিক দায়দায়িত্ব, অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর দেখভাল, সংগঠনের ভিতরে-বাইরে অপ্রীতিকর রাজনীতির মোকাবিলা করা। প্রথম যেদিন মিনার্ভা থিয়েটার উদ্বোধন হবে— 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটক— সে দিন যে মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মঞ্চে উঠতে হয়েছে একজন অভিনেত্রীকে, সেই ঘটনার উল্লেখ অত্যন্ত জরুরি। এই সময়ে তাঁর ব্যক্তিজীবনে স্বামীর সঙ্গে চলছে প্রবল অশান্তি এবং তিনি বাড়ি ছেড়ে চলেও গেছেন। কিন্তু উদ্বোধন যে দিন হবে সে দিনের অভিজ্ঞতা লিখেছেন শোভা সেন তাঁর আত্মজীবনীতে— 'মিনার্ভা উদ্বোধনের দিন একটু তাড়াতাড়ি থিয়েটারে চলে এসেছি। অনুষ্ঠান শুরু হতে আর অল্প কিছুক্ষণ বাকি। হঠাৎ বাড়ি থেকে মিনার্ভায় ফোন এল। শুনছি, ওদিক থেকে বাবু চিৎকার করছে 'মা, বাবা আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি যাব না। তুমি শিগ্‌গির এস।' সেই ভয়ানক দিনটার কথা মনে পড়লে এখনও বুক কেঁপে ওঠে। আমার সমস্ত শরীর রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে কাঁপছে। ...আমি কাঁদছি, গ্রুপের ছেলেমেয়েরাও আমার অবস্থা দেখে বিহ্বল। নিমাই ঘোষ তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি নিয়ে এল। বিডন স্ট্রিট থেকে টালিগঞ্জ, রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। উড়ে যেতে চাইছে মন। ... ছেলেকে নিয়ে চলে এলাম হ্যারিসন রোডে বাপের বাড়ি। ওকে ওখানে রেখে থিয়েটারে গেলাম।

ততক্ষণে কার্যসূচি শুরু হয়ে গেছে। বক্তৃতাদি প্রায় শেষ। আমার আসার অপেক্ষায় সবাই উদ্বেগে অপেক্ষা করছে। কোনোরকমে পোশাক পরে, একটু মুখ পরিষ্কার করে নেমে গেলাম। শো ভালোই হল। সেদিন অনেকের ঈর্ষা, অনেকের আশীর্বাদ কুড়িয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল।[১৭] মিনার্ভার শুরুর সময় থেকে নানান সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ হাঁটতে হয়েছে এল টি জি এবং অবশ্যই এই দলের অন্যতম নেত্রী শোভা সেনকে। পারিবারিক জীবনের ধাক্কা সামলাতে সামলাতেও হেরে যাওয়ার কথা দূর স্বপ্নেও মনে আনেননি। থিয়েটার হল মিনার্ভাকে খানিকটা সুবিন্যস্ত করে তাঁরা নিয়মিত অভিনয় শুরু করেন ২৭ জুলাই থেকে। তখন মিনার্ভায় অভিনয়ের দিন ধার্য ছিল প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিন।

মিনার্ভায় যে ধরনের দর্শকের সমাগম হত তাঁদের রুচির সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে পারেনি হয়তো *LTG*। তাই প্রথমে দিকে 'ছায়ানট' বা 'ওথেলো' বেশি দিন চলেনি। ১৯৫৭ সালে তাঁরা অভিনয় করেছিলেন 'নীচের মহল' (গোর্কির 'দ্য লোয়ার ডেপথস' অবলম্বনে), যে নাটকের জনপ্রিয়তা ও

দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে *LTG*-র সদস্যরা ছিলেন একেবারেই নিশ্চিত, কিন্তু সেই 'নীচের মহল'ও যখন মিনার্ভায় এসে আগের জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে পারল না, তখন অত্যন্ত সংকটের মুখোমুখি দল। প্রচুর অর্থব্যয়ে যে থিয়েটার তাঁরা লিজ নিয়েছেন তা চালাতে না পারলে বিরাট একটা সমস্যা তৈরি হবে এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা। যাঁরা সত্যিই দলকে নিয়ে ভাবছেন তাঁদের মধ্যে অবশ্যই অন্যতম শোভা সেন। এই সময় তিনি এবং তাঁর মতো সচেতন, দলের প্রতি অনুগত সদস্যদের রাতের ঘুম চলে গেছে— চিন্তায় ভাবনায় তাঁরা অস্থির— এই চিন্তা-ভাবনা সমস্যা-সংকট থেকে *LTG* মুক্ত হল 'অঙ্গার' নাটক প্রযোজনার মাধ্যমে। বিষয়বস্তু একেবারেই অভিনব বাস্তব। কিছু দিন আগে বড়াধেমোর কয়লাখনিতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাকে নিয়ে হল নাটক। একুশ দিন ধরে বড়াধেমোর কয়লাখনিতে আটকে যাওয়া ন'জন শ্রমিকের জীবনের টানাপোড়েন, বেরিয়ে আসার ঘটনাকেন্দ্রিক এই নাটক *LTG*-কে বাঁচার পথ দেখাল। 'অঙ্গার'-এর সেট তৈরি করেছিলেন নির্মল গুহ রায়; আলোক পরিকল্পনা ছিল তাপস সেনের। যদিও এই নাটকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংযোজনী পণ্ডিত রবিশংকর এবং সে বিষয়ে একটি প্রাককথন রয়েছে। তা এই যে, বছর দুয়েক আগে পণ্ডিতজি দেখতে এসেছিলেন 'নীচের মহল'। সেদিন প্রায় দর্শকশূন্য প্রেক্ষাগৃহ। তিনি এ নাটক দেখে চমৎকৃত হন। সঙ্গীত শিল্পী কথা দেন *LTG*-র পরের নাটকে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন তিনি। 'অঙ্গার' নাটকের সঙ্গীত ভাবনায় রবিশংকরের জাদুস্পর্শ, মঞ্চ ভাবনা, আলো, উৎপল দত্তের বাস্তব-অন্বেষু বিষয়সন্ধানী নাটক আর একঝাঁক তরুণ তরুণীর উদ্দাম উৎসাহ আর উদ্দীপনায় 'অঙ্গার' বাংলা নাট্যমঞ্চে নিঃসন্দেহে বিস্ময় সংযোজন। কিন্তু 'অঙ্গার'-এর আগে 'মিনার্ভা' থিয়েটারকে কেন্দ্র করে সমস্যা দানা বেধে উঠছে। এমন-ই একটা অবস্থা যে এই নাটক যদি দর্শকের সমর্থন বা আনুকূল্য না পায় তা হলে হয়তো *LTG*-কে মিনার্ভা ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু 'অঙ্গার' সাফল্য লাভ করেছিল— সাধারণ মানুষ তাঁদের পছন্দের রায় জানিয়েছিলেন এই নাটকের পক্ষে— বাণিজ্যিকভাবেও সফল হয়েছিল 'অঙ্গার'।

তাপস সেন যিনি এ নাটকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন, তিনি জানাচ্ছেন কীভাবে 'অঙ্গার' বদলে দিল *LTG*-র মিনার্ভা পর্বের হিসেব নিকেশ। উৎপলের প্রথম জনপ্রিয় নাটক 'অঙ্গার'। 'উত্তর কলকাতার থিয়েটার জনাকীর্ণ হতে আরম্ভ করল। আমাদের আগের ধারদেনা-সংকট সব সমস্যার এ রকমভাবে সমাধান হল। ওই একটা থিয়েটার চলল। সেটি স্মরণীয় হয়ে রইল। ওটা একটা টার্নিং পয়েন্ট। তার আগে শেকসপিয়রের নাটক, গোর্কির গল্প অবলম্বনে নাটক এবং উৎপলের 'ছায়ানট' তেমন সাফল্য পায়নি। 'অঙ্গার'-ই প্রথম একটা নাটক যেটাতে সাধারণ দর্শক বাণিজ্যিকভাবে আসতে শুরু করল।'[১৮] তার প্রমাণ পাওয়া গেল মাত্র ছয়মাসের মধ্যে (৩১

ডিসেম্বর ১৯৫৯-২৯ মে ১৯৬০) 'অঙ্গার' শততম রজনী পূর্ণ করল। এ ছাড়া অঙ্গার পর্বে দু'তিন মাস *LTG* পারিশ্রমিক দিতে পেরেছিল। মূলত থিয়েটার থেকে পারিশ্রমিক পাওয়ার মতো কোনও অবস্থা ছিল না। মিনার্ভায় অভিনয় চালানোটাই কষ্টকর ছিল। থিয়েটার করার টাকা জোগাড় করাটাই ছিল মূল লক্ষ্য। এ ছাড়া মিনার্ভার শিফটার, গেটম্যান, ইলেকট্রিশিয়ান সবাইকে মাইনে দিতে হত। 'অঙ্গার'-এর মাধ্যমে যদি বা আর্থিক সুরাহা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করা গেল কিন্তু 'অঙ্গার'-এর ওপর শুরু হল অভিযোগ-আক্রমণ। প্রথম সারির দৈনিকে বলা হল এ নাটকে শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের কাহিনি মিথ্যা। অনেকেই এ নাটকের দিকে অভিযোগের আঙুল তুললেন অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের কারণে ইত্যাদি। যাবতীয় অভিযোগের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল উৎপল দত্তকে। কিন্তু সতীর্থরাও তাঁর পাশে ছিলেন। এ নাটকের বিশিষ্ট চরিত্রাভিনেত্রী (বিনুর মা) শোভা সেনকেও লড়াই করতে হল। তাঁর লড়াই ছিল ত্রিমুখী (১) প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকার আক্রমণের মোকাবিলা, (২) ধারদেনা শোধ করার জন্য নিরন্তর লড়াই, (৩) ব্যক্তিগত জীবনের চরম পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়ানো। শেষোক্ত লড়াই অন্তিমপর্বে গিয়ে দাঁড়াল— যখন দেবপ্রসাদ সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে গেল ১০ মার্চ, ১৯৬০; একটি বাঙালি মেয়ের কাছে এই ঘটনা তীব্র বেদনার, অসহনীয় যন্ত্রণার— কিন্তু সমস্ত রাগ দুঃখ, অভিমান-বঞ্চনা, অত্যাচার অবিচারের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে তিনি সোচ্চার হন— 'আমি এবার মুক্ত। ... আমি জানি, আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমি অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি, নারীত্বের লাঞ্ছনা ও অপমানের শোধ নিয়েছি শুধু। ... কত মেয়ে এভাবে নির্যাতিত হয়ে শেষ হয়ে যায় তার ইয়ত্তা নেই। আমি চেয়েছিলাম, আমি তাদের কাছে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকব। আমায় দেখে তারাও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে পুরুষশাসিত সমাজকে উপেক্ষা করতে শিখবে।'[১৯]

শোভা সেনের এই বয়ানটি তুলে ধরার একটিই কারণ, তা হল আমরা দেখতে পেলাম একটি মেয়েকে— যে একই সঙ্গে ভীষণ একটা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনে ও নাট্যিক জীবনে। ব্যক্তিজীবনের সংগ্রামের অবসান ঘটছে ১৯৬১-তে— উৎপল দত্তের জন্মদিনের দিন; ২৯ মার্চ শোভা সেন ও উৎপল দত্ত আইনসম্মত বিবাহবন্ধনে নিজেদের বেঁধে নিচ্ছেন। ব্যক্তিগত জীবন আর নাট্যিক জীবনের মধ্যে সংঘাত হয়তো শেষ হল উৎপল দত্তের সঙ্গে বিবাহের পর কিন্তু নাটকের জন্য নাট্যদলকে সচল সজীব রাখার লক্ষ্যে যে অবিরাম সংগ্রাম, তার অবসান ঘটেনি তাঁর জীবনে। প্রশ্ন ওঠে এই জীবনীশক্তি তিনি কোথা থেকে পান? কিছু কিছু মানুষ তাঁদের জীবনের লক্ষ্যের প্রতি এতটাই দৃঢ় ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন যে, তাঁরাই পারেন পারিপার্শ্বিককে অগ্রাহ্য করে স্থির লক্ষ্যের দিকে পৌঁছে যেতে। শোভা সেনের চারিত্রিক মূল বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে—

(১) দৃঢ়, অনমনীয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানসিকতা

(২) স্পষ্টবাদিতা

(৩) সকলের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব বা ডমিনেটিং পারসোনালিটি

(৪) বাস্তববুদ্ধি

(৫) নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি স্থিরবদ্ধ থাকা

(৬) আত্মবিশ্বাস

(৭) কর্মদক্ষতা

(৮) পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতনতা

এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির জোরেই শোভা সেন সংগঠনের উন্নতির জন্য যেমন কাজ করেছেন, তেমনই সংগঠনের ভেতরে বাইরে যখনই সংঘাত বেঁধেছে, তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখা গেছে। 'অঙ্গার' তিনশো রজনী (১৯৬১-র ৩০ এপ্রিল) সফলতার সঙ্গে চললেও একই নাটকের সফলতার পুনরাবৃত্তির ফায়দা না তোলার অভিপ্রায়ে 'অঙ্গার' বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর পর 'ফেরারী ফৌজ' হয়েছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন' হয়েছে; কিন্তু 'কল্লোল' (২৯ মার্চ, ১৯৬৫) মঞ্চস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাস ও অবরোধ একই সঙ্গে ঘিরে ধরল 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'কে। শোভা সেন তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন 'কল্লোল' প্রযোজনার সময়। মিনার্ভা পর্বে *LTG*-র প্রযোজনায় 'কল্লোল' এক বিপ্লব— এক আন্দোলনের প্রতীক। ১৯৬৫ সালের ২৯ মার্চ উৎপল দত্তের জন্মদিনে প্রথম অভিনয় হয় কল্লোল-এর। 'খাইবার' জাহাজটাই যেন স্টেজে উঠে এসেছিল। উৎপল দত্তের চিন্তার, মঞ্চ পরিকল্পনার বৃহৎ ব্যাপক বিস্তৃতি মঞ্চরূপ পেল। এর আগে ১৯৬২-তে সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণের সময় উৎপল দত্ত ও শোভা সেন দেখেছিলেন নিকোলাই আখলোপকভের পরিচালনায় 'দি ওশান' নাটক। শোভা সেন লিখেছেন 'কল্লোল' নাটক প্রযোজনা পরিকল্পনার সময় 'দি ওশান'-এর কথা তাঁদের মনে ছিল।

'কল্লোল'-এর পরিকল্পনা, সাফল্য, জনপ্রিয়তা, নাট্যজগৎকে তোলপাড় করে দেওয়ার কথা সকলের জানা। কিন্তু এবার আমাদের একটু অন্য দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আগেই আমরা বলেছি এই 'কল্লোল'-এর সেট প্রস্তুতির জন্য শোভা সেন টাকা ধার করেছিলেন সুশীল করণের কাছ থেকে, তাপস সেন এ কথা জানাচ্ছেন। দর্শক দেখে গেল বিশাল মঞ্চ, অনবদ্য অভিনয়, অভূতপূর্ব পরিচালনা। কিন্তু দর্শকের আড়ালে থেকে গেলেন সেই নারী শোভা সেন, যাঁর প্রচেষ্টায় অর্থ জোগাড় হল। 'কল্লোল' সাফল্য পেল। অভিনয়ও করলেন কৃষ্ণাবাঈ-এর চরিত্রে— যা শোভা

সেনের অভিনয় জীবনের এক স্মরণীয় সংযোজন।

কিন্তু 'কল্লোল'-কে কেন্দ্র করে বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ল— বিচলিত হল তৎকালীন সরকার। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বন্ধ হল। গ্রেফতার হলেন উৎপল দত্ত ও জোছন দস্তিদার। তাপস সেন লিখছেন— 'স্টেটসম্যান ছাড়া সমস্ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেল। এটাকে আমরা আন্দোলন হিসাবে, চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিলাম। উৎপল গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও 'কল্লোল' কিন্তু একদিনও বন্ধ হয়নি। আমরা 'কল্লোল চলছে চলবে' স্লোগান দিয়েছিলাম।'[২০]

— এই সময়ে সামনে এগিয়ে এলেন শোভা সেন। যে নাটক 'দিল্লির গদি' পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে, সেই নাটকের পরিচালককে গ্রেফতার করা হল পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধবিরতির পরের দিন। দলের প্রত্যেকে তখন ভীত সন্ত্রস্ত— গ্রেফতার হওয়ার ভয়— এই অবস্থায় দলকে নেতৃত্ব দিলেন শোভা সেন। তিনি কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করলেন না। শত্রুপক্ষকে অগ্রাহ্য করে তিনি তৈরি করলেন নিজেকে, সাহস সঞ্চয় করলেন— উৎপল দত্তের কথা মনে রেখে আরও শক্তি সংগ্রহ করলেন। দেখা যাচ্ছে একটি নাট্যদলকে মানসিক শক্তি জোগাবার জন্য কীভাবে নিজেকে শক্ত রেখেছিলেন তিনি। — উৎপল দত্তের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, অন্যান্য বন্দিদের খাওয়া দাওয়ার সাংঘাতিক অসুবিধা— শোভা সেন তাঁদের জন্য খাবার তৈরি করে নিয়ে গেছেন। দলের সকলের মনে সাহস জোগাচ্ছেন— আবার জেলে গিয়ে উৎপল দত্ত-সহ বন্দিদের খাবার জোগাচ্ছেন। আবার তারই সঙ্গে 'কল্লোল'-এর শো যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে সে দিকেও নজর রাখছেন। এরই মধ্যে শ্যুটিং করছেন, ছোট্টমেয়ের দেখাশোনা করছেন। যেন দশ হাতে সামলাচ্ছেন সমাজ সংসার কর্মক্ষেত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি। মানসিক দিক থেকেও তাঁর সহনশীলতা কতখানি তা বোঝা যায় 'কল্লোল'— এই সময়কালের পর্যালোচনায়। এই সময় সংবাদমাধ্যম থেকেও শুরু হয় বিরোধিতা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত দুটি পত্রিকা 'কল্লোল'-এর বিজ্ঞাপন ছাপা বন্ধ করে দেয়। তবে সাধারণ মানুষ গর্জে উঠেছিল 'কল্লোল'কে কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত ও অন্যান্য কমরেডদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে। এগিয়ে এসেছিলেন বুদ্ধিজীবীরাও। তাপস সেন তৈরি করেছিলেন স্লোগান— 'কল্লোল চলছে চলবে।' বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, হোর্ডিং-এ বিজ্ঞাপনে 'কল্লোলিনী কলকাতা' প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। ঢেকে গিয়েছিল প্রতিবাদে স্লোগানে তিলোত্তমা নগরীর মুখ। উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদার, জ্যোতি বসু প্রমুখ বামপন্থী নেতারা জেল থেকে ছাড়া পেলে ময়দানের জন কলরবে উদ্‌যাপিত হয়েছিল 'কল্লোল বিজয়োৎসব', ৭মে, ১৯৬৬। শহিদ মিনারের নীচে অগণিত মানুষের সমাগমে জেগে উঠেছিল 'কল্লোল' নাটকের আদলে তৈরি খাইবার জাহাজের দৃশ্যপট। আর এই

দিনটি চিহ্নিত হয়ে থাকল নাটকের ইতিহাসে নাট্যের জন্য জনপ্রতিবাদের স্মারক দিন হিসেবে। আর উৎপল দত্ত 'কল্লোল' বন্ধ না হওয়ার বিশেষ স্বীকৃতি দিলেন শোভা সেনকে।— 'কল্লোল যে বন্ধ হয়নি তার প্রধান কৃতিত্ব যেমন কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র তেমনিই শোভার। ওদের ওপর ভার ছিল বলে নাট্য-আন্দোলনের জয়পতাকা উড্ডীন ছিল মিনার্ভা থিয়েটারে।'[২১]

মিনার্ভা পর্বে 'কল্লোল' ও 'তীর' এই দুটি নাটকের জন্য দু'-দু'বার গ্রেফতার হন উৎপল দত্ত। প্রথমবার 'কল্লোল'-এর সময় দলের সমস্ত সদস্যের মনে সাহস সঞ্চার করে নেতৃত্বদানে সফল হয়েছিলেন শোভা সেন।

ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে একা দিনাতিপাত, শাসকশ্রেণির আতঙ্ক— এত সবের মধ্যে তবু সে দিন তিনি পাশে পেয়েছিলেন দলকে— বন্ধুদের ও পার্টির মানুষজনকে। এ ছাড়াও 'কল্লোল' বন্ধ হতে দেয়নি সাধারণ দর্শক-দলের লড়াকু সৈনিকরা। প্রতিটি শো পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় চলেছে বলেই অর্থসংকটও তেমন ছিল না। কিন্তু 'তীর' (১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৭) নাটকের অভিনয় চলাকালীন উৎপল দত্ত যখন শ্যুটিং-এর কাজে ('গুরু' ছবির শ্যুটিং) বোম্বাইতে, তখন প্রত্যেকটা দিন আতঙ্কের দিন কাটিয়েছেন শোভা সেন। ১৯৬৭-র ২১ নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল হয়েছে আর— 'তীর' নাটকের মূল বিষয়বস্তু হল যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে— নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায়। শোভা সেন লিখছেন— 'মিনার্ভায় তীর নাটকের অভিনয় চলছে। ভয়ে ভয়ে থাকি। কোনো খবর পাই না। মেয়ে নিয়ে টালিগঞ্জের বাড়িতে কীভাবে যে সেই দিনগুলো কেটেছে তা ভাবতেও এখন ভয় লাগে।'[২২] এর কিছুদিনের মধ্যেই গ্রেফতার হন উৎপল দত্ত। তাঁকে কলকাতায় আনা হয়। কিন্তু শ্যুটিং-এর অর্থক্ষতির কথা ভেবে তিনি 'সাময়িক আপস' করেন যা প্রচারিত হয় 'উৎপল দত্ত মুচলেকা দিয়েছে'— এই দুর্নামে। — 'কল্লোল'-এর দুর্যোগের দিনে শোভা সেন যেভাবে দলকে উদ্দীপিত করতে পেয়েছিলেন 'তীর'-এর দুর্দিনে ঠিক উল্টো ঘটল। সমস্ত দল চলে গেল উৎপল দত্ত শোভা সেনের বিরুদ্ধে। তিনটি অভিব্যক্তির কথা এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করলে বিষয়টি সম্পর্কে শোভা সেনের পক্ষের একটা যুক্তি আমরা খুঁজে পাব। শোভা সেনের বয়ানে—

> (১) থিয়েটারে গিয়ে দেখি, সেখানেও সকলের অন্য মূর্তি। উৎপলকে না পেয়ে সকলেই গালাগাল আর ধিক্কার আমার উপরই বর্ষণ করছে। এত বড়ো দুর্দিন আমাদের জীবনে আর কখনো আসেনি। পাশে কেউ নেই। সকলের থেকে আলাদা হয়ে গেছি।
>
> (২) আমি ঠিক করলাম এই সময় আমার উচিত ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, ওর মনোবল

ফিরিয়ে আনা। ... আমি থিয়েটারে ছুটি চাইলাম। সহকারী পরিচালক ইন্দ্রজিৎ সেন আমাকে ছুটি দিল না, দুর্ব্যবহার করল।

(৩) সবচেয়ে নির্দয় আঘাত করল সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। সে আমাকে শাস্তি দিল, আমি অভিনয় করতে পারব না। আমাকে গ্রুপ থেকে সাসপেন্ড করা হল। এত বড়ো অপমান এর আগে আমাকে কেউ করতে সাহস পায়নি। ... মনে হল, এল টি জি-র সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই। এই গ্রুপ ছাড়া তো আর কোনো ভাবনাচিন্তাই ছিল না আমাদের। সত্য আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল, আমি নাকি চিরদিন কেবল মহিলা সদস্যদের কথাই চিন্তা করেছি। ... আমি ভেবে এসেছিলাম, সেটাই আমার কর্তব্য। একটা মেয়েকে গ্রুপে আনার যে কত ধকল সে ওরা বুঝবে কী করে? কোনোদিন এসব ওরা তো মাথা ঘামায়নি। 'তীর' নাটকে চোদ্দ থেকে আঠারটি মেয়ে কাজ করত। নানা জায়গা থেকে পেশাদারি অপেশাদারি মহিলা শিল্পী জোগাড় করতে হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের সুবিধে অসুবিধে আমাকেই দেখতে হয়েছে। নইলে তারা আসবে কেন? কীসের লোভে?

উপরোক্ত ক্ষোভ, অভিযোগ কিংবা দলের সদস্যদের ব্যবহারে আহত শোভা সেনের পক্ষের অভিমত পাওয়া গেল— উল্টোদিকের বক্তব্য উদ্ধার করা গেল না। তবে এই বয়ান থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই সময় পর্বে ('তীর' নাটকের কারণে উৎপল দত্তের গ্রেফতার হওয়ার পর) দলের কাছে ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছেন দলেরই প্রাণপুরুষ উৎপল দত্ত এবং অভিভাবক স্থানীয় শোভা সেন। কয়েকটি প্রযোজনার মধ্য দিয়ে অতীতের তিক্ত সম্পর্ক ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে এল, কিন্তু দলের ভাঙন রক্ষা করা সম্ভব হল না। 'মানুষের অধিকারে' (১৯৬৮), 'যুদ্ধং দেহি' (১৯৬৮) এবং 'লেনিনের ডাক' (১৯৬৯)-এর পর লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের মধ্যে থেকেই জন্ম নিল 'বিবেক যাত্রা সমাজ' এবং তার কিছু দিনের মধ্যেই *PLT* তৈরি হল।

মিনার্ভা পর্বে গৌরব ও অভিযোগের দায়ভার উভয়ই বহন করতে হয়েছে শোভা সেনকে। ১৯৭১-এর ২৮ জুলাই মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে দেন উৎপল দত্ত, শোভা সেনরা। দলের মধ্যে নানান দ্বন্দ্ব-অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন দানা বেঁধে উঠছিল তার মোকাবিলা করা বা আর্থিক দিক থেকে বাণিজ্যিক থিয়েটার চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্যও ছিল না। মিনার্ভার বাড়িওয়ালা কস্তুর চাঁদ জৈনকে তাঁরা জানিয়ে দেন, মিনার্ভা তাঁরা আর চালিয়ে যেতে পারছেন না। কিন্তু কয়েকজন বিরোধী পক্ষের শিল্পী ও হলের কর্মী থিয়েটারে জোর করে বিনা অনুমতিতে 'অঙ্গার' নাটকের অভিনয় করার প্রস্তুতি নিতে থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয় এবং সাতজন কর্মী গ্রেফতার হয়। মিনার্ভার পর্ব শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না, কারণ মিনার্ভা ছেড়ে দেওয়ার পরও মামলা চলতে থাকে— যখনই মামলার

দিন ঠিক হয় ছুটতে হয় শোভা সেনকে। মামলা চালিয়ে যাওয়া, টাকা জোগাড় করার দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর ওপর। মিনার্ভার লিজ যেহেতু উৎপল দত্তের নামে অতএব সেই আর্থিক দায়ের ভার বহন করতে হয় তাঁদেরই ব্যক্তিগতভাবে— গ্রুপ বা কমিটি কোনও দায়িত্ব নেয় না। অনেক সময় মিথ্যা কলঙ্ক, কুৎসা এমনকী শারীরিক আক্রমণেরও মুখোমুখি হতে হয়েছে। একটি নাট্য নির্মাণের জন্য যে প্রাণপাত শ্রম— একটি নাট্যদলকে সঠিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ও প্রভূত পরিশ্রম— শেষাবধি সেই দায়িত্ব পালনে পিছ-পা হননি শোভা সেন বরং সব সময় প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে বুক দিয়ে আগলে রেখে দলকে চালিত করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। উৎপল দত্তের কথায় ‘নেতৃত্ব-ক্ষমতার সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা আসত যখন দলের কিছু যশকামী বা অসৎ ব্যক্তি জোট বেঁধে রাতের পর রাত মিটিং-এর নামে কুৎসার বন্যা বওয়াত বা সাধারণ সভায় প্রস্তাব তুলত, আমাকে এবং শ্রীমতী সেনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হোক, কারণ এরা কাউকে কোনো পয়সা দেয় না।’[২৩] এই রকম পরিস্থিতিতে শোভা সেন সামাল দিতেন ঠাণ্ডা মাথায়। ধৈর্যের সঙ্গে। — কতকগুলো বৈশিষ্ট্য উৎপল দত্ত ব্যাখ্যা করেছেন শোভা সেন এ প্রসঙ্গে— রবিবার ম্যাটিনি, ইভিনিং শো করার পর সারা রাত জেগে চলত মিটিং— অভিযুক্ত হতেন শোভা সেন ও উৎপল দত্ত। সেই সময় শোভা সেন ১. কখনও চটতেন না, ২. আবেগতাড়িত হয়ে মিনতি করতেন না, ৩. মাথা ঠাণ্ডা রাখতেন, ৪. প্রতিটি অভিযোগ বিশ্লেষণ করতেন, ৫. যুক্তি দিয়ে মিথ্যে অভিযোগ খণ্ডন করতেন। ‘কল্লোল’-এর সময় এই ধরনের বাক-বিতণ্ডা চরম রূপ নেয় বলে উৎপল দত্ত জানাচ্ছেন শোভা সেনের আত্মজীবনীর ভূমিকায়। অর্থাৎ এই পর্বে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে যেমন খ্যাতি অর্জন করেছেন, তেমনই ব্যক্তিজীবনের অশান্তি, গ্রুপ সম্পর্কিত অন্তর্কলহ, ছেলেকে মানুষ করা, সংকটকালে শিশু কন্যাসন্তান নিয়ে কখনও একলা থাকার অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক বা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধতা, মিনার্ভা থিয়েটার কেন্দ্রিক সমস্যা ও আর্থিক সংকট— এই রকম নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে পথ হাঁটতে হয়েছে। ‘আমরা নাট্য আন্দোলন করতে এসেছি। কোনোদিন নাটক থেকে পয়সার প্রত্যাশা করিনি। শত অভাবেও কোনোদিন থিয়েটারকে এতটুকু চাপ দিইনি। আমি বিশ্বাস করে এসেছি, নাট্য আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে উৎপলকেই এই আন্দোলনের পথনির্দেশ করতে হবে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি সব সময় চেষ্টা করেছি উৎপলের মনোবল অটুটু রাখতে।’[২৪] আর উৎপল দত্তও স্বীকার করেছেন তাঁর জীবনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন শোভা সেন। উৎপল দত্তকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ‘ব্যক্তিগত জীবনে আপনি কার দ্বারা সবচেয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন? উত্তর : আমার স্ত্রী শোভা সেন’।[২৫] নৃপেন্দ্র সাহা সরাসরি জানিয়েছেন : ‘ভারতবর্ষের পশ্চিমবাংলার থিয়েটারের সৌভাগ্য যে উৎপল দত্তের মতন একজন

কলোসাস জায়ান্টকে সে তার মঞ্চে পেয়েছে, সেই সঙ্গে পেয়েছে থিয়েটারের একজন যথার্থ ধাত্রী জননীকে, যিনি সর্বংসহা হয়ে কলোসাস জায়ান্টকে ধরে রেখেছেন। আবার অজস্র লিলিপুটকেও তার অঙ্কে আশ্রয় দিয়েছেন। শোভা সেন তাই এল টি জি বা পি এল টি-রই কেবল সংগঠক নন, বাংলা থিয়েটার তথা বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারের সংগঠক, ধাত্রী জননী।'[২৬]

### পি এল টি (PLT) পর্ব

যে স্বপ্ন নিয়ে শুরু হয়েছিল মিনার্ভা অধিগ্রহণ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে থিয়েটারের প্রচেষ্টা, তা বেশি দিন ধরে রাখা সম্ভব হল না— ১৯৭১-র ২৮ জুলাই শেষ হল মিনার্ভা পর্ব এবং শুরু হল এক নতুন অধ্যায় পিএলটি পর্ব। মিনার্ভা ছেড়ে আসাটা খুব শান্তিপূর্ণভাবে হয়নি। মিনার্ভার স্বত্ব ছেড়ে দিয়েও কিন্তু স্বস্তি পেলেন না এল টি জি-র সদস্যরা। মামলা চলতে থাকল মিনার্ভাকে কেন্দ্র করে কিন্তু সেই সঙ্গে থিয়েটারের খিদে তাঁদের তাড়িত করল নতুন সৃষ্টির প্রেরণায়। এলটিজি-র ভাঙনের আগুন গ্রাস করার আগেই কিন্তু তার আঁচ এসে পৌঁছেছিল। উৎপল দত্ত বুঝতে পারছিলেন, এ বার দল ভাঙনের মুখে। কিন্তু সেই ভাঙন বা থিয়েটার করতে না পারা, শূন্যতা সৃষ্টি করতে পারেনি— তার আগেই এলটিজি-র কয়েকজন সদস্য মিলে তৈরি করেছেন 'বিবেক যাত্রা সমাজ'।[২৭] কিন্তু 'বিবেক যাত্রা সমাজ'ও বেশি দিন চালাতে পারেননি তাঁরা। যাত্রাগোষ্ঠী চালানোর মতো ব্যবসায়িক বুদ্ধি তাঁদের ছিল না। সে সময় উৎপল দত্তের বাইরে যথেষ্ট সুনাম, জনপ্রিয়তা। তাই শোভা সেন এবং অন্যান্যরা ভেবেছিলেন তাঁকে নিয়ে যদি কিছু করা যায়। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। তাঁদের ভেতরে তখন নাট্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তাঁদের লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ভেঙে গেল তাঁদেরই চোখের সামনে। 'তখন আমরা পীপল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটার নাম নিলাম। লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা নামটা ক্লেম করলাম।'[২৮] তৈরি হল 'পিপলস লিটল থিয়েটার'— পিএলটি। উৎপল দত্তের নেতৃত্বের পাশে পাশে এই পর্বেও সহযোদ্ধা থাকলেন শোভা সেন। 'বিবেক যাত্রা সমাজ'-এর অস্তিত্ব স্বল্পকালের হলেও উৎপল দত্তের জীবনে বিশেষ করে পিএলটি পর্বের নাটকগুলির ওপর এর প্রভাব পড়েছিল সাংঘাতিক। যাত্রার অভিঘাত তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন যে 'পরিচালক হিসেবে বলতে পারি, যাত্রায় কাজ করে আবার যখন আমি থিয়েটারে ফিরে আসি, আমি ফিরে আসি বিপুল উদ্দীপনা, উদ্যোগ ও এক ভিন্ন মনোভাব নিয়ে।'[২৯]— বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, বিপুল উত্তেজনা, জনসাধারণের সান্নিধ্যের প্রভাব, জনমুখী চেতনা— পিএলটি পর্বের নাটককে চালিত করেছে। আর এই পর্বে যে ধরনের নাটকগুলি তিনি রচনা করলেন, সেখানে শোভা সেন

হয়ে উঠলেন অপরিহার্য অভিনয় সম্পদ এবং এত বড় মাপের প্রযোজনাগুলির মঞ্চায়নের কারণে যে সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন হয় তার নেতৃত্বেও রইলেন শোভা সেন। লক্ষ করলে আমরা দেখব উৎপল দত্ত কিন্তু আর কোনও বিনোদমূলক রাজনৈতিক বক্তব্যশূন্য প্রযোজনার প্রতি আগ্রহী হলেন না। তাঁর নাট্য অন্বেষণ, নিজস্ব চিন্তাভাবনার বিশ্লেষণ সময় ও সমাজকেই গুরুত্ব দিল। যার অংশীদার হল গোটা পিপল্‌স্ লিট্‌ল থিয়েটার। আর এই পর্বের নাট্যনির্মাণে, চরিত্রসৃষ্টিতে, সাংগঠনিক কাজে সর্বোপরি উৎপল দত্তের সামগ্রিক নির্মাণক্ষেত্র ও জীবনপ্রবাহে (চিন্তন-মনন-শারীরিক) সজাগ থাকলেন শোভা সেন।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে শোভা সেন যেভাবে নিজেকে তুলে ধরলেন তা শুধু অভিনেত্রীর দায়মাত্র নয়, চরিত্রনির্মাণের বুননে তাঁর রাজনৈতিক সত্তা প্রকাশিত হল। একটি সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত বলেছিলেন— রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকলে এই ধরনের চরিত্র নির্মাণ অত্যন্ত কঠিন। সেই সচেতনতা শোভা সেনের ছিল। ‘রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকেই এটা সম্ভব হয়। শোভার থেকে অনেক বড়ো অভিনেত্রী প্রভাদেবী। কিন্তু তিনি কৃষ্ণবাঈ কিছুতেই অতো ভালো করতে পারতেন না। কারণ তিনি তো আর আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী নন। তিনি কমিউনিস্ট নন। মার্কসিস্ট নন।’[৩০]

এই পর্বে শোভা সেন অভিনীত নাটকের সংখ্যা প্রায় ১৯টি; এর মধ্যে ‘কল্লোল’, ‘নীচের মহল’, ‘ম্যাকবেথ’ পুনঃপ্রযোজিত। পথনাটকের মধ্যে আছে ‘দিন বদলের পালা’ (১৯৭৭), ‘কালো হাত’ (১৯৮১)। এলটিজি পর্বে অভিনীত নাটকের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৪টি, সময়কাল (১৯৫৪-১৯৬৯) ষোলো বছর। আর তিনি এই পর্বে প্রায় ৫৪টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন পনেরো-ষোলো বছর ধরে। পিএলটি পর্বে এই চলচ্চিত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩। আসলে সময়ের অনুপাত ধরলে বিশেষ তারতম্য হবে না, কিন্তু এটা ঠিক যে নাটকের ব্যস্ততার কারণে চলচ্চিত্রে সময় দিতে পারছেন না। পরের দিকে আরও কাজ তিনি কমিয়ে দেবেন চলচ্চিত্রের। তাঁর লক্ষ্য আরও একমুখী হবে। বাড়তে থাকবে পরিশ্রম ও দায়িত্বের পরিধি। উৎপল দত্তের সঙ্গে বিবাহিত জীবন তাঁকে সুস্থিত পারিবারিক পরিবেশ উপহার দিলেও ছেলেকে বড় করা, যথার্থ শিক্ষা, বিদেশে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা, তার বিবাহ দেওয়া— এই সমস্ত দায়িত্ব ক্রমাগত পালন করতে হয়েছে শোভা সেনকে। এরই মধ্যে ১৯৬২-র ১০ নভেম্বর তাঁর ও উৎপল দত্তের সন্তান বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম হয়েছে। সন্তানসম্ভবা শোভা সেনকে নাটকের দর্শক কিন্তু রেহাই দেয়নি। ‘ফেরারী ফৌজ’-এ নীলিমা দাশ অভিনয় করতেন রাধার ভূমিকায় আর শোভা সেন বঙ্গবাসী দেবীর ভূমিকায়। যত দিন

পেরেছেন ওই রকম অবস্থায় অভিনয় চালিয়ে গেছেন। সত্যিই এক ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র। তাঁর পরিবর্তে যে দিন অন্য এক অভিনেত্রীকে দিয়ে বঙ্গবাসী দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করানো হল, দর্শকদের মধ্যে থেকে প্রতিবাদ উঠল— 'শোভা সেন কোথায়? তাকে চাই।' ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে গায়ে কালো চাদর জড়িয়ে তাঁকে মঞ্চে অভিনয় করতে হয়। আসলে এভাবেই বোধহয় অভিনেত্রীসত্তা বিজয়ী হয়ে ওঠে। কিন্তু নারীসত্তা বা মাতৃসত্তাকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। আড়াই মাস ছুটি নেওয়ার পর আবার নিয়মিত অভিনয় করতে থাকেন 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে। শুধু তো অভিনয় করার তাগিদে নয়— দর্শকদের চাহিদাকে অস্বীকার করতে পারেন না তিনি।

এই সময় তিনি আর্থিক পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছেন— ১০ নভেম্বর ১৯৬২ তাঁদের কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে দায়িত্ব বেড়েছে, আর্থিক অনটনের অন্যতম কারণ শুধু তাঁর পারিবারিক ক্ষেত্র নয়— নাটকের ক্ষেত্রও। কেননা এই সময়ে তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে যে উপার্জন করতেন তা দিয়ে সংসার চালানো খুব কষ্টকর ছিল না— যদি না নাট্যদলের আর্থিক বিষয়ে তাঁকে ভাবতে হত। এই আর্থিক সমস্যাজনিত সংকট চিরকালই বহন করতে হয়েছে তাঁকে। 'থিয়েটারের নেপথ্য সমস্যা' বিষয়ে একটি রচনায় যখন ১৯৮৭-র শুরুতে গত এক বছরের হিসেব মেলাতে বসেছেন, তখন হল পাওয়া ইত্যাদি অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আর্থিক সমস্যা। শোভা সেন জানাচ্ছেন তাঁদের সমস্যার কথা :

(১) 'দিন দিন খরচের বহর তো বেড়েই চলে। কাগজের বিজ্ঞাপন-এর শুল্ক দিন দিন বাড়ছে। বড় বড় কাগজের বড় খাই।'

(২) 'তারপর হল ভাড়া। তাও ঊর্ধ্বমুখী। যেহেতু চাহিদার তুলনায় প্রেক্ষাগৃহ কম, মালিকরাও ভাড়া বাড়িয়ে চলেছেন। অবশ্য তাদের খরচও বেড়েছে।'

(৩) 'তারপর সেটের কথায় আসা যাক। প্রথমে সেট রাখার গো-ডাউন। তার ভাড়া মাসে কম গুনতে হয় না। কিন্তু সেই ভাড়া গুনেও পার নেই। গো-ডাউনগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে নিজেদের খরচ করতে হয়।'

(৪) 'সেটে যারা কাজ করেন তারা এবং যারা লাইট করেন তারাই খরচের সিংহভাগ নিয়ে থাকেন। তার ওপর আছে আশাররা (যারা দর্শকদের আসন দেখিয়ে দেন), টিকিট বিক্রি করেন যারা, পোশাক পরাতে যে ড্রেসাররা আসেন ... ইত্যাদি ইত্যাদি।'[৩১]

এই সমস্ত খরচ দিয়ে শিল্পীদের কপালে কিছুই জোটে না। তাই তিনি অকপটে স্বীকার করেন:

'তবুও ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে চলেছি বছরের পর বছর। এ সবই তো আমাদের জানা কথা। তবুও কিসের লোভে এই আত্মত্যাগ। এ একটা বড়ো প্রশ্ন।'[৩২]

আত্মত্যাগের এক বড় জায়গা তৈরি করেছেন শোভা সেন। তবে এ কথাও ঠিক যে শুধু মাত্র উৎপল দত্ত ও শোভা সেনের অর্থে এবং শ্রমের ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠেনি এলটিজি বা পিএলটি-র কর্মকাণ্ড। তাঁরা শক্ত ভিতটা গড়ে দিয়েছিলেন। দলের সদস্যদের দায়বদ্ধতা, শ্রম, অধ্যবসায়, সম্মিলিত শক্তিতে এলটিজি বা পিএলটি-র কর্মসৌধ।

শোভা সেনের 'স্বার্থত্যাগ' বা এই 'আত্মত্যাগ'-এর শিক্ষা না থাকলে হয়তো প্রায় সাতটি দশক ধরে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারতেন না। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন সংগঠন ও সংসার। পেশাদার জীবন বা নাটকের প্রতি দায়িত্বশীলতা এবং পরিবারকে একই সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার দক্ষতা তাঁকে অর্জন করতে হয়েছে। সংগঠক হওয়ার কারণে সেই দায়দায়িত্ব অনেক বেশি তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল এবং তিনি কখনও হেরে যাননি বা পিছপা হননি। কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন— 'In her, attempt to juggle her time between home and career, my mother could pay little attention to me. But I am happy that she maintained both sides of her life despite all the odds and social pressures, she must have had faced as a working mother.'[৩৩] বিষ্ণুপ্রিয়া মনে করেন যে শোভা সেন শুধুমাত্র একজন 'fabulous actress' নন, একজন 'fabulous mother' ও বটে।

প্রশ্ন ওঠে যে একজন মহিলা বলেই কি এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় ঠেলতে ঠেলতে নিজস্ব লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়? একজন পুরুষ অভিনেতা, সংগঠকেরও নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে অনেক ঝড়-ঝাপটা, সমস্যা, জটিলতা ভাঙতে ভাঙতে এগোতে হয়, তবে দুটি ক্ষেত্রে লড়াইটা দু'রকমের। উৎপল দত্তকেও মানসিক শারীরিক স্তরের সমস্যা অতিক্রম করতে হয়েছে। কিন্তু শোভা সেন তাঁর সমকালে দাঁড়িয়ে একজন সংগঠক হিসেবে একজন অভিনেত্রী হিসেবে পরিবারের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে যেভাবে কাজ করে গেছেন দশকের পর দশক, তাঁর নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলন, ক্ষিপ্রতা, স্থির বুদ্ধি, মানসিক দৃঢ়তার জোর— তা বাংলা নাট্য তথা ভারতীয় নাট্যের জগতে বিরল। সাতটি দশক জুড়ে যে নিরলস পরিশ্রম তিনি করে গেছেন, তারই সুবাদে তাঁর সম্পর্কে বলা হয় 'সাত দশকের সুদীর্ঘ নাট্যজীবন যেন একটি মিথ।'[৩৪]

সেই শোভা সেনের যোগ্য উত্তরসূরি তেমন তৈরি হল না। অভিনেত্রী প্রচুর এসেছেন নাট্যের আলোকিত আসনে, কিন্তু সংগঠক? হাতে গোনা। যাঁরা এসেছেন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের দলের পরিচালক। সেই সূত্রেই সংগঠক। শোভা সেনের সাংগঠনিক শক্তি সম্পর্কে এবং দক্ষতা সম্পর্কে বহু বিদগ্ধ মানুষজন যাঁরা তাঁকে চিনতেন বা সরাসরি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন বা বাইরে থেকে তাঁর এই গুণপনার সন্ধান করেছেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে সহমত পোষণ করেছেন।

নাট্যনির্মাণ ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কীভাবে শোভা সেন কাজ করেছেন তারই কিছু প্রামাণ্য ঘটনা এই নিবন্ধে তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্বের মধ্য দিয়ে আলোচিত হয়েছে। নাট্য নির্মাণে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি ছিল— (১) উৎপল দত্ত সৃষ্ট কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও সময়জ্ঞান মান্য করে চলা, (২) সংগঠনের আর্থিক সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ, (৩) নাটকের প্রয়োজন অনুসারে অভিনেত্রী সন্ধান করা, তাঁদের পরিবারকে নানাভাবে বুঝিয়ে দলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সম্মতি আদায় করা, (৪) নতুন অভিনেত্রীদের প্রাথমিক অভিনয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা, (৫) দলের সামগ্রিক সমস্যা সম্পর্কে সজাগ সচেতন থাকা। এই কাজগুলো করার জন্য তাঁকে অনেক সময় দৃঢ় হতে হয়েছে, স্পষ্ট কথা বলতে হয়েছে। সেই কারণে হয়তো তাঁর অলক্ষ্যে তাঁকে রূঢ়ভাষী বলা হয়। এমনও বলা হয় শোভা সেন অর্থ ছাড়া কিছু বোঝেন না ইত্যাদি। এই মনোভাবের মধ্য থেকে আমরা যদি ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরে তাঁর কাজের বিশ্লেষণ করি, তা হলে তাঁর ব্যক্তিত্বের যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে বলে মনে হয়। সর্বোপরি এটাও স্বীকার করা দরকার যে, তিনি তাঁর কর্মক্ষমতায় যা করেছেন, তা করেছেন উৎপল দত্তের কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে, তাঁদের সংগঠনকে নির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্যের দিকে স্থির রেখে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তাই নিজে কখনও পরিচালনার কথা ভাবেননি। যেহেতু তিনি বুঝেছিলেন ওই ক্ষেত্রটা তাঁর নয়। 'আজকাল' পত্রিকার পক্ষ থেকে অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উৎপল দত্তের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকীতে পিএলটি-র নতুন নাটক 'ক্ষমা করব না' মঞ্চস্থ হওয়ার কয়েকটা দিন আগে শোভা সেনের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন পরিচালনা করলেন না? তার উত্তরে শোভা সেন জানিয়েছিলেন— 'উৎপল এত ভালো পরিচালক যে উনি যখন ছিলেন, তখন তো এই অভাবটা কখনও আমরা বোধ করিনি। আর নাট্য পরিচালনাকে যে-উচ্চতায় তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে পৌঁছনো আমার পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। ফলে এটা নিয়ে কখনও চিন্তা করিনি। অভিনয় করেছি। আর, টাকা জোগাড় করা থেকে শুরু করে দলের জন্য সংগঠনের জন্যে অন্য যা যা করার দরকার করেছি।[৩৫]

পরিচালনা না করে পরিচালক উৎপল দত্তের কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য

নাট্যনির্মাণের বিবিধ আয়ূধ তিনি সংগ্রহ করেছেন। অভিনেত্রীদের জোগাড় করা যতটা কঠিন, তার চেয়েও কঠিন পরিবারের মানুষজনকে বোঝানো তাঁদের নাটক বিষয়টা সমাজে ততটা নিন্দনীয় নয়। এর জন্য শোভা সেন, যেন-তেন-প্রকারেণ সচেষ্ট ছিলেন। পিএলটি পর্বের প্রথম সাড়া ফেলে দেওয়া প্রযোজনা এবং মুখ্য চরিত্র বেণীমাধবের পাশাপাশি ময়নাও উল্লেখ্য চরিত্র। এই ময়না চরিত্রের অনুসন্ধানে শোভা সেন কতখানি উদ্যোগ নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জগন্নাথ বসু একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন শিল্পী ও সংগঠক শোভা সেনের চরিত্রের মেলবন্ধন দেখাতে।

আকাশবাণীতে একটি নাটকে শোভা সেনের সঙ্গে অভিনয়ে ছিলেন শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত। তাঁর কণ্ঠ সুন্দর এবং অভিনেত্রী হিসেবেও যথেষ্ট প্রতিভাময়ী। শোভা সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। আর উৎপল দত্ত যখন 'টিনের তলোয়ার' নাটকের জন্য নতুন মুখ খুঁজছেন, শোভা সেন শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্তকে নিয়ে এলেন উৎপল দত্তের কাছে। কিন্তু নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারে শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্তর মা রাজি ছিলেন না। তাঁকে রাজি করানোর জন্য শোভা সেন শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্তের বাড়ি পর্যন্ত চলে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে 'আমরাও বদ্যি, আপনারাও বদ্যি, আপনি রাজি হয়ে যান।' বদ্যিরা পারস্পরিক প্রীতির ব্যাপারে বিশেষ স্পর্শকাতর সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন শোভা সেন। কিন্তু কেন? কীসের তাগিদে তিনি চলে যান এক অপরিচিতের বাড়িতে? কীসের স্বার্থে? স্বার্থ বা উদ্দেশ্য একটাই, যে নাটকের কাজ করতে চলেছেন উৎপল দত্ত, যে নাটক প্রযোজিত হবে পিএলটি-র ব্যানারে, সেই কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য এই উদ্যোগ। থিয়েটারের কাজের জন্য তাঁর মতো শিল্পী অপরিচিত মানুষের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে দ্বিধা করেন না, কীভাবে কাজটি সম্পন্ন করা যায় সেই পথটিও যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে প্রস্তাব করেন। জগন্নাথ বসুর মন্তব্যটি এ ঘটনা প্রসঙ্গে শোভা সেনের অন্দরমহলের রূপটি তুলে ধরে— 'শর্মিষ্ঠা অভিনয় করেননি, করেছিলেন ছন্দা চ্যাটার্জি। কিন্তু শোভাদি উৎপল দত্তকে সাহায্য করতে যে কীভাবে কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতেন— তার একটা দৃষ্টান্ত দিলাম এটা। ... উৎপল দত্ত যুগন্ধর প্রতিভা, কিন্তু ওঁর তা হয়ে ওঠার পেছনে শোভাদির অবদান যে কতখানি তা যেন আমরা ভুলে না যাই।'[৩৬]

'টিনের তলোয়ার' নাটকে যিনি ময়না চরিত্রে বছরের পর বছর অভিনয় করে নাট্য ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিলেন তিনি ছন্দা চ্যাটার্জি। যাঁর কাছে উৎপল দত্ত ও শোভা সেন বাবা-মায়ের মতো। কতটা আপন করে কাছে টেনে নিতে পারলে এমন সম্বোধন সম্মান প্রাপ্তি হয়। 'সেই ছোট্টবেলায় এসেছিলাম। ... তখন দেখেছিলাম শোভাদিকে। উনি নিজে থেকে আমাকে কাছে ডেকে খুবই সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন। কাছে ডাকতেন— পার্ট বোঝাতেন। নিজে হাতে খাবার

বেড়ে দিতেন। আমার মায়ের সঙ্গে শোভাদির কোনো তফাতই দেখি না।’[৩৭] আবার এই মাতৃসমা, বন্ধুবৎসল শোভা সেন প্রয়োজনে রণং দেহি হতে দ্বিধা করেন না থিয়েটারের কারণে। পিএলটি-র শুরুর পর্বে ‘টিনের তলোয়ার’ অভিনয়ের পর পরই এই নাটকটি সরকারের রোষে ‘অশ্লীল’ বলে ১৯৭২ সালের ১ জুলাই রাজ্য সরকার পরিচালিত রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়। অথচ এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল রবীন্দ্রসদনেই ১৯৭১-এর ১২ আগস্ট। যথেষ্ট দর্শক সমাদরও পেয়েছিল। তাই এ নাটক নিষিদ্ধ করে দেওয়ার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল পিএলটি-র কুশীলবরা। রবীন্দ্রসদনের মুখ্য আধিকারিক তপতী মুখোপাধ্যায় শোভা সেনের পূর্ব পরিচিত। কিন্তু সরকারি চাকরিজীবী শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় নির্দেশ মানতে বাধ্য। শোভা সেন প্রমুখেরা হলে গিয়ে দেখেন পুলিশের ভ্যান ও হলের চারদিকে পুলিশি প্রহরা। এই ঘটনা শোভা সেনের ভেতরে যে ক্ষোভ তৈরি করেছিল তাতে এই পরিচিত আধিকারিককে সারা জীবন ক্ষমা করতে পারেননি।

মিনার্ভা পর্বে নানা প্রতিবন্ধকতা, ‘কল্লোল’ চলাকালীন উৎপল দত্তের গ্রেফতার, দলের সদস্যদের মধ্যে মনোবল জুগিয়ে ‘কল্লোল’ নাটকের অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন শোভা সেন। আবারও তার প্রকাশ ঘটল ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ নাটকের অভিনয়ে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সময়ে। ১৯৭৪ সালের ২৬ আগস্ট স্টার থিয়েটারে এই নাটক অভিনয়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয় কিছু মানুষ। ‘১৯৭৪ সালের ২৬ আগস্ট স্বাধীন ভারতের থিয়েটারের ইতিহাসে একটি কালো দিনরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সে দিন স্টার থিয়েটারে ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’র নাট্যকার ও নির্দেশক উৎপল ও আলোকশিল্পী তাপস সেন-সহ পিএলটি-র কলাকুশলীরা শারীরিকভাবে আক্রান্ত ও নিগৃহীত হলেন। এই সুপরিকল্পিত গুণ্ডাবাজির জন্য সেদিন নাটক মঞ্চস্থ করা যায়নি।’[৩৮] উৎপল দত্তেরও অভিমত ছিল যে ‘সশস্ত্র পুলিশের’ সামনেই এই ঘটনা ঘটেছিল। এই সময়ে কী ভূমিকা ছিল শোভা সেনের, উৎপল দত্ত জানাচ্ছেন— ‘গুণ্ডার দল বোমা-ইট ছুঁড়তে ছুঁড়তে আক্রমণ করেছে থিয়েটার। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের লাঞ্ছিত করেছে। শ্রীমতী সেন থেকেছেন সামনের সারিতে। অবিচল প্রতিজ্ঞায় কঠোর হয়ে। স্টার থিয়েটারের সামনে ‘দুঃস্বপ্নের নগরীর’ ওপর আক্রমণের সময়ে সশস্ত্র গুণ্ডারাও শ্রীমতী সেনের সামনে এসে অস্ত্র নামিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। এ আমার স্বচক্ষে দেখা।’[৩৯]

এই ঘটনার প্রতিবাদে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪-এর ৩০ আগস্ট, সেখানে মৃণাল সেন, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ মজুমদার প্রমুখের মধ্যে ছিলেন

শোভা সেনও। মূলত এই নাটকটির মধ্যে উঠে এসেছিল তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব ঘটনা। তথ্যচিত্রের আদলে উৎপল দত্ত দেখিয়েছিলেন কীভাবে সাধারণ নাগরিকজীবন এক ভয়াবহ সন্ত্রাসের পরিস্থিতিতে দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। স্টার থিয়েটারের সামনে প্রায় পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ধরে চলা এই ঘটনার তীব্র নিন্দায় সোচ্চার হয় সংবাদ মাধ্যম। এই নাটকের কারণে উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে। 'দুঃস্বপ্নের নগরী' ১৯৭৪-এর ১৬ মে কলামন্দিরে প্রথম অভিনয়ের পর সমস্ত শহরে যে সাড়া ফেলেছিল তা রোখা যায়নি। এ নাটক 'ব্যান্ড' হয়ে গেলেও বিভিন্ন জায়গা থেকে এ নাটকের অভিনয়ের জন্য ডাক আসতে থাকে। তখন নাটকের নাম পাল্টে অভিনয় করেছেন পিএলটি-র সদস্যরা। পিএলটি পর্বের উৎপল দত্তর সজীব সক্রিয়তায় উজ্জ্বল ও গৌরবময় হয়ে ওঠার সুবর্ণ সময়ে নিজস্ব ব্যক্তিত্বে অটল থেকেই শোভা সেন ওঁর নাট্যনির্মাণের সহযোদ্ধা ছিলেন। আর সেই দায়িত্বই যেন অনেক বেশি তাঁর ওপর এসে পড়ল উৎপল দত্তের প্রয়াণের পর। তাঁর বয়সোচিত অসুস্থতা বা অপারগতাকে তুচ্ছ করেই তিনি সক্রিয় থাকলেন উৎপল দত্তের স্বপ্ন পূরণে ও অপূর্ণ কাজের রূপায়ণে।

**উৎপল দত্তের প্রয়াণের পরবর্তী পর্ব**

উৎপল দত্তের প্রয়াণ শুধু মাত্র পিপলস্ লিট্ল থিয়েটারের নয়, বাংলা নাট্যজগতেই এক অপূরণীয় ক্ষতি। এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, কোনও নাট্যদলের যিনি পরিচালক, তিনিই যখন হয়ে ওঠেন সেই নাট্যদলের সর্বময় কর্তা, তাঁর অবর্তমানে সেই নাট্যদলের টিকে থাকার লড়াইটা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। অনেক সময় যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সাংগঠনিক ভিত ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। পিপলস্ লিট্ল থিয়েটার-এর ক্ষেত্রে এমনটাই স্বাভাবিক ছিল যেহেতু তিনিই ছিলেন প্রধান নিয়ন্ত্রক। নট-নাট্যকার-নির্দেশক। স্বভাবতই তাঁর প্রয়াণের পর পিএলটি-র বেঁচে থাকাটাই সংকটজনক হয়ে উঠতে পারত, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত এই দলের অস্তিত্ব। তাঁর অবর্তমানে নাট্যভাবনা-মঞ্চ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পিএলটি-র মান কতটা পূর্বোচিত গৌরব বহন করতে পারল কিনা কিংবা জনপ্রিয়তা কতটা খর্ব হল তার বিচার হয়তো দর্শক করবেন। কিন্তু পিএলটি যে তাঁর অস্তিত্ব বজায় রাখল, বিভিন্ন প্রযোজনার মধ্য দিয়ে থাকল সচল, তার প্রধানতম কৃতিত্ব ও অবদান শোভা সেনের।

এলটিজি বা পিএলটি— দুটি নাট্যদল প্রতিষ্ঠার পর থেকে উৎপল দত্ত রচিত ও নির্দেশিত নাটকই মঞ্চস্থ হয়েছে। অন্য কোনও নাট্যকারের নাটক মঞ্চস্থ হয়নি সেভাবে। তাঁর সহযোগী

পরিচালকদের একটা টিম ছিল ঠিকই কিন্তু নাটক রচনা ও নির্দেশনার মূল দায়িত্বই ছিল উৎপল দত্তের। উৎপল দত্তের প্রয়াণের পর কোনও শূন্যতা ও সংকটকাল যাতে তৈরি না হয়, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন শোভা সেন। পিএলটি-র সমস্ত রকম কাজের সঙ্গে নিজেকে যেমন সংযুক্ত রেখেছিলেন, নিয়মিত অভিনয়ও করেছেন সমান্তরালভাবে। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নিজেকে আরও সক্রিয় রেখেছেন। বরং এই পর্বে শোভা সেনের অংশগ্রহণ আরও সক্রিয় ও সচেতন। উৎপল দত্তের সঙ্গে পরিচয়ের দিন থেকে তাঁর প্রয়াণের মুর্হূত পর্যন্ত শোভা সেন সব সময় তাঁর সঙ্গী থেকেছেন। তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতি, প্রশংসা-নিন্দা, প্রেম-অপ্রেম, ভালবাসা-বেদনা বিচিত্র অনুভব ও অবস্থার সঙ্গী হয়েছেন শোভা সেন। তাঁর আত্মজীবনী 'স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লালদুর্গ' বইটির শেষ অংশটিতে লিখলেন :

'আমার এই কাহিনির শেষে উৎপলকেই বলি, তুমি বলেছিলে :

ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি

লড়ে যাচ্ছি দুই কমরেড।

আজ তোমাকেই বলি : আমি একা হয়ে গেলাম কমরেড। তোমার অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার শপথ নিচ্ছি তোমার চিতার পাশে দাঁড়িয়ে।'[৪০]

উৎপল দত্তের প্রয়াণের পর তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় শোভা সেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কী ছিল উৎপল দত্তের অসম্পূর্ণ কাজ যা সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে স্থির নির্দিষ্ট দলের নেত্রী ও সদস্যগণ। প্রথমত পিএলটি সব সময় তাঁদের নাট্যকর্মের মধ্যে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। উৎপল দত্তের অসুস্থতার মাঝেও নিয়মিত অভিনয় ধারা অব্যাহত থেকেছে। তাঁর প্রয়াণের পর সেই ধারা যেন অব্যাহত থাকে তার জন্য সব সময় সচেষ্ট থেকেছেন শোভা সেন। দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছে একটা সংগঠনকে সচল রাখতে গেলে কী কী পন্থা নিতে হয়। কাজের মাধ্যমেই সংগঠনকে সক্রিয় ও সচল রাখতে হবে— এই ভাবনা সব সময়ই তাঁর মধ্যে ছিল। আদর্শবাদী থিয়েটারের সপক্ষে থাকার অভিলাষে পরিহার করেছেন সমঝোতার সহজ পথ। বয়সজনিত কারণে তাঁর সক্রিয়তা কমে গেলেও মননে তিনি ২৪ ঘণ্টার থিয়েটারবাসী। তাঁর মধ্যে নির্মমতা আছে। জেদ আছে, স্বার্থপরতা আছে। কিন্তু এ সব কিছুর উৎসমূল থিয়েটার। তাই কোনও শিল্পীর পরিচয় চিহ্নিত হয় না তাঁর লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়ে। 'কর্মী' শব্দটাই তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এই 'কর্মী' মানুষটি কিন্তু তাঁর 'কমরেড', 'সঙ্গী'র বিচ্ছেদে সরে দাঁড়ালেন না থিয়েটারের

অঙ্গন ছেড়ে। বরং এই সংকটপর্বকে অতিক্রম করার সাহস ও শক্তি জোগালেন পিএলটির অনুগামী সতীর্থদের। পিএলটির প্রধান স্তম্ভ উৎপল দত্ত। তাঁর অবর্তমানে নেতৃত্বের সংঘাত বা নির্দেশনার অধিকারকে কেন্দ্র করে একটা সমস্যা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু শোভা সেন সেই সমস্যাসংকুল জায়গাটা তৈরি হতে দিলেন না। নিজে যেমন দায়িত্ব নিলেন, নেতৃত্ব দিলেন সংগঠনকে, আবার কাজের মধ্য দিয়ে শোক থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করলেন। উৎপল দত্তের মৃত্যুর দু'দিনের মধ্যেই পিএলটির পরবর্তী প্রযোজনার সংগীত গ্রহণের কাজে যুক্ত হয়ে পড়লেন কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সাংগঠনিক কাজ ও মহলা নিয়ে। 'আজও নেই মুহূর্তেকের বিশ্রাম। আজও বিরামবিহীন শ্রমে উদ্দীপ্ত উৎপল দত্তের স্ত্রী, কন্যা আর তাঁর রক্ত দিয়ে গড়া পিপলস্ লিট্‌ল থিয়েটার।...'[৪১] দৃঢ়চিত্তে 'ব্যারিকেড' নাটকের মহলায় নিবিষ্ট হন সদ্য স্বামীহারা শোভা সেন আর এক স্বামীহারা বৃদ্ধার ভূমিকায়। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য!

উৎপল দত্তের মৃত্যুর এক বছর পূর্তির আগেই অবশ্য তাঁর জন্মদিনে পিএলটি উদ্যোগী হয়েছিল উৎপল দত্তের কর্মভাবনাকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করায়। তাঁর ৬৫-তম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ-পত্রটি ছিল এই রকম— 'PLT ...cordially invites you to attend the inauguration of a Theatre Museum and Research Centre and Photographic exhibition at 5 pm on Tuesday, 29th march, 1994 at Madhusudan Mancha (Dhakuria, Dakhinapan) Calcutta. The inauguration ceremony will be followed by the stage performance of 'Agneepath'...'[৪২] আমন্ত্রণপত্র থেকে বোঝা যায় যে, কয়েক মাসের মধ্যেই (১৯৯৩ আগস্ট— ১৯৯৪ মার্চ) পিএলটি নানান ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছে। যে 'অগ্নিপথ' নাটকটির কথা বলা হল, তা মূলত উৎপল দত্তের বেশ কয়েকটি জন-আদৃত নাটকের কিছু কিছু দৃশ্যের সংযোগে তৈরি— সমগ্র নাট্যকর্মটিকে বেঁধেছিলেন নিজস্ব দক্ষতায় উৎপল দত্তের আরেক আদর্শনিষ্ঠ সহযোগী ও ছাত্র সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। 'অগ্নিপথ'-এ সংকলিত হল উৎপল দত্ত পরিচালিত 'সূর্যশিকার', 'রাইফেল', 'একলা চলো রে', 'মহাবিদ্রোহ' নাটকের অংশবিশেষ। এই রকম ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়-চিহ্নিত নাটকগুলির একত্র সংযোগে গড়ে উঠেছে 'অগ্নিপথ'। এই সংকলন নাট্যভাবনার নির্দেশক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অগ্নিপথ'-এর স্মরণিকায় জানাচ্ছেন যে'In his lifelong exploration of history, Dutt appealed to the imagination and reason of the Indian people, calling on them and inspiring them through the evocation of models from the past to topple the present social system itself'। এই কাজগুলো হয়েছে শোভা সেনের নেতৃত্বেই। 'সূর্য শিকার'-এ ঊর্মিলা, 'মহাবিদ্রোহ'-তে কস্তুরী, 'রাইফেল'-এ সৌদমিনীর ভূমিকায় অভিনয় করলেন

শোভা সেন। সংকলন ও নির্দেশনায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় আর অন্য পরিচালকদের মধ্যে রইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত ও মৃণাল ঘোষ। সমস্ত কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে রইল শোভা সেনের সক্রিয় উপস্থিতি। এই 'অগ্নিপথ' শীর্ষক নাট্য কোলাজের স্মরণিকায় একেবারে শীর্ষে মুদ্রিত হল পিএলটি-র শপথ বাক্য— 'পিপলস্ লিট্‌ল থিয়েটারের অঙ্গীকার— উৎপল দত্তর উত্তরাধিকার'।

এই উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে চলার সম্মুখভাগে রইলেন শোভা সেন। উৎপল দত্তের প্রয়াণের পর তাঁরা পুরনো নাটকগুলিরই অভিনয় চালিয়ে গেছেন দলকে সচল রাখার জন্য। ১৯৯৪-এর ১৯ আগস্ট তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে পিএলটি ও উৎপল দত্ত ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে মঞ্চস্থ হল 'কল্লোল' রবীন্দ্রসদনে— যার পুনর্নির্মাণ করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত ও মৃণাল ঘোষ। এ নাটকে কৃষ্ণাবাঈ-এর ভূমিকায় শোভা সেন আর লক্ষ্মীবাঈ-এর ভূমিকায় অভিনয় করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত। উৎপল দত্তের স্মরণে এই পর্বের তিনদিনব্যাপী নাট্যানুষ্ঠানের বাকি দু'দিন ২০ ও ২১ আগস্ট ১৯৯৪— অ্যাকাডেমি মঞ্চে অভিনীত হল 'সন্ন্যাসীর তরবারি'। এ পালা রচনা ও পরিচালনা করেছিলেন উৎপল দত্ত। তারই পুনর্নির্মাণ (পুনর্নির্মাণ শেখর গঙ্গোপাধ্যায়) প্রযোজিত হল, যেখানে অভিনয় করলেন শর্মিষ্ঠা গঙ্গোপাধ্যায়, জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, শুভলক্ষ্মী গঙ্গোপাধ্যায়, শুভ্রা গোস্বামী, বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত প্রমুখ অভিনেত্রী। পরের বছর ১৯৯৫-তে উৎপল দত্তের জন্মদিনে ২৯ মার্চ, 'বণিকের মানদণ্ড' ও ১৯৯৬-র ২৯ মার্চ 'দিল্লি চলো'— পর পর দু'বছর পুরনো নাটকেরই অভিনয় হল। কোনও নাটকের পরিচালনার ক্ষেত্রে শোভা সেন এগিয়ে এলেন না— কিন্তু পরিচালনা ভিন্ন যাবতীয় ক্ষেত্রে রইল তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি।

উৎপল দত্তের উপস্থিতিই ছিল দলের কঠোর শৃঙ্খলা ও চূড়ান্ত পরিশ্রমের উৎসমুখ। শোভা সেন সাংগঠনিক ক্ষেত্রকে যতটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন, নাট্যগঠনে ততটা মনোযোগী ছিলেন না। তা ছাড়া এই দিকটি পরিচালকেরই দায়িত্ব। তবু দলের কর্ত্রী হিসেবে কিছুটা দায় যেন তাঁর ওপরেও এসে পড়ে। তাই প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার ভারও তাঁকে বহন করতে হয়েছে কোনও কোনও সময়ে। যেমন '57 Rosemary Avenue' বা '৫৭ গোলাপমেরী সরণী' নাটকটি সম্পর্কে। 'The Telegraph' পত্রিকার নাট্যসমালোচক যখন লিখলেন— 'Politically correct Tribute' শিরোনামে— 'Most shamefully, this stirring play on the First war of Indian Independence was evidently staged without adequate rehearsals. Many actors were guilty of fumbling their lines and cues, among them the redoutable Shobha Shen herself. Hardly any way to pay obeisance to their mentor.'[৪৩] এ নাটকের নির্দেশক দীপ্তেশ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও যেহেতু শোভা

সেন-ই দলের নেতৃত্বে, তাই নাটকের সাফল্য অসাফল্যের দায়ভার তাঁর ওপরই বর্তাবে। এই ধরনের সমালোচনা যখন হয় তখন মনে হয়, তা হলে কি মহলার বা শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কিছুটা শৈথিল্য পিএলটি-কে গ্রাস করছে, নইলে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সংলাপ বিষয়ে সচেতন নন কেন? এ ছাড়াও নাটকটির অনুবাদ সম্পর্কে বলা হল 'An Unacknowledged Adaptation from Bernard Shaw'। তবে পিএলটি-র কর্মপ্রয়াসে কোনও ছেদ পড়েনি শোভা সেনের নেতৃত্বে, গুণগত উৎকর্ষের তারতম্য হওয়া সত্ত্বেও।

এই কর্মোদ্দীপনাতেই উৎপল দত্তের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দত্তের তত্ত্বাবধানে এক অভিনব প্রয়াসে উদ্যোগী হয়ে উঠল পিএলটি। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৮.০৬.২০০০ তারিখে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, সেখানে লেখা হয়—

উৎপল দত্ত ফাউন্ডেশন প্রযোজিত

স্বাধীনতার উত্তরাধিকার

উৎপল দত্তর নাটক অবলম্বনে

স্বাধীনতার ইতিহাস

মঞ্চ * আলো * ধ্বনি সহযোগে

এক সাহসী আলেখ্য

গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা

(তথ্যকেন্দ্র কলিকাতা)

১৭ জুন থেকে ৩০ জুন

প্রতিদিন সন্ধে ৬ টায় ও ৭টায়

প্রবেশ অবাধ

এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উৎপল দত্ত ফাউন্ডেশন। উৎপল দত্তের প্রয়াণের পর এটিও একটি বড় কাজ শোভা সেনের।

'স্বাধীনতার উত্তরাধিকার'-এ অবশ্য পুরনো নাটকগুলির টুকরো টুকরো দৃশ্য অভিনীত হয়েছে— যেমন 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'মহাবিদ্রোহ', 'দাঁড়াও পথিকবর', 'ফেরারী ফৌজ' থেকে শুরু করে 'একলা চলো রে', 'তিতুমীর' ইত্যাদি নাটক— যেখানে স্বাধীনতা আন্দোলন কিংবা বিপ্লবী ভাবনার প্রসঙ্গ আছে। আলো শব্দ ধ্বনি স্লাইডের ব্যবহারে এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনব, কিন্তু

এইভাবে কত দিনই বা সম্ভব শুধু পুরনো নাটকের পুনরাভিনয়? ক্রমশ তৈরি হচ্ছিল নতুন নাটক মঞ্চায়নের আকাঙ্ক্ষা আর তাই ২০০১ সালে পিএলটি-র প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হল 'ক্ষমা করব না' (২০০১)। উৎপল দত্তের প্রয়াণের পর এই প্রথম কোনও পূর্ণাঙ্গ নতুন নাটকের অভিনয় প্রত্যক্ষ করল দর্শক। নতুন নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন শোভা সেন ও সদস্যরা। শোভা সেন জানাচ্ছেন— 'It's a tremendous feeling. This is happening after 11 years. It's so refreshing. There was a feeling of stagnation all these years even though we did stage old plays.'[৪৪] নতুন নাটক করার মধ্যে যে উৎসাহ ও উত্তেজনা ক্রিয়া করে নবাগত সদস্যদের ওপর, তার আভাস পেলেন শোভা সেন ও পিএলটি-র সদস্যরা, দীর্ঘ এগারো বছর পর যখন তাঁরা 'ক্ষমা করব না' নাটকটি করার সিদ্ধান্ত নিলেন সবাই।

২০০১ সালে প্রযোজিত 'ক্ষমা করব না' সর্বার্থেই পিএলটি-র মতাদর্শ ও কর্মভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এক উল্লেখ্য প্রযোজনা। কিন্তু কেন এই নাটক? এর উত্তরে শোভা সেন বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে— 'নাটকে উৎপল যে রাজনৈতিক আদর্শের কথা বলত সেটা রয়েছে এই নাটকেও, তাই পিএলটি এটা বেছেছে।'[৪৫] আজকাল পত্রিকার নাট্যসমালোচক অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি একটি সাক্ষাৎকারেও শোভা সেনের এই মনোভাবটিই প্রকাশিত যে তাঁদের এই নাটকটি মঞ্চায়নের পেছনে যুক্তি এই যে, এ নাটক ফ্যাসিবিরোধী নাটক এবং পিএলটি-র আদর্শ বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই হল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধতা।

চিলির কবি এরিয়েল ডর্ফম্যানের 'উইডোজ' অবলম্বনে 'ক্ষমা করব না'। এ নাটকের নির্দেশক ছিলেন পিএলটি-র দীর্ঘদিনের সঙ্গী আঠারো বছর ধরে উৎপল দত্তের সহযোগী পরিচালক সমীর মজুমদার। আর ৭৮ বছর বয়সে প্রায় দু'ঘণ্টা সারাক্ষণ মঞ্চে থেকে বাংলা থিয়েটারে ইতিহাস তৈরি করলেন শোভা সেন। বিষ্ণু বসু বিস্মিত হয়েছিলেন যে 'আটাত্তর বছরে এভাবে নাটকের মূল চরিত্রে নামা ... না, বাংলা নাটকে এরকম কোনও উদাহরণ আছে বলে মনে করতে পারছি না।'[৪৬] এই নাটকে মেয়েদের যে প্রতিবাদ-চিত্র ফুটে উঠেছে তা থেকে মনে হতে পারে এ নাটক ফেমিনিজমের নাটক, কিন্তু শোভা সেন এই রকম কোনও বিভাজনের নীতিতে বিশ্বাস করেন না, তিনি মনে করেন '... মেয়েরা শোষিত আর পুরুষেরা শোষক এই বিভাজনটা আমার কাছে খুব কৃত্রিম লাগে। নারীবাদ বা পুরুষবাদে নয় ... আমি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যে, ইন্ডিভিজুয়ালিজমে বিশ্বাসী।'[৪৭] এই বিশ্বাসের ভিত তৈরি হয়েছে উৎপল দত্তের মানসিকতার প্রভাবেও। মহিলাদের প্রতি উৎপল দত্তের আলাদা এক সম্ভ্রম শ্রদ্ধার জায়গা ছিল। তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। আর সেই

কারণেই শোভা সেনের সঙ্গে ছিল তাঁর এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। উৎপল দত্তের প্রয়াণের পর শোভা সেন আরও বেশি করে তা অনুভব করেছেন— দুজনের মধ্যে শৈল্পিক প্রতিযোগিতা থাকলেও বাস্তব জীবনের ভেতরে তার ছাপ পড়েনি। শোভা সেনের দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি কখনই ‘dominate’ করতেন না— ‘He never gave any orders, never even asked for a glass of water, never asked where I am going, and why, how I am spending my money and so on. He gave me total liberty as a wife, although as a director he was extremely strict.’[৪৮]

কেন শোভা সেন একজন যথার্থ নাট্যব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন? কী তাঁর গুণপনা? প্রথমত, তিনি একজন আপাদমস্তক থিয়েটার কর্মী, থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগ, দ্বিতীয়ত, কঠিন পরিশ্রমী এবং তৃতীয়ত, থিয়েটারের জন্য স্বার্থত্যাগ করতে পেরেছিলেন একেবারে ব্যক্তিগত স্তরে।

আজীবন শোভা সেনকে লড়াই চালিয়েই যেতে হয়েছে। উৎপল দত্তের প্রয়াণের পর যে সংকট ও শূন্যতা তৈরি হয়, তার মোকাবিলায় তিনি সেনাপতির ভূমিকা গ্রহণ করে দলকে নেতৃত্ব দেন। স্বীকার করেন উৎপল দত্তের প্রয়াণের পর তৈরি হয়েছে একটা সৃজনশীলতার ব্যবধান বা গহ্বর— সত্যিই তো উৎপল দত্তের অস্তিত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা প্রতিমুহূর্তে অনুভূত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। এলটিজি এবং পিএলটি— দুই পর্বেই মূলত তিনি ছিলেন একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক, সংগঠক, জনমানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এবং ভাবনা-চিন্তার আকর ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুর পর সেই জায়গা শোভা সেন দু'হাতে আগলে রাখলেন তাঁর অভিনয় এবং সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে। তবু স্বীকার করলেন— ‘I must admit we don’t have many talented writers or directors among us. The post-Utpal phase has seen a perceptible decline in all spheres— leadership, quality, discipline... ।’[৪৯] কিন্তু কাজ তাঁরা থামিয়ে দেননি। পিএলটি-র সভানেত্রীকে সামনে রেখে কাজ করে গেছেন তাঁরা।

২০০৩ সালে পুনর্নির্মিত ‘তিতুমীর’ নাটকের অভিনয়ে শোভা সেন ‘জঞ্জালী’ চরিত্রে আবারও দর্শককে মুগ্ধ করলেন। তাঁর বয়স তখন আশি। বাংলা মঞ্চে অশীতিপর কোনও অভিনেত্রীর সক্রিয় উপস্থিতি যেমন বিস্ময়ের, তেমনই উৎসাহদ্দীপক। ‘The Statesman’ পত্রিকায় ‘Return to old glory’ শিরোনামে লেখা হল— ‘Sova Sen once more surprised the audience with her interpretation of Janjali.’[৫০] পিএলটি-তে তাঁর নাট্যাভিনয়ের ধারা অব্যাহত থেকেছে। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি দলকে সচল রাখলেন। নিজের জীবনীশক্তিকেও আরও বেগবান করে

তুললেন এই পর্যায়ে এসে। ওই বছরেই উৎপল দত্তের দশম মৃত্যুবার্ষিকীতে উৎপল দত্তের লেখা দীপ্তেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে বিচার দৃশ্য সম্বলিত একটি ছোট নাটক মঞ্চস্থ হয়। পিএলটি-র নতুন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে নতুন নাটকে তাঁর অভিনয়, নিঃসন্দেহে একটা চালিকা শক্তির কাজ করেছে।

'ক্ষমা করব না' (২০০১) থেকেই উৎপল দত্তের সহযোগী পরিচালক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন নির্দেশনার ক্ষেত্রে বা বলা যায় যে শোভা সেনের পছন্দ অনুযায়ী পিএলটি-তে নির্বাচিত হলেন উৎপল দত্ত-উত্তর-পর্বের নাট্য পরিচালকবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে আছেন অসিত বসু, সমীর মজুমদার, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁদের অনুরোধেই এবং দলের নেতৃত্বের কারণেই অনেক সময়ই শোভা সেন তাঁর শারীরিক ও বয়সজনিত সমস্যা সত্ত্বেও কখনও কখনও মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন নাটকের সূচনায় বা প্রান্তে। অর্থাৎ এই ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে পিএলটি সব সময়ই চেয়েছে তাঁদের দলনেত্রীকে সামনে রেখে কাজ করে যেতে উৎপল দত্তের প্রয়াণ পরবর্তী পর্বে। যেমন 'কিরাতপর্ব' নাটকটি উৎপল দত্ত রচনা করেন ১৯৯০ সালে, সেই সময় তিনি সত্যজিৎ রায়ের 'আগন্তুক' ছবির কাজে ব্যস্ত এবং শারীরিক অবস্থাও বিশেষ ভাল ছিল না। তাই সে সময় মঞ্চস্থ করতে না-পারা 'কিরাতপর্ব' মঞ্চস্থ হল উৎপল দত্তের উত্তর-পর্বে। এ নাটকে উৎপল দত্ত মহাভারতকে ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং এটাই দর্শকের কাম্য, উৎপল দত্তের কাছে কোনও প্রথাগত ভাবনার প্রতিফলন নয়। উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন যে মহাভারতের সময়ে আর্যকুলের ক্ষমতায়নের সঙ্গে হিটলার অভ্যুদিত নাৎসিবাহিনীর মানসিকতার কোনও ফারাক নেই। আসলে চিরকালই অনার্যজাতি প্রান্তিক, ক্ষমতালোভীর কাছে অচ্ছুৎ, অপাঙ্‌ক্তেয়। অসিত বসুর নির্দেশনায় এ নাটক সেই প্রার্থিত বাতাবরণটি তৈরি করতে পেরেছিল এবং শুরুতেই শোভা সেনের উপস্থাপনা সরাসরি পৌঁছে দেয় নাটকের অভ্যন্তরে। অর্থাৎ শোভা সেনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করলেন পরিচালক এবং শোভা সেনও সেই মূল্যটা বুঝে গেলেন— নাটকের জন্য তিনি কতটা অপরিহার্য, স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও তাঁর উপস্থিতি কতটা মূল্যবান।

কিরাতপর্ব-র মতোই 'পরিবর্তন' (২০১১) নাটকে তিনি অবতীর্ণ হন স্বল্প সময়ের জন্য, উৎপল দত্তের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে। ফ্রিডরিশ ভোলফ-এর 'প্রফেসর মামলক' অনুসরণে উৎপল দত্ত এই নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন। ২০১১-য় যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে পরিবর্তনের একটা বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে, সেই সময় আবারও এই নাটকটি নির্বাচন করল পিএলটি। প্রয়োগ পরিকল্পনা ও পরিচালনা অসিত বসু-র। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে প্রযোজনাকে সমকালীন

করে তোলার দায়বদ্ধতার কথা বিস্মৃত হননি অসিত বসু। বর্তমান সময়ে কিছু মানুষ ক্ষমতার আগ্রাসনে কীভাবে ‘ফ্যাসিজম’কেই আঁকড়ে ধরছেন, তারই ছবি এ নাটকে।

এ নাটকের শেষ পর্বে শোভা সেনের দৃঢ় ঘোষণায় প্রতিফলিত হয় প্রযোজনার মূল বক্তব্য। অর্থাৎ এই নাটকেও শোভা সেন অবতীর্ণ হলেন। প্রশ্ন জাগে, অসিত বসু এই বক্তব্য উপস্থাপনার জন্য শোভা সেনকে যে নির্বাচিত করলেন তার অন্যতম কারণ অবশ্যই দলনেত্রীকে সামনে রেখে নাটক উপস্থাপিত করলে তাঁর প্রতি যেমন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়, তেমনই থিয়েটারের দর্শকদেরও বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয় যে শোভা সেনের মতো বর্ষীয়ান শিল্পী এখনও পিএলটি-র কাজে সক্রিয় হয়ে মঞ্চে উপস্থিত হচ্ছেন। একেবারে সাম্প্রতিক প্রযোজনা ‘কুশপুত্তলিকা’ (২০১৪)। সেখানে তিনি মঞ্চে অবতীর্ণ হননি, কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছবিসহ উদ্ধৃত করে তৈরি হয়েছে ‘কুশপুত্তলিকা’র প্রচারপুস্তিকা। নাটক প্রসঙ্গে পিএলটি-র সভানেত্রী ‘শোভা সেন’ লিখলেন— ‘‘আমাদের নাট্যগুরু ‘উৎপল দত্তের’ ২১তম মৃত্যু দিবসে (১৯শে আগস্ট) তারই লেখা ‘কুশপুত্তলিকা’ নাটকটির মঞ্চায়ন পিএলটি-র সম্মিলিত গুরুপ্রণাম। ২০১৪ সালের পিএলটি-র এই প্রযোজনায়, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা প্রমাণ করে উৎপল দত্তের থিয়েটার বোধ এবং দর্শন কতখানি প্রাসঙ্গিক ও তার নাট্যচর্চা আমাদের নাট্যাঙ্গনে কতটা প্রয়োজনীয় এবং যে কোনও দেশের নাট্যভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।’[৫১] এই নাটকের মূল বক্তব্য স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের পুঁজিবাদের বিকাশ বা শিল্পায়ন সংক্রান্ত নানান জটিলতা। এ নাটকের নির্দেশকও অসিত বসু। উপদেষ্টা হিসেবে শোভা সেনকেও পাওয়া গেল এ নাটকে। তাঁর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া পাল ও স্বপন ঘোষ।

শোভা সেন— দীর্ঘতম সময় জুড়ে নাট্যজগতে কাজ করে যাওয়ার ইতিহাস গড়ে দিয়েছেন তিনি। ১৯৪৪ সালে ‘নবান্ন’ নাটকের সূত্রে তাঁর নাট্যজগতের সঙ্গে যোগাযোগ— তার পরে ১৯৫৪-তে ‘ম্যাকবেথ’ নাটকে অভিনয়ের জন্য আহূত হয়ে আসেন ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’-এ। উৎপল দত্তের সহযোদ্ধা হয়ে সেই সময় থেকে ২০১৬ ফেব্রুয়ারি যখন এই নিবন্ধ লেখা হচ্ছে তখনও তিনি এই নাট্যদলের সভানেত্রী। ১৯৯৩-তে উৎপল দত্ত প্রয়াত হয়েছেন, তার পরেও পূর্ণ উদ্যমে কাজ করেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বয়সজনিত কারণে তিনিও অসমর্থ হয়েছেন, শয্যাবন্দি হয়েছেন। কিন্তু ২০১১-১২ পর্যন্ত তিনি নাট্যের সর্বৈব কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সচল থেকেছেন শরীরে মনে। অভিনয় ছাড়াও তাঁকে সংগঠনের যাবতীয় দায়দায়িত্ব, অর্থকরী বিষয়, এপিক থিয়েটার পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশনা সংক্রান্ত ভাবনা, উৎপল দত্ত ফাউন্ডেশনের নানাবিধ কর্মকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ে সব সময়ে সক্রিয় থাকতে হয়েছে। বাংলা নাট্যমঞ্চে এই রকম কর্মকুশলী নারীর বিকল্প আর

নেই বললেই চলে। সেই দিক থেকে বিচার করলে তিনি নিঃসন্দেহে এক স্বতন্ত্র নাট্যব্যক্তিত্ব।

শুধু অভিনেত্রী শোভা সেন নয়, সাংগঠনিক শোভা সেনের কৃতিত্বও বাংলা নাট্যজগতে বিরল সংযোজন। তিনি তো শুধু মাত্র একজন দক্ষ নাট্য অভিনেত্রী বা সফল চিত্রাভিনেত্রী নন, তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হল তিনি একজন দায়বদ্ধ শিল্পী, নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতে চাওয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শিল্পী। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের বাইরে সংগঠক হিসেবে তাঁর যে পরিচিতি গড়ে উঠল, সেই কাজে যখন তিনি দায়িত্ব নিলেন তখন তাঁর বয়স খুবই কম। নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন— '...ঐ সময়ে একজন অপরিণতবয়স্কা মহিলা হিসাবে অভিনয় ও সাংগঠনিক দিক থেকে যে পরিণত ভূমিকা শোভাদি নিয়েছিলেন তা ভাবতে আজ অবাক লাগে। পূর্বের এল.টি.জি. বা পরবর্তীকালের পি.এল.টি এক সামাজিক ও রাজনৈতিক কমিটমেন্ট নিয়ে কাজ করে চলেছে, এবং দীর্ঘ সময়ে শোভাদি তাঁর ভূমিকায় অক্লান্ত যোদ্ধা।'[৫২]

হয়তো আমরা বিস্মিত হই কিন্তু শোভা সেনের কাছে 'থিয়েটার হল ধর্ম'। তিনি মনে করেন 'Theatre is my religion'।[৫৩] যে সময়ে শোভা সেনরা অভিনয়ের জগতে এসেছিলেন অর্থাৎ গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে, তখন নাট্যমঞ্চে মেয়েদের অভিনয় করাটাই ছিল সাহসের পরিচয়। সেই সাহস তো তিনি অর্জন করেছিলেন উপরন্তু তাঁর মধ্যে ছিল যে তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা, তারই জোরে বাহ্যিক সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলা নাট্যজগতের এক স্বতন্ত্র প্রতিভা— একটি নাট্যদলের ধাত্রীস্বরূপা এবং যুগোত্তীর্ণ প্রতিভাধর এক নাট্যপুরুষের ধারক। আবার সমস্ত জীবনটাই তাঁকে ধরে রাখল তাঁর দৃঢ় রাজনৈতিক বিশ্বাস। শোভা সেনের গোটা জীবনটাই যেন একটা সংগঠন— একটা মিথ।

## তথ্যসূত্র


১. উৎপল দত্ত, 'ভূমিকা', শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ,* তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ ৬

২. শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ,* পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ৩

৩. শোভা সেন, 'উৎপলের অন্যতম সেরা ও তন্নিষ্ঠ ছাত্র', উৎপল দত্ত (সম্পা.) *এপিক থিয়েটার,* মার্চ ২০০৭, কলকাতা, পৃ ১৮

৪. শোভা সেনের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, ২০১১, কলকাতার 'কল্লোল' আবাস

৫. তদেব

৬. উৎপল দত্ত, 'শোভাকে', *শাহেনশা তোমার পুরস্কার তোমারই থাক,* দীপ প্রকাশন, প্রথম দীপ সংস্করণ, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা, পৃ ২০

৭. শোভা সেনের সাক্ষাৎকার, গ্রাহক নৃপেন্দ্র সাহা, 'শোভা সেন : বাংলা মঞ্চের দুর্ধষশক্তি, *গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা,* ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা নভেম্বর - জানুয়ারি ১৯৮৮, কলকাতা

৮. তদেব পৃ ১৭

৯. শোভা সেনের সাক্ষাৎকার, গ্রাহক নৃপেন্দ্র সাহা, ...... পূর্বে উল্লেখিত, পৃথ ১৩

১০. শোভা সেন, স্মরণে বিস্মরণে... পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৩৯

১১. তদেব, পৃ ৪০

১২. উৎপল দত্ত, 'ভূমিকা', শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন* .... পূর্বে উল্লিখিত; পৃ ৬-৭.

১৩. তুহিন চট্টোপাধ্যায়, 'কল্লোলের জয়জয়ন্তী', অশোক দাশগুপ্ত (সম্পা.) *শারদীয় আজকাল* ১৪০৭.

১৪. তাপস সেন, 'শোভাদি', আলোক দেব (সম্পা.) *প্রতিকৃতি,* শোভা সেনের থিয়েটারের ষাট বছর পূর্তিতে বিশেষ সংখ্যা, ২০০৪, কলকাতা, পৃ ১৬

১৫. 'উৎপল দত্ত  একটি সাক্ষাৎকার' পরিগ্রাহক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস মজুমদার (সম্পা.), *শূদ্রক,* শরৎ ১৪০০, সঙ্কলন ১০, পৃ ১৩৬

১৬. তদেব, পৃ. ১৩৬

১৭. শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন* .... পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ৪৩-৪৪

১৮. তাপস সেন 'স্মৃতির আলোকে উৎপল দত্ত' , তারাপদ ঘোষ ও অজিত মণ্ডল (সম্পা.) *পশ্চিমবঙ্গ,* উৎপল দত্ত স্মারক সংখ্যা ১৪০৮, বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ১ ও ২, ৬ ও ১৩ জুলাই ২০০১, কলকাতা, পৃ ৪৮

১৯. শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে*.... পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ৪৮

২০. তাপস সেন, 'স্মৃতির আলোকে উৎপল দত্ত'.... পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ৪৯

২১. উৎপল দত্ত, 'ভূমিকা, শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে*.... পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ৮

২২. শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে*.... পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ৮৯

২৩. উৎপল দত্ত, 'ভূমিকা', শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে* .... পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ৭

২৪. শোভা সেনের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, ২০১১, কলকাতার 'কল্লোল' আবাস

২৫. উৎপল দত্তের সাক্ষাৎকার, পরিগ্রাহক প্রশান্ত দাঁ, অরূপ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *এপিক থিয়েটার,* প্রাক সুবর্ণজয়ন্তী সমালোচনা ও বিতর্ক সংখ্যা, উৎপল দত্ত ফাউন্ডেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার স্টাডিজ, আগস্ট ২০১২, পৃ ৫০

২৬. নৃপেন্দ্র সাহা, 'বাংলা রঙ্গমঞ্চের দুর্ধর্ষ অভিনেত্রী', উৎপল দত্ত (সম্পা.), *এপিক থিয়েটার,* শোভা সেনের অভিনয় জীবনের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ ৩৬

২৭. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভূমিকা' *উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র,* ৫ম খণ্ড, শোভা সেন ও সৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা.), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ১৯৯৭, কলকাতা

২৮. তদেব,

২৯. তদেব,

৩০. উৎপল দত্ত, শোভা সেন, বিষ্ণুপ্রিয়া পাল, সৌভিক রায়চৌধুরী, 'কথোপকথন', উৎপল দত্ত (সম্পা.) *এপিক থিয়েটার,* শোভা সেনের অভিনয় জীবনের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা, পৃ ৭

৩১. শোভা সেন, 'থিয়েটারের নেপথ্য সমস্যা', উৎপল দত্ত (সম্পা.) *এপিক থিয়েটার,* ১৯৮৭,

কলকাতা, পৃ ২৪

৩২. তদেব, পৃ ২৪-২৫

৩৩. Damayanti Datta on Sova Sen, 'Theatre is my Religion', Look, *The Telegraph,* 19.1.1997, Calcutta

৩৪. 'নাট্যশোধ সংস্থান'-এ সংরক্ষিত শোভা সেনের জীবনপঞ্জির শিরোনাম

৩৫. অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'শোভা সেনের মুখোমুখি', *আজকাল,* সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৫ আগস্ট, ২০০১

৩৬. জগন্নাথ বসু, 'শোভা সেন প্রসঙ্গে', আলোক দেব (সম্পা.), *প্রতিকৃতি,* পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ৬৪

৩৭. ছন্দা চট্টোপাধ্যায়, 'আমার চোখে শোভাদি', তদেব, পৃ ৪৪

৩৮. অরূপ মুখোপাধ্যায়, 'পিপলস্ লিটল থিয়েটারের গঠন : এক আধুনিক নাট্যব্যক্তিত্বের অভ্যুদয়', *উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি,* দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ২০১১, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০১০ পৃ ১৫৯

৩৯. উৎপল দত্ত, 'ভূমিকা', শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে...* পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ৮

৪০. শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে...,* পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ৩৮২

৪১. শক্তি বিশ্বাস, 'শোভা সেন আছেন, তাই', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ও পিপলস্ লিটল থিয়েটার-এর যৌথ উদ্যোগে সংগ্রামী শিল্পী শোভা সেনের অভিনয় জীবনের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব, ১৫-২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩, *স্মরণিকা*।

৪২. পি এল টি পরিচালিত উৎপল দত্তের ৬৫তম জন্মবার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত 'অগ্নিপথ'-এর আমন্ত্রণপত্র।

৪৩. Ananda Lal, Politically Correct Tribute, *The Telegraph* 30.7.99, Kolkata.

৪৪. Arunava Das, An Interview with Sova Sen, 'Utpal's death has resulted in a Void', *The Statesman,* 12.10.2001, Calcutta.

৪৫. গৌতম চক্রবর্তী, 'শোভার হাত ধরে', *আনন্দবাজার পত্রিকা,* কলকাতা, ১০.৮.২০০১

৪৬. তদেব

৪৭. তদেব

৪৮. Damayanti Datta on Sova Sen, 'Theatre is my Religion', Look, *The Telegraph*, 19.01.1997, Kolkata.

৪৯. Arunava Das, An interview with Sova Sen... পূর্বে উল্লিখিত

৫০. Return to the Glory, *The Statesman,* 30.5.2003.

৫১. 'কুশপুত্তলিকা' নাটক প্রসঙ্গে পিএলটি-র সভানেত্রী শোভা সেনের কথা, কুশপুত্তলিকা নাটকের স্মরণিকা, ২০১৪

৫২. নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, 'শোভাদি', উৎপল দত্ত (সম্পা.) *এপিক থিয়েটার,* শোভা সেনের অভিনয় জীবনের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ ৩১

৫৩. Damayanti Datta on Sova Sen ..... পূর্বে উল্লিখিত

### চতুর্থ অধ্যায়

# নির্মাণের সঙ্কল্পে নাট্য সংহতি

## (কেয়া চক্রবর্তী ও স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত)

বাংলা নাট্যের ইতিহাসে গ্রুপ থিয়েটারের পথ পরিক্রমায় 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীর বিস্তৃত অস্তিত্ব বাংলা নাট্যের গৌরব যেমন বৃদ্ধি করেছে, তেমনই সচেতন কর্মোদ্দীপনায়, তারুণ্যসমৃদ্ধ ভাবনার বিকাশে সামগ্রিক বাংলা থিয়েটারকে চালিত করেছে ইতিবাচক পথে। এই নাট্যগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে যে দু'জন অভিনেত্রী দুটি ভিন্ন সময়পর্বে নিজেদের নিষ্ঠা, মেধা, ও অনন্য প্রতিভার মাধ্যমে 'নান্দীকার' গোষ্ঠীর নির্মাণকর্ত্রীরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা হলেন কেয়া চক্রবর্তী ও স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। দু'জনেই এসেছিলেন অভিনয়ের জন্য কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল তাঁদের কর্মক্ষেত্র শুধু অভিনয়ের গণ্ডিতে সীমায়িত রইল না। নাট্যনির্মাণের নানাবিধ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে দলের মধ্যে সংহতির ক্ষেত্রকেও মজবুত করলেন তাঁরা। গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়সীমায় (১৯৪৩-২০০৩) এঁরা নাট্যপরিচালনার কাজ না করলেও— তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ভিত্তিভূমি ছিল এই নাট্যগোষ্ঠী-ই। নিজের দলের প্রতি তাঁদের ভালবাসা মমতা শৃঙ্খলা আনুগত্য— দলের ক্ষেত্রে এবং সমগ্র গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেও দৃষ্টান্তস্বরূপ। 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীতে কেয়া চক্রবর্তীর সময়কাল ১৯৬১-১৯৭৭; স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত ১৯৭৮ সালে এই নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রায় আটত্রিশ বছর ধরে অদ্যাবধি (২০১৬ পর্যন্ত) কাজ করে চলেছেন। এই দুই প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রীর নাট্য জীবন সম্পর্কিত বিশ্লেষণ এই গবেষণাপত্রের আলোচ্য অধ্যায়ের মূল বিষয়। এই পর্বের আলোচনায় তাঁদের অভিনেত্রী পরিচয়ের থেকে গুরুত্ব পাবে— নাট্য নির্মাণকর্ত্রীর পরিচয় ও তাঁদের সাংগঠনিক শক্তির পর্যালোচনা।

## কেয়া চক্রবর্তী (১৯৪২-১৯৭৭)

'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় প্রতিভা যেমন ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল, তেমনই তাঁর সমকালে নয়— সামান্য কিছুকাল পরেই নান্দীকার গোষ্ঠীতে কেয়া চক্রবর্তীর যোগদান ও বিভিন্ন নাটকে তাঁর অভিনয় বাংলার নাট্যদর্শককে বিস্মিত করেছিল। তাঁর সমকালের দর্শক সমালোচক একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন, নাট্যক্ষেত্রে তৃপ্তি মিত্রের পর কেয়া

চক্রবর্তীর সমমাপের অভিনেত্রী কেউ আসেননি। ‘কেয়ার থেকে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী এক তৃপ্তি ছাড়া কেউ নেই।’[১] প্রতিতুলনার প্রশ্ন নয়, তৃপ্তি মিত্রের পর বাংলা থিয়েটারে ‘total’ থিয়েটার কর্মী বলতে যা বোঝায় কেয়া চক্রবর্তীর নাম তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে তাঁর যাত্রার শুরু নান্দীকার-এর সঙ্গে, কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন ১৯৬৬ থেকে। ‘তিন পয়সার পালা’ নাটকটি চলাকালীন এই নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। ‘নান্দীকার’-এ তাঁর কর্মব্যস্ত অবস্থান বা স্থায়িত্ব মাত্র এগারো বছরের (১৯৬৬-১৯৭৭) হলেও অস্তিত্বের গভীরতা ও তীব্রতা অনেক বেশি। খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি থিয়েটারের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন— তাঁর অনমনীয় দৃঢ় মনোভাব, সাহস ও পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের কারণে। কেয়া চক্রবর্তীর জীবনদর্শন ও জীবনবীক্ষা বার বার প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর নাট্যজীবনে-ও। যথাক্ষেত্রে আলোচনায় তা প্রকাশ পাবে।

‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের কালে ১৯৪২-এ তাঁর জন্ম— তাই তাঁর নাড়ীতে যেন আন্দোলনের বীজ উপ্ত ছিল। প্রতিবাদ, জেদ, অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করা ছিল তাঁর স্বভাবজ লক্ষণ। খুব ছোটবেলায় মা-বাবার সম্পর্কের অবনতির কারণে কেয়া চক্রবর্তীকে মাত্র আড়াই-তিন বছর বয়সে মাকে ছাড়াই থাকতে হয়— এই পরিস্থিতি তাঁর মানসিক গঠনে একটা অবসাদ, অস্থিরতা ও জটিলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাড়িতে শাসন-ও ছিল খুব কড়া। মাঝে মাঝে তাঁকে একলা তালাবন্ধ অবস্থায়ও থাকতে হয়েছে। নিঃসঙ্গতায়, কঠিন শাসনে অতিক্রান্ত হয় তাঁর শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলো। মায়ের সঙ্গ, স্নেহ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ থাকত তাঁর হৃদয়, কখনও কখনও বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু বন্ধুদের চেষ্টায় তা বন্ধ হয়েছে— এই রকম পরিস্থিতিতে বেড়ে ওঠা কেয়ার মনোজগতের গঠন হতে পারত অবসন্নতার প্রতিমূর্তি— কিন্তু বাস্তবে কেয়া তা না হয়ে, হয়ে উঠলেন এক প্রাণশক্তিময়— আনন্দ ও উদ্দীপনায় ফুটতে থাকা এক নারী। কেয়ার মধ্যে ছিল এক অনমনীয় দৃঢ়, বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী মনোভঙ্গি। এই মনোভঙ্গি তাঁকে স্কুল জীবনের গণ্ডি ছাড়িয়ে যখন এনে ফেলল স্কটিশচার্চ কলেজের চৌহদ্দিতে, তখন থেকেই কেয়া আপন স্বাধীন সত্তার জয়পতাকা তুলে ধরলেন।

স্কটিশচার্চ কলেজের এক বিশেষ ভূমিকা আছে কেয়া চক্রবর্তীর জীবনে। নাট্যের জগতে প্রবেশের আগে এই কলেজে তাঁর পড়াশোনার সময় থেকেই নিজস্ব জীবনের গতিপথ নিজেই ঠিক করে নিতে থাকেন তিনি। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় থেকে স্কুলজীবন শেষ করে ভর্তি হন স্কটিশচার্চ কলেজে।

বাড়িতে ইচ্ছে ছিল বেথুন অথবা ব্রেবোর্ন কলেজ, কিন্তু তিনি নিজে বেছে নেন এই কলেজ— যেখানে কো-এডুকেশন শিক্ষা প্রচলিত এবং মিশনারি কলেজের বাতাবরণ। এখান থেকেই আই.এ পাশ করেন ১৯৫৯-এ প্রথম বিভাগে, আর ১৯৬১-তে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ. পাশ করেন। এই কলেজ থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর নাট্যচর্চা। স্কটিশচার্চ কলেজে কেয়া চক্রবর্তী অভিনীত নাটক—

| **নাটক** | **নাট্যকার** | **চরিত্র** |
|---|---|---|
| সাঁঝের প্রদীপ | অখিল নিয়োগী | বেদেনী |
| | | (কলেজের বাইরে অভিনীত হয়) |
| ভাড়াটে চাই | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | একটি চরিত্র |
| কন্যকা | চিত্তরঞ্জন ঘোষ | কামিনী (১৯৫৮) |
| ত্রাহি | চিত্তরঞ্জন ঘোষ | সুলতা (১৯৫৯) |
| টংকাতংক | চিত্তরঞ্জন ঘোষ | মিনতি (১৯৬০) |

‘কন্যকা’ ও ‘ত্রাহি’ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তঃকলেজ নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে এবং এই নাটক দিল্লি ও ব্যাঙ্গালোরে প্রেরিত হয় এবং দুটি নাটকের জন্যই কেয়া চক্রবর্তী প্রশংসিত হন ও শংসাপত্র পান। স্কটিশচার্চ কলেজে পড়বার সময় চেকভের— ‘দি প্রোপোজাল’ অবলম্বনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবানুবাদ ‘প্রস্তাব’ নাটকটিতে— ১৯৬০-১৯৬১-এ কেয়া চক্রবর্তী অভিনয় করেন। তাঁকে নিয়ে আসেন ফিফ্‌থ ইয়ারে ইংরেজি অনার্সের ছাত্র রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। পরিচালক ছিলেন দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। ‘‘প্রস্তাব’ নাটকের রিহার্সালে কেয়া বসেছিল বেশ জড়োসড়ো হয়ে, ভীতুর মতো। পরে শুনেছিলাম, দীপেনবাবু কেয়াকে ভয় দেখিয়ে রেখেছিলেন যেন ও রিহার্সালের সময়ে আমার সামনে কোনো বাচালতা না করে, না হাসে।’[২] কলেজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর নিজস্ব অভিমত। পুরোপুরি মেয়েদের কলেজে পড়ার থেকে ‘Co-education system’ ছিল তার পছন্দের। একই সঙ্গে পুরুষ ও মহিলাদের শিক্ষাগ্রহণ মেয়েদের জীবনভঙ্গি ও জীবনগঠনের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে— এ কথা তিনি তার সদ্য যৌবনে পা ফেলেই বুঝতে পেরেছিলেন। সেই সময় কেয়া চক্রবর্তী স্কটিশচার্চ কলেজের প্রথম বর্ষের উজ্জ্বল তরুণী। কলেজ জীবনটাকে উপভোগ করেছেন কেয়া নিজস্ব গতিতে। তাঁর সহপাঠীর মতে— ‘উচ্ছ্বলতা কেয়ার চরিত্রের ও আচরণের ছিল সবচেয়ে দৃশ্য দিক। তাকে কখনও মনমরা দেখিনি, তার নানান মানসিক দ্বিধা ও যন্ত্রণার অন্ত ছিল না।’[৩] জীবনের এই পর্যায়ে নিজেকে নানান দিকে ব্যস্ত রেখেছিলেন তিনি। এই ব্যস্ততার দুটি কারণ হতে পারে— (১) নিঃসঙ্গতা ভুলে থাকার জন্য (২) প্রাণবন্ততার বহিঃপ্রকাশ।

এ সময়ে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন কেয়া— Student Federation বা S.F. নিয়ে তাঁর মধ্যে ছিল তুমুল উত্তেজনা। সাহিত্য পড়া, সাহিত্যের আলোচনা-আড্ডা-আরও বিচিত্র বিষয় নিয়ে পড়াশোনা ও লেখালেখির জগতে ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে থাকতেন তিনি। বিদগ্ধ আলোচনার আয়োজন ছিল অধ্যাপিকা কিটি স্কাটলারের বাড়িতে, যিনি ছিলেন অম্লান দত্তের স্ত্রী। তাঁর বাড়িতে ইংরেজি সাহিত্য, পাশ্চাত্য সংগীত, সত্যজিৎ রায়ের ছবি, বাংলা সাহিত্য, কবিতা ও নাটক ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। জীবনের এই পর্যায়ে নিজেকে নানান দিকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন তিনি।

কলেজে থাকতেই নাটকের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় এবং সেই সময় থেকেই নান্দীকারের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আকর্ষণ। এইরকম এক তরুণী উজ্জ্বল-মেধাবী, সরল, দুঃসাহসী কেয়া চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ পাশ করে ১৯৬৩-তেই দমদম ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে যুক্ত হন। এক বছরের মধ্যেই চাকরি পান স্কটিশচার্চ কলেজে। ১৯৬৪-১৯৭৪ এই দশ বছর টানা অধ্যাপনার চাকরি আর ক্রমশ নাটকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়া। এতটাই সেই সম্পৃক্তি যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, স্থায়ী আর্থিক নিরাপত্তাকে পিছনে ঠেলে, অধ্যাপিকা হিসেবে জনপ্রিয়তা ও ছাত্রছাত্রীদের গভীর অনুরাগকে সঙ্গী করে ইস্তফা দেন অধ্যাপনার পদ থেকেও। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল দু'নৌকায় পা দিয়ে পথ চলা যায় না। মনে হয়েছিল নাটকের জন্য বেশি সময় দিতে গিয়ে তিনি ছাত্রদের প্রতি অবিচার করছেন এবং কলেজে সঠিক পথে অধ্যাপনার কাজটি করতে গিয়ে নাটকের জন্য বেশি সময় দিতে পারছেন না। অতএব নিজের কাছে সততার প্রমাণ দিতে গিয়ে একটি পথকেই তিনি বেছে নেন— তা হল নাটক এবং অবশ্য সেই নাট্যদল হল 'নান্দীকার'।

নাটকের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র, সমাজগঠনের সমাজভাবনার চিত্রটাকে প্রকাশ করার তাগিদ তাঁকে নাট্যজীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। কেয়া চক্রবর্তীর অধ্যাপনার ধরনটি ছিল আলাদা। যখন তিনি স্কটিশচার্চ কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর— চাকরি করেছেন আরও দশটা বছর। সপ্রতিভ, প্রাণবন্ত, অল্পবয়সি, বিদূষী অধ্যাপিকা ছাত্রছাত্রীদের কাছে ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়— তিনি তখন 'কেয়াদি'। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা কেয়া চক্রবর্তীর কাছে পড়া বা শেক্সপিয়রকে চেনা যে এক অনন্য অভিজ্ঞতা, তা তাঁর ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিতে অম্লান। কখনও ছাত্রছাত্রীদের ডায়াসে এনে অভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতেন— 'পড়ানোর একটু নতুন স্বাদ। পড়ানোর ভঙ্গিটি আপনার বড়ো সরস ছিল, কেয়াদি। বাংলা স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েগুলোকে শেক্সপিয়ার চেনানোর কী আবেগ ছিল আপনার। কী স্পষ্ট উচ্চারণ। প্রাণ পেত

প্রতিটি শব্দ! আপনার মতো এক নাট্যব্যক্তিত্বের কাছে শেক্সপিয়ার পড়া, জীবনের এক সম্পদ হয়ে আছে কেয়াদি।'[৪] কত বছর আগের স্মৃতি, কিন্তু তার উজ্জ্বলতর প্রকাশ ঘটেছে এই স্মৃতিচারণায়। মনের থেকে এই অধ্যাপিকা কেয়া চক্রবর্তীকে গ্রহণ করেছিল তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ অনেক আগেই রপ্ত করে নিয়েছিলেন তিনি— যা ছিল তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন, নিজস্ব ভঙ্গি আর নাটক করার অভিজ্ঞতা। তিনি যদি অভিনেত্রী না হতেন হয়তো এভাবে পড়ানোর ভঙ্গিটি তাঁর অধরাই থেকে যেত। কিন্তু প্রয়োজনে তিনি ক্ষুব্ধ হতে দ্বিধা করেন না। সিলেবাসের অযৌক্তিকতায়ও তাঁর ক্ষোভ বেড়েছে বই কমেনি। শুধু চাকরির মনোবৃত্তি থেকে পড়াশুনা করা, ডিগ্রি পাওয়ার জন্য অস্থির অবস্থা তাঁর কাছে হাস্যকর হয়ে উঠেছিল। পড়ানোর ব্যাপারটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে।

১৯৬৯-১৯৭১ সময়পর্বে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে যখন সাংঘাতিক অরাজকতা, স্কুল কলেজে শিক্ষকদের নিরাপত্তা নেই— সে সময়েও কেয়া চক্রবর্তী সক্রিয় থেকেছেন ছাত্রছাত্রীদের যে-কোনও বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে। একটি ঘটনার উল্লেখে পরিস্ফুট হবে কীভাবে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে, 'সেই সময় একদিন বাইরের কিছু সশস্ত্র যুবক এসে স্কটিশ চার্চ কলেজের একটি ছাত্রকে টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছিল। অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, কর্মচারী, ছাত্র কেউ-ই সেদিকে তাকাতে সাহস পায়নি। কেয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রায় শাড়ি খুলে নেওয়া সত্ত্বেও ছাত্রটিকে পক্ষীশাবকের মতো বুকে জড়িয়ে রাখে এবং শেষ পর্যন্ত বাঁচায়।'[৫] এই ঘটনা স্পষ্ট করে দেয় ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে কেয়া চক্রবর্তীর দুর্মর সাহসিকতা ও সহমর্মিতার কোনও অভাব ছিল না।—

সৌমিত্র মিত্র প্রমুখরা যখন স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন সে সময়টা সারা কলকাতা বিপর্যস্ত ৬০-এর দশকের শেষ আর ৭০-এর দশকের শুরুর সময়কার অস্থিরতায়। কলেজে তাঁদের যে বন্ধুবান্ধবদের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ছিল, তাঁরা নাটক কবিতা গান নিয়ে চর্চা করতেন বা আড্ডা দিতেন সে ক্ষেত্রে কেয়া চক্রবর্তীর বিশেষ উৎসাহ ছিল। সব সময় তাদের পাশে থেকেছেন এবং পাশে থাকতে থাকতে কবে যেন তাঁদের শিক্ষিকা থেকে তাঁদের বন্ধু হয়ে গেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও তাঁর সদ্ভাব ছিল। কিন্তু সুস্থ সহৃদয় কলেজ অধ্যাপনার পরিবেশ ছেড়ে তিনি নাটককেই পুরোপুরি সময়ের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন। 'নান্দীকার'-এর 'নটী বিনোদিনী'র ৫০তম অভিনয়ের দিন দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের মধ্যে এক খোলাখুলি আলোচনার আয়োজন

হয়। দর্শকদের মধ্যে প্রশ্ন করার উদ্যোগকে জাগাবার জন্য কেয়া চক্রবর্তীর দুই ছাত্রছাত্রী সৌমিত্র মিত্র ও বোলান গঙ্গোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সৌমিত্র মিত্র-র স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে এই সময় থেকেই কেয়া চক্রবর্তীর মধ্যে কলেজ ও নাটক নিয়ে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি চাকরি ছেড়ে পুরো সময়ের জন্য থিয়েটারে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময় আবার বিরোধ বাধে রঙ্গনা ও নান্দীকারের মধ্যে। সবটা মিলিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে স্কটিশচার্চ কলেজের কৃতী ছাত্রী স্কটিশচার্চ কলেজের আধুনিকমনস্ক অধ্যাপিকা কেয়া চক্রবর্তী চাকরি ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে থিয়েটারের কাজে নিমগ্ন হন। অবশ্য এই মগ্নতা খুব শান্ত স্থির ভঙ্গির ছিল না, ছিল ঝোড়ো হাওয়ার মতো দুরন্ত-সাহসী ও গতিময়। তাঁর মানসিক গঠনের উৎসভূমি নারীবাদী মনোভঙ্গির বহির্প্রকাশ নয়, তাঁর স্বোপার্জিত সামাজিক, মানবিক বৃত্তি। যে সময়ে তিনি সচেতন নাট্যশিল্পী এবং মেধাবী অধ্যাপিকা, তখন কিন্তু সারা বিশ্ব জুড়ে নারীবাদী আন্দোলনের প্রবাহ। বিদেশি সাহিত্য পাঠ ও সমাজবিজ্ঞানমনস্কতা কেয়া চক্রবর্তীকে প্রভাবিত করেছিল অবচেতনে। তারই ফলস্বরূপ তিনি বর্জন করেছিলেন বিবাহিত নারীর অলঙ্কার— শাঁখা সিঁদুর। লিঙ্গভেদের ছুঁৎমার্গতা সরিয়ে তিনি ধূমপানেও দ্বিধাগ্রস্ত বা কুণ্ঠিত ছিলেন না। আবার এতটাই সংস্কারমুক্ত মনের মানুষ ছিলেন কেয়া চক্রবর্তী যে, খুব সাবলীলভাবেই পুরুষদের সামনে এমনকী ছাত্রদের সামনেও মেয়েদের ঋতু সংক্রান্ত বা শরীর সম্পর্কে কথা বলতে পারতেন অনায়াসে— যা অন্য অনেক মেয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেই ষাট-সত্তরের দশকে। সংস্কারমুক্ত দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় কেয়া চক্রবর্তীর এই মানসিক গঠনে। এ প্রসঙ্গগুলির অবতারণা শুধুমাত্র তাঁর মনোজগতের ছবিটিকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে।

বিভিন্ন জনের স্মৃতিচারণায়, তাঁর আত্মজৈবনিক দুটি রচনায়, তাঁর প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে কেয়া চক্রবর্তীর যে অবয়ব তৈরি হয় সেখানে তিনি সামাজিক বাধা-নিষেধ অতিক্রমী সাহসী, পরিহাস ও ব্যঙ্গে সামাজিক নিয়মকানুনের সমালোচক এক নারী। এক অভিনেত্রী। তিনি তাঁর বিশ্বাসকে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন যেমন, তেমনই তার প্রকাশও ঘটিয়েছেন। এই সাহস, আর্থিক নিরাপত্তা ভেঙে বেরিয়ে আসার স্থির সিদ্ধান্ত, মানুষ কেয়া চক্রবর্তীকে চিনিয়ে দেয়। এ কারণেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন দু'নৌকায় পা দিয়ে চলা যায় না— বেছে নেন নাটককে ও শিক্ষকতায় ইস্তফা দেন। তাঁর সিদ্ধান্ত 'যেদিন থেকে ঠিক করলাম অভিনয়ই করবো, সেদিনই ঠিক করলাম চাকরিটা ছেড়ে দেব। দুটো কাজ একসঙ্গে করলে স্বাভাবিকভাবে দুটোকেই বঞ্চিত করা হয়।'[৬] এমন নয় যে কলেজের পরিবেশ তাঁর ভাল লাগছিল না বা কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না— এ দুটির কোনওটির কারণে নয়, মূলত তিনি ছিলেন তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তে অনড়।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অনাগ্রহ-বিরক্তি, অপর দিকে নাটকের প্রতি ক্রমশ বাড়তে থাকা আগ্রহ— এই দুয়ের সংযোগ তাঁকে প্রাণিত করল নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণে। উপরন্তু সে সময়ে তিনি চোখের সামনে দেখছেন শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নাট্যব্যক্তিত্বদের— যাঁদের কাছে নাটকই শেষ গন্তব্য। 'এদিকে থিয়েটারটা ক্রমশ বেশি করে টানছিল। বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত গিরিশ কন্নড়ের *তুঘলক* নাটকে অংশগ্রহণ করি এই সময়। পরিচালক ছিলেন, শ্যামানন্দ জালান। তুঘলক হন শম্ভু মিত্র। তুঘলকের বিমাতা ও প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করি আমি। বহুদিন সকালে এই নাটকের রিহার্সাল করতে গিয়ে দেখেছি শম্ভুদা তুঘলক পর্বের ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করছেন। নান্দীকারে দেখতে পেতাম অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সকাল থেকে উঠে নাটক লিখছেন, নাটক পড়ছেন এবং সন্ধ্যেবেলায় আবার নান্দীকারের জন্যে নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছেন কিংবা অভিনয় করছেন। পুরোপুরি নাটক নিয়েই আছেন। নাটকের জগতের মানুষ হয়ে গেছেন তিনি। এ সব দেখে ঠিক করলাম যে, কোনো ব্যাপারে পুরোপুরি মন দিতে না পারলে কাজ করা যায় না। তখন ঠিক করলাম চাকরি ছাড়ব। অনেকেরই আপত্তি ছিল তাতে। এমনকি আমার স্বামীরও। কিন্তু আমার মা অভয় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, লোকের যা ভালো লাগে না তাকে দিয়ে তা করানো পাপ।'[৭] সেই কাজটা করবেন বলেই— থিয়েটার নিয়ে অনেক সময় কাটানোর জন্য দেশের বহু মানুষের কাছে পৌঁছতে পারার জন্যই স্কটিশচার্চ কলেজ, ছাত্রছাত্রীদের ভালবাসা, প্রতি মাসে প্রায় সাত-আটশো (তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে অধ্যাপকদের মাইনে বাড়ার কথা ছিল) টাকা রোজগারের নিশ্চিন্ততা দূরে সরিয়ে থিয়েটারকে একমাত্র অবলম্বন করলেন। 'নান্দীকার'ই হয়ে উঠল তাঁর একমাত্র অবলম্বন, ধ্যান-জ্ঞান, জীবনের বেঁচে থাকার অর্থ।

'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০-এর ২৯ জুন। আর কেয়া চক্রবর্তী প্রথম অভিনয় করেন 'নান্দীকার' প্রযোজিত চতুর্থ নাটক 'চার অধ্যায়' (১৯৬১)-এ। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে নান্দীকারের প্রথম রবীন্দ্রনাটকে মুখ্য ভূমিকায় এলার চরিত্রে অভিনয় করেন কেয়া চক্রবর্তী। এর আগে 'নান্দীকার' প্রযোজিত 'বিদেহী', 'দাও ফিরে সে অরণ্য' কিংবা 'সেতুবন্ধন'-এ কেয়া অভিনয় করেননি, কিন্তু নান্দীকারের স্থপতি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত ও নির্দেশিত 'প্রস্তাব', নাটকে অভিনয়ের জন্য তাঁকে নিয়ে আসেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ফলত 'নান্দীকার'-এ যুক্ত হওয়ার আগেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর সঙ্গে নাট্য অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এর প্রযোজনার সময় রুদ্রপ্রসাদ-ই কেয়া চক্রবর্তীকে নিয়ে আসেন 'এলা'র চরিত্রে অভিনয়

করার জন্য। ইতিমধ্যে এ নাটক ‘বহুরূপী’ নাট্যসংস্থা সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছে এবং তৃপ্তি মিত্র এলার ভূমিকায় তৈরি করেছেন নিজস্ব ঘরানা। ‘নান্দীকার’ প্রযোজিত ‘চার অধ্যায়’ সম্পর্কে পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোভাব এই যে ‘বহুরূপী’ এ নাটকের অভিনয় করে যে সাফল্য পেয়েছে, তার পর এ নাটক করা ‘নান্দীকারে’র পক্ষে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু ‘বহুরূপী’র অভিজ্ঞ নাট্যব্যক্তিত্বের প্রযোজনার তুলনায় কমবয়সি তরুণ প্রজন্মের প্রযোজনাটিরও বিশেষ প্রশংসা হয়েছিল। এ নাটকের আটটি অভিনয় হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি অভিনয়-ই ছিল আমন্ত্রিত। এ নাটকের আর্থিক সাফল্য ‘নান্দীকার’-এর পূর্ববর্তী ঋণ শোধ করতে সক্ষম হয়। এর পর বেশ কয়েকটা বছর কেয়া চক্রবর্তী ‘নান্দীকার’-এ অভিনয় করেননি নিজের পড়াশোনার জন্য, কিন্তু যোগাযোগ ছিল। ১৯৬৬-তে আবার তিনি নিয়মিতভাবে ‘নান্দীকার’-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং অভিনয় ছাড়াও সাংগঠনিক বিভিন্ন কাজে বিশেষভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

একজন নাট্যাভিনেত্রীর কাজ শুধুমাত্র অভিনয়ের গণ্ডীতেই সীমায়িত না থেকে যখন সংগঠনের নানাবিধ কর্মভাবনার বিবিধ ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে থাকে, তখন সেই অভিনেত্রীর অবস্থান সংগঠনে একটি বিশিষ্ট স্থানে উন্নীত হয়। কেয়া চক্রবর্তীর অবস্থানও ‘নান্দীকার’ নাট্যগোষ্ঠীতে ছিল তেমনই। কেয়া চক্রবর্তী ছিলেন প্রাণবন্ত, কর্মঠ। সংগঠনের সমস্ত কাজেই ছিল তাঁর বিপুল আগ্রহ। বিভাস চক্রবর্তীরা যখন ‘নান্দীকার’ থেকে একসঙ্গে প্রায় ১৩ জন বেরিয়ে যান, তার পর পরই ‘নান্দীকার’-এ আবারও নিয়মিতভাবে আসতে থাকেন কেয়া চক্রবর্তী এবং ‘নান্দীকার’-এর মতো কর্মব্যস্ত দলে সংকট সংশয়ের কালে যে ভূমিকা নেন, তা তাঁকে চিহ্নিত করে থিয়েটারের একজন যথার্থ কর্মী হিসেবে। শুধু অভিনেত্রী নন সংগঠক হিসেবেও তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। থিয়েটারের ক্ষেত্রে তিনি ক্রমশ হয়ে উঠেছিলেন অপরিহার্য। ‘...বলতে গেলে তৃপ্তিদির পরই ওর নাম করা যায়। কেয়ার থিয়েটার সম্বন্ধে যে পড়াশুনো, আগ্রহ, চর্চা তার যে থিয়েটার নিয়ে ব্যাপক ভাবনা, যে বোধ, যে জীবন দর্শন— সবকিছু নিয়েই একজন থিয়েটারের মানুষ হিসাবে অনেক জায়গা দখল করেছিল। ... সার্বিকভাবে থিয়েটারের মানুষ হয়ে ওঠা খুব কম মানুষের ক্ষেত্রেই হয়— কেয়ার কিন্তু এটা ঘটেছিল। সমস্ত কিছুর সঙ্গে থিয়েটারকে নিজের অস্তিত্ব করে তোলা, থিয়েটারকে নিজের জীবনচর্চার অঙ্গীভূত করে নেওয়া, থিয়েটারকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে গ্রহণ করা— এই জায়গায় কেয়া কিন্তু অনেক বড়ো জায়গায় পৌঁছেছিল ও পৌঁছত।’[৮] এ ছাড়াও বিভাস চক্রবর্তী লিখেছেন— ‘...নান্দীকারের মতো এতবড়ো গুরুত্বপূর্ণ কর্মব্যস্ত দলে ও যে একজন সংগঠকের ভূমিকা নিয়েছিল সেটাও কম বড়ো কথা নয়। তার সাংগঠনিক ক্ষমতা, অভিনয় ক্ষমতা সেই সময় নান্দীকারকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে।’[৯]

শুধু তো বিভাস চক্রবর্তী নন— যাঁরা সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সঙ্গে দিনের পর দিন কাজ করেছেন তাঁরাও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা স্বীকার করেছেন একবাক্যে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের উদ্ধৃতি তুলে ধরলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। এঁদের মধ্যে রাধারমণ তপাদারের মন্তব্যটির মধ্য থেকে কেয়া চক্রবর্তীর জীবন সম্পর্কিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উঠে আসে। রাধারমণ তপাদার ছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ স্নেহধন্য এবং তিনি কেয়া চক্রবর্তীরও প্রায় সমসাময়িক। তাঁর অবচেতনে কেয়া চক্রবর্তী সম্পর্কে ঈর্ষার মনোভাব যে কাজ করত তা তিনি অকপটে স্বীকারও করেছেন। নান্দীকার-এর 'তিন পয়সার পালা'-নাটকটির প্রযোজনার সময় থেকেই মূলত কেয়া চক্রবর্তীর জনসংযোগ বাড়তে থাকে। ক্রমশ তা দায়িত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়— তাঁর মন্তব্যটি ছিল এ রকম— 'নান্দীকার থেকে রঙ্গনা নেওয়ার ব্যাপারে কেয়া কিন্তু এগিয়ে যায় অনেকটা। তার সাংগঠনিক ক্ষমতার বিকাশডানা বিস্তৃত হয় ক্রমে। আজ এখানে প্রেস কনফারেন্স, কাল ওধারে মিটিং এরকম বহুবিধ দৌড়ঝাঁপে কেয়া নিজেকে ছড়িয়ে দেয় ধীরে ধীরে।'[১০] দীর্ঘদিনের শুভানুধ্যায়ী চিত্তরঞ্জন ঘোষ লিখছেন— 'গ্রুপ থিয়েটারের কাজ নিছক অভিনয় নয়, এটা একটা আন্দোলনের অঙ্গ। গ্রুপের সদস্যদের ভালো শিল্পী তো হতেই হবে, সেই সঙ্গে ভালো নাট্যকর্মী ও কমরেড-ও হতে হবে। এই দিক থেকে কেয়ার জুড়ি মেলা ভার। 'ছোটো', 'বড়ো', 'শক্ত' বা 'অতি-শ্রমসাধ্য' যে কাজই হোক, কেয়া যেচে নিয়ে তা করত। পোশাক বা সহনির্দেশনার দায়িত্বও তার কোনো কোনো নাটকে ছিল। প্রচারের কাজ, হিসেবের কাজ, পুরো সে দেখত। দলের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করত নিখুঁতভাবে। সদস্যদের সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় সর্বদাই অগ্রণী ছিল। অপরিণত সদস্যদের তৈরি করে তোলায় নানা চেষ্টা ছিল। নান্দীকারের লাইব্রেরী গঠনের মূলেও তার চেষ্টাই প্রধান।... দলের জন্য বহু স্বার্থত্যাগ রয়েছে তার। চাকরি ছেড়েছে। সংকটের দিনে ব্যক্তিগত দায়ে হাজার হাজার টাকা জোগাড় করেছে। ভাঙন দেখা দিলে প্রাণপাত করে তা রুখেছে।'[১১] নান্দীকার-এর আরেক সদস্য অচিন্ত্য দত্ত ১৯৭৩ সালে 'নান্দীকার'-এ যোগ দেন এবং 'ফুটবল' নাটকে কেয়া চক্রবর্তী ও তিনি ছিলেন সহকারী পরিচালক। তাঁর জবানিতে পাওয়া যায়— 'এরপর শুরু হল *ফুটবল*— নান্দীকারের ইতিহাসে এক সর্বকালীন record breaker। কেয়াদির দায়িত্ব নাটকের পোষাকের— সেইসঙ্গে সহকারী পরিচালক— আমিও আর এক সহকারী পরিচালক। ... চল্লিশ জনের পোষাক— যা করলেন কেয়াদি Market-এ গিয়ে সে সব কিনে নিয়ে আসা তারপর মিহিরদাকে দিয়ে সেগুলি সেলাই করানো—। ... এছাড়া 'নান্দীকার'-এর বিজ্ঞাপনের কাজ দেখতেন কেয়াদি। শ্রদ্ধেয় চণ্ডী লাহিড়ীর আঁকা কার্টুন ছবি ফুটবল এর বিজ্ঞাপনে এক অন্যমাত্রা জুগিয়েছিল।'[১২] 'নান্দীকার'-এর সেই সময়ের এক তরুণ সদস্য প্রকাশ

ভট্টাচার্য লিখছেন— '...দেখতাম রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মঞ্জু ভট্টাচার্য, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, পরিমল মুখোপাধ্যায়কে কোনো না কোনো কাজ করছেন। থিয়েটারে অভিনয় ছাড়াও অনেক কাজ আছে এবং সেগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পারলাম।... কেয়াদি ও পরিমলদা বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতেন অজিতদার সঙ্গে স্ক্রিপ্ট এর কাজে।'[১৩]

শুধু তো পোশাক বা স্ক্রিপ্ট নয়, বিজ্ঞাপনের দায়িত্বও বহন করতেন কেয়া চক্রবর্তী। নানান অসুবিধার মধ্যে অভিনয় করেও। অভিনয় শেষে আবারও পরের দিনের বিজ্ঞাপন লিখতে বসে যাওয়া। তাঁর মায়ের যেদিন পেসমেকার বসবে সেদিনই 'ভালোমানুষ'-এর ডবল শো। পৌনে তিনটে নাগাদ রঙ্গনায় পৌঁছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেকআপ নিয়ে প্রত্যেক দিনের মতো একইভাবে শান্তা ও শান্তাপ্রসাদের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শককে অভিভূত করা। আবার শো শেষ করেই রঙ্গনার কাউন্টারের সামনের সিঁড়িতে বসে পরের দিনের বিজ্ঞাপনের ম্যাটার তৈরি করা। তার পর আবার হাসপাতাল। পরিবারের সংকট-মুহূর্তে দলের কাজে এতটুকু ফাঁক না রাখার প্রবণতা। 'ভালোমানুষ' চলাকালীন ভালোমানুষের বিজ্ঞাপন তৈরি করছেন তিনি এবং এই বিজ্ঞাপনগুলি দেখলে বোঝা যায় কীভাবে ভাবছেন তিনি, নতুন ভাবে নাটকটিকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। মূলত চারজনের চারটি অবস্থান থেকে অভিনয় ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে কেয়া চক্রবর্তীর অবদান প্রসঙ্গে তথ্য দিয়েছেন। প্রথম জন সহকর্মী তথা সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বী রাধারমণ তপাদার, দ্বিতীয় জন অভিজ্ঞ অধ্যাপক নাট্যবিদ কেয়া চক্রবর্তীর মাস্টারমশাই চিত্তরঞ্জন ঘোষ, তৃতীয় জন সমকালের ভ্রাতৃস্থানীয় সহকর্মী অচিন্ত্য দত্ত এবং চতুর্থ জন নতুন সদস্যের চোখ দিয়ে দেখা কেয়া চক্রবর্তীর কাজে বিস্মিত গুণমুগ্ধ প্রকাশ ভট্টাচার্য। এঁদের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে উঠে এল অনেকগুলো দিক— যাকে সূত্রাকারে সাজালে বলা যায়—

- ❖ প্রেস কনফারেন্স-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেকে অপরিহার্য করে তোলা,
- ❖ 'নান্দীকার'-এর বাইরে 'নান্দীকার'-এর মুখপাত্র হয়ে ওঠা;
- ❖ 'ছোট', 'বড়', 'শক্ত' বা 'অতি-শ্রমসাধ্য'— সব রকমের কাজে সমান দক্ষতা;
- ❖ পোশাক তৈরি করা;
- ❖ সহ-নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করা;
- ❖ প্রচারের কাজ, বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করা;
- ❖ হিসাবের কাজ করা;
- ❖ সদস্যদের মধ্যে একতার ভাব বজায় রাখতে উদ্যোগী হওয়া;

- অপরিণত সদস্যদের তৈরি করে তোলার চেষ্টা;
- 'নান্দীকার'-এর লাইব্রেরি গঠন;
- দলের জন্য স্বার্থত্যাগ;
- চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দলের সংকটে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অর্থের জোগাড় করা;
- দলের ভাঙনরোধে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ;
- স্ক্রিপ্ট সংক্রান্ত কাজে পূর্বজ পরিচালকদের সহযোগী হয়ে ওঠা;
- এক মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রীর পরিবর্তে অভিনয় করে দলকে সাময়িক সংকট থেকে রক্ষা করা;
- চুল বাঁধা, মেকআপ-এ সাহায্য করা ইত্যাদি নেপথ্যকাজেও অংশগ্রহণ।

অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এই গবেষণাপত্রের লক্ষ্য নয়, কিন্তু অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীই সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ক্রমশ নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছেন। তাঁর অভিনয় সম্পৃক্ত থাকত 'নান্দীকার'-এর সমস্ত কাজের সঙ্গে। সবার্থেই তিনি ছিলেন গ্রুপ থিয়েটারের যোগ্য কর্মী এবং 'নান্দীকার' ছাড়া অন্যত্র অভিনয় করার কথা কল্পনাতেও আনেননি। কয়েকটি নাটকে তিনি 'নান্দীকার'-এর বাইরে গিয়ে অভিনয় করেছেন তবে বিশেষ প্রয়োজনে। যেমন ১৯৭৪-এ কার্জন পার্কে গুলিবিদ্ধ হন বাইশ বছরের যুবক প্রবীর দত্ত। তারই প্রতিবাদে শামিল হয়ে। বাদল সরকার পরিচালিত 'মিছিল' নাটকে কোরাসে ছোট্ট একটা চরিত্রে অভিনয় করেন কেয়া চক্রবর্তী। 'মিছিল' ছিল পথ নাটক। ছোট্ট একটি চরিত্রে অভিনয় করলেও সময়মতো রিহার্সালে আসা, চরিত্রটি বাস্তবায়িত করার জন্য অভিনয়ের দিন কার্জন পার্কের মাটিতে পরিষ্কার শাড়িটি কর্দমাক্ত করা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ছিলেন একেবারে নিয়মনিষ্ঠ। '...কেয়ার নিষ্ঠার কথা, যা মগজের নয়, নিষ্ঠা ছিল কেয়ার মজ্জার ভেতর, তার অন্তর্গত বোধে।'[১৪] এই অন্তর্গত নিষ্ঠায় সাংগঠনিক নানান কাজে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন কেয়া চক্রবর্তী। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নিজেকে ক্রমশ তৈরি করে নিয়েছিলেন। অনেকে প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। অনেকে শ্রম দিয়ে সেই জায়গাটা পূর্ণ করেন। কেয়া চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে এই শ্রম ও প্রতিভার মিলন ঘটেছিল থিয়েটারের কর্মী হিসেবে। এই ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা 'নান্দীকার'কে তার সুসময় এবং দুঃসময়ে সাহায্য করেছিল। ১৯৬৭-১৯৭৭ এই এক দশককাল জুড়ে কেয়ার উত্থানের পর্ব। 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'শের আফগান' নাটকে কখনো নিজস্ব ভূমিকায় কিংবা কখনও কারও ছেড়ে যাওয়ার পর তার জায়গায় অভিনয় করতে করতে নিজেকে যেমন প্রস্তুত করেছেন, তেমনই 'নটী বিনোদিনী'-তে মঞ্জু ভট্টাচার্যের পর বিনোদিনীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় একটা বাঁক আর 'ভালো মানুষ'-এ শান্তা ও শান্তাপ্রসাদের

ভূমিকায় তাঁর অভিনয় ইতিহাস। এর পরই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র 'আন্তিগোনে'র ভূমিকায় তিনি ঝলসে উঠলেন। 'চক্র'-র দ্রৌপদী আর 'ফুটবল'-এর মাসি (তাঁর শেষ মঞ্চাবতরণ) প্রশংসিত হল। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয়, চারিদিকে প্রশংসার জোয়ার—এ সবের মধ্যেও কেয়া চক্রবর্তী নিজের অহঙ্কারের বাতাবরণে ঢুকে কূপমণ্ডুকতার পরিচয় দিলেন না— বৃহত্তর নাটকের স্বার্থে নিজেকে উজাড় করে দিলেন।

পূর্ব সূত্রানুসারে তাঁর কাজের ক্ষেত্রগুলি আলোচনা করা যেতে পারে—

**সহনির্দেশনা :** মঞ্চ তাঁর 'প্রবুদ্ধ প্রতিভার বিচরণভূমি' হলেও অভিনয়ের আলোকিত দুনিয়ার বাইরে থিয়েটারের অন্যান্য কাজগুলোও তিনি মনোযোগ দিয়ে করে গেছেন সমান্তরালভাবে। বলিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করার আকাঙ্ক্ষা যেমন তাঁর তীব্র ছিল, পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য লাভও তাঁর কাছে ছিল তেমনই আকাঙ্ক্ষিত। থিয়েটারের অন্যান্য কাজের দায়িত্ব গ্রহণেও তিনি ছিলেন সমান উৎসাহী। মূলত অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর জীবনগ্রাফ যখন ঊর্ধ্বমুখী, তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন সহপরিচালনার কাজ। কী কাজ ছিল সহনির্দেশকদের? 'ফুটবল' প্রযোজনার আরেক সহ নির্দেশক ও অভিনেতা অচিন্ত্য দত্ত জানাচ্ছেন যে— 'বেসিক্যালি তখন দুটো ডিপার্টমেন্ট থাকত একটা নির্দেশনা সহযোগী আর প্রযোজনা সহযোগী। দুজন দুজন করে চারজন থাকতেন সাধারণত। প্রযোজনা সহযোগী থাকতেন পরিমলদা আর সঙ্গে আর কেউ। কেয়াদি প্রধান সহপরিচালক হতেন। ... সহযোগীদের কাজ ছিল একটা production-এর সবটাই লিখিত আকারে রাখা। ডকুমেনটেশন। নির্দেশনা সহযোগী হিসেবে আমরা, একজন অভিনেতা এখান থেকে ওখানে গেলে সেটা একেবারে আঁকা থাকত। আর কোন ডায়ালগে কে কোথায় যাবে তার note রাখা। যা কিছু উপকরণীয় ডিরেকটোরিয়াল কাজের জন্য, সেগুলোর ব্যবস্থা করা। প্রযোজনা সহযোগীর দায়িত্ব ছিল ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে রিকুইজিশন কেনার। ডিরেক্টর শুধু পছন্দ করে দেবেন কিন্তু কিনতে যাবার অত সময়ও তাঁর নেই। এইভাবেই আমাদের তখনকার দিনের কাজগুলো হোত।'[১৫]

'নটী বিনোদিনী' নাটকে নির্দেশনা সহকারী হিসেবে কাজ করেন কেয়া চক্রবর্তী ও পরিমল মুখোপাধ্যায়। এ নাটকে বিনোদিনীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন মঞ্জু ভট্টাচার্য— ৫০তম অভিনয়েও বিজ্ঞাপনে তাঁর নামই পাওয়া যায়। কেয়া চক্রবর্তী কোনও ভূমিকায় অভিনয় করতেন না। কিন্তু মঞ্জু ভট্টাচার্যকে সাজসজ্জার ব্যাপারে সাহায্য করতেন তিনি। অথচ এ নাটকের তিনি Assistant

Director. 'কোনো কাজকেই ছোটো ভাবতেন না কেয়াদি। নান্দীকার-এর *নটী বিনোদিনী* নাটকের নাম ভূমিকায় তখন অভিনয় করেন মঞ্জু ভট্টাচার্য। মেকআপ রুমে মঞ্জুদিকে সাহায্য করেছেন কেয়াদি। কখনও চুল বেঁধে দিয়েছেন। কখনও মেকআপের সরঞ্জাম এগিয়ে দিয়েছেন। পরে মঞ্জুদি যখন নান্দীকার ছেড়ে চলে গেলেন, কেয়াদিকে বিনোদিনী করতে হল। ... আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্তি মিশিয়ে চরিত্রটি নতুন ভাবে তুলে ধরলেন।'[১৬] তিনি অনায়াসে একেবারেই সাধারণ কাজগুলি করেন— সহমর্মী হয়ে, প্রয়োজনে অনেক বড় ঝুঁকি নিতে পারেন, এমনকী মূল চরিত্রে অভিনয়ের ক্ষমতাও দেখাতে পারেন। 'নটী-বিনোদিনী'র সমালোচনা প্রসঙ্গেও সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না— কেয়া চক্রবর্তী ও পরিমল মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব। 'The joint conduction of Keya Chakraborty and Parimal Mukherjee bore the mark of their seriousness to the subject.'[১৭]

'নটী বিনোদিনী'র সহকারী পরিচালকদ্বয় তাঁদের কাজ যথাযথভাবে করেছিলেন, এ কথা সমালোচক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন কিন্তু কী কাজ তাঁরা করেছিলেন এই নাটকে? অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনাজনিত কৌশল বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়— পরিচালকের এই উদ্ভাবনী শক্তির পশ্চাতে এবং দু'জন সহকারীর কি কোনও অবদান নেই!'

'শাহী সংবাদ' নাটকটি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত। এই নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ১৯৭৪-এর ২ ফেব্রুয়ারি। কেয়া চক্রবর্তী তখন পূর্ণোদ্যমে 'নান্দীকার' গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। 'এরিক টুয়েলভ'-এর দ্বারা প্রাণিত হয়ে এই নাটকটি রচনা করেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়- রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত-কেয়া চক্রবর্তী তিনজনে মিলে। রঙ্গনায় এ নাটকের নিয়মিত অভিনয় হতে থাকে। 'নান্দীকার' গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় 'শাহী সংবাদ'-এর, সেখানে নাটক ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলি সংগ্রাহক হিসেবে ওই তিনজনের নামই ছাপা হয়। এ নাটকের মঞ্চ নির্মাণ করেন রাধারমণ তপাদার। শব্দ নিয়ন্ত্রণে হিমাংশু পাল, সাজসজ্জায় ভূপেন ঘোষ, রূপসজ্জায় শক্তি সেন, সুর রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং নৃত্য পরিকল্পনা শম্ভু ভট্টাচার্য। আলোয় ছিলেন তাপস সেন। অভিনয়ে 'নান্দীকার'-এর নিয়মিত শিল্পীরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন— অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারমণ তপাদার, পরিমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। অভিনেত্রীরা ছিলেন সীমা ঘোষ ও লীলা মিত্র। কেয়া চক্রবর্তী এ নাটকে প্রথমে অভিনয় না করলেও প্রযোজনার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পৃক্তি লক্ষণীয়। তবে ১৯৭৪-এ অগাস্ট মাসে 'কালান্তর' পত্রিকায় এই নাটকের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেখানে মূল চরিত্রের পাশাপাশি অন্যান্য যাঁরা ভাল অভিনয় করতেন, তাঁদের মধ্যে কেয়া চক্রবর্তীর নামও উল্লিখিত হয় অর্থাৎ প্রথম

থেকে এ নাটকে তিনি অভিনয় করেননি। দেবেশ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কেয়া' গ্রন্থের জীবনপঞ্জিতে লেখা হয়েছে 'শাহী সংবাদ' নাটকে গোড়ার দিকে অভিনয় করেননি, পরে করেছেন। 'শাহী সংবাদ' সমালোচকদের দৃষ্টিতে বিশেষ প্রশংসার নাটক ছিল না— 'নান্দীকারকে শক্তিমান গোষ্ঠী বলছি। এই প্রযোজনার কয়েক জায়গাতেও আছে তাঁদের সেই শক্তির পরিচয়। একাধিক শিল্পীর উৎকৃষ্ট অভিনয়ের কথাও অস্বীকার করবার নয়। কিন্তু সমগ্রভাবে নাটকটি কিছু চমক আর চিৎকৃত বচনের উর্ধ্বে পৌঁছতে পারল কী?'[১৮] আসলে এ নাটকে স্ট্রিন্ডবার্গ-এর রূপান্তরে ত্রয়ী নাট্যকার আওরঙ্গজেবের প্রপৌত্র ফারুক-সিয়ারের (১৭১২-১৯) সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ষড়যন্ত্রের বিষয়গুলির মধ্যে বর্তমান সময়ের একটা ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। ফারুক সিয়ারের বন্ধু মীরজুমলাকে আঁকা হয়েছে গণদেবতা হিসেবে। ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে বাংলার মঞ্চে দেখানো হচ্ছে মীরজুমলার নৈতিক সমর্থনে তরুণেরা আড়তদারের গুদাম লুঠ করে, হাতবোমা ব্যবহার করে ইত্যাদি। মুঘল সাম্রাজ্য ও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গকে স্ট্রিন্ডবার্গ প্রাণিত হয়ে মেলাতে গিয়ে সূত্রধার-ভাষ্যকারের সাহায্য নিলেও নাট্যকার ত্রয়ী ব্যর্থ হচ্ছেন। অভিনয়ের দাপট থাকলেও বিষয়বস্তুর দুর্বলতায় ও নাট্যের গঠন-কৌশলগত ব্যর্থতায় 'শাহী সংবাদ' তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে এই নাটকে কেয়া চক্রবর্তীকে দর্শক পেয়েছেন তিনটি ভিন্নধর্মী চরিত্রে— (১) তথ্য সংগ্রহ ও নাট্যরূপায়ণে (২) নাট্যের সহযোগী নির্দেশক হিসেবে (৩) অভিনেত্রীরূপে। 'শাহী সংবাদ'-এ একটি দৃশ্যে তাঁর অসাধারণ অভিনয়-স্মৃতি ধরা আছে রুশতী সেনের কলমে— '...একজন বাঁদী বাদশাহ ফারুকশিয়ারের নজরে পড়েছিল। বাদশাহ তাকে কামনা করেন। বাদশাহের অন্তঃপুরে অশান্তি বাড়ে। অপমান আর অশান্তি মিলে মেয়েটি বাদশাহের প্রাসাদ ছেড়ে চলে যায়। বাদশাহ তাকে ফিরিয়ে আনেন, প্রশ্ন করেন, সে কোথায় গিয়েছিল। কণ্ঠস্বরের নামমাত্র প্রয়োগ ছাড়া, শুধুমাত্র অধর-ওষ্ঠের সঞ্চালনে মেয়েটির ভূমিকায় কেয়া চক্রবর্তী উত্তর দিতেন 'বান্দীবাজার'। নীরব কথনের সেই অভিনয়ে মেয়েটির ক্লান্তি, গ্লানি এবং বক্তব্য প্রেক্ষাগৃহের শেষ সারির দর্শকের কাছেও অনায়াসে পৌঁছে যেত। ওই মুহূর্তটি স্মৃতি-বিস্মৃতির টানাপোড়েনে আজও পুরো হারিয়ে যায়নি।'[১৯] 'শাহী সংবাদ' নান্দীকারের গৌরব প্রযোজনা না হলেও এই নাটকে কেয়া চক্রবর্তীর ত্রিবিধ গুণপনা প্রমাণ করে এই সময়ে ১৯৭৪-এ তিনি দলের কাছে কতটা অপরিহার্য এবং গ্রহণীয়। 'নটী বিনোদিনী', 'শাহী সংবাদ'-এর পর অনেকগুলো নাটকে যেমন 'ভালোমানুষ', 'আন্তিগোনে', 'আমরা সবাই যাবো কুল পাড়তে', 'চক্র', 'সওদাগরের নৌকা'— তাঁর নাম সহকারী পরিচালক হিসেবে দেখা যায় না। অথচ তিনি তখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ সময়ের থিয়েটার কর্মী। '...মোটামুটি ১৯৭৪ থেকে— তখন থেকে আমি চাকরি ছেড়ে পুরোটাই থিয়েটারে। যেহেতু থিয়েটারে আমরা

টাকা পাই না সেহেতু আমি সপ্তাহে একদিন চার ঘন্টা করে একটা লেখার কাজ করি। এ ছাড়া এবং থিয়েটার ছাড়া আমার অন্য কিছু নেই।'[২০] এই নাটকগুলির মধ্যে দুটি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভালোমানুষ, আমরা সবাই যাবো কুল পাড়তে), দুটি রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (আন্তিগোনে ও চক্র) এবং রাধারমণ তপাদারের (সওদাগরের নৌকা) নির্দেশনায় অভিনীত হয়। রাধারমণ তপাদার ও কেয়া চক্রবর্তী দুজনেই ছিলেন 'নান্দীকার'-এ সমসাময়িক এবং দুজনেই ছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ জন। রাধারমণ তপাদার নিজে স্বীকার করেছেন যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণজনিত শ্রদ্ধা এতটাই ছিল যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য কেয়া চক্রবর্তীকে তিনি ঈর্ষা করতেন। এই কারণেই তিনি যখন 'সওদাগরের নৌকা' পরিচালনা করলেন— বাদ দিয়েছিলেন কেয়া চক্রবর্তীকে। ওই নাটকটিতে তিনি কেয়াকে নেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, কেয়াকে নিলে সে আরও বিখ্যাত হয়ে যাবে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও কাছে চলে যাবে। কিন্তু কেন এই নাটকগুলিতে সহকারী নির্দেশক হিসেবে তাঁর নাম পাওয়া গেল না? সে কি তথ্য যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে, না কি তিনি সহকারী হিসেবে ওই দুই নির্দেশকের পাশে ছিলেন না? তবে এই সময় তিনি অন্যান্য সাংগঠনিক কাজগুলো নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। তা ছাড়া এটাও সত্যি যে 'সওদাগরের নৌকা' ছাড়া অন্যান্য নাটকগুলিতে যেমন 'ভালোমানুষ', 'আন্তিগোনে' বা 'চক্র'-তে তিনি মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'আমরা সবাই যাবো কুল পারতে'— নাটকে তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না। যে নাটকগুলিতে তিনি মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন সেখানে সহকারী নির্দেশক হিসেবে কাজ করাটা ছিল অসুবিধাজনক। রঙ্গনায় 'নান্দীকার' অভিনয় করে ১৯৭০-এর শেষ দিকে। এর কিছু দিন পর থেকেই অভিনয় ছাড়া অন্যান্য কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। 'রঙ্গনা' নেওয়ার পর থেকে নানান মিটিং, প্রেস কনফারেন্স, দৌড়ঝাঁপ চলত। এই সময়কালে পাবলিসিটির বিশেষ দায়দায়িত্ব তাঁরই ওপর। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় এবং পাবলিসিটির দায়দায়িত্ব সামলানো ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁকে সহযোগী নির্দেশক হিসেবে না পাওয়ার কারণও হতে পারে।

আবার তাঁকে সহকারী নির্দেশক হিসেবে পাওয়া গেল 'ফুটবল' (১৯৭৭) নাটকে। এ নাটকে তাঁর ভূমিকা মাসির চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও মূল চরিত্র নয় এবং মঞ্চে তাঁর দীর্ঘ উপস্থিতি ছিল না। পিটার টারসনের 'জিগার জ্যাগার' অবলম্বনে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত রূপান্তরিত ও নির্দেশিত 'ফুটবল' নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৯৭৭-র ১০ মার্চ। নান্দীকার-এ বা বাংলা রঙ্গমঞ্চে এটিই তাঁর শেষ কাজ। লক্ষণীয় বিষয় যে, আগের দুটি নাটকে তিনি ছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী—

আর 'ফুটবল'-এ তিনি সহযোগী হলেন রুদ্রপ্রসাদের। প্রায় ৪০/৫০ জন কুশীলব নিয়ে কাজ। নান্দীকার-এর অফিসের সামনের ফুটপাথে রিহার্সাল হত। প্রায় ছ'মাস ওয়ার্কশপ ভিত্তিক কাজের পর নাটক মঞ্চস্থ হয়। পথচলতি মানুষেরাও দাঁড়িয়ে রিহার্সাল দেখতেন— নানান মন্তব্য করতেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত-কেয়া চক্রবর্তীর কাছে। সেগুলি মনোযোগ সহকারে শুনতেন তাঁরা এবং কাজের শেষে সে-সব মন্তব্যের বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বর্জন করা হত। সাধারণ মানুষ বলে তাঁদের মতামতকে অগ্রাহ্য করতেন না পরিচালকরা। সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করার সময় কি তাঁর ইচ্ছে হয়নি একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের নির্দেশক হতে? সুরজিৎ ঘোষের একটি অভিমত পাই 'কেয়াদি কখনো পরিচালক হতে চেয়েছিলেন কিনা বলতে পারব না তবে নানা কথাবার্তায় মনে হয়েছে, সেরকম কোনো সুযোগ এলে তিনি খুশিই হতেন।[২১]

**পোশাক :** শুধু সহকারী নির্দেশনা নয়— 'ফুটবল' নাটকে ওই বিপুল সংখ্যক অভিনেতা অভিনেত্রীর পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্ব ছিল তাঁর। পোশাকের মেটেরিয়াল কিনে— 'নান্দীকার'-এর নিজস্ব দর্জি মিহিরবাবুকে দিয়ে পোশাক তৈরি করানোর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। এই নাটকের অপর এক সহকারী পরিচালক অচিন্ত্য দত্ত জানাচ্ছেন যে, নাটকের যাবতীয় কাজকর্ম সেরে কেয়া চক্রবর্তীর রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটের বাড়িতে তাঁরা নানান কাজ করতেন। 'আন্তিগোনে'র পোশাকও কেয়া চক্রবর্তীর ডিজাইনে তৈরি। ফিকে সবুজ একটু ভারী কাপড়ের 'আন্তিগোনে'র সেই বিখ্যাত পোশাক— এই পোশাকটি সম্পর্কে কেয়া চক্রবর্তী কবিতা সিংহকে জানিয়েছিলেন— 'কেন পোশাকের ডিজাইন তো আমি করি। আর অভিনয়ের পর এ পোশাক আমি নিজে হাতে কেচে আয়রণ করে তুলে রাখি।'[২২] এই মনোভঙ্গিতে প্রকাশ পায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি তাঁর কতটা যত্ন-সম্ভ্রম। থিয়েটারের জন্যই তিনি বলিপ্রদত্ত, শুধু অভিনয় করেই থিয়েটারের কার্য সম্পাদনের অপক্ষপাতী তিনি। বার বার নিজমুখে এ কথা বলেওছেন ঘনিষ্ঠজনের কাছে। 'থিয়েটারের জন্যে আমি— কী বলব তোমায়— বলিপ্রদত্ত! দ্যাখো, আমি তো শুধু অভিনয়ই করি না। আমার দলের প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখ, টাকা-পয়সা, সেট-সেটিং, পোশাক-আশাক, এমনকী বিজ্ঞাপন, টিকিট ছাপানো— এসব সাংগঠনিক দিকের কথাও আমাকে ভাবতে হয়। আবার কী নাটক হবে, কীভাবে হবে, তার জন্যেও যে আলোচনা, যে তর্কযুদ্ধ, তাতে শামিল হতে হয়।'[২৩]

**বিজ্ঞাপন ও পাবলিসিটি:** কেয়া চক্রবর্তীর সাংগঠনিক কাজের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা। মূলত 'ভালোমানুষ'-এর সময় থেকেই পাবলিসিটি বিভাগের দায়িত্ব পান তিনি। বিজ্ঞাপনগুলির দিকে

নজর করলেই বোঝা যায় কীভাবে ভাবছেন কেয়া চক্রবর্তী। বিখ্যাত কার্টুন আঁকিয়ে চণ্ডী লাহিড়ীর অভিনব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে বিষয়ের যোগ্য সঙ্গতে গড়ে উঠেছিল এই পর্বের বিজ্ঞাপনগুলি। বিজ্ঞাপনের ধরনটা পাল্টাতে শুরু করল 'ভালোমানুষ'-এর সময় থেকে। আর এই নাটক দিয়ে 'রঙ্গনা'তে ঋণগ্রস্ত 'নান্দীকার' আবার মুখ তুলে দাঁড়াল। 'শাহী সংবাদ' নাটকের বিজ্ঞাপনে ছড়া বা সংলাপ ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেখতে পাই। মানুষকে আগ্রহী করে তোলার জন্য আনন্দবাজার, যুগান্তর, কালান্তর ইত্যাদি সেই সময়কার জনপ্রিয় খবরের কাগজ এবং ইংরেজি সংবাদপত্রে নিয়মিত যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে তার ম্যাটার তৈরি করে দিতেন কেয়া চক্রবর্তীই। আমৃত্যু। কারণ তাঁর মৃত্যুর পর সেই বিজ্ঞাপন লেখার ভার যখন পড়ল অন্যদের ওপর, তখন তা বড় বেদনার মতো বেজেছিল তাঁদের মনে। এর আগে তাঁরা কখনও 'নান্দীকার'-এর কোনো বিজ্ঞাপন লেখেননি। সব লিখতেন তাঁদের কেয়াদি। কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর প্রথম তাঁরা নিজ হাতে বিজ্ঞাপন লিখলেন। আসলে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন কী হবে, কী লেখা হবে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাঁরই ওপর। 'কিন্তু পুরোটাই কেউ এককভাবে করতে পারত না। দল থেকে sanction হওয়ার ব্যাপার ছিল। রুদ্রদা, অজিতদা, পরিমলদা— উনি তো প্রায় পারমানেন্ট সেক্রেটারি— তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হত। আবার কোন কিছু সেক্রেটারির মনঃপুত না হলে সেটা রূঢ়ভাবেও বলে দেওয়া হত।' পাবলিসিটির Creative দিকটা তো আছেই, সেই সঙ্গে পাবলিসিটির খুব রেগুলার কাজ হচ্ছে ঠিক সময়ে বিজ্ঞাপনটা পৌঁছে দেওয়া আনন্দবাজারে, যুগান্তরে। সেই সময়ে যাতে, যে যাবে সে যেন টাকাটা পেয়ে যায়। এমনটা না হয় যেন, পশুপতিদা নেই বা কাল রাত্রে চাইতে ভুলে গেছিলাম। 'তখন সুধাংশু বলে ছোট্ট মতো একটা ছেলে ছিল— কেয়াদির অত্যন্ত অনুরক্ত এক ভক্ত, সে ওই বিজ্ঞাপনগুলো সমস্ত কাগজে গিয়ে দিয়ে আসত এবং ওই ভুলটা কখনো হতো না। কেয়াদি ফোন করে বলেছেন সুধাংশু তুই পশুপতিদা মানে ছোড়দা বেরবার আগে টাকাটা নিয়ে নে। বা কোনদিন হয়তো সত্যি টাকা জোগাড় করা গেল না তখন জয়ন্তবাবু এঁরা সব আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপনের দায়িত্বে ছিলেন— তাঁদের ফোন করে কেয়াদি বলেছেন। ওটা আবার সুধাংশু বললে হবে না— কাল আমি টাকাটা দেবই, আমি গ্যারান্টি। মানে creativeটা তো আছে কিন্তু এই Organisational-এর রোজকার হ্যাজার্ডস— আসলে যে কাজটাই করতেন একেবারে নিখুঁত করে করতেন।'[২৪]

বিজ্ঞাপন তৈরির ক্ষেত্রে আমরা দেখি ছড়া দিয়ে বা সংলাপ দিয়ে 'শাহী সংবাদ'-এর বিজ্ঞাপন হচ্ছে। যেমন ১৯৭৪-র ১২ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে 'শাহী সংবাদ'-র বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে— সেখানে 'শাহী সংবাদ' নতুন নাটক বলে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে— 'তিন পয়সার পালা' ও 'নটী বিনোদিনী'র

নাটকের কথা পরে আসছে।

এ ছাড়াও তিনি 'আন্তিগোনে'-র বিজ্ঞাপন তৈরি করেছিলেন— রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত লিখছেন '৭৫-এ কেয়া যখন আন্তিগোনে-তে মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, অজিতেশ করছেন ক্রেয়ন তখন জরুরি অবস্থা চলছিল। চিত্তরঞ্জন ঘোষের রূপান্তর হলেও স্ক্রিপ্টটা সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে মাজাঘষা করে আমরা প্রায় আমাদের মতো করে নিয়েছিলাম। ওই নাটকের বিজ্ঞাপন করত কেয়া নিজের হাতে: 'থেবাই-এর আকাশে শকুন রাজপথে মৃতদেহ'। এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে কলকাতা শহরের সে সময়কার অবস্থার হয়তো কোনও মিল পেয়েছিলেন সরকারি কর্তাব্যক্তিরা; তাই আমাদের আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেওয়া নিষেধ হল।'[২৫] শুধু আন্তিগোনে' নয় রঙ্গনায় 'নান্দীকার'-এর 'ভালোমানুষ' প্রযোজনা যেমন 'নান্দীকার' গোষ্ঠীকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল— টাকাপয়সা ঋণ-ধার শোধ করে মুখ তুলে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর পথ দেখিয়েছিল, তেমনই বিজ্ঞাপনের জগতেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে 'যুগান্তর' পত্রিকায় ২৪-০১-১৯৭৫ সালে প্রায় 15cm X 2 Column বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার জন্য মূল্য ধার্য হচ্ছে প্রায় ১০৫০ টাকার কাছাকাছি। আনন্দবাজার পত্রিকায় ৮৩৫ টাকা। (10cm x 2col)। নিঃসন্দেহে আজ থেকে ৩৫ বছর অগে এই টাকার মূল্য হিসেব করলে বিস্মিত হতে হয়! বিজ্ঞাপনের বয়ানগুলি কেয়া চক্রবর্তী লিখলেও দলের ভারপ্রাপ্ত মানুষজনকে দিয়ে বিষয়টি অনুমোদন করিয়ে নিতে হত। ব্যক্তিগত শত অসুবিধা সত্ত্বেও বিজ্ঞাপন তৈরির কাজে তিনি কোনও সমঝোতা করতেন না। কীভাবে তিনি অভিনয়ের গুরুত্ব এবং বিজ্ঞাপন তৈরির কাজ একইসঙ্গে— সমান গুরুত্বে সম্পন্ন করতেন তারই একটা চিত্র তুলে ধরেছেন প্রকাশ ভট্টাচার্য— 'কেয়াদির মায়ের পেসমেকার বসবে। যেদিন অপারেশন, 'ভালোমানুষ' নাটকের সেদিন দুটো শো। 'ভালোমানুষ'-এ কেয়াদিই তো সব। যদি না আসতে পারেন ঠিক সময়ে? অপারেশনে যদি কোনো বিভ্রাট হয়? পৌনে তিনটে নাগাদ হাঁফাতে হাঁফাতে রঙ্গনায় পৌঁছলেন কেয়াদি। কয়েক মিনিটের মধ্যে মেকআপ নিয়ে শান্তা ও শান্তাপ্রসাদ। দর্শকরা টেরও পেলেন না অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবনের উদ্‌বেগ, দুশ্চিন্তা। দুরন্ত একটি নাটক দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে দর্শকরা বাড়ি ফিরে গেলেন। দুটো শো শেষ করে কাউন্টারের সামনের সিঁড়িতে বসে পরের দিনের বিজ্ঞাপনের ম্যাটার তৈরি করলেন কেয়াদি। দৌড়লেন হাসপাতালে।'[২৬]

পাবলিসিটি বলতে এখানে শুধু খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের কথাই আলোচনা করা হল। কিন্তু শুধু বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে নয়, কেয়া চক্রবর্তীর জনসংযোগ ক্ষমতাও ছিল সাংঘাতিক। নানান জায়গায়

তাঁকে মিটিং করার জন্য যেতে হত।— একই সঙ্গে ওপরতলার ক্ষমতাবান মানুষদের সঙ্গে তাঁর শিক্ষা বুদ্ধি ব্যবহার— এই ত্রিবিধ গুণপনায় সখ্য গড়ে নিতে পারতেন, আবার প্রয়োজনে একে দাদা তাকে বৌদি পাতিয়ে সহজ সরল ভঙ্গিমায় কাজ উদ্ধার করে নিতেও পারতেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের পাশাপাশি তাঁর নামটাও এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হচ্ছিল, সাংগঠনিক নেতৃত্বে এতটাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শেষের দিকে 'নান্দীকার'-এর সাংগঠনিক সমস্ত কাজেই তাঁর ভূমিকা ছিল প্রধান।

**অর্থসংগ্রহ:** সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে ওঠা কেয়া চক্রবর্তীর অর্থসংগ্রহে একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। সুরজিৎ ঘোষের স্মৃতিচারণায় পাই যে একবার তিনি সুরজিৎ ঘোষের বাড়ি এসেছিলেন হাতে শাড়ির বাণ্ডিল— বেনারসী শাড়ি, আঁচলে সোনার কাজ। এই শাড়িটা তিনি বিক্রি করে দলের প্রয়োজনে টাকা জোগাড় করবেন এই মনোভাব। শাড়ির সঙ্গে বিশেষত বেনারসী জাতীয় শাড়ির সঙ্গে মেয়েদের একটা আলাদা সমত্ব জড়িয়ে থাকে। দলের জন্য সেটুকু ত্যাগ করতেও তিনি রাজি। এমনকী রঙ্গনায় 'ভালোমানুষ' মঞ্চায়নের জন্য বিয়ের যাবতীয় গয়না বাঁধা দিয়েছিলেন। যাবতীয় সেন্টিমেন্টকে দাবিয়ে রেখে থিয়েটারের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতায়-ই জয়ী হয়েছিল।

কেয়া চক্রবর্তীর নিজস্ব বয়ানে চণ্ডী লাহিড়ীকে জানিয়েছিলেন শাড়ি গহনা নয়, তাঁর একটাই স্বপ্ন : নিজেদের একটি মঞ্চ মনের মত করে গড়ে তোলা। তার জন্য কোনো ত্যাগই যথেষ্ট নয়। রঙ্গনায় 'ভালোমানুষ' করবার সময় প্রচণ্ড অর্থের টানাটানি। বিয়ের যাবতীয় গয়না বাঁধা দিয়েছিলেন যেমন, তেমনই 'নান্দীকার'কে বাঁচানোর জন্য কত রকমভাবে যে অর্থসংগ্রহ করেছেন তিনি, তার কোনও হিসেব নেই। শুধু নিজের নয় প্রয়োজনে মায়ের গহনাও বন্ধক দিয়েছেন দলের কাজের জন্য। যখন রঙ্গনা নেওয়া হচ্ছে সেই সময় অর্থের চাহিদা প্রবল। কতরকমভাবে কেয়া চক্রবর্তী আর্থিক সুরাহার জন্য 'নান্দীকার'-এর পাশে থেকেছেন সে সব ঘটনা অনেকেই জানেন না, আবার অনেকেরই স্মৃতিতে তা উজ্জ্বল। 'নান্দীকার তখন আজকের মতো এত প্রতিষ্ঠিত নয়। পয়সাকড়ির যথেষ্ট অভাব। এই অবস্থায় ধারদেনা করে আমরা রঙ্গনা নিলাম। নান্দীকারের তখন আমি ট্রেজারার। কেয়া নিজের গয়না বন্ধক রেখে আমার হাতে টাকা তুলে দিয়েছিল।'[২৭] হিসাবরক্ষক অরুণ চট্টোপাধ্যায় এই ত্যাগের কথা ভুলতে পারেননি যেমন, তেমনই রাধারমণ তপাদার— কেয়া চক্রবর্তীর এক প্রতিদ্বন্দ্বী অথচ গুণমুগ্ধ সহকর্মী— তিনিও জানিয়েছেন যে 'নান্দীকার' তখন সরকারি সাহায্য পায় না। আনন্দশংকরের মিউজিক ঠিক হয়ে গেছে অথচ টাকা নেই। এই সময় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কেয়া চক্রবর্তী

তাঁর গয়না এনে ধরে দেন— তখনকার দিনে যার মূল্য ‘৩-৪ হাজার’ টাকা আর আজকের দিনে প্রায় লাখখানেক। অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য নয় বা ধারণার বাইরে এ জাতীয় আত্মত্যাগ, কিন্তু এইটাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক আচরণ। ভেতর থেকে এই তাগিদ তিনি অনুভব করতেন, কোনওরকম লোক দেখানো মনোবৃত্তি তাঁর মধ্যে ছিল না। নিজের শাড়ি গয়না ছাড়াও দলের বিপদে ছুটে গেছেন বন্ধুবান্ধবদের কাছে— হাত পেতে টাকা চেয়েছেন। ধারদেনা করে আনা সেই টাকায় মেটানো হয়েছে ‘রঙ্গনা’র হল ভাড়া। এতটাই দুঃসাহসী বেপরোয়া এবং নিজ লক্ষ্যে স্থির যে শুধু নিজের শাড়ি গয়নার বিনিময়ে টাকা জোগাড় করেছেন তা নয়, বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকেও ধারদেনা করছেন মরিয়া হয়ে। ‘রঙ্গনা’-র হল ভাড়া মেটাচ্ছেন নিজের বন্ধুত্বের খাতিরে টাকা জোগাড় করে। ‘কোনও এক নাট্যকর্মী অসীম চক্রবর্তী সম্পর্কে দু-একটি কথা’ বইতে লেখক অসীম সামন্ত ‘লেনেবালা দেনেবালা’-র বিষয়ে লিখতে গিয়ে জানাচ্ছেন ‘সকলেই জানেন, অসীম প্রচুর ধার করতেন। কিন্তু অসীম যে দু-হাতে টাকা ধার দিতেনও- একথা ক’জন জানেন? ... তবু কিছু কিছু ঘটনার সাক্ষী যেহেতু এখনো বর্তমান তাই সেই সব ঋণগ্রহীতার নাম সামান্য পালটে একটি দুটি উদাহরণ দিতে চাই।

যেমন ধরা যাক খেয়া চক্রবর্তী।

চুয়াত্তরের ২৫শে ডিসেম্বর। প্রতাপ-এ সেদিন অসীমের জন্মদিন পালিত হচ্ছে। হন্তদন্ত হয়ে গ্রিনরুমে এলেন খেয়া। তিনি তখন কাছাকাছি অন্য একটি মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করেন। গ্রুপ থিয়েটারই করেন। কিছু টাকার দরকার এক্ষুনি— হল্-ভাড়া বাকি পড়ে গেছে—না দিতে পারলে, শো বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন অসীম। কাউন্টার সেলের ৭৩০০ টাকার মধ্যে ৩০০ টাকা নিজেদের জন্য রেখে, ২০০০ টাকা পরের দিনের বিজ্ঞাপনের জন্য রেখে বাকি ৫০০০ টাকাই দিয়ে দিলেন খেয়ার হাতে।’[২৮]

এই লেখা থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ওই খেয়া চক্রবর্তী আসলে কেয়া চক্রবর্তী; প্রতাপ মঞ্চের কাছাকাছি রঙ্গনা এবং একটি গ্রুপ থিয়েটার হল ‘নান্দীকার’। ১৯৭৪-র ২৫ ডিসেম্বর সেই সময় রঙ্গনায় ‘শাহী সংবাদ’ বা ‘ভালোমানুষ’ চলছে। আসলে এইভাবে টাকা চাইতে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্যই ছিল কোনও সংকটজনক অবস্থা থেকে দলকে রক্ষা করা। দেখা গেছে যে দলের বিপদে-আপদে এভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কেয়া চক্রবর্তী। আর ১৯৭৪-এর ৫০০০ টাকা আজকের দিনে কত হতে পারে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়!

**রঙ্গনা থেকে বিতাড়ন পর্ব:** যে সময় বাংলা থিয়েটারের সাংগঠনিক রাশটা ছিল পুরুষদের হাতে, সেই সময় কেয়া চক্রবর্তী এই ক্ষেত্রটাকে নিজের মতো ব্যবহার করার শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। শুধু অভিনয় নয়— থিয়েটারের নানান বিভাগে কাজ করার মধ্য দিয়ে থিয়েটারের আত্মাকে ধরতে চাইছিলেন। রঙ্গনার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। একটা নিজস্ব মঞ্চের স্বপ্নে তিনি পাগল ছিলেন। প্রথমদিকে রঙ্গনায় 'নান্দীকার' তেমন ব্যবসা হয়তো করতে পারেনি, কারণ তারা সপ্তাহে পাঁচটি— বৃহস্পতি, শনি (২ টো শো) ও রবি (২ টো শো) ভিন্ন ভিন্ন নাটকের শো করতে থাকে তা একেবারেই পেশাদারি মঞ্চের পক্ষে যায় না। যখন থেকে তারা একই নাটক সপ্তাহে তিন দিন করতে লাগল এবং 'ভালোমানুষ'- আশাতীত সাফল্য দিল তখনই টাকা পয়সার ভার, ঋণের ভার 'নান্দীকার-এর' কাঁধ থেকে নামল। কিন্তু এই সাফল্য বা স্বস্তির ইতিহাস খুবই কম দিনের। 'ভালোমানুষ'-এর পর 'আন্তিগোনে'র রিহার্সালের সময় 'নান্দীকার'কে ঘাড় ধরে রাস্তায় বের করে দেওয়া হল। এরই প্রতিবাদে গর্জে উঠল 'নান্দীকার' এবং থিয়েটারের মানুষ। সেখানে কেয়া চক্রবর্তীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। টাকা পয়সা ধারদেনা করে, নিজের গয়না গাড়ি বিক্রি করে সর্বস্ব দিয়ে যে রঙ্গনা তৈরির সময় তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা— সেই রঙ্গনা থেকে হলের মালিক নান্দীকার-এর জিনিসপত্র সুদ্ধ তাদের হল থেকে বিতাড়িত করল। এরই প্রতিবাদে 'নান্দীকার'-এর শিল্পীরা রঙ্গনার সামনে জড়ো হল। পুলিশের চোখের সামনে রুদ্রপ্রসাদদের গায়ে হাত তুললে কেয়া ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার এক চোখে আগুন, অন্য চোখে জল। ১৯৭০ সালে রঙ্গনা নেওয়া হয়। ক্রমশ সংগ্রাম, প্রাণপণ লড়াইয়ের-এর মধ্য দিয়ে সেই স্বপ্ন যখন পূরণের পথে সেই সময়ই স্বপ্নভঙ্গ হল। হলের মালিক গণেশ মুখোপাধ্যায়রা বিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন। বাধা এসেছিল নানান দিক থেকে আর 'আন্তিগোনে'র রিহার্সালের সময় 'নান্দীকার'কে পথে টেনে নামিয়ে আনা হল। কেয়া চক্রবর্তীরা রঙ্গনার সামনে পিকেটিং শুরু করেন। মেয়েদের মধ্যে তাঁর তৎপরতা ছিল অনেক বেশি। গীতা দে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়দের কাছেও ছুটে গেছেন। অনেক অনুনয় বিনয় করেছেন কিন্তু তাঁদেরও কিছু করার ছিল না— কারণ তাঁরাও সেখানে চাকরি করেন। কিন্তু কেয়া চক্রবর্তীদের কাছে থিয়েটার, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা শিল্পমাধ্যম নয়— আরও অতিরিক্ত কিছু। জীবনধারণের অঙ্গ থিয়েটার। তাই কয়েকবছরের জন্য 'রঙ্গনা'কে ভিত্তি করে 'নান্দীকার'-এর যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, ইচ্ছা তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে। সেদিন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটে গিয়েছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের কাছে। আর উন্মাদের মতো অবস্থা হয়েছিল কেয়া চক্রবর্তীর। প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন সৌমিত্র মিত্র 'কেয়াদি সেদিন যখন রঙ্গনা থেকে বেরিয়ে আসেন, অঝোর ধারায় কাঁদছেন....।' কখন আসে এই কান্না? আসলে তাঁর আকাঙ্ক্ষা

স্বপ্ন, প্রত্যাশা এই সব কিছু জড়িয়ে ছিল রঙ্গনার সঙ্গে। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর যখন তিনি থিয়েটারকে তাঁর সমস্ত কিছু দিয়ে দেওয়ার সঙ্কল্পে স্থির তখনই রঙ্গনার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ বাধল 'নান্দীকার'-এর। ছেড়ে দিতে হল তিল তিল পরিশ্রমে গড়া নিজস্ব মঞ্চের অধিকার। সৌমিত্র মিত্র জানাচ্ছেন— 'রঙ্গনা নিয়ে যখন গণ্ডগোল হল তখন উনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাগলের মতো। নেতা মন্ত্রীদের দোরগোড়ায় ঘুরতেন। একদিন ভোরবেলা চলে এসেছেন আমার বাড়ি। সারারাত ঘুমোতে পারেননি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো অবস্থা। আমি তখন আকাশবাণীতে একটা ক্যাজুয়াল চাকরি করি। ট্রামে দুজনে গেলাম ধর্মতলা। হাঁটতে হাঁটতে আকাশবাণী ভবন অবধি গেলেন। তারপর বলে গেলেন বালিগঞ্জের দিকে যাবেন। আমার তো ভয় হচ্ছে যদি রাস্তায় কিছু হয়! তারপর রুদ্রদার ফোন আকাশবাণীতে। আমি বললাম বলে গেছেন বালিগঞ্জের দিকে যাবেন— মানে হয়তো কোনও মন্ত্রীর বাড়ি যাবেন। আসলে থিয়েটারের প্রতি কমিটমেন্টটা এমনই ছিল। যদি রঙ্গনাটা বাঁচানো যায়।'[২৯]

**ভাঙন রোধ:** একটি সচল দল— বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সমাবেশ সেখানে। নেতৃত্বে আছেন দু'জন প্রবল শক্তিশালী নাট্যব্যক্তিত্ব অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। স্বাভাবিকভাবে বিবিধ কারণে দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্তর্কলহের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে বার বার। ভাঙনের মুখোমুখি হয়েছে দল। আর সেই ভাঙনরোধে বার বার সক্রিয় হয়েছেন কেয়া চক্রবর্তী। দলটাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। দু'হাত দিয়ে আগলে রাখতেন। কেয়া চক্রবর্তীর জীবনের চলার পথের অন্যতম পথ-প্রদর্শক চিত্তরঞ্জন ঘোষ তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন কেয়া চক্রবর্তীকে। অধ্যাপক, বন্ধু, অভিভাবক চিত্তরঞ্জন ঘোষ বারবার ভাঙন লক্ষ করেছেন 'নান্দীকার'-এর। আর লক্ষ করেছেন এই দল ভেঙে যাওয়ার ঘটনার বিপরীত স্রোতে দাঁড়ানো কেয়ার অবস্থান। যতবার দলে ভাঙন দেখা গেছে ততবারই কেয়া চক্রবর্তীর মধ্যস্থতায় সেই ভাঙন জোড়া লেগেছে। প্রধান ঐক্যশক্তি ছিলেন কেয়া। এইটাই ছিল তাঁর স্বভাব। একেবারে গোড়ার দিকে যখন বিভাস চক্রবর্তী অশোক মুখোপাধ্যায়রা ১৯৬৬-তে প্রায় ১৪ জনের মতো 'নান্দীকার' ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন কেয়া চক্রবর্তী দলে নিয়মিত আসতেন না। কিন্তু এর পরই তিনি দলে আসেন এবং নিয়মিত অভিনয় করতে থাকেন ও তৎকালীন সংকটাবস্থা অনেকটাই সামলে দেবার দায়িত্ব বহন করেন। বিভাস চক্রবর্তীদের সঙ্গে মায়া ঘোষ-ও দল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর মায়া ঘোষ অভিনীত বেশ কয়েকটি চরিত্রে কেয়া চক্রবর্তী অভিনয় করতে থাকেন। নতুন নাটকের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো নাটকগুলিতেও অভিনয় করতে থাকেন। যাতে দল ভেঙে না পরে। একবার রঙ্গনার সময়েও

'নান্দীকার'-এ ভাঙন শুরু হয়। ব্যথিত চিন্তিত কেয়া চক্রবর্তী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ছুটে গিয়েছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও সুব্রত পালের সঙ্গে। রাত ৯টা থেকে প্রায় ১২টা পর্যন্ত আলোচনা চলেছিল। সমস্যার সমাধান হয় রাত সাড়ে তিনটেয়। কেয়া চক্রবর্তীর এত আনন্দ হয়েছিল যে সেই রাত্রে বেরিয়ে পড়েছিলেন রাতের কলকাতা দেখতে। আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, কেয়া চক্রবর্তীর এই আনন্দের উৎস দলের মধ্যে সবাইকে একসঙ্গে ধরে রাখতে পারার আনন্দ!

দু'হাত দিয়ে আগলে ধরে ভাঙন-ভূমিকে উর্বরা রাখতে চেয়েছেন সব সময়। কিন্তু শেষরক্ষা করা যায়নি কারণ এক অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত মৃত্যু এসে গ্রাস করেছে কেয়া চক্রবর্তীর জীবন-স্বপ্ন-নাট্যবিকাশকে। থিয়েটারের ভূমিতে সর্বস্ব পণ রাখা কেয়া চক্রবর্তীর জীবনের শেষ মুহূর্তটি উৎসর্গীকৃত হল থিয়েটারের কাছে নয়—অবিবেচক, দায়িত্বজ্ঞানহীন এক সিনেমা কোম্পানির খামখেয়ালিপনার কাছে। দুর্ভাগ্য থিয়েটারের আপামর দর্শকের। ১৯৭৭ সালের ১২ মার্চ সাঁকরাইলের কাছে 'জীবন যে রকম' চলচ্চিত্রের শুটিং-এ তিনি একটি অন্ধ মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। গঙ্গার জলে ঝাঁপ দেওয়ার একটি দৃশ্যে তিনি সাঁতার না জানা সত্ত্বেও ঝাঁপ দেন এবং তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। পরদিন তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় ক্ষতচিহ্ন-সহ অনেক দূরের গঙ্গাবক্ষ থেকে। কী লাভ হল তাঁর একটি পাকা চাকরি ছেড়ে সর্বক্ষণের থিয়েটার কর্মী হয়ে? থিয়েটারের জন্য সর্বস্ব পণ রাখা জীবন নিমেষে তলিয়ে গেল গঙ্গার গভীরে। একদিন পর সেই উদ্ধার হল ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তও মাঝপথে থেমে গেল। মঞ্চ থেকে তাঁর অস্তিত্বকে সরিয়ে দেওয়া গেল না অবশ্য। তিনি সজীব জীবন্ত হয়ে বেঁচে রইলেন নাট্যপ্রেমী মানুষের স্মৃতিতে। যাঁরা তাঁকে দেখেননি, তাঁদের কাছেও তিনি অতীত নন, বর্তমানের তারুণ্যে উজ্জ্বল। আজও থিয়েটারের আলোচনায় তিনি তাঁর অস্তিত্ব জানান দেন। কেয়া চক্রবর্তী সব সময় দাঁড়াতেন ন্যায়ের পক্ষে। 'আন্তিগোনে' তাঁর প্রিয় চরিত্র। 'আন্তিগোনে'র মতোই তিনি প্রতিপক্ষের সামনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঋজু। দৃঢ় তাঁর অবস্থান। মানুষকে তিনি বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাসের আস্থাই ছিল তাঁর বেঁচে থাকার রসদ। সেই বিশ্বাস নিয়েই তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন— বেঁচেও রইলেন তাঁর মৃত্যুর পরেও। অপরাজেয় 'আন্তিগোনে'— অপরাজিতা কেয়া চক্রবর্তী। সেই কবে, নারীবাদের নিশান তখনও বাঙালি মেয়েদের হাতে হাতে উড্ডীন নয়— সেই সময়ে সত্তরের দশকে নিজের পরিচয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। তাই কখনওই ব্যবহার করেননি স্বামীর পদবি, পরেননি শাঁখা সিঁদুর। মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল তাঁর। সিঁদুর আলতা শাঁখা ইত্যাদি বিবাহচিহ্নকে কোনও দিনই আমল দেননি তিনি। কেননা

ভালবাসার মূল্য তাঁর কাছে অনেক বেশি বাইরের এই প্রচলিত চিহ্নধারার চেয়ে। তাই তাঁর মৃত্যুর পর যাঁরা তাঁকে সিঁদুর আলতায় সাজিয়ে তুলেছিলেন তা ছিল বড় বেমানান— ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কেয়া চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠজনেরা। তাঁর নিজের রচনাতেও ওই একই কথার প্রতিধ্বনি— তাঁর বিশ্বাসের যে কথাগুলো গল্পের আড়ালে বলে যেতে চেয়েছেন— 'আমার বাপের বাড়ি— যে বাড়িতে আমি ২৩ বছর ধরে মানুষ— না—'মেয়েমানুষ' হয়েছি; সে বাড়ির পদবিটা মুছে গেল। আমার নিজস্ব কোন পদবি নেই, নাম নেই। আমি অমুক বাবুর স্ত্রী শুধু। সিঁদুর পরি। কেন? কীসের চিহ্ন? ভালোবাসা, সতীত্ব, পাতিব্রত্য? ছেলেদের কিছু পরতে হয় না কেন।'[৩০] জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটাই ছিল আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা। সময়ের চেয়ে তিনি অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন তাঁর ভাবনা-চিন্তার স্তরে। তিনি তাঁর কাজ, কল্পনা-সঙ্কল্প-দৃঢ়তায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'নান্দীকার'-কে জড়িয়ে ধরে থিয়েটারকে নির্ভর করে বাঁচতে চাইছিলেন, কেয়া চক্রবর্তী ও 'নান্দীকার' যেভাবে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল, তা এক বিরল দৃষ্টান্ত। 'নান্দীকার'-এর গঠনপর্বে তাই কেয়া চক্রবর্তী শুধুমাত্র এক প্রতিভাধর অভিনেত্রী নন— প্রাণদায়িনী শক্তি, নির্মাণের অধিষ্ঠাত্রী। তাঁকে বাদ দিয়ে তাই 'নান্দীকার'-এর ইতিহাস, গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাস, থিয়েটারের ইতিহাস অসম্পূর্ণ— খণ্ডিত।

## স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত (১৯৫০)

'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীতে দুই পর্বের দুই অভিনেত্রীর সহযোগ ও দায়িত্ব গ্রহণ সমগ্র থিয়েটার জগতের কাছেই এক প্রাপ্তি। প্রথম পর্বে কেয়া চক্রবর্তী এবং দ্বিতীয় পর্বের দীর্ঘসময় জুড়ে স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত নাট্যসংহতির কাজ করে চলেছেন। বাংলা নাট্যে, নির্দেশক হিসেবে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর আবির্ভাব তাঁর অভিনেত্রী জীবন শুরু হওয়ার প্রায় দু'দশক পরে। প্রথম জীবনে বাংলার বাইরে— তার পর মফঃস্বল এবং কলকাতার থিয়েটারে কাজ করার পর স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীতে যোগ দেন। যে সময়ে তিনি 'নান্দীকার'-এ সেই সময়টা 'নান্দীকার'-এর সংকটকাল। উল্লেখ্য যে কেয়া চক্রবর্তীও যে সময়ে নিয়মিতভাবে 'নান্দীকার'-এ যোগ দেন, সে সময়টাও এক সংকটের কাল। সেই সংকটজনক অবস্থা থেকে তিনি যেমন দলকে সুস্থিত করতে সহযোগী হয়েছিলেন, স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের সহযোগিতাও ছিল একইরকম। সেই সমস্যা সঙ্কুল সময়ে নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দিনের পর দিন অভিনয় ছাড়াও সংগঠনের নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে পরিশ্রম ও দায়িত্বশীলতার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন এবং আজও প্রমাণ করে চলেছেন 'নান্দীকার'-এর প্রতি, থিয়েটারের প্রতি

তাঁর সচেতনতা। নাট্যনির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ সংযুক্তি থাকলেও নাট্যনির্দেশনায় তাঁকে প্রথম আহ্বান জানায় 'রঙরূপ' গোষ্ঠী। তাঁর প্রথম নির্দেশিত নাটক 'রঙরূপ' গোষ্ঠীর 'খুঁজে নাও'— অবশ্য পরবর্তী সময়ে 'নান্দীকার'-এর বিভিন্ন প্রযোজনায় তিনি নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন এবং নিজেকে প্রমাণ করেছেন। 'নান্দীকার'-এ তাঁর প্রথম নির্দেশিত নাটক 'মাধবী' (২০১০)। তবে নির্দেশক হিসেবে আত্মপ্রকাশের বহু আগে থেকেই তিনি নাট্যদলের একজন সক্রিয় নাট্যকর্মী। পোশাক, সঙ্গীত পরিচালনা, নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর, সাংগঠনিক নানান কাজকর্মের মধ্য দিয়ে নাট্যনির্মাণের বিশিষ্ট সহায়ক হয়ে উঠেছেন, নাট্যদলের সংহতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর নাট্যনির্মাণ ও নির্দেশনা সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশের আগে তাঁর 'নান্দীকার'-পূর্ব জীবনকথার আলোচনাও এ ক্ষেত্রে জরুরি। কেননা 'নান্দীকার' পর্বে নাট্য ও সংঘাতের ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান, বাল্যকৈশোরেই শুরু হয়েছিল তার চর্চা এবং সেই চর্চার পরিসর ছিল অনুকূল। স্বাতীলেখার পিতা রামদাস হালদার, মা রমা হালদার। মা ছিলেন এলাহাবাদের একজন নাট্যসম্পর্কে উৎসাহী ও আগ্রহী মহিলা এবং মাসি মীরা মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত ভাস্কর শিল্পী হিসেবে পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর গড়ে ওঠার ভিত্তিভূমিটি তৈরি করে দিয়েছিলেন তাঁর মা। 'My mother was very liberal and made me participate in Bengali, English and Hindi plays. She encouraged me to take up music and dance.'[৩১] ছোটবেলা থেকে মায়ের অনুপ্রেরণায় নাচ-গানের চর্চা চলতে থাকে এবং মাত্র সাত বছর বয়সে প্রথম অভিনয় করেন মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকে, কীর্তিমান চরিত্রে। সাত বছর থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত এলাহাবাদে হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে করতে নাটক সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়। পাশাপাশি চলতে থাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মার্গসংগীতের চর্চা। একই সঙ্গে পিয়ানো ও বেহালা বাদনে পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি। সাত বছর বয়স থেকে বেহালা বাজানো শিখতে থাকেন— তাঁর শিক্ষক হিডেন জার্মান বলে পরিচিত— যিনি নানান ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। স্বাতীলেখা ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রী। এই সংগীতচর্চার বিশেষ এক ভূমিকা ছিল স্বাতীলেখার পরবর্তী নাট্যজীবনে— যা তাঁকে আরও অনেক অভিনেত্রীর মধ্যে আলাদা মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছিল।

একজন শিল্পীর বাল্যকৈশোর গড়ে ওঠা ও তার পারিপার্শ্বিক, পরবর্তী জীবনকে অনেকটাই প্রভাবিত করতে পারে। স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে এলাহাবাদের এক নিরুপদ্রব স্বাধীন স্বচ্ছন্দ পরিবেশে। তাঁর নিজের কথায়— 'আমার ছোটবেলা খুব ভালবাসার মধ্যে,

খুব স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে কেটেছে। এবং স্বাধীনতা বলতে, মা বা আমার পরিবার আমার কথা ভীষণভাবে গ্রহণ করত। আমার ইচ্ছাগুলোকে তাঁরা পূর্ণ করার সুযোগ দিত।'[৩২] বাড়ির শিক্ষাও তাঁকে বিশেষভাবে প্রাণিত করেছিল— "...আমি Just যে শিক্ষাটা আমার বাড়িতে পেয়েছি সেটাই বোধহয় আমাকে মুক্তি দিয়েছে। যার ফলে আমি যে কাজটাই করেছি, থিয়েটার বল কি অন্য কিছু সেটাই কিন্তু আমি প্রাণ মন ঢেলে করেছি। তার মধ্যে আমি কোনও খামতি রাখিনি। আর জানো, ছোটবেলায় আমাকে বাড়িতে বলা হত যে তুমি যদি বাড়িতে নিজের সৌন্দর্য দেখতে না পাও তাহলে তুমি বাইরেও দেখতে পাবে না। এটা কিন্তু ভীষণ সত্যি কথা। You must know how to love your home. তোমার নিজের বাড়িতে beauty দেখতে পারা উচিত, তাহলেই 'you can see beauty outside!'[৩৩] ছোটবেলা থেকেই একটা জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল এবং এই ইতিবাচক জীবনভঙ্গিমা তাঁর পরবর্তী জীবনের জটিলতা ও ভাঙা-গড়ার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

এলাহাবাদে থাকতে থাকতেই তাঁর অভিনয় জীবনের সূচনা। এলাহাবাদ পর্বে স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত অভিনীত নাটকগুলি ছিল— কারাগার (কীর্তিমান, ১৯৫৭), কারাগার (কংসরক্ষিতা, ১৯৬০), নূরজাহান (লায়লা, ১৯৬০), মিলিওনেয়ারস (মুখ্য ভূমিকা ১৯৬০), মিড সামার নাইটস্ ড্রিম (পার্ক, ১৯৬০), ওথেলো (ডেসডিমোনা, ১৯৬১), বিজিবডি (বিজিবডি ১৯৬১), কারাগার (হিন্দি, চন্দনা, ১৯৬২), টি হাউস অব দি অগাস্টজুন (বিশেষ চরিত্র, ১৯৬৬), অ্যাজ ইউ লাইক ইট (অরল্যান্ডো, ১৯৬৬), চিরকুমার সভা (বিশিষ্ট চরিত্র, ১৯৬৬), মার্চেন্ট অব ভেনিস (পোর্শিয়া ১৯৬৭), ডেথ টেকস এ হলিডে (দি ইংগার গার্ল ১৯৬৯), দ্য ব্যারেটস অব ইউম্‌পোল ট্রিট (হেনরিয়েটো, ১৯৭০), নেফা কি এক সাম (সগাই, ১৯৭১), কাঞ্চনরঙ্গ (সীমা, ১৯৭১), দ্বিবাহু (হিন্দি মুখ্য চরিত্র, ১৯৭১), খনা (খনা, ১৯৭১)। এলাহাবাদ পর্বে তাঁর নাট্যপরিচালক ছিলেন অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এতগুলো নাটকে বিশেষ চরিত্রে অভিনয় তাঁর নাট্য অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে যেমন, তেমনই নাটকের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। তাই বিবাহ-পরবর্তী জীবনে কলকাতায় এসেও নাট্য অভিনয়ে তার আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে ওঠে।

বিবাহসূত্রে তিনি কলকাতায় আসেন ১৯৭২-এ। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ এই পাঁচ বছরে তাঁর নাট্যাভিনয়ে ছেদ পড়েনি। সুহৃদ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় কলকাতা-পর্বে তাঁর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে ছিল 'কলকাতার ইলেক্ট্রা' ও 'নটী বিনোদিনী'। দিদি ও জামাইবাবুর উদ্যোগে 'কলকাতার ইলেক্ট্রা' নাটকে একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় তাঁর অভিনেত্রী জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। ওই বছরেই কেয়া

চক্রবর্তী মারা যান। 'নান্দীকার'-এ এক সংকটজনক অবস্থা। এই সময়ে বুদ্ধদেব বসু রচিত 'কলকাতার ইলেক্ট্রা' নাটকে স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত-র অভিনয়খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 'নান্দীকার'-এ আসার প্রস্তাব দেন। শুরু হয় 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীতে তাঁর অভিনয়-পর্ব। ১৯৭৮-এ 'নান্দীকার' যোগদান এবং ২০১৬ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এই নাট্যদলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে পথচলার এক তন্নিষ্ঠ কর্মী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত প্রমাণ করেছেন বছরের পর বছর ধরে এই রকম একজন সদস্যের মূল্য কতখানি একটি নাট্যদলের কাছে! আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় এবং তারও দীর্ঘদিন পর অত্যন্ত জনপ্রিয় চলচ্চিত্র 'বেলাশেষে'-এ (দুটি ছবিতেই স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর বিপরীতে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতা) প্রধান চরিত্রে অভিনয় করলেও, প্রভূত সুনাম ও পরিচিতি লাভ করলেও, স্বাতীলেখা কিন্তু মনে করেন— চলচ্চিত্র নয়, তাঁর অভিনয়ের মূল ভূমি হল নাটক। এই নাটককে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে তার সুখ-দুঃখ, ভালবাসা-বেদনা, প্রাপ্তি-নৈরাশ্য, আবার নাটকের ভূমিতে দাঁড়িয়েই নির্মিত হয়েছে তাঁর স্বপ্নসৌধ।

মূলত 'খড়ির গণ্ডি' নাটকের জন্যই তিনি 'নান্দীকার'-এ আসেন এবং এ নাটকের মুখ্য ভূমিকায় তিনিই অভিনয় করেছিলেন। আবার 'ফুটবল' নাটকে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতেন। অর্থাৎ ছোট বা বড়ো চরিত্র নিয়ে কোনও রকম ছুঁৎমার্গ ছিল না স্বাতীলেখার। এই মনোভাব যে কোনও নাট্যগোষ্ঠীর সদস্যদের অত্যন্ত গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয়। পরবর্তী সময়ে আবার তিনিই 'ফুটবল' নাটকে মাসির চরিত্রে অভিনয় করেন। কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর তাঁর এই চরিত্রে অভিনয় করতে এসেছিলেন কাজল চৌধুরী—কেয়া চক্রবর্তীরই বন্ধু। কিন্তু কাজল চৌধুরী ও স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর মধ্যে কোথাও যেন একটা বিভাজন রেখা তৈরি হয় যখন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত লেখেন যে— 'স্বাতীর লয়ালটি গোটা দলের প্রতি। কাজল শুধু পার্টটা করতে আসত।'[৩৪] এই কথাগুলো প্রমাণ করে যে একজন অভিনেত্রী হিসেবেই স্বাতীলেখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখেননি, নিজেকে সমগ্র দলের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। 'নান্দীকার'-এর নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রে স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত অপরিহার্য হয়ে উঠলেন ক্রমশ তাঁর ব্যক্তিত্বের জোরে ও নানাবিধ গুণপনায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল—

- তিনি দিনরাত কাজ করতে পারেন।
- 'নান্দীকার'-এ আসার পর তিনি একটা বড় খুঁটি হলেন। প্রথমে 'খড়ির গণ্ডি' নির্মিত হয়, এরপর 'ফুটবল' চলতে থাকল, আবার শুরু হল 'আন্তিগোনে'।

- শুধু অভিনয় সংক্রান্ত কাজ নয়। পোশাক, সঙ্গীত, নিয়ে নানান ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটতে লাগল তাঁর মধ্যে দিয়ে।
- ওয়ার্কশপ বা নাট্যশালা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে কোশ্চেনেয়ার তৈরি করার দায়িত্ব ছিল তাঁরই ওপর।
- নাট্যশালা পরিচালনায় নানান 'ইনটেলেকচুয়াল ইনপুট' দিতে লাগলেন।

১৯৭৮-এর পর স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত ও 'নান্দীকার'-এর জীবনে একটা পরিবর্তনের দিক সূচিত হল। স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর নাট্যভাবনাও 'নান্দীকার' গ্রহণ করল। 'নান্দীকার'-এর কর্মপ্রবাহে তিনি সংযুক্ত করলেন তাঁর গুণাবলি।

১) তিনি ভাল পিয়ানো ও ভায়োলিন বাজাতে পারেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীত-ভাবনা নিয়ে তাঁর শিক্ষা ও চর্চা নিরন্তর প্রভাব রেখেছে 'নান্দীকার'-এর প্রযোজনায়।
২) ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে।
৩) দিনরাত কাজ করার ক্ষমতা রাখেন।
৪) ইনলেটেকচুয়াল ইনপুট দিতে সক্ষম।
৫) মানুষ হিসেবে সদর্থক ভাবনার অধিকারী।
৬) নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সখ্য তৈরির ক্ষমতা।

'নান্দীকার'-এর সংকটকালে দলে অতগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসার ফলে তিনি যেমন দলের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছিলেন, দলও তাঁকে গ্রহণ করেছিল পূর্ণ সমাদর দিয়ে। দুই পর্বে দুই অভিনেত্রীই এসেছিলেন ভাঙনের কালে, ফলত নানারকম সমস্যার মুখোমুখি তাঁদের হতে হয়েছিল। দুজনেই তাঁদের আবেগ- প্রতিভা-উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন— যা 'নান্দীকার'-এরও প্রাপ্তি। আর ১৯৮০ সালে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর সঙ্গে বিবাহ হয় রুদ্রপ্রসাদের। ব্যক্তিজীবন ও নাট্যজীবনের মধ্যে নাটক-ই হয়ে উঠেছিল তাঁদের সেতুবন্ধন— যা দীর্ঘ আটত্রিশ বছর ধরে অটুট।

স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত 'খড়ির গণ্ডি' নাটকে মূল চরিত্রে অভিনয় করলেন যখন, তখন এই নাট্যগোষ্ঠী সম্পর্কে এমন ধারণা মানুষের মধ্যে চারিয়ে গিয়েছিল যে, যেহেতু কেয়া চক্রবর্তী বা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নেই তাই এঁদের প্রযোজনার মান সেই উচ্চতায় পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু 'খড়ির গণ্ডি' দেখার পর এই ধারণা বদলাতে থাকল এবং দর্শকসমাজ সদ্য আগত স্বাতীলেখাকে গ্রহণ করলেন। 'A dream debut as Grusha in Khorir Gandi was followed up by equally compelling

performances. More than anything, Calcuttans were attracted by her remarkable versatility.'[৩৫]
স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় (বিবাহ পরবর্তী জীবনে সেনগুপ্ত) শুধু অভিনয় নয়, তাঁর বিচিত্রমুখী অধীত শিক্ষাকে নানাক্ষেত্রে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীতে তাঁর বিবিধ কাজকর্মকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল— সঙ্গীতভাবনা ও প্রয়োগ (প্রয়োগ অর্থে যেখানে তিনি নিজে মঞ্চে বা নেপথ্যে যন্ত্রানুষঙ্গে অংশ নিয়েছেন), পোশাক পরিকল্পনা, নাটক নির্বাচন, রূপান্তর, অনুবাদ— এই বিষয়গুলি হল প্রযোজনাগত দিক। আর সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কিত আলোচনা আরও কয়েকটি অনুপর্বে ভাগ করা হয়েছে। তাঁর কার্যাবলির বিভাজন এইভাবে দেওয়া যেতে পারে—

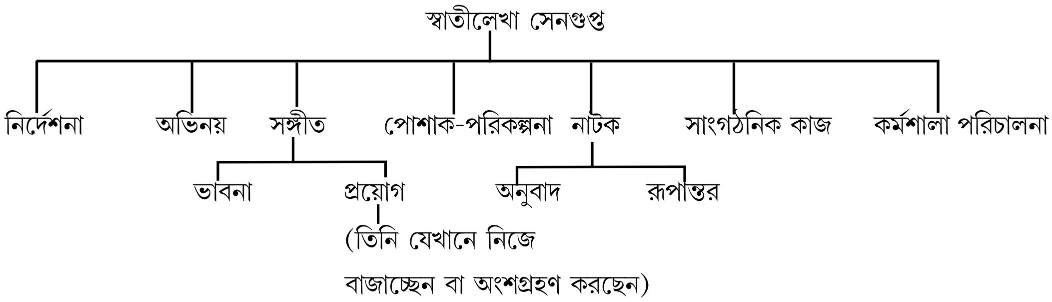


গবেষণাপত্রের সময়কালের একেবারে শেষ প্রান্তে অর্থাৎ ২০০৩ সালে স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত নাটক-নির্দেশনার কাজটি করেন এবং সেই কাজটি তিনি করেছিলেন 'নান্দীকার' গোষ্ঠীতে নয়— 'রঙরূপ' নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায়। তাই এই নাটকটির নির্দেশনা প্রসঙ্গের আলোচনা একেবারে শেষে রাখা হল। এ ছাড়া নির্মাণকর্মে তাঁর কাজের নির্ধারিত ক্ষেত্রটি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকেনি— এ কারণেই কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে সে-বিষয়ে আলোচনা করা হল।

'খড়ির গণ্ডি' নাটকেই 'নান্দীকার'-পর্বে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর কোনও original cast হিসেবে মুখ্য ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ। কেন এই নাটকটি নির্বাচন করেছিলেন পরিচালক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত? তাঁর উত্তর 'অজিতেশ সদ্য 'নান্দীকার' ছেড়ে গেছে। এমতাবস্থায় দলে বয়োজ্যেষ্ঠরা চাইছিলেন, একটা বড়ো কিছু হোক, যাতে বোঝা যায় আমরা রুগ্‌ণ হয়ে পড়িনি। তাছাড়া, কিছু দিন আগেই 'ফুটবল' হয়েছে! বিরাট এক তরুণবাহিনী কাজের জন্য উন্মুখ। এই দুই চাপে 'ককেশিয়ান চক সার্কল' রূপান্তরের কাজে হাত লাগাই।'[৩৬] এই 'বড়' নাটকের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ক্ষেত্রে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত-র সহায়ক হয়েছিলেন স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায়। প্রথম এত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করলেও দর্শক-সমালোচকদের প্রশংসা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি। টগর ও লুৎফার ভূমিকায় অভিনয় স্বাতীলেখার কাছেও ছিল প্রথম আবিষ্কারের রোমাঞ্চে পূর্ণ। তিনি পাশে পেয়েছিলেন রুদ্রপ্রসাদ

সেনগুপ্তর মতো নির্দেশক এবং সহমর্মী সহকর্মীদের। এলাহাবাদের জন্ম ও বড় হওয়ার কারণে তাঁর বাঙলা উচ্চারণে অবাঙালিসুলভ টান ছিল। তাই তাঁকে নিয়ে আলাদা করে রিহার্সাল করানো হত। প্রায় ন'মাস ধরে প্রযোজনাটি প্রস্তুত হয় শুধু তাঁর জন্য নয়, সামগ্রিকভাবে প্রযোজনাটির মান উন্নয়নের জন্যও। বাঙলা ভাষা যতই কাঁচা থাক বা ব্রেখট সম্পর্কে তাঁর ততোধিক জ্ঞান না থাকলেও অচিন্ত্য দত্ত প্রমুখের মতো সহকর্মী সদস্যদের অকৃত্রিম সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর প্রভূত পরিশ্রম। তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে পত্রপত্রিকাগুলি। '...লুৎফার দুরূহ রূপায়ণ স্বাতীলেখার, নতুন এই মুখটিতে আর এক অকালপ্রয়াত প্রতিভার আদল দেখা গেলেও, পরবর্তীকালে চমক লাগানোর ক্ষমতা এর আছে।'[৩৭] তবে বিরূপ আলোচনাও যে হয়নি তা নয়। 'দেশ' পত্রিকায় দেবাশিস দাশগুপ্ত লেখেন যে, 'লুৎফার ভূমিকায় স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে একালের মঞ্চে একটি নতুন আবিষ্কার। কিন্তু তাঁর আবেগ যখন তীব্র হয় তখন তিনি প্রথাচিহ্নিত গণ্ডীর বাইরে নন। বুদ্ধির কাছে আবেদন রাখতে পারেন না।'[৩৮] 'খড়ির গণ্ডি' স্বাতীলেখার আত্মপ্রকাশের প্রথম ধাপ। এ নাটকে অভিনয় ছাড়া অন্যান্য বিভাগে তখনও তিনি সংযুক্ত হতে পারেননি। যাঁরা দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা সকলেই প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব যেমন এ নাটকের মঞ্চ ভাবনা ছিল কুমার রায় ও অতি দাস, পোশাক রঘুনাথ গোস্বামী, আলো কণিষ্ক সেন, রূপসজ্জা শক্তি সেন ও সুভাষ সেন। তবে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর কৃতিত্ব এখানেই যে, প্রথম মঞ্চাবতরণের মধ্য দিয়ে তিনি 'নান্দীকার' গোষ্ঠীর একটা সংকটজনক শূন্যস্থান সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটাই পূর্ণ করার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'নান্দীকার'-এর অপর দুটি প্রযোজনা 'ফুটবল'-এ মাসি ও 'আন্তিগোনে'-তে আন্তিগোনের ভূমিকায় কেয়া চক্রবর্তীর পরিবর্তে অভিনয় করে তিনি প্রযোজনাটি সচল রাখতে সাহায্য করেছিলেন। Calcutta Notebook-এ লেখা হয়— '...It also deserves to be noted that Nandikar's new leading lady, Swatilekha Chatterjee bears a Striking resemblance to the unforgetable Keya Chakraborty whose cruel death last year left a void in the Bengali Theatre, that can not really be filled."[৩৯] কেয়া চক্রবর্তীর অবর্তমানে যে অপূরণীয় শূন্যতার আশঙ্কা করেছিলেন দর্শক সমালোচক সমাজ, ক্রমশ সেই জায়গাটা স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত তাঁর মতো করেই পূর্ণ করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন বা যাচ্ছেন দীর্ঘ আটত্রিশ বছর ধরে। নাট্যনির্মাণের বহুধাবিভক্ত স্তরে তাঁর কার্যাবলি বিস্তৃত হয়েছে এবং চলচ্চিত্রের আকর্ষণেও এই থিয়েটারের ক্ষেত্র ছেড়ে পা বাড়াননি অন্যত্র। তাঁর জীবনদর্শনে থিয়েটারের স্থান সর্বোচ্চে Group theatre remains my first love. I still don't know too much about films and it's doubtful whether I'will act in other films after Gharey Bairey. I may, but at present I'am not too sure."[৪০]

থিয়েটারকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই অভিনয় ছাড়াও থিয়েটারের অন্যান্য বিভাগের কাজে মনোনিবেশ করেছেন আনন্দের সঙ্গে। সেখানে তাঁর কাজ— সৃজনের আনন্দেরই প্রকাশ।

বাল্যকাল থেকেই স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজানোর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এলাহাবাদে থাকাকালীনই তাঁর এই প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। কলকাতায় আসার পর, 'নান্দীকার'-এ যুক্ত হওয়ার পূর্বে তিনি যে যে নাটকে অভিনয় করেছিলেন সেখানে তাঁর অভিনয় বিশেষ প্রশংসিত হলেও— সঙ্গীতকার স্বাতীলেখার ভূমিকা ততোধিক পরিচিতি পায়নি— যার সর্বৈব প্রকাশ ঘটল 'নান্দীকার'-এর প্রযোজনাগুলিতে। দু'ভাবে তার বিকাশ ঘটেছে— (১) প্রযোজনাগুলির সঙ্গীত ভাবনায় তাঁর ভূমিকা (২) তিনি নিজে মঞ্চে বা নেপথ্যে যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ নিয়েছেন। সংগীত পরিচালনা বা যন্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার অনেক আগে থেকেই অভিনেত্রী হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। 'খড়ির গণ্ডি'র সমকালে বা পরবর্তী সময়ে তিনি 'ফুটবল', 'আন্তিগোনে', 'মুদ্রারাক্ষস'-এর মতো প্রযোজনায় এবং 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' প্রযোজিত 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' (বিভাস চক্রবর্তী পরিচালিত) ইত্যাদি নাটকে কোনও পরিবর্ত চরিত্রে এ অথবা কখনও original cast তাঁর অভিনয় সাড়া ফেলেছে নাট্যমহলে। ক্রমশ 'নান্দীকার'-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে। তাঁকে প্রথম দেখা গেল 'ব্যতিক্রম' (প্রথম অভিনয় ১৩.০৩.১৯৮১)-এ সঙ্গীত প্রয়োগ ভাবনায়। ব্রের্টোল্ট ব্রেখ্ট-এর 'এক্সেপশন অ্যান্ড দ্য রুল' অবলম্বনে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ও রূপান্তরে অভিনীত হয় 'ব্যতিক্রম'। 'নান্দীকার'-এর বিশেষ প্রবণতাই ছিল বিদেশি নাটকের রূপান্তরে বা অনুবাদ। এই নাটকের রূপান্তরে একটা নিজস্ব ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন রুদ্রপ্রসাদ। রূপান্তরের ভঙ্গিতে কতকগুলি বৃত্তান্তে ভেঙে ভেঙে নাটক বেঁধেছেন ব্রেখ্‌টকে অনুসরণ করেই। ব্রেখ্ট-এর ভঙ্গিই হল একটানা গল্প বলে যাওয়া নয়— ভেঙে বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন তিনি। এখানেও সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন পরিচালক। নাটকের আরম্ভেই স্বাতীলেখাকে দিয়ে সেই কাজটি করালেন পরিচালক। গানের মধ্য দিয়ে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলেন স্বাতীলেখা তাঁর সুরেলা কণ্ঠের মাধ্যমে। তাঁর এই ভূমিকার প্রশংসা করে যুগান্তর পত্রিকা। সমালোচনার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নাটকের সূচনাংশের গানটি কতটা গুরুত্ব বহনকারী সমগ্র নাটকের প্রেক্ষিতে। সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছেন স্বাতীলেখা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ছোট বা বড় ভূমিকা বা একটিমাত্র সঙ্গীতাংশে অংশগ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না স্বাতীলেখা— যা গ্রুপ থিয়েটারের এক কর্মীর যথোচিত মানসিকতাও। এ নাটকের গীতিকার ছিলেন গৌতম চৌধুরী এবং সুরকার দেবাশিস দাশগুপ্ত। 'ব্যতিক্রম' নাটকের

পরিচালক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং এই দুজন গীতিকার ও সুরকারের ভাবনায় বেহালাবাদনে স্বাতীলেখার ভূমিকাও ছিল অভিনব ভাবনার পরিচায়ক এবং বেহালাবাদক হিসেবে তিনি যে কতটা পারদর্শী তার প্রমাণও এই 'ব্যতিক্রম' নাটক। নির্দেশনার ক্ষেত্রে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত যে ক্রমশই পরিণত হয়ে উঠছিলেন তার পরিচয় 'ব্যতিক্রম' নাটকে পাওয়া যায় শৈল্পিক ভাবনা ও জীবনমনস্কতার মধ্য দিয়ে আবার অভিনয়ের ক্ষেত্রে পাঁচুগোপাল দে (কুলি), সোমনাথ মুখোপাধ্যায় (সওদাগর), নমিতা পাল (মৃত কুলির স্ত্রী)— প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নাটককে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন তেমনই, নাট্যমুহূর্ত তৈরি করতে স্বাতীলেখার বেহালাবাদনও বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। 'এখন যেরকম' বিশেষ পরিচিত পত্রিকা না হলেও এ পত্রিকার সমালোচকের হৃদয়কে যখন স্পর্শ করেছিল সেই দৃশ্য, তা অন্যান্য দর্শকদের অন্তরকেও ছুঁয়ে গিয়েছিল বলেই মনে হয়। পত্রিকাটির সমালোচক সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে— পুরো সংগীতাংশটির ভাবনা অত্যন্ত সুন্দর। একেবারে শেষে মৃত কুলির স্ত্রী তার নাবালক শিশুপুত্রটিকে নিয়ে মূর্চ্ছনায় তৈরি হয় সেন্টার স্টেজে এসে দাঁড়ায়, বেহালার শব্দে, শিশুটির মাথায় হাত বোলায়। হাহাকার...। উল্লেখ্য যে এই অসীম হাহাকার সৃষ্টিতে বেহালাবাদন ভিন্নমাত্রা যোগ করেছিল এবং নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের হাতের জাদুতে সেই মুহূর্তকে ধরা গিয়েছিল বলেই মনে হয় এবং সে ক্ষেত্রে শুধু যন্ত্রী নন সামগ্রিকভাবে নির্দেশকের ভাবনাচিন্তার বিভিন্ন স্তর বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। তবে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে রেহাই দেন না সমালোচকেরা। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যই করা হয়— 'হাতে মাইক নিয়ে বেশ সুরেলা গান গেয়ে তিনি মঞ্চের পেছনে ছুটে গিয়ে যন্ত্রীদের পাশে বসে গেলেন সঙ্গীতে সঙ্গত করার জন্য। তাঁর ওপর পরিচালকের বোধহয় আস্থা কম ছিল, তাই তাঁকে আর সেখান থেকে উঠে আমাদের নাটকের স্থান কাল বার বার বোঝাতে হয়নি।'[৪১] এই ধরনের মন্তব্য থেকে এই ধারণা হয় যে হয়তো অভিনেত্রী হিসেবে তখনও তিনি তৈরি নন। কিন্তু ইতিহাস বলছে এর কিছু দিন আগেই তিনি 'নান্দীকার'-এ যুক্ত হন এবং 'খড়ির গণ্ডি' নাটকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন। হয়তো নির্দেশকের নির্দেশ মতোই তিনি যন্ত্রসংগীতের সঙ্গত করাতে মনোনিবেশ করেছেন— পরিচালক প্রথম দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাননি।

পরবর্তী প্রযোজনা 'হননমেরু' (প্রথম অভিনয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩)-র সংগীতভাবনায় একটা বড় ভূমিকা ছিল স্বাতীলেখার। ইউরিপিদেস-এর 'ইফিগেনাইয়া ইন আউলিস' নাটকটি গৌতম চৌধুরীর রূপান্তর বা অনুবাদে মঞ্চস্থ হয় 'হননমেরু' নামে। ইউরিপিদেস তাঁর নাটকটি অসমাপ্ত রেখেই মারা

যান। তাঁর পুত্র এ নাটক প্রযোজনার সময় নাটকের পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করে নিয়েছিলেন। ১৯৮৩ সালে নান্দীকার এ নাটকটি সময়োপযোগী করে নির্মাণ করে। রাসিন-এর নাটক বা এরফিলের কাহিনির অন্তর্ভুক্তি নাটকটিকে বিশেষ সমৃদ্ধ করতে পারেনি। কিছু কিছু সুন্দর নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হয়ে উঠেছে অবশ্যই। এ নাটকটির ক্ষেত্রে সমালোচকেরা অন্যান্য চরিত্রগুলির বিশেষ প্রশংসা না করলেও তাঁদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। তাঁর ইফিগেনাইয়া স্পর্শ করেছিল দর্শক সমাজকে। এমনকী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর আগামেমনন-কে মনে হয়েছিল আড়ষ্ট, আর্কিলিউস ও ক্লিতেম স্নেত্রাকে অতিনাটকীয় এবং আগামেমননের কন্যা ইফিগেনেইয়ার ভূমিকায় স্বাতীলেখার প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গীত ভাবনা সম্পর্কেও ইতিবাচক দিকটা লক্ষ করেছিলেন সামালোচকেরা। তাঁর চরিত্রের বালিকাস্বরূপ সহজ আন্তরিকতা প্রকাশ যেমন কঠিন ছিল, তেমনই প্রাচীন পৌরাণিক পটভূমিকায় নির্মিত নাটকের সংগীতভাবনার কাজটিও ছিল দুরূহ। সেখানেও প্রশংসিত হন স্বাতীলেখা। স্পষ্টতই লেখা হয় ‘কাহিনির, পরিবেশ রচনার এবং সবার ওপরে নাটকের বক্তব্যকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে গান আর সুর এখানে যে বেশ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে, সে কৃতিত্ব ‘ইফিগেনেইয়া’ স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর’ বিশেষত আবহ সংগীত। মূলত পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের আশ্রয়ে ললিত সুর দৈনন্দিতার অতিরিক্ত কিছু অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নিয়ে যায় আমাদের। ফলে নাটকে রূপায়িত চিরন্তন প্রশ্নগুলি আমাদের কাছে বাস্তব হয়ে ওঠবার পরিবেশ পায়।’[৪২] । এই আবহ স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত তৈরি করেছিলেন মূলত পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতকে আশ্রয় করে। এই আবহ আমাদের প্রত্যেক দিনের অভিজ্ঞতার বাইরে আরও অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেয়। ফলে এ নাটকের যে চিরন্তন প্রশ্ন, আমাদের সামনে তা বাস্তব হয়ে ওঠে। তবে তাঁর সুরে গাওয়া কোরাসের গানগুলি নির্দ্বিধায় প্রশংসা করতে পারা যায়নি, কারণ গ্রিক নাটকের মূলেই থাকে কোরাসের ভূমিকা। যেখানে এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতিও দর্শকের মেনে নিতে কষ্ট হয়।

আপাতদৃষ্টিতে ‘শেষ সাক্ষাৎকার’-এর মতো নাটকে সংগীত বা আবহের তেমন কোনও ভূমিকা আছে বলে মনে নাও হতে পারে, কিন্তু এ নাটকেরও আবহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্বাতীলেখাই। ১৯৮৮-র নান্দীকার প্রযোজনা ভ্লাদিমির দোজোরৎসেও-এর ‘লাস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট’ অবলম্বনে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত পরিচালিত নাটকটি ছিল ‘শেষ সাক্ষাৎকার’। এ নাটকে পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে একমাত্র নারী চরিত্রে রূপদান করেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। আবহ সংগীতের দায়িত্বও অর্পিত হয় তাঁরই

ওপর। এ নাটকটি কথাসর্বস্ব নাটক এবং বিষয় বক্তব্যে বিতর্ক সৃষ্টিকারী। সাক্ষাৎকারের ফর্মাটে বোনা এ নাটকের মুখ্য চরিত্র ডঃ শুভঙ্কর কর্মকার— দেশের সেরা হার্ট সার্জন। নিজের কার্ডিওলজি সেন্টারের সুনামের জন্য এমন এক পন্থা গ্রহণ করলেন যা অন্যায় পন্থা। তিনি বেছে বেছে সেই সমস্ত রোগীরই অপারেশন করলেন যারা বাঁচবে। কয়েকজন মারা গেল অপারশেন না হওয়ার কারণে। মৃতদের মধ্যে একজন বেঁচে গেল— সে হল মহসিন, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তার অপারেশন করেছিলেন ডঃ কর্মকারের সেন্টারের এক অধ্যাপক— ডঃ চ্যাটার্জি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে লাগল, তা হলে যারা মারা গেছে তারাও তো বেঁচে যেতে পারত যদি অপারেশন হত। ডঃ কর্মকার তাঁর কাজের জন্য পদ্মভূষণ পেলেন এবং স্বাস্থ্যদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবেও স্বীকৃতি পেলেন। কিন্তু তাঁকে কিন্তু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল। প্রশ্নকর্তা এক তরুণ সাংবাদিক অনির্বাণ মজুমদার। কিন্তু অনির্বাণের ভবিষ্যৎটিও নষ্ট করে দেওয়া হল। অনির্বাণের স্ত্রী বীণাকে সঙ্গে নিয়ে এক নামপরিচয়হীন মানুষ এসেছেন ডঃ শুভঙ্কর কর্মকারের মুখোমুখি হতে। এই নামগোত্রহীন মানুষটিই হল আমাদের সমাজের প্রতিভূ— প্রয়োজনে যে উত্তপ্ত হতে জানে প্রশ্ন তুলতে পারে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে। এই রকম বিষয় মঞ্চে নিয়ে আসা এবং অন্যায় কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা— নিঃসন্দেহে এক সাহসী পরিচালকের প্রযোজনা। এই জাতীয় বিতর্কিত ও সামাজিক দ্বন্দ্ব-জটিলতাপূর্ণ কাহিনির মঞ্চায়নে আবহের ভাষা কী রকম হবে তা খুব সহজে অনুমেয় নয়। যদিও ১৯৭৮-এ আসা স্বাতীলেখার চিন্তাভাবনা ১৯৮৫-তে অনেক পরিণত হয়ে উঠেছিল। তাই শিক্ষাচর্চা এবং মনন দিয়ে তিনি এই নাটকের আবহ তৈরি করেছিলেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে অভিনয়ের পাশাপাশি সঙ্গীত প্রয়োগ নিয়েও নাট্যজগতে নিজস্ব একটা জায়গা ক্রমশ তৈরি হয়েছে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর।

স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে বারবারই একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে, যখনই তিনি কেয়া চক্রবর্তী অভিনীত কোনও নাটকের কোনও ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। দর্শকের মনে এই প্রতিতুলনা আসা স্বাভাবিক, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে কোনও তুলনামূলক জায়গায় এঁদের অভিনয় বাঁধা পড়ে থাকেনি— নিজস্ব অভিব্যক্তিতে স্বতন্ত্র শিল্পকথা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন স্বাতীলেখা। 'শঙ্খপুরের সুকন্যা' (প্রথম অভিনয় ২৩ আগস্ট ১৯৯০)— তেমনই এক প্রযোজনা। বের্টোল্ট ব্রেখট-এর 'গুড পার্সন অব সেজুয়ান' প্রাণিত 'ভালোমানুষ' (১ম পর্ব কেয়া চক্রবর্তী অভিনীত) এবং 'শঙ্খপুরের সুকন্যা' (২য় পর্ব স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত অভিনীত)— দুটি নাটক-ই বাংলা রঙ্গমঞ্চের গর্ব। কেয়া চক্রবর্তী অভিনীত 'ভালোমানুষ' মানুষের মনে যে জায়গা অধিকার করে আছে তাকে সরিয়ে আবারও নতুন

চেহারায় নতুন ভাবনায় একই নাট্যের উপস্থাপনা এবং প্রশংসা আদায় করে নেওয়া সহজ ছিল না। জানকী ও জনার্দন একই সঙ্গে দুটি চরিত্রের রূপায়ণে স্বাতীলেখা নিজেকে প্রমাণ করেছেন। জানকী— দেহপসারিণী। জীবিকা যাই হোক না কেন, সে মানুষের ভাল করতে চায়। দেবতাদের সাহায্য পেলেও এই জানকীর সাধ্য কি চারিদিকের স্বার্থপরতার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে— পচে গলে যাওয়া সমাজব্যবস্থার মধ্যে নিজে ও অপরকে ভাল রাখার! তাই জানকীকে জনার্দন সাজতে হয়। 'ভালোমানুষ'-এ যেমন শান্তা হয়ে উঠেছিলেন শান্তাপ্রসাদ। 'খড়ির গণ্ডি' থেকে যাত্রা শুরু করার পর বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করতে করতে (খড়ির গণ্ডি, নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র, নীলা, হননমেরু, ব্যতিক্রম, ফুটবল, শেষ সাক্ষাৎকার ইত্যাদি) স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত মঞ্চের ওপর বর্তমানে অকুতোভয়। তাই অভিনয় নিয়ে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য যেমন ছিল, তেমনই আশৈশব যন্ত্রসংগীতের শিক্ষায় শিক্ষিত স্বাতীলেখা— দুটি বিষয়কেই মঞ্চের ওপর নিয়ে আসেন নিজ কৃতিত্বে। এ নাটকে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বেহালাবাদনও একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তৈরি করে।

দুটি পর্বে এ নাটকের মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী-ই শুধু বদলে যায় না, নির্দেশকও বদলে যায়। প্রথম প্রযোজনাটি ছিল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত কেয়া চক্রবর্তী অভিনীত আর দ্বিতীয় পর্বের প্রযোজনাটি ছিল রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত পরিচালিত স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত অভিনীত। দুই অভিনেত্রীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা যেখানেই পৌঁছে যাক না কেন— যখন পরিচালক স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে বেহালাবাদক হিসেবে উপস্থিত করেন, তখন তাঁর উপস্থিতি ও মঞ্চাবতরণের ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা যোজিত হয়। বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক Donald Mac Kechnie স্পষ্টতই লিখলেন— '...late in the first half, the lady plays the violin quite well, I thought in the second half that there was not much left for her outside of a spot of levitation but this is an actress truly of infinite variety and how fortunate we were and are, to see her.'[৪৩]

'শঙ্খপুরের সুকন্যা'-য় তাঁর অভিনয়-ই ছিল মুখ্য, কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বেহালাবাদক রূপে তাঁর ভিন্ন পরিচয়ও। এর কয়েক বছর পর আবারও তিনি সঙ্গীত পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' (১৯৯২) নাটকে। আর্থার মিলার এর 'ডেথ অফ আ সেলসম্যান' অবলম্বনে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু'।— শুধু সঙ্গীতভাবনা নয়, এ নাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। তবে সঙ্গীতস্রষ্টা হিসেবে অনেক বড় দায়িত্ব পালন করলেন তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' (প্রথম অভিনয় ২৭

এপ্রিল ১৯৯৬)-এ। মধুসূদন দত্ত রচিত কালজয়ী কাব্য-নিহিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই কঠিন পাঠকে মঞ্চোপযোগী করে একক অভিনয়ে দর্শকদের বিস্মিত করেছিলেন গৌতম হালদার। তাঁর অভিব্যক্তি, শরীরী ও বাচিক উভয়ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছিলেন নবীন প্রজন্মের মেধাবী অভিনেতা-পরিচালক। কিন্তু তাঁরও সহযোগী ছিলেন যাঁরা, তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এ ধরনের প্রযোজনা বোধহয় সম্ভব ছিল না। এঁদের মধ্যে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। মঞ্চের ওপর অভিনেতার বাঁ দিকে (actor’s left) যে যন্ত্রীরা বসতেন তাদের মধ্যমণি ছিলেন স্বাতীলেখা। তাঁর বেহালাবাদন সম্পর্কে লেখা হয়— ‘সংগীতবোদ্ধা না হয়েও প্রযোজনায় সংগীতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর হাতের বেহালাকে আমার মনে হয়েছে এ নাটকেরই আর একজন কুশীলব, গৌতমের সহ অভিনেতা। গৌতম যা আমাদের চোখ ও কানের কাছে হাজির করেন স্বাতীলেখা তাকেই সুরের ভেতর দিয়ে বইয়ে দেন আমাদের ধমনীতে।’[৪৪]

লক্ষ করলে দেখা যাবে ‘মেঘনাধবধ কাব্য’ থেকেই নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর পর তারই অনুজ শিষ্য গৌতম হালদার। প্রশ্ন জাগে, এই সময় স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত কেন নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন না। পরবর্তী সময়ে ‘মাধবী’ (২০১০) নির্দেশনা পর্বে তাঁর অভিমত ছিল, ছোটদের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার কারণে তিনি আর নির্দেশনার প্রতি মনোযোগী হননি। গৌতম হালদার-এর নির্দেশনার সময়পর্বে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে তিনি নেপথ্যে থেকে কাজ করে গেছেন। যেমন ‘নগরকীর্তন’ (প্রথম অভিনয় ১৯৯৭-এর অগাস্ট মাস)-এর প্রযোজনা প্রস্তুতির সময় স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত শুধু অভিনয় নয়, সংগীতভাবনার ক্ষেত্রেও তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। এই নাটকটিও রচনা করেছিলেন নবীন প্রজন্মের নাট্যকার কৌশিক রায়চৌধুরী। অভিনব পরিকল্পনায় একঝাঁক শিল্পীর দলবদ্ধ অভিনয়ের স্বাক্ষর হয়ে রইল ‘নগরকীর্তন’। এর আগে ‘ফুটবল’ প্রযোজনার সময় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের বক্তব্য ছিল যে, আনন্দ থেকে এ প্রযোজনার জন্ম। আনন্দ দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। গভীর কোনও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এ নাটকের উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র বিনোদনের জন্যই তৈরি হয়েছে এই নাটকটি। তবে ‘ফুটবল’ নাটক শুধু বিনোদনসর্বস্ব নয়। তেমনই ‘নগরকীর্তন’-এ বিনোদনের নানান উপকরণ থাকলেও এ নাটকও জীবন সম্পর্কে গভীর এক বোধে উত্তীর্ণ করে মানবসমাজকে। শুধু প্রযোজনার পরিকল্পনায় মানচিত্রটি বদলে যায় নির্দেশকের কাজের বা ভাবনার ভিন্নতায়। এ নাটকে সংগীতের একটা বড় ভূমিকা ছিল এবং যথারীতি সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। তিনি অভিনেত্রী হিসেবে যেমন এই প্রযোজনার সহযোগী হয়ে উঠলেন, তাঁর সঙ্গীত চিন্তাও প্রযোজনাকে সাহায্য করল।

শুধু সঙ্গীত নয়, পোশাক পরিকল্পনায় তাঁর ভাবনা প্রযোজনাটি নির্মাণের সহায়কও বটে। আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়— 'স্বাতীলেখার বসুমতী প্রযোজনার সম্পদ— দেবীপূজায় অচলাভক্তি, স্নেহ, শাসন ও আত্মসম্মানবোধের ঋজুতা থেকে খুনি ছেলেকে নির্দোষ প্রমাণ মেলোড্রামা পর্যন্ত। ... প্রযোজনা শ্রুতি ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে স্বাতীলেখার সঙ্গীত পরিচালনা ও বর্ণাঢ্য পোশাক পরিকল্পনায়।'[৪৫] সমালোচকের এই মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে এ নাটকে স্বাতীলেখার কর্মভাবনা প্রকাশিত হয়েছিল—(১) অভিনয় (২) সঙ্গীত পরিচালনা (৩) পোশাক পরিকল্পনা। নাটকের পরিচয়পত্রে এ নাটকের নির্মাণকারীদের মধ্যে উল্লেখ করা হয় স্বাতীলেখার নাম। নাটক: কৌশিক রায়চৌধুরী, গৌতম হালদার; মঞ্চপরিকল্পনা : সঞ্চয়ন ঘোষ; আলো : জ্যোতি দত্ত, অশোক প্রামাণিক, সঙ্গীত সহযোগ: স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত; গানের সুর : গৌতম হালদার প্রমুখ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে নাটকে সঙ্গীত সহযোগে ছিলেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত কিন্তু গানের সুর রচনা করেছিলেন গৌতম হালদার। শুধু সঙ্গীত সহযোগ করলেও সমালোচকদের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। সমালোচক আনন্দলালের মতে 'Nevertheless, Nagar Kirtan evidences laborious effort toward the creation of a malevolent musical. Sanchayan Ghosh's dark ominous decor is artistic, the lighting effective, and Swatilekha Sengupta's lead violin soloing above the amplified synth and pop rhythms marks an appropriate and unusual symbolic statement'[৪৬] একই সঙ্গে অভিনয় ও সংগীতে সহযোগ— দর্শককে চমকে দিয়েছিল। 'মা'-এর ভূমিকায় মঞ্চে অভিনয় করতে করতেই কখনও বেহালা কখনও বা সিন্থেসাইজার বাজানো, মঞ্চের সামনের এক অংশে যন্ত্রীদের সহযোগী হয়ে ওঠা নিঃসন্দেহে ছিল কঠিন কাজ— আর সেই কাজটি ছিল তাঁর কাছে অনায়াসসাধ্য। এ কাজটি করতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়— স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত বার বার 'নান্দীকার' প্রযোজনায় তাঁর এই পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন।

'নান্দীকার'-এর প্রযোজনাগুলির সঙ্গীতভাবনা এবং নিজে স্বয়ং যন্ত্রী হয়ে যেভাবে নিজেকে সক্রিয় রেখেছেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, ক্রমশ নিজে সমৃদ্ধ হয়েছেন, দলকে সমৃদ্ধ করেছেন— এই উদাহরণ বাংলা মঞ্চে অভিনেত্রীদের মধ্যে বিরল। সমগ্র ভারতীয় রঙ্গমঞ্চেও এমন অভিনেত্রীর তুলনা মেলা ভার। আবার তিনিই কয়েকটি প্রযোজনায় পোশাক পরিকল্পনার কাজটিও করেছেন সুষ্ঠুভাবে। মূলত থিয়েটারের সার্বিক কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখার সুদৃঢ় মনোভাব অভিনয় ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিজেকে প্রমাণ করার দায়বোধ থেকে জাগ্রত হয়। স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে প্রথম পোশাক

সম্পর্কে সচেতন হতে দেখা যায় 'ফুটবল' নাটকে। হয়তো পুরনো দর্শকদের মনে পড়ে যাবে এই 'ফুটবল' নাটক প্রথমবার মঞ্চস্থ হওয়ার সময় কেয়া চক্রবর্তী ছিলেন পোশাকের তত্ত্বাবধানে। এ বিষয়টি কেয়া চক্রবর্তী সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত (২০০৩ পর্যন্ত) স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর পরিকল্পিত পোশাক সম্বলিত নাটকগুলি হল— (১) 'ফুটবল' নাটকটি 'নান্দীকার'-এ সময়ান্তরে তিনবার মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৭-১৯৭৮, ১৯৮৬ এবং ২০০১ সালে। নাটকের অন্তর্কাঠামো ঠিক রেখে ওপরের রূপসজ্জায় পরির্তন এসেছে। এ নাটকের একটি মাত্র শো-এ অভিনয় করেন কেয়া চক্রবর্তী এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই বন্ধু কাজল চৌধুরী কয়েকটি শো (কাজল চৌধুরীর বয়ানে মাত্র ছ'টি শো-তে তাঁকে অভিনয় করিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়)-তে অভিনয় করেন। 'অনুষ্টুপ' পত্রিকায় দেওয়া কাজল চৌধুরীর মতকে খণ্ডন করে ব্রাত্য বসু কর্তৃক গৃহীত রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত যে সাক্ষাৎকারটি দেন সেখানে জানাচ্ছেন '...না, বসিয়ে দিইনি। এটাও অনেক কিছু মিলে। সেগুলো তো বলে লাভ নেই। কাজল এল, নান্দীকারে কাজ করল। প্র্যাকটিক্যালি বাঁচাল নান্দীকারকে পার্টটা করে। আবার তারই সঙ্গে কী কারণে কাজলের বদলে স্বাতীলেখা করল, তার কারণ হয়তো কতগুলো আছে।...'[৪৭] সর্বার্থেই রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত দলের পরিচালক, তাঁর কথা অনুসরণ করে বলা যায় যে, প্রথমাবধি দলের প্রতি স্বাতীলেখার দায়িত্বশীলতা তাঁকে অভিনয় ছাড়াও অন্যান্য কাজে প্রাণিত করেছিল। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে পোশাকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'ফুটবল' নাটকের প্রথম প্রযোজনার সময় এ নাটকের পোশাক পরিকল্পনা করেছিলেন কেয়া চক্রবর্তী। পরবর্তী পর্যায়ে যখন আবারও 'ফুটবল' নব পর্যায়ে, অভিনেতা-অভিনেত্রী বদল করে মঞ্চস্থ হল, তখন পোশাক পরিকল্পনার ভার অর্পিত হল স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর ওপর— বা বলা ভাল, তিনি এই কাজে আগ্রহী ছিলেন বলেই তাঁকেই গ্রহণ করতে হল এ দায়িত্ব। নতুন করে তখন ভাবনা-চিন্তা করে কাজটি করতে শুরু করেন তিনি। 'আমাদের ফুটবল প্রযোজনা নতুন করে প্রযোজনার ব্যবস্থা হচ্ছে। ৭৭ সালে ফুটবলে যা পোশাক ছিল সেটা এখন কেন হবে? সময় পাল্টে গেছে, চেহারা পাল্টে গেছে, এখন হেডব্যান্ড এসেছে, ব্যাগিপ্যান্ট এসেছে, সেগুলো আমরা ক্রাউড-এ ব্যবহার করব না কেন?'[৪৮] অর্থাৎ যেহেতু 'ফুটবল' 'পিরিয়ড ড্রামা' নয়, তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরিকল্পক।

পোশাক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর কাছে অত্যন্ত জরুরি বিষয় ছিল অর্থনৈতিক দিক। কী করে কম খরচে অথচ যথাযথ পোশাক তৈরি করা সম্ভব সে চেষ্টাটা সব সময় করতেন দলের সুবিধার জন্য। 'মুদ্রারাক্ষস'-এর ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটেছিল। 'মুদ্রারাক্ষস' প্রথম অভিনয় হয় ১৯৭৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি। মূল রচনাটি সংস্কৃত নাট্যকার বিশাখ দত্তের। শম্ভু মিত্র অভিনয় করেছিলেন

চাণক্যের ভূমিকায়। কেয়া চক্রবর্তীর ভূমিকা ছিল প্রিয়দর্শিকা-র। পরবর্তী সময়ে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর নির্দেশনায় আবার-ও যখন 'মুদ্রারাক্ষস' অভিনীত হয়, তখন শম্ভু মিত্র চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করলেও অন্যান্য চরিত্রে অভিনেতাদের বদল ঘটে। স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত এই প্রযোজনায় চন্দন দাসের বৌ-এর চরিত্রে অভিনয় করতেন এবং এ নাটকের পোশাকের দায়িত্ব ছিল তাঁর। যেহেতু এটি পিরিয়ড ড্রামা, তাই বিশেষ গুরুত্ব ছিল চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরিকল্পনার। এ নাটকে শম্ভু মিত্রের ভূমিকা ছিল প্রধান। তাই তাঁর পোশাকটা নিয়ে স্বাতীলেখাকে বিশেষ চিন্তা করতে হয়নি। তিনি নিজেই সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং তিনি যে স্বাতীলেখার চেয়ে অনেক ভাল চিন্তা করবেন এ বিষয়ে কোনও ধন্দ ছিল না স্বাতীলেখার — '...ওঁরটা আমি আর চিন্তা করিনি। কারণ ওর থেকে আমি তো আর ভালো চিন্তা করতে পারব না। তা এখানে আমি কাকে গুরুত্ব দেবো? পরিচালককে, মূল অভিনেতাকে নাকি প্রযোজককে?'[৪৯] এক্ষেত্রে পরিচালক বা মূল অভিনেতার ওপরই নির্ভর করেন তিনি। তাই 'মুদ্রারাক্ষস'-এ মূল অভিনেতা শম্ভু মিত্রেরই ওপর যেমন নির্ভর করেন, তেমনই পরিচালক যখন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত তখন তাঁর পোশাকের রং কোন চরিত্রে কেমন হবে সে সিদ্ধান্ত রুদ্রপ্রসাদই গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর মতামতের ওপর পরিকল্পক কিছু বলতে চান না। তবে 'মুদ্রারাক্ষস'-এর প্রযোজনার সময় বাকি প্রায় ৪৫ জনের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাঁদের। পোশাকের একটা বিশাল দায়িত্ব ছিল কেননা কুশীলব সংখ্যা চল্লিশের বেশি। এত লোকের পোশাক তৈরিও যথেষ্ট ব্যয়বহুল। ''তাই 'যে কাপড় আমরা কিনেছিলাম সেটা কি করে কম খরচায় করা যায় এটা মূল ভাবনা ছিল। কারণ এতে শিল্পী কুশীলব ছিলেন ৪৫ জন। তাই প্রত্যেকের ধুতি কিনে রং করে তার আলাদা ডিজাইন করে এবং মুহূর্তে মুহূর্তে সেগুলো পাল্টানো তার কোচা আলাদা এমন কি ধুতি পরার স্টাইলও ছিল সব আলাদা।'' অর্থাৎ পোশাক সম্পর্কে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর কয়েকটি ধারণা আমরা প্রত্যক্ষ করি— (১) তিনি কম খরচে পোশাক বানানোর পক্ষপাতী (২) তাঁর থেকে সিনিয়র অভিনেতা বা পরিচালকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে পোশাকের ব্যাপারে তাঁরাই যদি সচেতন হন বা অভিমত দেন তাহলে তাঁদের মতামত, পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দেন স্বাতীলেখা (৩) কুশীলব বেশি হলে পোশাকের ক্ষেত্রে খরচটাও বেড়ে যায় আর সেই জন্যই কাপড় কিনে রং করে পোশাকের সৌন্দর্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক সংগতির একটা চেষ্টা করেন। শুধু 'মুদ্রারাক্ষস' বলে নয়, যে কোনও নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর এই মনোভাবটাই কাজ করে যা প্রধানত দলের স্বার্থের কথা ভেবেই। 'ফুটবল' ও 'মুদ্রারাক্ষস'-এর মতো অধিক সংখ্যক কুশীলব সম্বলিত নাটক ছাড়াও 'শেষ সাক্ষাৎকার'- (আধুনিক বিদেশি নাটকের অনুবাদ/ভাবানুবাদ), 'নগর কীর্তন' (একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুরোহিত পরিবার ও আধুনিক ভোগসর্বস্ব জীবনের স্বাদ পাওয়া

পুত্র) নাটকের পোশাক পরিকল্পনা করেছিলেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। 'শেষ সাক্ষাৎকার' অনূদিত বা রূপান্তরিত নাটক হলেও তাকে বাঙালিয়ানায় সজ্জিত করেছিলেন নাট্যকার আর অভিজাত ডাক্তার বাঙালিকে যথাযথ পোশাকে সজ্জিত করেছিলেন স্বাতীলেখা। পাশাপাশি সাংবাদিকের অসহায় স্ত্রী ও জনৈক ভদ্রলোককে সহজ সাধারণ পোশাকে মানানসই বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছিলেন স্বাতীলেখা। আবার 'নগরকীর্তন'-এ পোশাকের ক্ষেত্রে নাটকানুসারে ভিন্নতা দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত পরিবারের রক্ষণশীল আচারনিষ্ঠতা তাদের আচরণ অভিনয়ে যেমন ফুটে উঠেছিল তেমনই এই পরিবেশ রক্ষায় পোশাকও সহায়তা করেছে। অপরদিকে উচ্ছৃঙ্খল, ভোগসর্বস্ব জীবনকে বেছে নেওয়া পুত্রের কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক আচরণের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেছেন পরিকল্পক। তাই সমালোচকদের মতে এ নাটকের পোশাক ছিল 'বর্ণাঢ্য'। অর্থাৎ একটা contrast বা বৈপরীত্য রাখতে চেয়েছেন। নাটকে এই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব যেমন নাট্যদ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে, পোশাকের মধ্য দিয়েও তিনি এই দ্বন্দ্বময়তা রক্ষা করতে চেয়েছেন।

**নির্দেশনা:** নির্দেশনা সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশের আগে অত্যন্ত জরুরী একটি মন্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন— ''ফুটবল' নাটকে সহযোগী ছিলেন কেয়া চক্রবর্তী। তার সম্পর্কে বলা হোল— '...নিজেকে নিয়ে পঞ্চান্ন জন মানুষের মিছিলকে পরিচালনা করেছেন রুদ্র... এদের সকলের নাম ফুটবল আত্মার নাম কেয়া চক্রবর্তী। নান্দীকার পর্বে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ধরতে না পারলেও নান্দীকার গোষ্ঠীর বাইরে গিয়ে তিনি এই নির্দিষ্ট সময়সীমাতেই নাট্য নির্দেশনার কাজ করেছেন। তাঁর প্রথম নির্দেশিত নাটক খুঁজে নাও— যা রঙরূপ-এর হয়ে তিনি মঞ্চনাটকের নির্দেশনা দিলেন। প্রথমত নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীতে তিনি অভিনেত্রী, নির্মাণকর্ত্রী, কখনও কখনও কোনও নাটকে সহযোগিতা করেছেন নির্দেশনার কাজে (নেপথ্য কর্মী হিসেবে) কিন্তু নির্দেশনায় অংশ নেননি সে কারণেই রঙরূপ গোষ্ঠীর কর্ণধার সীমা মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধ বা জোর ছিল স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত-র কাছে যে তাঁদের হয়ে একটি নাটকে নির্দেশনা দেবেন স্বাতীলেখা। ২০০৩ সালে তাঁর সঙ্গে এই যোগাযোগটি ঘটে। রঙরূপ নাট্যগোষ্ঠীর 'খুঁজে নাও' নাটকের অভিনয়পত্রী তথা 'Director's Note'-এ লেখা হয় 'এই নাটকের মঞ্চায়নের বছর দুই আগে 'রঙরূপ'-এর সীমা মুখোপাধ্যায় স্বাতীলেখার মুখ থেকে কথা আদায় করে ছেড়েছিলেন যে তাঁদের একটি নাটক স্বাতীলেখাকে পরিচালনা করতে হবে। মজা করেই তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন এ কাজ তিনি করবেন না। I much cold feet. কিন্তু সীমা এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী নন।'[৫২] স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর তখন আঠারো বছর আগে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের রূপান্তরিত একটি Script-এর

কথা মনে পড়েছিল। মূল চরিত্রে সে সময় ভাবা হয়েছিল আট-নয় বছরের সোহিনীকে। তখন যেহেতু নান্দীকার-এ অভিনেতাদের দল ভারী ও বলিষ্ঠ, তাই সে সময় নান্দীকার-এ প্রযোজনাটির প্রতি আগ্রহবোধ করেনি। নাটকটি সে সময় স্থগিত থাকে। তবে আমাদের মনে হতেই পারে যে যদি সেই সময় 'নান্দীকার' প্রযোজনাটি করত, তা হলে হয়তো বাংলা মঞ্চ স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর মতো পরিচালককে পেত না। একটি কিশোরীর সমস্যা যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এ নাটকে তাকে যখন বিশ্লেষণ করছেন এক নারী নির্দেশকের চোখ দিয়ে, তখন স্বভাবতই এ নাটকের পাঠ ও আবেদন অন্য মাত্রা পাচ্ছে। অনেকেই তাই সাধুবাদ জানিয়েছিলেন স্বাতীলেখা শুধু নয় সীমা মুখোপাধ্যায়কেও। 'ধন্যবাদ সীমা মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর নাট্যদল রঙরূপকে, যিনি বা যাঁরা স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে নির্দেশক হিসেবে নিয়ে এলেন। তাই তো বাংলা মঞ্চে সত্যবতী নামের একটি মেয়ের মানসিক রোগের আয়নায় ধরা পড়ে গেল পৃথিবীর বুকে নয়া প্রজন্মের অস্থির যন্ত্রণা আত্মক্ষয়ী জিজ্ঞাসা।'[৫৩] অর্থাৎ সীমা মুখোপাধ্যায় যিনি দীর্ঘসময় ধরে নাট্যনির্দেশনার কাজ করে চলেছেন, অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন 'নান্দীকার' গোষ্ঠীর মুখ্য অভিনেত্রী এবং সংগঠক স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে, তাঁর একটা সম্ভ্রম মিশ্রিত ভালবাসা তৈরি ছিল তাঁর প্রতি। সেই জায়গাটা থেকেই, স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর নাট্যকর্মের বিভিন্ন দিকের মধ্যে অপ্রকাশিত এই নির্দেশনার ক্ষেত্রটিতে অভিষেক ঘটালেন বয়সে সামান্য কিছু বড় স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর।

এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যবতী মানসিক ভারসাম্যহীন এক বালিকা। সত্যবতীরা আমাদের আশেপাশেই বা আমাদের মধ্যেই। সাধারণ নিয়মে তাদের হয়তো 'পাগল' নামে চিহ্নিত করা হয়। আসলে সত্যবতীদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির কোথাও যেন একটা পার্থক্য থেকে যায়। সমাজের সাধারণ জীবনের সঙ্গে সত্যবতীদের মিশ খায় না। তাই সত্যবতীদেরও মনে হয় তাদের বসবাসের জন্য পৃথিবীটা বড় কঠিন জায়গা। তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। সমাজও তাদের প্রতি নৃশংস ভূমিকা নেয়। এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সত্যবতীরাই। বাবা-মা সব সময়েই তাঁদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পালন করেন তাঁদের সন্তানকে— সে সন্তান স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক তা তাঁরা মনে রাখেন না। সত্যবতীকেও বাবা-মা স্নেহচ্ছায়ায় গড়ে তুলেছেন। ছোটবেলা থেকে সে এ রকম ছিল না— ছিল সর্ববিষয়ে উৎসাহী পারদর্শী। মেধাবী ছাত্রী সত্যবতী খেলাধূলায় ভাল ছিল— বিশেষ করে সাঁতারে। কিন্তু হঠাৎ করেই সব কিছু বদলে গেল। মানসিক সমস্যায় পীড়িত হল সত্যবতী। তার বড়ো ভাই চায় তার বোন সুস্থ থাক, ছোটভাই ছোট থেকেই দিদিকে এই রকম মানসিক ভারসাম্যহীন-ই দেখেছে। তার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে দিদিকে দেখেছে mental

asylum-এ। সে ক্ষেত্রে সত্যবতীর একমাত্র ভরসাস্থল তার বাবা-মা। এই রকম এক গতানুগতিক ছাঁচে ফেলা গল্পের বাইরে এসে একেবারে অন্য রকম ভাবনা চিন্তার জগতে দর্শককে পৌঁছে দিলেন নির্দেশক। প্রথম নির্দেশনাতেই তিনি ব্যতিক্রমী হয়ে উঠলেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনিকে কেন্দ্র করে অনেক গভীর ব্যাপকতর সামাজিক সমস্যাকে ধরতে চাইলেন স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। দ্বিমুখী এই সমস্যা। এক দিকে সত্যবতী বা সত্যবতীদের জীবনাভিশাপ ও অন্য দিকে বাবা-মায়ের সমস্যাদীর্ণ অস্থিরতার হাহাকার।

স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত-র প্রথম নির্দেশনার কাজ হলেও, দীর্ঘ নাট্য-অভিজ্ঞতায় তিনি নাটকটি বেঁধেছিলেন যথেষ্ট মুনসিয়ানায়। সমগ্র প্রযোজনাটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন অর্থাৎ অভিনয়ের মধ্যে যে এনার্জি বা উত্তেজনা থাকা প্রয়োজন তার খামতি ছিল না। সেই সঙ্গে ছিল আনন্দের আবহাওয়া। যা মঞ্চায়িত হয়েছিল সমস্ত শিল্পীর মধ্যে। যদিও তিনি নিজের দলের বাইরে গিয়ে একেবারে একটা অচেনা অজানা টিম-এর সঙ্গে কাজ করেছেন। তবে সব সময় তিনি সহযোগিতা পেয়েছেন সীমা মুখোপাধ্যায়ের। দুজনেই মহিলা, দুইজনেই অভিনেত্রী, দুজনেই নির্দেশক। স্বভাবতই উভয়ের মধ্যে একটা সহযোগিতা ও সহৃদয়তার ক্ষেত্র তৈরি হবে এটাই স্বাভাবিক। রঙরূপ-এর নির্দেশক সীমা মুখোপাধ্যায় এবং রঙরূপ-এর আমন্ত্রিত নির্দেশক স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত— দুজনের মধ্যে সেই সমঝোতাটা তৈরি হয়েছিল। সীমা মুখোপাধ্যায় স্বাতীলেখাকে সাহস জুগিয়েছিলেন, তাঁর স্বাধীনতার ওপর কোনও রকম হস্তক্ষেপ করেননি। রঙরূপ-এর সদস্যদের মধ্য থেকে অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। মূল চরিত্র সত্যবতীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সোহিনী সেনগুপ্তকেও নির্বাচন করেন পরিচালক নিজে। নিয়মিত রিহার্সালের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছিল ‘খুঁজে নাও’।

যেহেতু নির্দেশনায় প্রথম পদক্ষেপ তাই যাঁরা রিহার্সাল বা অন্যান্য কাজে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ‘খুঁজে নাও’-এর অভিনয়পত্রীতে— ‘This is my first directorial venture and I grateful to Rudrababu, to Seema to Sohini and to the entire cast for their support.’[৫৪]

‘খুঁজে নাও’ নাটকটির মূল রচয়িতা অলওয়েন ওয়াইমার্ক; রূপান্তর রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সঙ্গীত পরিচালনা স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। মঞ্চ পরিকল্পনা কৌশিক রায়চৌধুরী। মঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন বিলু দত্ত, আলো বাদল দাস, পোশাক পরিকল্পনা দেবাশিস রায়চৌধুরী, সহায়তা ‘নান্দীকার’। এ নাটকের

কুশীলবরা ছিলেন সীমা মুখোপাধ্যায় (মা), শ্যামল সরকার (বাবা), সোহিনী হালদার (সত্যবতী) এবং রাণি মিত্র, অপর্ণা ধর, শিবানী পাল, গীতা সরকার, গোপা নন্দী, দেবাশিস রায়চৌধুরী, কালীপদ ঘোষ, অভিজিৎ সিন্‌হা, সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, কৌশিক মুখার্জী প্রমুখ।

প্রয়োগ ভাবনার ক্ষেত্রেও বিশেষ অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন স্বাতীলেখা। তিনি প্রৌঢ়া অভিনেত্রীদের দিয়ে স্কুল ছাত্রী বা কিশোরী সাঁতারুর ভূমিকায় অভিনয় করানোর সাহস ও অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন। গোটা মঞ্চ জুড়ে ক্রমাগত তিনি ভেঙেছেন এবং জুড়েছেন। কিন্তু কেন তিনি এই পদ্ধতি নিলেন? এ প্রশ্ন তাকে করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন যেহেতু সত্যবতী সব কিছু ভেঙে গেলে শৃঙ্খলা মানে না, অস্থিরতা করে। কিন্তু কেন তার এই অস্থিরতা? আসলে সমাজের আরও পাঁচজনের বিচারে বিচার্য নয় সত্যবতী। তাই খুব স্পষ্ট ভাষায় লেখা হল আনন্দবাজারে যে 'স্বাভাবিক মেয়েকে পাগল করার ট্রাজেডি নয়, পাগল মেয়েকে স্বাভাবিকতার নিরিখে বিচার করতে যাওয়ার করুণ বিপর্যয়— এ নাটক।'[৫৫]

সোহিনী হালদার এর কিছু দিন আগেই এই ধরনের একটি চরিত্রে রূপদান করেছিলেন 'পারমিতার একদিন' চলচ্চিত্রে। কিন্তু এ নাটকে তাঁর সংবেদনশীলতা ও উপস্থিতি ছিল আরও তীব্র। প্রত্যেক দিন মঞ্চে নিজেকে এভাবে প্রকাশ করার কৃতিত্ব বড় কম নয়। তাঁর অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? একটি সাক্ষাৎকারে 'খুঁজে নাও' নাটকে মা-কে নির্দেশক হিসেবে সোহিনী কেমন দেখেছেন, সে অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন— 'My Mother is very professional and can't tolerate tardiness. When the lights come on, she had no personal relationship with me. Working under her made me more professional and sincere.'[৫৬]

এ নাটকের সংগীতভাবনাও ছিল স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর। তিনি তাঁর প্রিয় রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেছেন 'খুঁজে নাও'-এর আন্তর-আবিষ্কারে। কেননা রবীন্দ্রনাথের সুর, গান মানুষের প্রত্যেক অনুভূতির সঙ্গে মিশে থাকে। প্রত্যেকটা অনুভূতির তন্ত্রকে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথের সুরকে এখানে প্রার্থনা সঙ্গীতের মতো ব্যবহার করেছেন। আবার ঘুমপাড়ানি গান, লোকসংগীত, জসিমুদ্দিনের লেখাও তিনি গানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন যথাযথভাবে।

স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর নির্দেশনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করল দর্শক— যার পরিণততর রূপ পরবর্তী সময়ে তাঁকে আরও বেশি সচেতন, দায়িত্বশীল,

দক্ষ নির্দেশক রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে প্রথম নির্দেশনা 'খুঁজে নাও' থেকেই তিনি নিজেকে সামগ্রিক নাট্যনির্দেশক (Total Theatre Director) হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন।

## তথ্যসূত্র


১. গৌরকিশোর ঘোষ, 'কেয়া, আন্তিগোনে, আমি', দেবেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *কেয়া*, দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৮৩

২. অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কেয়া সম্পর্কে', তদেব, পৃ. ১৪

৩. বিবেকানন্দ রায়, 'তিন বছর কেয়াকে যেমন দেখেছি', তদেব, পৃ. ৫৮

৪. চম্পা চক্রবর্তী, 'যখন কেয়াদি হতে চাইতাম', মধুময় পাল (সম্পা.), *আগুনের খেয়া*, সেতু, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ৬৪

৫. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কেয়ার বাঁচা', তদেব, পৃ. ৭৮

৬. অরুণোদয় ভট্টাচার্য, 'ছবিটি পৌঁছে দেওয়া হয়নি', আনন্দলোক, ২.০৪.৭৭

৭. কেয়া চক্রবর্তী, 'শেষ সাক্ষাৎকার', পরিগ্রাহক শ্যামাপ্রসাদ সরকার, অমৃত, ২৫ মার্চ, ১৯৭৭, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মধুময় পাল (সম্পা.), *আগুনের খেয়া*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৬২

৮. বিভাস চক্রবর্তী, 'থিয়েটার জীবন-দর্শন-কেয়া', দেবেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *কেয়া*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৩৯

৯. তদেব, পৃ. ৩৭

১০. রাধারমণ তপাদার, 'স্মৃতির চেয়েও বড়ো এক আকাশ, তার মধ্যে স্বেচ্ছাচারী শুধু মেঘ', দেবেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৪২

১১. চিত্তরঞ্জন ঘোষ, 'ফুলের মশাল', মধুময় পাল (সম্পা.), *আগুনের খেয়া*, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১০২

১২. অচিন্ত্য দত্ত, 'কেয়াই আজ কেয়ারিং', মধুময় পাল (সম্পা.), *আগুনের খেয়া*, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৫১

১৩. প্রকাশ ভট্টাচার্য, 'মায়ের অপরেশন এবং দুটো শো', মধুময় পাল (সম্পা.), *আগুনের খেয়া*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫৩

১৪. বাদল সরকার, 'আমাদের নাটক, কেয়া চক্রবর্তী ও কিছু প্রাসঙ্গিক ইত্যাদি কথন', দেবেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *কেয়া*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১৩

১৫. অচিন্ত্য দত্ত-র ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, ২০.০৪.২০১৫, অচিন্ত্য দত্ত

‘নান্দীকার’-এর প্রাক্তন সদস্য এবং ‘ফুটবল’ নাটকে পরবর্তী পর্যায়ে হরির ভূমিকায় অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন।

১৬. প্রকাশ ভট্টাচার্য, ‘মায়ের অপারেশন এবং দুটো শো’, মধুময় পাল (সম্পা.), *আগুনের খেয়া,* পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫৪

১৭. Sandhya Sen, ‘Nandikar’s Nati-Binodini’, *Cine Advance,* W. E.MAR.L

১৮. ‘নান্দীকারের শাহী সংবাদ’, নাট্যসমালোচক, পুনর্মুদ্রিত মধুময় পাল (সম্পা.), *আগুনের খেয়া,* পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ২৮১

১৯. রুশতী সেন, ‘এলোমেলো স্মৃতির নৈর্ব্যক্তিক-ব্যক্তিক’, *ফালতু লেখায় ফালতু কথা,* সূত্রধর, জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা, পৃ. ৭৫

২০. কেয়া চক্রবর্তীর, সাক্ষাৎকার, গ্রাহক প্রজ্ঞাপারমিতা বসু, ‘অধুনা প্রগতিবাদী এই দেশে শিক্ষিতা অভিনেত্রী হিসেবে, কেমন বুঝছেন?’ চিত্তরঞ্জন ঘোষ (সম্পা.) *বহুরূপী* পত্রিকা সংখ্যা ৪৭, মে ১৯৭৭, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ থিয়েমাইম নাট্যগোষ্ঠীর স্মারকগ্রন্থ ১৯৭৬

২১. সুরজিৎ ঘোষ, ‘স্মৃতি : সুখ-দুঃখ মিলিয়ে’, দেবেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *কেয়া,* পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১১৪

২২. কবিতা সিংহ, ‘সঙ্গী’, তদেব, পৃ. ১২৩

২৩. কবিতা সিংহ, ‘সঙ্গী’, দেবেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ১২২

২৪. অচিন্ত্য দত্ত-র ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, পূর্বে উল্লিখিত

২৫. রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ‘নাট্যকারের সন্ধানে একটি চরিত্র’, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০.১১.২০০৮

২৬. প্রকাশ ভট্টাচার্য, ‘মায়ের অপারেশন এবং দুটো শো’, মধুময় পাল (সম্পা.), পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৫৪

২৭. অরুণ চট্টোপাধ্যায়, ‘নান্দীকারের কেয়া’, দেবেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *কেয়া,* পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৫৫

২৮. অসীম সামন্ত, ‘লেনেবালা, দেনেবালা’, *কোনও এক নাট্যকর্মী অসীম চক্রবর্তী সম্পর্কে দু’-একটি কথা,* পরম্পরা, সেপ্টেম্বর ২০১২, কলকাতা, পৃ. ৫৫-৫৬

২৯. সৌমিত্র মিত্র-র ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক-গবেষক, কলকাতা, ২০.০৪.২০১৫ সৌমিত্র মিত্র বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, আবৃত্তিকার, কেয়া চক্রবর্তীর ছাত্র, ঘনিষ্ঠ জন।

৩০. কেয়া চক্রবর্তী, 'মিসেস আর পি সেনগুপ্ত', পুনর্মুদ্রণ মধুময় পাল (সম্পা.), পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১২৯, প্রথম প্রকাশ দুর্বা পত্রিকা, নীলা কর (সম্পা.), নারীবর্ষ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭৫

৩১. Sohini Sengupta, 'My Mom & Me', by Sarbani Sen, *India Today*, Kolkata, March 2009.

৩২. পৌলমী বসু ও অচিন্ত্য দত্ত, 'মুখোমুখি : স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত', সুনীল সাহা (সম্পা.), *প্রাচ্য* নাট্যবিষয়ক ষান্মাসিক সংকলন, জুলাই ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ১১৩-১১৪

৩৩. তদেব, পৃ. ১১৪

৩৪. রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর সাক্ষাৎকার, গ্রাহক ব্রাত্য বসু, 'আমার জীবন ফেরত পেলে— থিয়েটারটাই করব', *যে কথা বলোনি আগে এ বছর সেই কথা বলো*, কালিন্দী ব্রাত্যজন, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ৭২

৩৫. Swatilekha Chatterjee, 'upstaging the cinema', Lime Light, *The Telegraph*, Kolkata, 25.09.83

৩৬. রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, 'খড়ির গণ্ডি', কৌশিক রায়চৌধুরী (সম্পা.), *নাটক সমগ্র* ২ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১০, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৫, পৃ. ২৮০

৩৭. শোভন পাঠক, চিত্রমঞ্চের এ-কোণ ও-কোণ 'অন্তনীতির গোড়া ধরে' (নান্দীকার), *বেতার জগৎ*, ১৬-৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৮

৩৮. দেবাশিস দাশগুপ্ত, 'শিল্প সংস্কৃতি নাটক', গৌরকিশোর ঘোষ (সম্পা.), দেশ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, কলকাতা

৩৯. Calcutta Note book, *The Statesman*, Calcutta, Sept 4, 1978

৪০. Swatilekha Chatterjee, 'Upstaging the Cinema', Lime Light, *The Telegraph*, 25.09.83, Kolkata

৪১. 'ব্যতিক্রম' নাটকের আলোচনা, শিল্প সংস্কৃতি, *দেশ*, ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, কলকাতা

৪২. শুভ বসু, 'বিদেশী নাটকের ঋণ ছাড়িয়ে', *প্রতিক্ষণ*, ০২.১২.১৯৮৩, কলকাতা

৪৩. Donald Mac Kechnie, 'A remarkable Play', *The Statesman*, April, 17, 1991.

৪৪. পিনাকী ঘোষ, 'গলায় মধুসূদনের ভাষা, শরীরে নিজের', *স্যাস নাট্যপত্র*, সংকলন ১৩, ১৯৯৬

৪৫. মনসিজ মজুমদার, 'অসাধারণ সুসংবদ্ধ প্রযোজনা', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭

৪৬. Ananda Lal, *The Business Telegraph,* Calcutta, 05.09.1997

৪৭. রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার, গ্রাহক : ব্রাত্য বসু, 'আমার জীবন ফেরত পেলে—থিয়েটারটাই করব,... পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭১

৪৮. স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর সাক্ষাৎকার, 'নাটকে পোশাক', সোনারপুর কৃষ্টিসংসদ, *কৃষ্টি পত্রিকা*, ১৯৮৬, পৃ. ৯

৪৯. তদেব, পৃ. ১০

৫০. তদেব, পৃ. ১০

৫১. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২০ জুলাই, ১৯৭৭

৫২. 'রঙরূপ' নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়পত্রীর নির্দেশকের কলম

৫৩. সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাবাশ স্বাতীলেখা সঙ্গে সোহিনীও, *সংবাদ প্রতিদিন*, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩

৫৪. 'রঙরূপ' নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়পত্রীর Director's Note.

৫৫. মনসিজ মজুমদার, 'সোহিনীর সত্যবতী টেনে রাখে', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৭ মে ২০০৩

৫৬. Sarbani Sen, An interview with Swatilekha Sengupta and Sohini Sengupta. 'My Mom & Me', India Today, March 2006.

## পঞ্চম অধ্যায়

# নির্দেশনার নতুন ভাষ্য

### (শাঁওলী মিত্র, ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়, সোহাগ সেন)

বিংশ শতকের আশির দশকে শাঁওলী মিত্র, ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ও সোহাগ সেন বাংলা রঙ্গমঞ্চে নাট্যনির্দেশনার বিবর্তনে যে অভিঘাত তৈরি করলেন তা প্রচলিত নাট্য ভাবনার বাইরে নতুন এক পথের দিশা দিল। কোথায় তাঁদের অভিনবত্ব? তাঁদের নির্দেশিত নাটকগুলির বিষয়ভাবনা, উপস্থাপন-রীতি, নাট্য নির্দেশনার পদ্ধতি পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে এই কারণ বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। এঁরা তিনজনে প্রায় কাছাকাছি সময়ে কাজ করেছেন, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান রেখেও স্বতন্ত্র থেকেছেন। শুধুমাত্র তিন নির্দেশকের পারস্পরিক বৃত্তের ফারাকে নয়, সমগ্র বাংলার নাট্যভাবনার প্রেক্ষিতেও। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সত্তরের দশকে নির্মিত তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনার মুখ্য অভিমুখ ছিল দলের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে নাট্য প্রযোজনার চাহিদা পূরণ। কিন্তু পরবর্তী দশকে এই তিন তরুণ নির্দেশকের ওপর কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাট্য প্রযোজনার ভার বহনের দায় ছিল না, ছিল বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে নিজেদের নাট্যচর্চার আলোতে নিজস্ব বোধকে, মননজাত বক্তব্যকে নাট্যের মাধ্যমে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা।

''থিয়েটর' এমন একটা পাটাতন, যে পাটাতন থেকে আমি আমার সময়ের মানুষজনের কাছে আমার নিজের ভাবনার কথা, নিজের উপলব্ধির কথা-বলতে পারি। 'মানুষ' নামক যে জটিল জীবটি আমাকে এবং আমার সমসময়কে ক্যালইডস্কোপিক বিচ্ছুরণ দিয়ে আবিষ্ট করে, উত্তেজিত করে, মনের মধ্যে রাশি রাশি প্রশ্নবান হেনে আমাকে ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে বাধ্য করে— সেই জটিল জীবটির সঙ্গে সম্পৃক্ত আমার সমস্ত ভাবনারই অংশীদার করতে চাই চারপাশের সবাইকে! লেন-দেন করতে চাই ভাবনার আবেগের। সেই লেন-দেনের মাধ্যমটি আমার কাছে থিয়েটর---- হ্যাঁ, হয়ত অভিনয়-সম্পর্কিত দুরন্ত এক আকর্ষণ থেকেই এর জন্ম। কিন্তু বাল্যে বা কৈশোরের সময় থেকেই যে-সব নাট্য আমার মনে তোলপাড় তুলেছে— তাতে সেই আকর্ষণটা— হয়তো বলতে পারা যায় একটা 'মিশন'-এ পরিণত হয়েছিল।''[১] শাঁওলী মিত্র মনে করেন, যে শিল্পমাধ্যমে তিনি জীবনের জটিলতা, নিজের সম্পর্ক, নিজের বোঝাপড়া প্রকাশ করতে পারেন সেই শিল্প মাধ্যমটাই তাঁর।

এই তিন নাট্যপরিচালকের নাট্য নির্দেশনার ক্ষেত্রটি বিচার বিশ্লেষণের জন্য কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনাবস্তুকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে---- জীবনকথা, নির্দেশিত নাটকের বিষয়বস্তু, নাট্যনির্দেশনার পদ্ধতি, মঞ্চভাবনা, অভিনয়রীতি ও অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন, নির্দেশকের নাট্যদর্শন, সমাজমনস্কতা ইত্যাদি।

## শাঁওলী মিত্র (১৯৪৮)

ভারতীয় নাট্যকলার দুই কিংবদন্তি শিল্পী শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের পরবর্তী প্রজন্ম শাঁওলী মিত্র, তাঁদের একমাত্র সন্তান। ‘বহুরূপী’ নাট্যসংস্থা এই দুই নাট্যশিল্পীর স্বপ্ন প্রতিষ্ঠান— এই প্রতিষ্ঠানের জন্মবর্ষেই ১৯৪৮-এ শাঁওলী মিত্রের জন্ম। প্রথম অভিনয়ের স্মৃতি তাঁর অস্পষ্ট, কারণ তখন তাঁর বয়স খুবই কম। ‘বহুরূপী’ প্রযোজিত তুলসী লাহিড়ীর লেখা ‘ছেঁড়াতার’ নাটকে তালির গাজন দৃশ্যে একবার তো শাড়িই খুলে গিয়েছিল ছোট্ট অভিনেত্রীর। প্রথম সংলাপ বলেন চার বছর বয়সে ‘দশচক্র’ নাটকে। এক প্রতিবেশীর ছোট বাচ্চার ভূমিকায় সে খেলতে আসে ডাঃ গুহের বাড়িতে— একটিই সংলাপ ছিল একেবারে শেষ দৃশ্যে— ‘মাসিমা, মা আমাকে অরুণ বরুণের সঙ্গে খেলা করতে মানা করে দিয়েছে।’ এর পর ‘ছেঁড়াতার’ নাটকে ‘বসির’-এর ভূমিকায় অভিনয়ের পর ‘ডাকঘর’-এ অমলের ভূমিকায় শিশুশিল্পী হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা। শৈশব পর্ব অতিক্রম করে পরবর্তী জীবনে বহুরূপী প্রযোজিত একাধিক নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন শাঁওলী মিত্র।

### বহুরূপী-তে শাঁওলী মিত্র অভিনীত নাটক (১৯৬৯-১৯৭৯)

| নাটক | প্রথম অভিনয় | চরিত্র | নাট্যকার | নির্দেশক |
|---|---|---|---|---|
| ১. ত্রিংশ শতাব্দী | ১৯৬৯ | মিসেস ইথারলি | বাদল সরকার | হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় |
| ২. কিংবদন্তী | ১৯৭০ | সুলভা | কুমার রায় | তৃপ্তি মিত্র |
| ৩. পাগলা ঘোড়া | ১৯৭১ | মেয়েটা | বাদল সরকার | শম্ভু মিত্র |
| ৪. টেরোড্যাকটিল | ১৯৭২ | মীনা | ইন্দ্র উপাধ্যায় | তৃপ্তি মিত্র |
| ৫. গণ্ডার | ১৯৭২ | দেইজি | ইউজিন ইওনেস্কো (অনু. শাঁওলী মিত্র) | তৃপ্তি মিত্র |
| ৬. ঘরে-বাইরে | ১৯৭৪ | বিমলা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (নাট্যরূপ : তৃপ্তি মিত্র) | ঐ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭. | যদি আর একবার | ১৯৭৬ | বনলতা রায় | বাদল সরকার | ঐ |
| ৮. | গীতরত্ন | ১৯৭৬ | শ্রীমতী | চিত্তরঞ্জন ঘোষ | কুমার রায় |
| ৯. | পাখি | ১৯৭৭ | শ্যামা | মনোজ মিত্র | তৃপ্তি মিত্র |
| ১০. | ওরা | ১৯৭৮ | ---- | আলবের কাম্যু | শঙ্করপ্রসাদ ঘোষ (অনুবাদ) |

১৯৬৯-১৯৭৯ এই দশ বছরে 'বহুরূপী' প্রযোজিত শাঁওলী মিত্র অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত নাটকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি মোট ৬টি; শম্ভু মিত্র, কুমার রায়, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্করপ্রসাদ ঘোষের নির্দেশনায় একটি করে নাটকে অভিনয় করেছেন শাঁওলী মিত্র। এই একটি পর্বে বিদেশি নাটকের অনুবাদ করেন তিনি।

ছোটবেলা থেকেই শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকার কারণে তিনি ও তাঁর পরিবার বুঝতে পেরেছিলেন যে থিয়েটার ও অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা একসঙ্গে চালানো সম্ভব নয়। তাই স্কুল ফাইনালের পর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক নিয়ে পড়া শুরু করলেন। এম.এ. পাশ করার পর পরবর্তী সময়ে ফোর্ড ফাউন্ডেশন-এর স্কলারশিপ নিয়ে বর্ণনাত্মক থিয়েটার সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। এর জন্য তাঁকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান করতে হয়েছে। HRD (Human Resource Development)-এর ফেলোশিপ নিয়ে তিনি সম্পূর্ণ করেন তাঁর গবেষণা কর্ম— যার বিষয় ছিল শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রকে কেন্দ্রে রেখে বাংলা থিয়েটারে রাজনৈতিক বিষয়ের নব তরঙ্গ বা নব দিগন্তের উদ্ভাবন— (Political content in New Wave Bengali Theatre focussing on Sombhu Mitra and Tripti Mitra)।

'বহুরূপী'তে এই নাটকগুলির অভিনয়সূত্রে নাট্য সম্পর্কিত অনেক কাজ হাতে-কলমে শেখার একটা পথ তৈরি হয়েছিল শাঁওলী মিত্রের। তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় যখন 'কিংবদন্তী' নাটকে সুলভার চরিত্রে অভিনয় করলেন তখন মায়ের কাছ থেকে শিখলেন কীভাবে কণ্ঠস্বরকে ব্যবহার করতে হয়। চিৎকার করাটাও যে একটা টেকনিক তা ওই সময় তিনি আয়ত্ত করলেন। এ ছাড়াও হাঁটা, চলা, দাঁড়ানো, নানান মুভমেন্ট, কেমন করে দাঁড়ালে মেয়েদের দেখতে ভালো লাগে ইত্যাদি বিষয়গুলি রপ্ত করতে লাগলেন। অভিনয় শিক্ষা, নাট্য নির্দেশকের প্রাথমিক ভিত্তি। সেই ভিত্তি প্রস্তরের সূচনা এই পর্বে। শম্ভু মিত্রের অভিনয় শিক্ষার ধরন ছিল তিনি নিজে উঠে দাঁড়িয়ে ভঙ্গিগুলো দেখিয়ে দিতেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে মহলা দেওয়ার রীতি তিনিই প্রচলন করেছিলেন যা সকলে মেনে নিয়েছিলেন।

শম্ভু মিত্র যতক্ষণ না অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছ থেকে প্রার্থিত বিষয়টি পাচ্ছেন ততক্ষণ তিনি মহলা চালিয়ে যেতেন। নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে বেঁধে নয়— দীর্ঘ সময় ধরে অভিনয় শিক্ষণের পদ্ধতি তৈরি করতে পেরেছিল বহুরূপী। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শাঁওলী মিত্র তৈরি হচ্ছিলেন এবং নিজেকে অভিনেত্রী হিসেবে প্রস্তুত করছিলেন।

বহুরূপীতে শাঁওলী মিত্র অভিনীত কয়েকটি চরিত্রের প্রসঙ্গ এ ক্ষেত্রে আলোচনা করা যেতে পারে। শম্ভু মিত্র নির্দেশিত 'পাগলা ঘোড়া' নাটকে শাঁওলী মিত্রের frenzy-র মতো চলে যাওয়াটা শম্ভু মিত্রের পছন্দ হচ্ছিল না। হঠাৎই একদিন শাঁওলী মিত্র স্টেজে খোলা চুলে পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে বলে ঘুরতে শুরু করলে— এই ভাবেই একটা মুহূর্ত তৈরি হয়ে গেল। বহুরূপীর নাট্যোৎসবে শম্ভু মিত্রর একান্ত ইচ্ছাতেই শাঁওলী মিত্র অভিনয় করেছিলেন সুরঙ্গমার চরিত্রে রাজা নাটকে। শাঁওলী মিত্রের সুরঙ্গমার চরিত্রায়ণ শম্ভু মিত্র খুবই পছন্দ করতেন এবং বলে দিতেন কীভাবে করতে হবে। শুধু নিজের নির্দেশিত নাটকগুলি সম্পর্কে নয়, তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত 'ঘরে-বাইরে' নাটকের অভিনয়ে তৃপ্তি মিত্র না থাকলে মহলায় শম্ভু মিত্র নির্দেশ দিতেন শাঁওলী মিত্রকে। এই সব চরিত্রে অভিনয় করতে করতে বিশেষ করে 'সুরঙ্গমা'র চরিত্রে অভিনয় করতে করতে তাঁর মধ্যে এক বোধের জন্ম হয়। একজন ব্যক্তিমানুষের চেয়ে অভিনীত চরিত্রটির উচ্চতার কারণে, ওই চরিত্রটি ছোঁয়ার তাগিদে সাধারণ ব্যক্তিমানুষ প্রতিনিয়ত নিজেকে উন্নত করে। 'গীতরত্ন'—কুমার রায় নির্দেশিত নিধুবাবুর জীবনকেন্দ্রিক নাটকটির শ্রীমতী চরিত্রের জন্য শাঁওলী মিত্রকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন শম্ভু মিত্র। বাবার নির্দেশনায় খুবই অল্প কাজ করার সুযোগ ঘটেছিল শাঁওলী মিত্রের। কিন্তু এই সময়কালে তৃপ্তি মিত্র ও শম্ভু মিত্রের নির্দেশনা সংক্রান্ত কাজে সাহায্যের সময়, চরিত্রগঠনে বোধের উন্মেষ তাঁরাই জাগিয়ে দিয়েছিলেন শাঁওলী মিত্রের মধ্যে। ১৯৭৬ সালে 'ডাকঘর' যখন তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনায় প্রস্তুত হচ্ছিল পুনরায়, তখন শাঁওলী মিত্র তাঁকে নির্দেশনার কাজে সাহায্য করেন। বলা যেতে পারে নির্দেশনার প্রথম পাঠ শুরু হয় এইখান থেকেই। ১৯৭৯ সালে নানাবিধ কারণে 'বহুরূপী'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে থিয়েটারের কাজকর্মের সঙ্গে সাময়িকভাবে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। দীর্ঘদিন প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল বাচিক শিল্পের নানান আঙ্গিক নিয়ে। প্রচুর অনুষ্ঠান করেছেন আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটকের। এই সময়ে বেতার নাটকে শাঁওলী মিত্র হয়ে ওঠেন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী।

বহুরূপীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরের বছরেই ১৯৮০ সালে ক্যালকাটা রেপার্টরি থিয়েটারের

ব্যানারে ‘গালিলেওর জীবন’ প্রযোজিত হয়। আশির দশকের গোড়ায় ক্যালকাটা রেপার্টরি থিয়েটারের প্রযোজনায় জার্মান পরিচালক ফ্রিৎস বেনেভিৎজ-এর নির্দেশনায় কলকাতায় ব্রেখ্‌টের ‘লাইফ অফ গালিলেও গালিলেই’-এর বাংলা অনুবাদ মঞ্চস্থ হয়। গালিলেও-র ভূমিকায় অভিনয় করেন শম্ভু মিত্র। গালিলেও-র মেয়ে ভার্জিনিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য শাঁওলী মিত্রকে নির্বাচন করা হয়। সদ্য জণ্ডিস থেকে উঠলেও এই চরিত্রে অভিনয়ের ব্যাপারে শাঁওলী মিত্র একটুও দ্বিধা করেননি। তার কারণ ফ্রিৎস বেনেভিৎজ-এর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং শম্ভু মিত্র কেমন করে কোনও বড় চরিত্রে অভিনয় করার প্রস্তুতি নেন তা দেখার অদম্য আগ্রহ। বহুরূপীতে যখন শম্ভু মিত্র বড় বড় চরিত্রের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তখন শাঁওলী মিত্র বয়সে ছোট। একটি চরিত্রে কীভাবে দিনের পর দিন নিখুঁত পরিশ্রম আর চর্চায় রূপ নেয় তা অনুভব করার বয়স তাঁর ছিল না— আর যখন তিনি বড় হলেন শম্ভু মিত্র তখন দু’একটি প্রযোজনা ছাড়া নতুন কোনও কাজে হাত দিলেন না— পুরোনো প্রযোজনাগুলিতেই অভিনয় করতেন। বাবার সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগও তাঁর বিশেষ ঘটেনি। এই সমস্ত কারণে শাঁওলী মিত্র ভার্জিনিয়া চরিত্রে অভিনয় করলেন এবং এই সময়কাল নির্দেশনা ও অভিনয় সংক্রান্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হয়ে রইল। শাঁওলী মিত্রের নির্দেশনা সংক্রান্ত কাজে — শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র ও ফ্রিৎস বেনেভিৎজ-এই তিন ব্যক্তিত্বের সরাসরি প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১৯৭৯ সালে ‘বহুরূপী’ নাট্যসংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া এবং ১৯৮০তে গালিলেও-এর অভিনয় করার পর শাঁওলী মিত্র নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন বাচিক শিল্পের বিভিন্ন ধরনের কাজে। আবৃত্তির অনুষ্ঠান করতেন পেশাদারি শিল্পী হিসেবে। শ্রুতিনাটক নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন; আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, নাটকে অভিনয়, স্ক্রিপ্ট লেখা ইত্যাদি কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর নাট্যভাবনা চিন্তার জগৎকে সচল রেখেছিল। ১৯৭৫ সালে শারীরিক অসুস্থতা কিছুটা কাটলে বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৭৭ সালে বহুরূপীর বিশিষ্ট অভিনেতা কর্মী-সদস্য কালীপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এই সময় তাঁর বারবার মনে হত যে তিনি শুধু কণ্ঠস্বর নিয়ে কাজ করছেন অথচ ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর চোখ, হাত, পা, সমস্ত শরীরটাকে অভিনয়ের কাজে লাগাতে পারেন। অর্থাৎ ভেতরে ভেতরে অভিনয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে তাড়িত করছিল। এই রকম মানসিক অস্থিরতার সময়ে শম্ভু মিত্র তাঁকে ইরাবতী কার্ভের লেখা ‘যুগান্ত’ বইটি পড়তে দেন। এই বইটি শাঁওলী মিত্রের নির্দেশনার জগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে অজান্তেই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এই বইটি পড়ার পর প্রযোজনা সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন। কিন্তু

'যুগান্ত' বইটি পড়বার পর শাঁওলী মিত্রকে দ্রৌপদীর চরিত্রটিই সব থেকে বেশি আলোড়িত করে এবং এই দ্রৌপদী চরিত্রটি অবলম্বনে রচনা করেন তাঁর প্রথম নাটক 'নাথবতী অনাথবৎ' (১৯৮৩)। এ নাটকে কথকতার ভঙ্গিতে একক অভিনয়ের প্রথম পদক্ষেপ নাট্যসমাজে অভিনব প্রয়াসের দৃষ্টান্ত শুধু তৈরি করল তা নয়, জনপ্রিয়তা ও সাফল্য শাঁওলী মিত্রকে আনল আবারও নাট্যের বৃত্তে। তাঁর উৎসাহে উদ্যোগে শম্ভু মিত্রের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হল 'পঞ্চম বৈদিক' নাট্যদল এবং 'চর্যাশ্রম' নাট্যশিক্ষা কেন্দ্র। ১৯৮৩ সালের ১১ আগস্ট প্রথম 'নাথবতী অনাথবৎ' মঞ্চস্থ হয় শিশির মঞ্চে 'সারথি' আবৃত্তি সংস্থার উদ্যোগে। কিন্তু এ নাটকের অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণে নিজেদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তৈরি হয় তারই কারণে কিছুদিনের মধ্যেই নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হয় শাঁওলী মিত্রকে। দ্বন্দ্ব বা অন্তর্গত নানাবিধ সমস্যার কারণে দুটো অভিনয় করা হয়েছিল 'শাঁওলী মিত্রের Show' বলে। ১৯৮৩-র সেপ্টেম্বরের শেষে জন্ম নেয় 'পঞ্চম বৈদিক'। দলের নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং শম্ভু মিত্র। পঞ্চম বৈদিক'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, শঙ্কর মিত্র, দুর্গা মিত্র, শাঁওলী মিত্র, নিমাই বসু এবং সুব্রত পাল। সভাপতি শাঁওলী মিত্র এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন নিমাই বোস। ১৯৮৩ থেকে শাঁওলী মিত্র একটির পর একটি প্রযোজনা করে গেছেন সময়ের ব্যবধানে। কিন্তু ১৯৯৮ সাল নাগাদ গ্রুপ থিয়েটারের মানুষজনদের আচার-আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে শাঁওলী মিত্র কলকাতার কেন্দ্রীয় মঞ্চগুলি ছেড়ে সরে যান। টালিগঞ্জের শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিউট অফ কালচারে গড়ে তোলেন অন্তরঙ্গ নাট্যমঞ্চ। আবার সেখান থেকেও ২০০৪-এ সরে আসেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে। এর পর তাঁরা নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনের প্রেক্ষাগৃহে। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের জন্য যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন শম্ভু মিত্র ও তাঁর সমকালের শিল্পীরা, সেই অসমাপ্ত সংগ্রাম প্রবাহিত করতে পারেননি তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম। শাঁওলী মিত্র শুধু নন, বাদবাকি নাট্যদলগুলির কাছে যা চিরস্থায়ী সমস্যা হয়েই থাকল। বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনের পর 'তৃতীয় সূত্র'-এর সঙ্গে যৌথভাবে 'পঞ্চম বৈদিক' অভিনয় ক্রিয়া চালিয়ে গেছে 'উত্তম মঞ্চ' ভাড়া নিয়ে। কিন্তু আর্থিক সমস্যা ও আনুষঙ্গিক জটিলতার কারণে উত্তম মঞ্চের এই অভিনয় উদ্যোগ বন্ধ করে দিতে হয়। আবার শাঁওলী মিত্র ও 'পঞ্চম বৈদিক' ফিরে আসে মূল মঞ্চগুলিতে তাঁদের প্রযোজনাগুলি নিয়ে।

শাঁওলি মিত্র 'পঞ্চম বৈদিক' প্রযোজিত যে নাটকগুলিতে অভিনয় করেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে 'নাথবতী অনাথবৎ' (১৯৮৩), 'রাজা' (১৯৮৭), 'কথা অমৃতসমান' (১৯৯০), 'নাথবতী অনাথবৎ' (হিন্দিতে,১৯৯১), 'বিতত বিতংস' (১৯৯৬), 'পুতুল খেলা' (২০০২), 'চণ্ডালী' (২০০৫)।

২০০৫-এর পর আর কোনও নতুন প্রযোজনার নির্দেশনা দেননি শাঁওলী মিত্র। এই দায়িত্ব অর্পণ করেন উত্তরসূরি অর্পিতা ঘোষের ওপর এবং তাঁর নির্দেশিত 'পশুখামার'-এ তাঁর মঞ্চাভিনয় প্রত্যক্ষ করে দর্শক।

## পঞ্চম বৈদিক প্রযোজিত নাটকে শাঁওলী মিত্র অভিনীত চরিত্র

| | নাটক | অভিনয়কাল | নির্দেশক | অভিনীত চরিত্র | নাটককার |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | নাথবতী অনাথবৎ | ১৯৮৩ | শাঁওলী মিত্র | দ্রৌপদী | শাঁওলী মিত্র |
| ২. | রাজা | ১৯৮৭ | ,, | সুদর্শনা | শাঁওলী মিত্র |
| ৩. | কথা অমৃতসমান | ১৯৯০ | ,, | মহাভারতের বিভিন্ন নারীচরিত্র | শাঁওলী মিত্র |
| ৪. | নাথবতী অনাথবৎ (হিন্দিতে) | ১৯৯১ | ,, | দ্রৌপদী | ,, |
| ৫. | বিতত বিতংস | ১৯৯৬ | ,, | তিস্তা | সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায় |
| ৬. | পুতুল খেলা | ২০০২ | ,, | বুলু | হেনরিক ইবসেন রূপান্তর: শম্ভু মিত্র |
| ৭. | চণ্ডালী | ২০০৫ | ,, | প্রকৃতির মা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ('চণ্ডালিকা' গদ্য নাটক অবলম্বনে) |
| ৮. | পশুখামার | ২০০৬ | অর্পিতা ঘোষ | --- | জর্জ অরওয়েল অনুবাদ : অর্পিতা ঘোষ |

## ১৯৮৩-২০০৫ কালপর্বে শাঁওলী মিত্র নির্দেশিত নাটক

| | নাটক | নাটককার | অভিনয়কাল | প্রযোজনা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | নাথবতী অনাথবৎ | শাঁওলী মিত্র | ১৯৮৩ | পঞ্চম বৈদিক |
| ২. | রাজা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৯৮৭ | ,, |
| ৩. | কথা অমৃতসমান | শাঁওলী মিত্র | ১৯৯০ | ,, |
| ৪. | নাথবতী অনাথবৎ | শাঁওলী মিত্র | ১৯৯১ | ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (হিন্দিতে) | | | |
| ৫. | বিতত বিতংস | সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায় | ১৯৯৬ | ,, |
| ৬. | সুজন ব্রতীর সীমান্ত | ,, | ২০০০ | |
| ৭. | পুতুল খেলা | হেনরিক ইবসেন<br>রূপান্তর : শম্ভু মিত্র | ২০০২ | ,, |
| ৮. | রাজনৈতিক হত্যা | জাঁ পল সার্ত্রে | ২০০৪ | ,, |
| ৯. | চণ্ডালী | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর<br>('চণ্ডালিকা' গদ্যনাটক অবলম্বনে) | ২০০৫ | ,, |

পঞ্চম বৈদিক-এ শাঁওলী মিত্র নির্দেশিত মোট নাটকের সংখ্যা ৯। তার মধ্যে ১৯৮৩-২০০৩ কালপর্বে মোট ৫টি; এই তালিকার প্রেক্ষিতে শাঁওলী মিত্র নির্দেশিত নাটকগুলির পর্যালোচনা করা হল।

**নাথবতী অনাথবৎ :** শাঁওলী মিত্র নির্দেশিত প্রথম নাটক 'নাথবতী অনাথবৎ'-১৯৮৩-র প্রযোজনা। নাটক থেকে নাট্য হয়ে ওঠা যেমন এক প্রক্রিয়া তেমনই মূল বিষয়বস্তু থেকে নাটক হয়ে ওঠাও এক পরিভ্রমণ। নাট্যকার যিনি, তিনি তাঁর লেখ্যবস্তুর মধ্যেই বুনতে বুনতে যান নাট্যের অবয়ব। এই নাটকটির ক্ষেত্রে নাট্যকার এবং নাট্যনির্দেশক যেহেতু একই ব্যক্তি, ফলত লিখতে লিখতেই তাঁর মধ্যে নির্দেশনার কাজগুলো ক্রিয়া করতে থাকে। শাঁওলী মিত্রের ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটা স্বাভাবিক। উপরন্তু তিনি একজন অভিনেত্রীও। নাটকের পুরো বিষয়টি তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'নাথবতী অনাথবৎ'-এর কাহিনি মহাভারতকেন্দ্রিক। মহাভারত থেকে এমনই একটি চরিত্র নির্বাচন করলেন নাট্যকার, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর নিজস্ব ভাবনা চিন্তাও দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। এক নারীর চোখ দিয়ে দ্রৌপদীর অপমান অবমাননা-লাঞ্ছনা-যন্ত্রণার ছবিই তুলে ধরতে চেয়েছেন নাট্যকার। মহাভারত ব্যাখ্যাত হয়েছে এ যুগের আধুনিক শিক্ষিত এক নারীর চোখ দিয়ে। মহাভারতকেন্দ্রিক কাহিনি ১৯৮৩ সালেও যে কতখানি প্রাসঙ্গিক তারই বিশ্লেষণের আলোতে নাটকীয় বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করে নাটকটি বেঁধেছিলেন নাট্যকার। উপস্থাপনার ভঙ্গিটিও ছিল অভিনব। কথকতার আঙ্গিকে সমকালের প্রেক্ষিতে দ্রৌপদীর যন্ত্রণা ও পীড়নের প্রসঙ্গ দর্শককে আলোড়িত করেছিল। এ নাটকের একমাত্র চরিত্র কথক ঠাকুরন— তাঁর মুখে বর্ণিত পুরো কাহিনি। কাহিনি শুরু হয়— অপরূপা ধীমতী, সহ্যশীলা রাণী দ্রৌপদীর রূপের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। দ্রৌপদী নাথবতী হয়েও পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী হয়েও ছিলেন অভাগিনী অসহায় অনাথের মতো। তিনি ছিলেন অতি রূপবতী।

তার যোগ্য পাত্রের জন্য দ্রুপদ রাজা এক স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন। কঠিন এক লক্ষ্যভেদের পরীক্ষা। যখন রাজা ও রাজকুমারেরা এই কঠিন লক্ষ্যভেদের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন, তখন এক সাধারণবেশী ব্রাহ্মণ সফল হলেন এই লক্ষ্যভেদ করতে। তিনি ছদ্মবেশী অর্জুন। কিন্তু ভাগ্যের গতিচক্রে দ্রৌপদীকে বরণ করতে হল শুধু অর্জুনকে নয়, পঞ্চস্বামীকে। দ্রৌপদী তা সত্ত্বেও সুখী হতে চেয়েছিল কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকল না। কৌরবদের রাজসভায় তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হল। তার স্বামীদের বনবাস, অজ্ঞাতবাসের সময় দ্রৌপদী সঙ্গে থেকেছে সর্বদা। এমনকী জয়দ্রথ তাকে পাণ্ডবদের কাছ থেকে হরণ করতে চেয়েছে। কীচক তার নারীত্বকে অপমান করেছে— এই সমস্ত অপমান ও অসম্মানের বিরুদ্ধে, সমস্ত লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের প্রতিবাদে দ্রৌপদী চেয়েছেন একটা ধর্মযুদ্ধ হোক। যুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু তা ধর্মযুদ্ধ হয়নি। দ্রৌপদী বুঝতে পেরেছিল সমস্ত যুদ্ধেরই একটা নিজস্ব ক্রুর গতিপথ থাকে। কোন যুদ্ধই ধর্মযুদ্ধ হতে পারে না। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী থাকা সত্ত্বেও সারাজীবন সে যন্ত্রণা আর কষ্ট সহ্য করেছে একজন অনাথের মতো। তাই মহাভারত তাকে বর্ণনা করেছে নাথবতী অনাথবৎরূপে। স্বামী থেকেও সে অনাথ। অবশেষে মহাপ্রস্থানের পথে সে তার পঞ্চস্বামীর সঙ্গে যাত্রা করেছে। পথে তার পিছিয়ে পড়া বা কষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভীম যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছেন যে, দ্রৌপদীর এই কষ্টের কারণ দ্রৌপদী সবচেয়ে ভালবেসেছিল অর্জুনকে। আর অবসন্ন, ক্লান্ত, যন্ত্রণা আর দুঃখের তাপে দগ্ধ দ্রৌপদী এই মহাপ্রস্থানের পথেই আবিষ্কার করেছিল ভীমকে, ভীমের অকৃত্রিম হৃদয়নিঃসৃত ভালবাসার ঐশ্বর্যকে। 'নাথবতী অনাথবৎ' রচিত হয়েছিল ১৯৮৩ সালের জানুয়ারির গোড়ার দিকে আর নাটক মঞ্চস্থ হয় সেই বছরেই আগস্ট মাসে। একটানা ২০০৯ পর্যন্ত এ নাটকের মঞ্চায়ন হয়েছিল। এর পর মঞ্চে অভিনয় না হলেও পাঠ-অভিনয় দর্শককুলের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করে। এই পাঠ অভিনয় সম্পর্কে শ্রোতা দর্শকের চাহিদা যে কতখানি তা পরবর্তী সময়ে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ প্রমাণ করে দেয়। এই মহাভারতের কাহিনির মূল অবলম্বন ইরাবতী কার্ভের 'যুগান্ত' বইটি হলেও এ নাট্যের কাঠামো গঠনে শাঁওলী মিত্র সাহায্য নিয়েছেন কাশীরাম দাস, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, গোরক্ষপুরী প্রকাশনার মহাভারতকার, কবি বুদ্ধদেব বসু, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ পূর্বসূরিদের। এ নাটকের কথক ঠাকরুন মহাভারতের বিবিধ সংস্করণ থেকে বেছে নিয়েছেন দ্রৌপদীর আখ্যানটুকুই। দ্রৌপদীর চোখ দিয়ে দেখেছেন মহাভারতের সমকালকে। শুধু সেই কাল বা সেই যুগ নয়, প্রতিতুলনায় চলে আসে সমকালও। দ্রৌপদীর কথার মধ্য দিয়ে দ্রৌপদীর জীবন-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে একটা যুগের কথা— একটা যুগের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন নাট্যকার। কথকতা— এই লোকজ রীতিকে অবলম্বন করে

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মহাভারতের সময়কে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সমকালের সঙ্গে তার সংযোগ অন্বেষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন নাট্যকার। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভা ও অর্জুনের দ্রৌপদীকে গ্রহণ এবং কুন্তীর নির্দেশে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীকে বরণ করে নেওয়া ইত্যাদি ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে মূল নাটকের দ্বন্দ্বে প্রবেশ করেছেন নাট্যকার। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার কুন্তীর বয়ানে জানিয়েছেন যে সংসারে প্রধানত লড়াই বাঁধে সম্পদ আর নারীকে নিয়ে। তাঁর পুত্রেরা যদি এই নারীকে নিয়ে বিবাদ বাধায় তা হলে হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার হবে কী করে— আবার দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়, দ্বিধাগ্রস্ত হন। যুধিষ্ঠিরও একই আশঙ্কায় মায়ের মতকে গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত হয়ে যায় দ্রৌপদীর অধিকার তার পঞ্চস্বামীর ওপরে। নাট্যকার এই বিষয়টিকে অত্যন্ত ব্যঙ্গচ্ছলেই বিস্ময়সূচক ব্যাখ্যা করেন— 'সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। আচ্ছা, দ্রৌপদীকে কিন্তু এরা কেউ জিজ্ঞাসাই করলে না!'[২] দ্রৌপদীকে মেনে নিতে হল এই সিদ্ধান্ত। তিনি কী চেয়েছিলেন কী চাননি তার কোনও খবর রাখল না কেউ। নাট্যকার দ্রৌপদীর ভাগ্যচক্রে এর পরই নিয়ে এলেন সেই ভয়ঙ্কর পাশাখেলার প্রসঙ্গ। ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাসাদে দুর্যোধনের দুর্বিপাক ও হাস্যাস্পদ হওয়ার ঘটনা কীভাবে পাণ্ডবদের চরম সর্বনাশের পথে এগিয়ে দিল আর দ্রৌপদীর জীবন একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কথক ঠাকরুনের টিপ্পনীসহ সেই ঘটনা পরম্পরা চলতে লাগল। পরবর্তী যে ঘটনার প্রসঙ্গে চলে গেছেন নাট্যকার, তা হস্তিনাপুরের রাজসভায় পাশাখেলার ঘটনায়। এই পাশাখেলায় শকুনির কপটতায় যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হারান, শেষ পর্যন্ত বাজি রাখেন দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদীকে সভায় টেনে নিয়ে এসে একবস্ত্রা রজঃস্বলা নারীকে বস্ত্রহরণ করার পাশবিক খেলায় মেতে ওঠে দুর্যোধন-কর্ণ এবং সমস্ত কৌরবপক্ষ। বয়োজ্যেষ্ঠরা চুপ করে থাকেন। কিন্তু সে বারে ভীত ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সব কিছু ফিরিয়ে দিলেও আবার পাশাখেলার অন্তর্জালে আটকে পড়ে সমস্ত হারিয়ে পাণ্ডবদের তেরো বছরের জন্য যেতে হল বনবাসে আর দ্রৌপদীও পেলেন না তাঁর প্রেমাস্পদ অর্জুনকে। দ্রৌপদীর এই বিড়ম্বিত ভাগ্যের জন্য কাকে দায়ী করবে দ্রৌপদী? কৌরব না পাণ্ডব? আমরা দর্শককুল লক্ষ করব দ্রৌপদীর কাহিনি বলতে বলতে কথকরূপী নাট্যকার মথিত হতে থাকেন দ্রৌপদীর প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে।

নাটকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে দ্রৌপদীর ব্যক্তিগত না পাওয়াগুলো, তাঁর অন্তরের বেদনাদীর্ণ ক্ষতগুলোর সন্ধান করেছেন নাট্যকার। একটু একটু করে দ্রৌপদী ফুরিয়ে এসেছেন— শুষ্ক হয়ে এসেছেন, চোখের জল তাঁর ফুরিয়ে গেছে। রিক্ত নিঃস্ব এই নারী একটা যুগের যন্ত্রণাকে যেন বহন করেছেন নিজের মধ্যে। বনবাসে গিয়েও তিনি মিলিত হতে পারেননি তার সবচেয়ে প্রিয় প্রেমিক

স্বামী অর্জুনের সঙ্গে। নিয়ম মতো যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁকে প্রথম এক বছর ঘর করতে হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কারণে অর্জুন সেই সময়কালে যুধিষ্ঠিরের শয়নকক্ষে ঢুকে পড়ায় শাস্তিস্বরূপ তাকে বারো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হয়। দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ বিচ্ছেদ। বনবাসে অবশ্য অর্জুনকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়নি— সেখানে তিনি উলুপী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রাকে পেয়েছেন। কিন্তু দ্রৌপদী তো শুধুই অর্জুনের পথ চেয়ে দিন কাটিয়েছেন। বারবার দ্রৌপদী তার অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে, কৃষ্ণকে। প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। অজ্ঞাতবাসের সময় কীভাবে সৈরিন্ধ্রী কীচকের কাছে অপমানিত লাঞ্ছিত হয়েছেন সেই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সারাজীবন ধরে অপমানের ভারবহন করে চলতে চলতে ক্রুদ্ধ দ্রৌপদী তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে যাওয়ার প্রাক্কালে কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন দুঃশাসনের কেশ আকর্ষণের কথা, দুর্যোধনের ঊরুতে কুৎসিত ইঙ্গিতের কথা, বস্ত্রহরণের কথা। আর তাই দ্রৌপদী চেয়েছে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য এক ধর্মযুদ্ধ হোক পৃথিবীতে। আর কৃষ্ণাকে শান্ত করার জন্য বারবার তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত ভালবাসা, ক্রোধ, অপমান ভুলে যেতে হবে রাজনীতির স্বার্থে। অগ্নিতে ঘি পড়ার মতো জ্বলে উঠেছে কৃষ্ণা— আর্তনাদ করে উঠেছেন— 'আমি যদি আমার ব্যক্তিগত অপমান ভুলে যাই সখা কৃষ্ণ, তা হলে কি ধর্মরাজ্য আসবে পৃথিবীতে? তুমি কি এই অঙ্গীকার করতে পারো যে তা হলে আর কোনও নারী ভবিষ্যতে অনুরূপভাবে লাঞ্ছিতা হবে না? উৎপীড়িতা হবে না? এই ক্ষমায় কি সেই স্বর্গরাজ্য আসবে পৃথিবীতে? বলো কৃষ্ণ— !'[৩] এইখানেই নাট্যকার মহাভারত ও সমকালকে বেঁধে ফেলেন— দ্রৌপদীর যন্ত্রণা কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। ব্যাসদেবের 'নাথবতী অনাথবৎ' আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদী, কৃষ্ণা, পাঞ্চালী, সৈরিন্ধ্রী হয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। দ্রৌপদী যে ধর্মযুদ্ধ চেয়েছিল তা হয়নি। হয়েছিল অন্যায় যুদ্ধ। মহাভারতের যুদ্ধ সমাপন পর্বে দ্রৌপদীর কাছে সব শূন্য মনে হয়— অর্থহীন মনে হয়। তার জীবন যে কোনও সার্থকতা পেল না তারই জন্য ব্যথিত দুঃখিত দ্রৌপদীকে ব্যাসদেব আখ্যাত করেন সঠিক পরিচয়ে— 'নাথবতী অনাথবৎ'। নাট্যকারের কলমে তাই মাঝে মাঝে ধুয়োপদের মতো উঠে আসে— 'নাথবতী অনাথবৎ ও দ্রুপদকন্যা। জীবনভর পেলে তুমি অসহ যন্ত্রণা।' নাটকের শেষ হয় দ্রৌপদীর মৃত্যুদৃশ্যে। দ্রুপদরাজের কন্যা, আদরের দুলালী, পঞ্চপাণ্ডব-প্রিয়া দ্রৌপদী জীবনভর অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে আশাহীন, সুখহীন, নিঃস্ব শূন্য দ্রৌপদী তার পঞ্চস্বামীর সঙ্গে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে চলল স্বর্গের পথে। পথে চলতে গিয়ে সে পড়ে যায়— কিন্তু নাট্যকার ইরাবতী কার্ভের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে জানিয়েছেন যে, পড়েই দ্রৌপদীর মৃত্যু হয়নি। তাঁর পঞ্চস্বামী তাঁকে ফেলে চলেই যাচ্ছিল, শুধু ফিরে আসে ভীম।

জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদীর চোখের সামনে চলচ্ছবির মতো ভেসে যেতে থাকে তাঁর জীবনে কতবার ভীম তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে, রক্ষা করেছে, প্রতিবাদ করেছে— সেই দৃশ্যগুলি। দ্রৌপদীর অনুভব তাঁর পঞ্চস্বামীর মধ্যে একমাত্র ভীম— ভীমই তাকে ভালবেসেছিল। তাই তার প্রার্থনা 'আর জন্মে তুমি কেবল আমার হোয়ো ভীম।'[৪] শাঁওলী মিত্র এই নাটক রচনার ক্ষেত্রে ইরাবতী কার্ভের বইটির ওপর অনেকটাই নির্ভর করেছিলেন। তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা দ্রৌপদীর কষ্ট হল বাস্তব কষ্ট— মাটির কষ্ট। সেই পুরোনো মৃতপ্রায় যুগের কষ্ট দ্রৌপদী ভোগ করেছিলেন তার নিজের জীবন দিয়ে। মহাভারতের সেই যুগযন্ত্রণাকে দ্রৌপদীর কাহিনির মধ্য দিয়ে যখন মঞ্চে উপস্থিত করেন শাঁওলী মিত্র, তখন তা হয়ে ওঠে এই সময়ের এই যুগের যন্ত্রণা বহনের সাক্ষ্য।

বিষয়ের মতো নাটকের নির্মাণ ভাবনাতেও অভিনবত্ব রেখেছিলেন শাঁওলী মিত্র। 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকের মঞ্চভাবনা সম্পর্কে নাট্যকার নিজে স্পষ্টতই নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর মুদ্রিত নাটকের বইটির সূচনায়। যেহেতু এ নাটকের কথক এক এবং একক চরিত্র, তাই স্বভাবতই অন্যান্য চরিত্রবহুল মঞ্চভাবনার থেকে নাটকের মঞ্চভাবনা স্বতন্ত্র হবেই। এই কথকের সঙ্গে আছে এক জুড়ির দল। তাঁরা নাটকের মধ্যে আছেন অথচ প্রত্যক্ষভাবে নেই। মঞ্চে তাঁরা সচল নন। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে থাকেন। তাঁদের বসার জন্য অন্য কোনও উপায় বের করলেন নাট্যনির্দেশক। 'তারা গান গায়, বাজনা বাজায়, প্রয়োজনে কথকের অভিনয়ে সাথ দেয়।'[৫] এই জুড়ির দলের জন্য মঞ্চের পিছন দিকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে একটা আড়াল দেওয়া হল। তারা বসলে তাঁদের কাঁধ পর্যন্ত দর্শক দেখতে পায়— এই পর্যন্ত আড়াল দেওয়া। বাঁশি, হারমোনিয়াম, তবলা, তরঙ্গ, ঘুঙুর, শঙ্খ, গুপীযন্ত্র ইত্যাদি দেশীয় বাদ্যযন্ত্র সম্ভারে তাঁরা বসেন। মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় এই জুড়ির দলের অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব যেমন রক্ষিত হয়— তেমনই ক্ষুণ্ণ হয় না মূল কথকের উপস্থিতি।

মধ্যমঞ্চের সামনে রাখা হয় একটি দেড় ফুট উচ্চতার ২'/২' বর্গাকার চারপায়া। তার ধার ঘেঁষে অভিনেতার বাঁ দিকে অর্থাৎ Actor's Left-এ থাকে একটি ছোট চৌকি— তার উচ্চতা ১০" মতো দৈর্ঘ্য প্রস্থে ১'/১'; আরও একটু বাঁদিকে আরও একটি ছোট চৌকি আর উইংসের ধার ঘেঁষে একটি পিঁড়ি। অভিনেতার ডানদিকের উইংস ঘেঁষে (Actor's Right-এ) এমন একটি আসন যার সামনের দিকে বসা যায় আর পেছনের দিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এই সমস্ত বসার জায়গাগুলো পায়াওয়ালা নয়, নিরেট বস্তু। রং— নীলচে ধূসর। পিছনে জুড়ির দলের সামনে যে আড়ালটা থাকে তার রঙও নীলচে ধূসর। আলোর প্রক্ষেপণে অর্থাৎ কখনও কথক কখনও জুড়ির দলের ওপর আলোক সম্পাতে

মঞ্চটির সজ্জা সাধারণ হয়েও অসাধারণ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে নাটকীয়তায়। প্রথমে পর্দা খুললেই দর্শক দেখতে পান মধ্যমঞ্চের উঁচু চৌকিতে বসে আছেন কথক ঠাকরুণ; তিনি দর্শকের দিকে পেছন ফিরে। স্বল্প আলোয় এবং তাঁর শরীরের হালকা দুলুনিতে দুলে ওঠে তাঁর পিঠের ওপর নেমে আসে লম্বা বেণী, পায়ে এবং মাথার দোলনে একটা ছন্দোময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে জুড়ির দলের দেশি অর্কেস্ট্রার সঙ্গীত। সমগ্র মঞ্চে মাত্র কয়েকটি চৌকি এবং একটি পিঁড়ির ব্যবহারে যে নিরাভরণ মঞ্চসজ্জা গড়ে তোলা হয় তা গতানুগতিক মঞ্চাসজ্জার ধারায় তৈরি হয় না। বিষয় এবং আঙ্গিকের মতো মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রেও নির্দেশকের ভাবনা সহজ, দেশজ এবং দৃষ্টিনন্দিত।

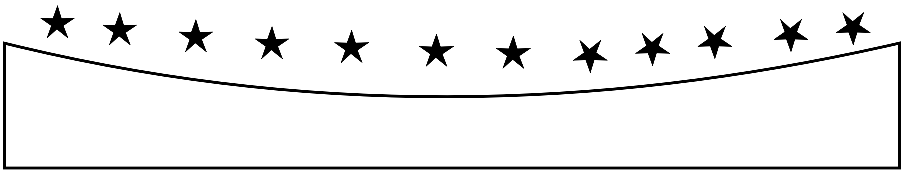

মঞ্চের পিছন দিকে নিচু আড়াল দেওয়া পর্দার ওপারে বসেন জুড়ির দল। এঁরা গান করেন, বাদ্যযন্ত্র সঙ্গত করেন প্রয়োজনে অভিনয়ে অংশ নেন শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে বা বাচিকে। জুড়ির দলের শরীরের অর্ধেক অংশ দৃশ্যমান থাকে মাত্র।

'নাথবতী অনাথবৎ' নাটক লেখা ও মঞ্চস্থ করার আগে দুটি নৃত্যানুষ্ঠান কীভাবে শাঁওলী মিত্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তাঁর মধ্যে জন্ম দিয়েছিল অভিনব নাট্যভাবনার, এই প্রসঙ্গ অত্যন্ত জরুরি বিষয়। 'সময়টা হবে '৮২ সাল। তখন নাথবতী অনাথবৎ-এর কথা সবে মাথায় এসেছে। সেই সময়ে জাতীয় চ্যানেলে প্রচারিত দুটি নৃত্যানুষ্ঠান আমাকে 'নাথবতী অনাথবৎ' লিখতে এবং মঞ্চস্থ করতে সাহায্য করেছিল।'[৬] অনুষ্ঠান দুটি ছিল নৃত্যানুষ্ঠান— যা তিনি দেখেছিলেন জাতীয় চ্যানেলে। সেইসময় তাঁর মধ্যে দ্রৌপদী ও মহাভারত নিয়ে নানান ভাবনা কাজ করে চলেছে। চোখের সামনে তৈরি হচ্ছে টুকরো টুকরো নানা ছবি। বিশেষ কোনও অভিব্যক্তি বা কোনও নাচের মুদ্রা বা কোনও বসা বা হাঁটার ভঙ্গিমা। কিন্তু সবগুলো একসঙ্গে মিলেমিশে কোনও পূর্ণাঙ্গ মুহূর্ত তৈরি হয়নি। হয়তো খানিকটা লিখেছেন বা দু'একটি গান লিখেছেন। কথকের এবং জুড়ির দলের ভাবনাটা প্রথম থেকেই তাঁর মাথায় ছিল। সেই সময়ই তিনি টেলিভিশনে দেখেন শ্রীমতী শোভা নাইডুর কুচিপুড়ি নৃত্য— যার বিষয় ছিল দ্রৌপদীর স্বয়ংম্বর সভা। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্যে কৌরবদের পক্ষে তিনি (শ্রীমতী নাইডু) যে নানান হাসির ভঙ্গি করছিলেন আর তার থেকে বেরিয়ে আসছিল বিভিন্ন চরিত্র। বস্ত্রহরণের দৃশ্যটিও শাঁওলী মিত্রকে অভিভূত করেছিল— শুধু মুগ্ধ নয়, এই দৃশ্যটি তাঁকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করেছিল

যা পরবর্তী সময়ে নাটক উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও প্রভাব রেখেছিল। ‘বস্ত্রহরণের অমন আধুনিক বিশ্লেষণ আমি আর কোনো নৃত্যানুষ্ঠানে দেখিনি,— আজও পর্যন্ত নয়। বস্ত্রহরণে তিনি কৃষ্ণকে আনেননি। তিনি দুঃশাসন হয়ে দেখাচ্ছিলেন— দুঃশাসন দ্রৌপদীর আঁচল ধরে টানছে—। আর দ্রৌপদী হয়ে দেখাচ্ছিলেন সে প্রাণপণে আঁচলটা আঁকড়ে আছে। আর তখন সেই শূন্যের মধ্যে আমি দর্শক হিসেবে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আঁচলটা,— অর্থাৎ কাপড়টা কেমন টান হয়ে আছে। একটা সময়ে তিনি দ্রৌপদী হয়ে হঠাৎ দুঃশাসনেরই দিকে ঝুঁকলেন। আর তাতেই দুঃশাসন আচমকা পড়ে গেল। শিল্পী সঙ্গে সঙ্গেই দুঃশাসন হয়ে সেটা দেখালেন। আর এমনি করেই যেন ঐ অশ্লীল কর্মটি আর চলতে পারল না।’[৭] শ্রীমতী শোভা নাইডুর এই উপস্থাপনা এবং শ্রীমতী পদ্মা সুব্রহ্মনিয়ম— এই দু’জন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর নৃত্য শাঁওলী মিত্রের সামনে যেন কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। কেননা কথকতার আঙ্গিক নিয়ে তিনি তখন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন। ‘...শ্রীমতী শোভা নাইডু, ও শ্রীমতী পদ্মা সুব্রহ্মনিয়ম— এই দুই বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর নৃত্য দেখে আমার সামনে যেন কল্পনার দরজা খুলে গেল। কথকতার আঙ্গিক নিয়ে তখন খুব ভাবছি তো!’[৮] টেলিভিশনে শ্রীমতী পদ্মা সুব্রহ্মনিয়ম-এর গীতার উপস্থাপনাও শাঁওলী মিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। গানের ভাষা ছিল তামিল, যা শাঁওলী মিত্রের অবোধ্য। কিন্তু যে নৃত্যশিল্পী অর্জুনের ভূমিকায় যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছেন তা তাঁর ভঙ্গি দেখে বুঝতে একটুও অসুবিধা হয়নি শাঁওলী মিত্রের। নৃত্যশল্পীর ভঙ্গি লক্ষ করে তিনি বুঝতে পারছিলেন স্পষ্ট যে, অর্জুন কখনও পিতামহ ভীষ্ম, কখনও গুরু দ্রোণাচার্য, কখনও কৃপাচার্যকে লক্ষ করছেন। অর্জুনরূপী তাঁর মুখের ভাবভঙ্গিমায় পরিবর্তনে অর্জুনের মনের ভাবগুলোর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিগুলো ধরা পড়ছিল। তখন অর্জুনের হত্যা করতে না চাওয়ার দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব, হাত থেকে ধনুর্বাণ পড়ে যাওয়া, কৃষ্ণের উপদেশ, ক্রমশ জীবনের গতিপথের একটা দিশা পাওয়া— এই সমস্ত কিছু একজন শিল্পী তাঁর নৃত্য ও ভঙ্গিমার মাধ্যমে যেভাবে ব্যক্ত করলেন, তা শাঁওলী মিত্রের নাট্যরচনার প্রবাহে সঞ্চারিত করল গতিবেগ। এই সমস্ত অনুপ্রেরণা শাঁওলী মিত্রের নাট্যগঠনে বিশেষ সাহায্য করেছিল সে কথা নাট্যকার-নির্দেশক নিজেই স্বীকার করেছেন।

একটা সময়— যে সময়টায় শাঁওলী মিত্র অভিনয় ছেড়ে বসে ছিলেন, তখন তিনি অনুভব করতেন ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন থিয়েটারের চোরাস্রোত তাঁকে টানছে। তিনি শ্রুতিনাটক, আবৃত্তি, বেতার নাটক বা নাট্যরূপ দেওয়া ইত্যাদি বেতার ও দূরদর্শনের জন্য কাজ করেছেন আর ভেবেছেন তিনি শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর নিয়ে কাজ করছেন— হাত, পা, চোখ, ভ্রূ সমস্ত কিছু ব্যবহার করে নিজেকে

প্রকাশ করা হচ্ছে না। যখন থেকে শাঁওলী মিত্র মনস্থির করেছিলেন নাটক করবেন বলে (১৯৮২ সাল নাগাদ) তখন থেকে তাঁর মনে হয়েছিল দেশজ গ্রামীণ নাট্যধারা ‘কথকতা’র কথা। পিতা শম্ভু মিত্র প্রসূত এই চিন্তাধারা থেকেই ‘নাথবতী অনাথবৎ’-এর ক্ষেত্রে কথকতার ভঙ্গিটি গ্রহণ করা হয়েছিল। মূলত কয়েকটি কারণে (১) আধুনিক থিয়েটারে এই নাট্যধারার ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। (২) এই বর্ণনামূলক ভঙ্গিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ করা যায়। (৩) আমাদের দেশের যে গ্রামীণ সংস্কৃতি তার মধ্যে যা লুকিয়ে আছে তা আপন জোরেই অত্যন্ত অভিজাত। (৪) আরও মনে হল এতে গান এবং নাচের খুব বড় ভূমিকা থাকে। (৫) দর্শকের কাছে একজন কথকের সরাসরি উপস্থাপনা খুব তাড়াতাড়ি কাহিনি ও তার বক্তব্যের সঙ্গে দর্শকের সেতুবন্ধন করে দেয়। শাঁওলী মিত্র এই বর্ণনাত্মক ভঙ্গি বা কথকতার রীতিতেই তাঁর প্রথম লিখিত ও নির্দেশিত নাটকটি উপস্থাপিত করলেন। আশ্চর্যের বিষয়, শাঁওলী মিত্র তাঁর আধুনিক মনস্কতাকে যেভাবে বুনে তুলেছিলেন— গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে আভিজাত্যের শিকড় সন্ধান করেছিলেন, সেই নাটক মঞ্চস্থ হবার দু’বছর পর ১৯৮৫-তে ফোর্ড ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে গবেষণার কাজে বর্ণনাত্মক লোকনাট্যের ধারা সন্ধান করতে করতে সেই ধারা প্রত্যক্ষ করলেন মহারাষ্ট্রে। বোম্বাই শহর থেকে বহু দূরে পরবণী জেলাশহরে। আটানব্বই বছর বয়স্ক শিল্পী রাজারাম ভউ কদম— যাঁর উপস্থাপনা নাচগান সমৃদ্ধ কথকতা। লোকনাট্যের যে আঙ্গিক সন্ধান করছিলেন একেবারে ভেতরের তাগিদে তারই প্রত্যক্ষরূপ যেন শাঁওলী মিত্র দেখলেন রাজারামের মধ্যে। চমকিত হবার মতোই এই ঘটনা এবং হয়তো এইভাবেই শিল্পের শিকড়ের গভীরতায় একটা অন্তর্লীন সাযুজ্যধারা প্রবাহিত হয়। অথচ দু’বছর আগে যখন শাঁওলী মিত্র মঞ্চস্থ করেন ‘নাথবতী অনাথবৎ’ তার আগে তিনি এ ধরনের উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ করেননি। ভাবনাটা তার মধ্য থেকেই উৎসারিত হয়েছে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই। বিষয়মাত্র নয়, এই সমস্ত লোকনাট্যের যে গঠনরীতি— শাঁওলী মিত্রের মনে হয়েছিল এই কর্মগুলোর মধ্যে একটা আভিজাত্যের এবং বুদ্ধির প্রকাশ রয়েছে। যা শুধু পৌরাণিক কাহিনি নয়— আধুনিক সময়ের বাস্তব সমস্যা ও জটিল জীবনকথা প্রকাশ করতে সক্ষম। কথা দিয়ে দর্শকের বঞ্চনার জগৎ তৈরি হতে থাকে, পরিবর্তিত হতে থাকে দৃশ্যভাবনা শুধু কথারই বুননে। কথা দিয়ে মঞ্চে নানান চিত্রকল্প, দৃশ্য ভাবনা গড়ে ওঠে। কখনও জঙ্গল কখনও রাজপ্রাসাদ কখনও জনপদ কখনও একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্ত। ভারতের এক প্রাচীন আঙ্গিক কথকতা যা একই সঙ্গে শিক্ষা ও বিনোদন উভয় দায়িত্বই পালন করে।

**নাট্যনির্দেশনার পদ্ধতি:** নাট্যনির্দেশক কীভাবে সমগ্র নাটকটি উপস্থাপিত করবেন তাঁর যে

ভাবনা বা ডিজাইন তৈরির পরিকল্পনা তা প্রত্যেক নির্দেশকের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র— যা নাটকের ক্ষেত্রে মূলগত একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। শাঁওলী মিত্র মূল কাহিনি গ্রহণ করেছিলেন মহাভারত থেকে আর দেশজ লোকরীতির সঙ্গে আধুনিক শিল্পাঙ্গিকের সম্মেলন ঘটিয়ে এক অভিনব উপস্থাপনরীতি প্রস্তুত করেছিলেন 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর ক্ষেত্রে। প্রথমেই তাঁর মনে হয়েছিল কী করে তিনি দ্রৌপদীর কাহিনিকে, একটা সময়ের যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করবেন। সময়ের যুগযন্ত্রণা যে নারী ধারণ করে আছেন, সেই দ্রৌপদীর জীবনকথা কীভাবে ব্যক্ত করবেন? তিনি তাঁর নাট্য অভিভাবক পিতৃদেব শম্ভু মিত্রের অভিভাবকত্বে (guidence) কথকতার ভঙ্গিটি গ্রহণ করলেন। কথকতার ক্ষেত্রে নানান সুবিধা অসুবিধার প্রসঙ্গ এসে গেল তার সামনে। তবে অসুবিধাগুলো কাটিয়ে একটা ইতিবাচক জায়গায় পৌঁছে দিলেন তাঁর নাটককে। নাটক থেকে নাট্য হয়ে ওঠার আশ্চর্য কাহিনির মধ্যে অনেক পরত থাকে। শাঁওলী মিত্রের মতে 'নাট্য শিল্পের সমস্ত উত্তেজনা সম্ভবত ঐ হয়ে ওঠা-টাকে ঘিরেই'। নির্দেশকের কথকতার আঙ্গিক গ্রহণের প্রধান সুবিধা ছিল যে তাঁকে হুবহু কোনও চরিত্রকে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব নিতে হয়নি। মানুষের কল্পনায় যে অর্জুন, দ্রৌপদী, ভীষ্ম, সত্যবতী থাকে, তাকে কোনও অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্য দিয়ে মানুষের চোখের সামনে হাজির করলে বিষয়টা লঘু হয়ে যাবে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। বরং কথকতার বর্ণনাভঙ্গি থেকে মানুষের কল্পনাশক্তি জাগ্রত হোক এটাই চেয়েছিলেন বা সেই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন নির্দেশক। স্পষ্টতই তিনি স্বীকার করেছেন—' 'নাথবতী অনাথবৎ' এবং 'কথা অমৃতসমান' এই দুটো পালাতেই এই আঙ্গিক গ্রহণ করবার ফলে অনেকগুলো ব্যাপার, বা বলতে পারি— স্তর, একই সঙ্গে মঞ্চে ঘটানো গেছে যা অন্য আঙ্গিকে এত সহজে সম্ভব হ'তো না।'[৯] এখানে অনায়াসেই কাহিনি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কথক প্রশ্ন করতে পারে, টিপ্পনী কাটতে পারে, 'কথা' দিয়ে ছবি করতে পারে। বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই এই রকম আঙ্গিক নির্বাচন করা হয়েছে। আঙ্গিকের জন্য বিষয় নয়। বর্ণনাত্মক থিয়েটারের এই ইতিবাচক দিকগুলো শাঁওলী মিত্রকে বিশেষ সাহায্য করল। 'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকে সঙ্গীতের একটা বড় ভূমিকা আছে। লেখার সময়ই শাঁওলী মিত্রের মাথায় এসেছিল একটা জুড়ির দলের প্রসঙ্গ। এই জুড়ির দল কিন্তু গানের মাধ্যমে সমস্ত নাটকটার চলনে সক্রিয় গতি সঞ্চার করে। জুড়ির দলের গান (তেওড়া ছন্দে)— 'কিছু কথা বলতে চায়/যে মন/ ও রে মন...' নাটক শুরু হয়। সমস্ত নাটকে কথকতার সঙ্গে সঙ্গে জুড়ির দলের প্রচুর গান নাটকে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরিস্থিতি অনুযায়ী জুড়ির দলের সুর, তাল, লয়ের পরিবর্তন ঘটে এবং যথাযথ পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কয়েকটি পরিবেশ দুর্যোধনের প্রতি কটাক্ষ করে— 'স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিকমণ্ডন/ দ্বারবোধে সেই দিকে চলে দুর্যোধন/ ললাটে

প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে/ দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভার সকলে।'[১০] গানের সুরেও সেই বিদ্রূপাত্মক মজা তৈরি করে দেন সুরকার। আবার দ্রৌপদীর রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যথাময় সময়কালে জুড়ির দল গেয়ে ওঠে—

বনবাসে পদব্রজে চলিলা সুন্দরী
বেশভূষা অলঙ্কারে ত্যাজিলা সুন্দরী
পথশ্রম নাহি মানে দ্রুপদনন্দিনী
পঞ্চস্বামীসনে বনে একাকী রমণী।[১১]

এই বর্ণনায় ব্যথার সুর ধ্বনিত হয়। এই জুড়ির দলের এবং কথক ঠাকরুনের গানের সুর করছেন নিজে ও কিছু কিছু গানের সুর করেছেন শাঁওলী মিত্র তাঁর গানের গুরু ধীরেন দাসকে দিয়ে।

শাঁওলী মিত্র নির্দেশিত পরবর্তী প্রযোজনা 'রাজা' মঞ্চস্থ হয় ১৯৮৭ সালে, কিন্তু আলোচনার সুবিধার্থে 'কথা অমৃতসমান'-এর আলোচনা আগেই করা হল এই কারণে যে এই নাটকটিও মহাভারতকেন্দ্রিক এবং আঙ্গিক ও বিষয়গত দিক থেকে 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর সম্প্রসারণ বলা যেতে পারে।

**কথা অমৃতসমান (১৯৯০)**— শাঁওলী মিত্রের লেখা দ্বিতীয় নাটক ১৯৯০ মঞ্চস্থ হয়। এই নাট্য প্রযোজনায় আবারও শাঁওলী মিত্র গ্রহণ করলেন মহাভারতের কাহিনি, কথকতার ভঙ্গি এবং নাট্যরীতির ধরনও বর্ণনাত্মক। কথক ঠাকরুনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি তুলে ধরলেন, কুন্তী, সত্যবতী, গান্ধারী, দ্রৌপদী প্রমুখ মহাভারতের বিভিন্ন নারী চরিত্রের অন্তর্লীন অনুভবের সন্ধিৎসা। এ নাট্য উপস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রতিক পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে মহাভারতীয় যুদ্ধের ভয়াবহতার, একটা পতনোন্মুখ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ। এই নাটক লিখতে গিয়ে নাট্যকার বারবার অনুভব করেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে— যে কঠিন দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে মানুষ পথ হাঁটছে সেই সমসময়ের কথা। যেহেতু মহাভারত মহাকাব্য, তার মধ্যে ধরা আছে কতশত মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও পারিপার্শ্বিকের সমস্যা। মহাভারতের যুগের প্রতিফলন ঘটে আধুনিক যুগেও। তাই আবার শাঁওলী মিত্র মহাভারতকেই অবলম্বন করলেন। কেন মহাভারত? তার উত্তর মিলল পঞ্চম বৈদিকের স্মরণিকায় —

> 'সমসাময়িক সময়ের এই ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের রূপটাকে প্রত্যক্ষ করতে করতে কেবলই মনে পড়ে মহাভারতের যুগের সেই ভয়াবহ অর্থহীন শূন্য পরিণামের কথা। মনুষ্যত্বের দায়বোধ থেকেই উঠে আসে কথা অমৃতসমান।'[১২]

যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং যুদ্ধ কেমন করে একটা যুগকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় এবং এক শূন্য পরিণামের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়— এই নাটকে তার-ই মর্মান্তিক বিশ্লেষণ। 'নাথবতী অনাথবৎ'— নাটক দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করতে করতে তাঁদের মনে হয়েছিল যে মহাভারত এক মহৎ বিস্ময়। জীবনের নানান স্তর, নানান জটিলতা— যা মানুষ প্রকাশ করতে চায় সবই রয়েছে এই মহাভারতের বিপুল অবয়বে। সেই জন্যই আবারও মহাভারতের দ্বারস্থ হল পঞ্চম বৈদিক। 'কথা অমৃতসমান'-এ দ্রৌপদীর জীবনযন্ত্রণার ইতিহাস অতিক্রম করে আরও গভীর বিস্তৃত ক্ষেত্রে কাহিনিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এখানে প্রকাশ পেয়েছে ন্যায়-অন্যায় বোধের কথা, মহাযুদ্ধের বিভীষিকা এবং তার ভয়াবহ পরিণামের কথা, অর্থহীন মনুষ্যত্বের কথা। শাঁওলী মিত্র আবারও নিজেকে দাঁড় করালেন কথকের ভূমিকায়। কেননা কথক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে অনেক জটিল বহুস্তরীয় বহুমাত্রিক কার্যকারণ প্রকাশ করা সহজ হয়ে ওঠে। নাথবতীতে যে কথক দ্রৌপদীর জীবনকথা বলে বেড়ায় এখানে সেই কথকের যুগবিশ্লেষণ আরও গভীর সত্যের সন্ধান করে। গল্পগাথা বলে, আবার বিশ্লেষণও করে। দ্রৌপদী থেকে সে ফিরে যায় উৎসে— সত্যবতী, কুন্তী, গান্ধারী, অম্বিকা, অম্বালিকা, মাদ্রী প্রমুখের জীবনোপখ্যানে। নারী চরিত্রগুলির পাশাপাশি মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রমুখ পুরুষ চরিত্রগুলির বিশ্লেষণও উঠে এসেছে নাটকে। যেমন কৃষ্ণের প্রসঙ্গে বলা হয় আবাল্য সরলতা এবং শেষকালে সবার পাপের ভার বহন করে নিজ বংশ— যদুবংশের ধ্বংসও তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। বিরাট এই পুরুষটির মৃত্যু হয় সামান্য এক ব্যাধের তীরের আঘাতে।

'কথা অমৃতসমান' নাটকটি লেখার আগে ১৯৮৫-৮৬ সালে দূরদর্শনের জন্য ধারাবাহিক হিসেবে লেখা হয় মহাভারতের কাহিনি তেরোটি পর্বে, যদিও তা ধারাবাহিক হিসেবে দূরদর্শনে প্রদর্শিত হয়নি এবং দীর্ঘদিন তা অযত্নেই পড়ে ছিল। শাঁওলী মিত্রের অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ডাঃ বারীন রায়ের অনুরোধে তাঁর বাড়িতেই ১৯৮৮ সাল নাগাদ লেখাটি পড়া হয়— তাঁর বন্ধুজনের সমক্ষে। সকলে ধৈর্য ধরে পাঁচ ঘন্টাব্যাপী এই নাটকটি শোনেন এবং বিশেষ এ নাটকটি নিয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। ১৯৮৮-র ডিসেম্বর নাগাদ নাটকটি সর্বসমক্ষে পড়ার পর নাটকের কাজ শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৯৮৯ -এর শেষাশেষি আর ১৯৯০-র জানুয়ারিতে মঞ্চস্থ হয় 'কথা অমৃতসমান'।

'আমি যে মহাভারতের মধ্যে বারবার নিজেদের আবিষ্কার করি! খুঁজে পাই নিজেকে, আত্মজনকে। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাকে! আধুনিক যুগের সঙ্কটের ছায়া দেখতে পাই সেই যুগের পটভূমিতে! তাই এই কথাগুলো বলতে ইচ্ছে করে। আবিষ্কার করতে ইচ্ছে করে অমৃতসমান সেই

‘সত্য’-কে।’[১৩] এই ‘কথা অমৃতসমান’-এ খুঁজতে চাওয়া হয়েছিল মহাভারতের যুগটার কথা— তার ভয়াবহ ধ্বংসের কারণ। বিষয় মহাভারত এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও গৃহীত হল কথকতার ভঙ্গিই। নাট্যকার নির্দেশকের মনে হয়েছিল ‘মহাভারত’কে অবলম্বন করে আধুনিক যুগের কোনও বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে গেলে কথকতাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু নাথবতীর কথক ঠাকরুনের সঙ্গে এই নাটকের কথক ঠাকরুনের চারিত্রিক তফাত রয়ে গেছে। কথনভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানের দিক থেকে অনেক বেশি পরিণত ‘কথা অমৃতসমান’-এর কথক। নাটকের শুরু থেকেই তার সেই পরিচয় আমরা লক্ষ করি। তার মধ্যে আছে রাজনৈতিক সচেতনতা তাই সে নাৎসি বাহিনীর অত্যাচার বা নিউক্লিয়ার হলোকস্ট নিয়ে মন্তব্য করতে পারে। আধুনিক যুগের সঙ্গে প্রতিতুলনা করে মহাভারতের যুগের। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মানুষ ও মানুষের অস্তিত্ব। একটা যুগের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তির কাহিনি বর্ণনা সহজ ছিল না। নানান কারণে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে উঠতে একটা যুগের ধ্বংস হয়। কথক শুরু করে সত্যবতীর কাহিনি দিয়ে। কথক একজন মহিলা বলেই যে শুধুমাত্র নারীচরিত্রের পক্ষে কথা বলেছেন তা নয়— অনিবার্য ঘটনা ও চরিত্রকে গুরুত্ব দিয়েছেন শাঁওলী। সত্যবতী, অম্বিকা, অম্বালিকা, কুন্তী, গান্ধারী, মাদ্রীর পাশাপাশি ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ, দুর্যোধন এমনকী কৃষ্ণের প্রতি তাঁর সহজ সজাগ দৃষ্টি। শাঁওলী মিত্র মহাভারতের যে আত্মার উন্মোচন করেছেন যা বহুস্তরিক এবং বহুমাত্রিক। সবার কথাই উঠে এসেছে— উঠে এসেছে তাদের পরাভবের কাহিনি। এঁরা জানতেন যুদ্ধ হলে যুগটা ধ্বংস হবে। এদের সবাই সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন যুদ্ধটাকে রোধ করতে। কিন্তু যুদ্ধটাকে রোধ করতে পারেননি। নাট্যকার রূপকের সাহায্যে বিষয়টি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, একটা পাথরের চাঁইকে পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে দিলে সে যেমন গড়িয়ে পড়তে থাকে তার গতিরোধ করা যায় না, এক দিকে ধাক্কা যায়, ভাঙে গড়িয়ে পড়ে পতনের দিকে— ঠিক তেমন করেই এই পুরো যুগটা গড়িয়ে পড়ল অনিবার্য পতনের দিকে, তার গতিরোধ করা গেল না। শুরু হয়ে গেল মহারণ। কথক কৃষ্ণের প্রসঙ্গে বলে— যে কৃষ্ণ এই দেশটার জন্য কত কিছু করতে চেয়েছিলেন— মানুষের পাপের ভার বহন করেছিলেন— সেই শক্তিময় কৃষ্ণের মৃত্যু হল কত সাধারণভাবে কত নিষ্ঠুরভাবে। মহাভারতের এই বিপুল পরিব্যাপ্ত জীবনযাপন জীবনভাবনাকে রূপ দিলেন শাঁওলী মিত্র তার ‘কথা অমৃতসমান’ নাটকে।

‘কথা অমৃতসমান’ নাটকের মুখ্য আধার মহাভারত। এই বিরাট মহাকাব্যের বিভিন্ন নারী চরিত্রের অন্তর্দাহ, প্রবঞ্চনা, সামাজিক, রাষ্ট্রিক টানাপোড়েন তাঁদের জীবনপ্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের

বাঁকগুলোকে নাট্যকার চিত্রিত করেছেন। নাটক শুরু হয় সত্যবতীর কাহিনি দিয়ে। পরাশর মুনি ও মৎস্যগন্ধা কন্যা সত্যবতীর অবৈধ মিলনজাত সন্তান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব-ই তো সমগ্র মহাভারতের প্রণেতা। এই সত্যবতীই শান্তনুর পত্নীরূপে ধীবরকন্যা থেকে হস্তিনাপুরের কুরুবংশের রূপবতী গুণান্বিতা সম্রাজ্ঞী। গঙ্গাপুত্র ভীষ্মকে বিমাতা সত্যবতীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয় যে তিনি কোনও দিন কুরুবংশের সিংহাসন দাবি করবেন না। তাই হস্তিনাপুরের রাজত্বের উত্তরাধিকার পান শান্তনুর পর শান্তনু ও গঙ্গার পুত্র ভীষ্ম নয়, শান্তনু ও সত্যবতীর পুত্রদ্বয় চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে মারা গেলে বালক বিচিত্রবীর্যকেই দেবব্রত সিংহাসনে বসালেন— নিজে থাকলেন রাজপ্রতিভূ। পরবর্তী পর্যায়ে বিচিত্রবীর্যের তিন রানির মধ্যে দু'জন অম্বিকা ও অম্বালিকার ক্ষেত্রজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সহধর্মিণী গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রীর জীবনোপাখ্যানের আড়ালে তাদের আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা অপূর্ণতা ও অন্তর্যন্ত্রণার ছবি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। তাঁর অত্যন্ত নির্মম নিরাসক্ত কলমে ব্যক্ত করেছেন সত্য ইতিহাস— 'যে প্রাসাদে সত্যবতী বেশ মাথা উঁচু ক'রে অহংকার নিয়ে এসে প্রবেশ করেছিল সেই প্রাসাদ থেকে একেবারে হেরে যাওয়া অতি বৃদ্ধা সত্যবতী দুই বৃদ্ধা বিধবা পুত্রবধূসহ ধীরে ধীরে বেরিয়ে বনবাসে চলে গেল। তারপর কবে যে মরে গেল সত্যবতী, কবে যে মরে গেল অম্বিকা-অম্বালিকা— এত খবর তো কেউ রাখলেই না।'[১৪] মহাভারতের নারী চরিত্রগুলির এই মর্মান্তিক পরিণতির প্রসঙ্গ বারবার ফিরে এসেছে শাঁওলী মিত্রের কলমে। যেমন নাটকে উঠে এসেছে গান্ধারী কুন্তী মাদ্রীর প্রসঙ্গও। গান্ধারের রাজকন্যা গান্ধারী বালিকা অবস্থায় হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে এসে যখন মুগ্ধ— চারিদিকের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে বিহ্বল (এই রকমই কল্পনা করেছেন মহারাষ্ট্রের মহাভারত ব্যাখ্যাতা ইরাবতী কার্ভে) ঠিক তখনই গান্ধারের রাজকুমারীর সঙ্গে আসা সখীটি গান্ধারীকে জানিয়েছে তার স্বামী অন্ধ। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন নাট্যকার। এই খবর শুনে গান্ধারী মূর্ছিত হয়ে পড়েন। সেই থেকে নিজের চোখ ঢেকে নেন গান্ধারী— আর কোনও দিন দেখেননি এই পৃথিবীর আলো আকাশ। তিনি কি একবারও দেখেছিলেন তাঁর স্বামী ধৃতরাষ্ট্রকে— প্রশ্ন তুলেছেন কথক। গান্ধারীর আকাঙ্ক্ষা-দুর্ভাগ্য-পরাভব স্বল্প পরিসরে ব্যক্ত করে নাট্যকার পাঠককে বিচলিত করেছেন। এ নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র— কুন্তী, যদুবংশের শূররাজের কন্যা। কুন্তীকে বালিকা বয়সে দান করে দেওয়ার দুঃখ বাঙ্ময় করেন নাট্যকার। কেননা নাট্যকার যখন নারী, তিনি মনে মনে অনুভব করেন এক নারীর বাল্য কৈশোর যন্ত্রণার কথা। কুন্তী স্বয়ংম্বরসভায় পাণ্ডুর গলায় মালা দেন, পাণ্ডুকে ভালবেসে তাঁরই অনুরোধে তিনি তিনবার দেবতাদের আহ্বান করে তিন ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম দেন কিন্তু পাণ্ডু তাঁর সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দেন কুন্তীকে নয়, তাঁর অপর স্ত্রী মাদ্রীর

প্রতি। মাদ্রীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েই পাণ্ডুর মৃত্যু। বারবার পুত্র ও পুত্রবধূর লাঞ্ছনা, কানীন পুত্র কর্ণের প্রতি স্নেহার্ত নারীর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বুদ্ধিমত্তা, প্রেম, কর্তব্যের বিপুল পটচিত্রে কুন্তীর চরিত্রচিত্রণ। অনেকখানি গুরুত্ব দিয়ে ব্যক্তিত্বময়ী এই নারীচরিত্রের বর্ণনা করেছেন নাট্যকার। তাঁর জীবনের শেষ পরিণতিও মর্মান্তিক। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী বৃদ্ধবয়সে বাণপ্রস্থে থাকাকালীন বনের জলন্ত অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করেন। দ্রৌপদীর প্রতি কুন্তীর যে অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা তা কথক আমাদের দৃষ্টিগোচর করে— বর্ণনাংশে নাট্যকার লেখেন— 'আহা দ্রৌপদীকে বড় ভালবেসেছিল কুন্তী।' এক নারীর প্রতি আরেক নারীর অনাবিল সম্পর্কের স্পর্শ ছুঁয়ে যায় পাঠক শ্রোতার হৃদয়। যখন অন্যায় পাশাখেলায় সর্বস্ব হারিয়ে রজস্বলা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের লাঞ্ছনা ঘৃণা সহ্য করে তখন মহাভারতের সাক্ষ্যে কথক, কুন্তী হয়ে স্মরণ করেছিল পাণ্ডুকে। পরাভূত পঞ্চপাণ্ডব যখন অপমানিত- সর্বস্ব খুইয়ে সভা থেকে নতমস্তকে বেরিয়ে যায় তখন ব্যথিত কুন্তীর অন্তর কীভাবে ভেঙে পড়েছিল তারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। কুন্তীর তীব্র যন্ত্রণাময় অভিব্যক্তির ওপর থেকে আলো কমে আসে, মঞ্চের আবছা আলোয় কথক গান ধরে—

'আহা কী সুখে সে এসেছিল
এই ভুবনে!/
এই জীবন বিতালো সে গো,
কোন সাধনে।'[১৫]

এ নাটকেও দ্রৌপদীর ভূমিকা গুরুত্ব পেয়েছে অনেকখানি। সত্যবতী, অম্বিকা, অম্বালিকা, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রীর পর দ্রৌপদীর কথায় আবারও কথকের প্রতিবাদ, ক্ষোভ, সহমর্মিতা তীব্র হয়ে উঠেছে। স্বয়ংম্বর সভা থেকে শুরু হয়নি দ্রৌপদীর কাহিনি এ নাটকে। কিন্তু বিভিন্ন পটভূমিতে ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে দ্রৌপদীর চিত্র তুলে ধরেছেন নাট্যকার। অন্যায় পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির সর্বস্ব খুইয়ে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব যখন বনবাসে সে সময়ে কৃষ্ণের প্রতি দ্রৌপদী ব্যক্ত করেছে তার ক্ষোভ। কৃষ্ণের মুখে তার পুত্রদের কথা শুনে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে দ্রৌপদী— তার বড় দেখতে ইচ্ছে করেছে তার পঞ্চপুত্রকে। এক অনাবিল মাতৃসত্তার উন্মোচন! অজ্ঞাতবাসকালে কীচকের অপমান ভুলতে পারেনি কৃষ্ণা। আর এই সব কিছুর প্রতিবাদে সে চেয়েছিল সব অন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে ধর্মযুদ্ধ হোক। প্রতিষ্ঠিত হোক ধর্মরাজ্যের। হয়নি— প্রত্যেকেই সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অনিবার্য পতনকে রোধ করা সম্ভব হল না। বিধ্বংসী পরিণতির মাঝেও কিন্তু নাট্যকার উচ্চারণ করেছেন স্বস্তিবাক্য— নাটকের পরিসমাপ্তিতে—

‘সর্ব পাপ দূর হো-ক,
আকাশ নির্মল হোক,
বায়ু পবিত্র হোক,
এই পৃথিবী গ্লানিমুক্ত হোক।’[১৬]

‘কথা অমৃতসমান’ প্রযোজনাটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ২৩ জানুয়ারি, ১৯৯০; অ্যাকাডেমি মঞ্চে। প্রযোজনায় অংশ নিয়েছিলেন মূল গায়েন : তড়িৎ ভট্টাচার্য। জুড়ির দলে ছিলেন বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ, সোমা দে, রঞ্জনা চক্রবর্তী, বৈশাখী নাগ, রবীন মজুমদার, অরূপ মান্না, রতন বসুরায়, তুষার রায়, সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়, রূপম বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, স্বপন আঢ্য। আলোক পরিকল্পনা : কালীপ্রসাদ ঘোষ, সঙ্গীত পরিকল্পনা : তড়িৎ ভট্টাচার্য, মঞ্চ ও পোশাক : শাঁওলী মিত্র, সহায়ক কণ্ঠস্বর : দেবকমল মণ্ডল, কালীপ্রসাদ ঘোষ, অপূর্ব রায়। কথকের ভূমিকায় ও নির্দেশনায় : শাঁওলী মিত্র।

নাটক রচনার শুরুতেই নির্দেশক একটি মঞ্চনির্দেশ জ্ঞাপন করেছেন যার থেকে পাঠকের চোখে মঞ্চ সম্পর্কে একটা কল্পনা বা ভাবনা তৈরি হতে পারে। এই নাটক নির্দেশনার মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে শাঁওলী মিত্রের সমাজমনস্কতা। ১৯৯০ সালে ‘কথা অমৃতসমান’ প্রযোজনার মধ্য দিয়ে নির্দেশকের মনে হয়েছিল মহাভারতের শিক্ষা হয়তো বর্তমান সময়ে হিংসাত্মক বিভেদের রাজনীতি থেকে দূরে সরে আসার একটা পথ দেখাবে। সামাজিক মানুষ হিসেবে শাঁওলী মিত্র এই দায়বোধ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এখানেও শাঁওলী মিত্র কথকতার আঙ্গিকই গ্রহণ করেছিলেন। ‘নাথবতী অনাথবৎ’-এর কথক ঠাকরুনের চরিত্রের থেকে— এ নাটকের কথক ঠাকরুন অনেক বেশি পরিণত এবং মানুষের অস্তিত্বের প্রতি সে অনেক বেশি সজাগ ও সহৃদয়। মানবজাতির প্রতি এই স্নেহার্দ্র মনোনিবেশের বৈশিষ্ট্যটি নির্দেশক নাট্যকার সচেতনভাবেই কথকের মধ্যে বুনে দিয়েছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধটাই যুগটাকে একেবারে অনিবার্য পতনের সামনে এনে দাঁড় করায়। যুদ্ধশেষে কথকের যুদ্ধ-পরিণতির ব্যাখ্যাংশেও বর্তমান পৃথিবীর অস্ত্র নিক্ষেপ ও নিরীক্ষার অবস্থার কথা উঠে আসে। একটা যুগের অবসানের ইঙ্গিত দিয়ে স্মরণ করেন ব্যাসদেব-এর সেই অমোঘবাণী ‘অতিক্রান্ত সুখাঃ কালাঃ/পর্য্যুপস্থিত দারুণাঃ/শ্বঃ শ্বঃ পাপিষ্ঠ দিবসাঃ/পৃথিবী গতযৌবনা’। নাট্যকারের অনুবাদে ‘সুখের দিন শেষ হয়েছে/পৃথিবী এখন বিগতযৌবনা/যুগের পরিসমাপ্তি আগতপ্রায়/ধর্ম লোপ পাবে,/পাপের বৃদ্ধি হবে,/হাহাকারে ভ’রে যাবে পৃথিবী,/হাহাকারে ভ’রে যাবে পৃথিবী!’[১৭] নাট্যকার এই পরিণামী বিধ্বংসের চিত্র শেষ দৃশ্যে রাখতে চাননি। তিনিও এক সুন্দর কলুষমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন—

আগামী প্রজন্মের জন্য। তাই জুড়ির দল সমবেত সুরে ও প্রার্থনার ভঙ্গিতে বিভিন্ন তলে দাঁড়িয়ে এক অনবদ্য কোরিওগ্রাফি তৈরি করে। তারই মধ্যে কথকরূপী শাঁওলী মিত্র তীব্র আবেগে, শক্তিতে আহ্বান জানান— এই পৃথিবীতে ন্যায়, নীতি, সত্য, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার আগামী প্রজন্মের পৃথিবীটাকে ভালো করে দেবার। আকুল হয়ে ওঠে তার কণ্ঠস্বর সর্ব পাপ দূর হোক/আকাশ নির্মল হোক/ বায়ু পবিত্র হোক/এই পৃথিবী গ্লানিমুক্ত হোক। সন্তান-সন্ততিদের জন্য যে নাট্যকার নির্দেশক গ্লানিমুক্ত কলুষমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখাতে চান তিনি তো তখন আর শুধু মহাভারতের সময়ে আটকে থাকেন না। মহাভারতের উড়ানে আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে বাস্তব অসত্য, অসুন্দরের প্রতিস্পর্ধী সত্য সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন আঁকেন। সমকালীন প্রত্যাশায় এ নাটক এবং নাটকের নির্দেশক সমাজ-প্রতিভূ হয়ে ওঠেন। অথচ এই সর্বশেষ প্রার্থনাটি সম্পর্কে নাট্যকারকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ১৯৯০ সালের জানুয়ারিতে 'কথা অমৃতসমান' মঞ্চস্থ হয়েছিল— তার কিছু দিন আগেই গোরবাচভ আর রেগনের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাই কারও কারও মনে হয়েছিল নাটকের শেষে প্রার্থনাটির কোনও প্রয়োজন নেই কেননা আমরা এখন আর ওই 'edge'-টায় দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু নাটক থেকে এই প্রার্থনা অংশটুকু বাদ দেননি নির্দেশক। আর সত্যিই আশ্চর্যের বিষয় কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় খাড়িযুদ্ধ। মানুষ প্রত্যক্ষ করল অস্ত্রনিক্ষেপের ভয়াবহ পরিণতি। পশুপাখির মৃত্যু-পরিবেশের এক ভয়ানক বিপর্যয়— 'কথা অমৃতসমান'-এও কথক বলে মাছেদের, পাখিদের মরে যাওয়ার কথা আর এ নাটক তখন রাজনৈতিক সামজিক দিক থেকে হয়ে ওঠে সমকালীন। নির্দেশক শাঁওলী মিত্র মহাভারতকে অবলম্বন করে পারিপার্শ্বিক জীবনের জটিলতার স্তরগুলোকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই পৃথিবীকে গ্লানিমুক্ত করার জন্য আকুল হয়েছেন। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে শাঁওলী মিত্র মনে করেন মানুষ হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো আমরা তুচ্ছ, আমাদের ক্ষমতা বা বুদ্ধিও সীমিত— 'কিন্তু, তবু, ব্যক্তিমানুষ হিসাবেই আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু দায় থাকে সমাজের প্রতি। যে সমাজটায় বাস করি, সে সমাজটা আছে বলে 'ব্যক্তি আমি'-টা কিছু সুবিধা ভোগ করে থাকি— সেই সমাজটার প্রতি কিছুটা কর্তব্য থাকেই আমার।'[১৮] এই কর্তব্য থেকেই এই দায়বদ্ধতা থেকে একজন সচেতন শিল্পী তাঁর নাটকে— নাট্যকর্মে সমাজমনস্কতার পরিচয় দেন শিল্পীসত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই। 'কারণ থিয়েটর তো মানুষকে নিয়ে, মানুষের জন্যে। মানুষের গভীর সমস্যার কথাই তো বলে শিল্প। ছবি, গান, সাহিত্য, থিয়েটর .... ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সেইসব সমস্যা যখন মানুষের চেতনাকে নাড়া দেয়, মানুষকে গভীর করে তোলে, তখনই আমরা শিল্পের আস্বাদ পাই।'[১৯] যিনি নাটক থেকে 'নাট্য' গড়েন তিনি অবশ্যই এক রূপকার। তিনি চরিত্রগুলো নানাভাবে দাঁড় করিয়ে বসিয়ে ছবি রচনা করেন। তাঁকে

সাহায্য করে আলো, মঞ্চ, রঙ। বাচনভঙ্গির নকশায়, সংলাপের সুরে, আবার কখনও শুধুই নৈঃশব্দ্য দিয়ে নির্মিত হয় নাট্য অবয়র। ছবি বা composition নাট্যনির্দেশকের কাছে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নাটক তো শুধুমাত্র বিনোদন নয় তাঁর কাছে, আরও গভীর কোনও অন্বেষণ। তাই প্রথম যে প্রশ্নটা তাঁর কাছে উত্থাপিত হয় তা হল নাট্যনির্মাণের উদ্দেশ্য কী? শাঁওলি মিত্রর ভাবনায়— 'তবু কেবলমাত্র বিনোদনের কথা মাথায় রেখে আমরা নাটক করি না। করতে ইচ্ছে হয় না। আমাদের এমন কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করে যাতে সামাজিক মানুষ হিসেবে বাঁচতে বাঁচতে আমাদের যা কিছু অনুভব হচ্ছে তার সবটুকু উজাড় করে দেওয়া যায় ঐ নাট্যের মাধ্যমে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন, আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট, আমাদের রাজনৈতিক বাতাবরণ, আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থান— এই সবটার মধ্যে বাঁচতে বাঁচতে মানুষ বলেই মনের মধ্যে কিছু কথা তো জন্মাতে বাধ্য! কিছু কিছু অনুভব তো এমন থাকবেই যা তাড়া করে ফিরবে আমাদের! সেই কথাগুলো এই নাট্যশিল্পের পাটাতনকে অবলম্বন করে আমরা বলতে চাই।'[২০] অর্থাৎ একজন নাট্য নির্দেশকের কাছে বিশেষ করে শাঁওলী মিত্রের মতো সমাজমনস্ক সচেতন নাট্যনির্দেশকের কাছে (ক) নাটক শুধুমাত্র বিনোদন নয় (খ) নাটকের মধ্যে এমন কিছু বার্তা পৌঁছে দিতে চান যাতে সামাজিক মানুষের বাঁচার অনুভূতিগুলো ছোঁয়া যায়। (গ) মানুষের দৈনন্দিন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে কিছু কথা জন্ম নেয় যা তাড়া করে বেড়ায়— সেই কথাগুলো প্রকাশ করার জন্য নাট্যমঞ্চ হয়ে ওঠে এক জোরালো পাটাতন। শাঁওলী মিত্রের নাট্যনির্মাণের মূল লক্ষ্যই হল সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের উত্তরণের পথ খোঁজা।

**রাজা (১৯৮৭) :** 'নাথবতী অনাথবৎ' প্রযোজনার প্রায় চার বছর পর শাঁওলী মিত্র 'পঞ্চম বৈদিক'-এর হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা'- নাটকটি মঞ্চস্থ করান। 'রাজা'- বহুরূপীতে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় অভিনয় হয় ১৯৬৪ সালে— 'দুটি অন্ধকারের নাটক' এই শিরোনামে। 'রাজা'র সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল 'রাজা অয়দিপাউস' সফোক্লিসের গ্রিক নাটকের বাংলা অনুবাদ। তাই ১৯৮৭ সালে 'পঞ্চম বৈদিক' যখন 'রাজা' আবার মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিল তখন শম্ভু মিত্রের নামটি অবশ্য পরিচালক হিসেবে ব্যবহৃত হল না শম্ভু মিত্রের আপত্তির কারণে। পরিচালনা বলতে যা বোঝায় এ নাটকে শম্ভু মিত্র তা করেননি বলেই তিনি স্বয়ং নিজে আপত্তি তুলেছিলেন। যদিও এ কথা সত্য যে মঞ্চভাবনা, আলোক পরিকল্পনা আবহচিন্তা সর্বত্রই তাঁর প্রভাব ছিল স্পষ্ট। হয়তো এ কারণেই পুরোপুরি পরিচালক হিসেবে নিজেকে প্রচারিত করতে না চাইলেও 'তত্ত্বাবধায়ক' হিসেবে তাঁর নামটি ব্যবহৃত হল। টিকিটের প্রদর্শিত ভাষা ছিল এইরকম :

'শম্ভু মিত্রের তত্ত্ববধানে
তাঁরই পূর্বতন প্রযোজনার ধারা অনুসরণে পঞ্চম বৈদিক-এর
নিবেদন রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' "
'শম্ভু মিত্রের তত্ত্বাবধানে পঞ্চম বৈদিক-এর নিবেদন রবীন্দ্রনাথের
রাজা। (৪ঠা জুলাই ১৯৮৭ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার শো-এর টিকিট।
২৮শে এপ্রিল '৮৭ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। প্রবেশ মূল্য ১৫টাকা।)'[২১]

এ নাটকের পরিচালক হিসেবে শম্ভু মিত্রের নামটি ব্যবহার করা না হলেও প্রকারান্তরে তিনিই পরিচালক। 'রাজা' নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকে নিজেরাই মহলা শুরু করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পরিবর্ধন— সবটাই করেছিলেন শম্ভু মিত্র। তাই এই পরিচালনার কৃতিত্ব নিতে চাননি কেউই। তবে যেহেতু শাঁওলী মিত্র পঞ্চম বৈদিকের প্রধান প্রয়োগকর্তা, তাই এটুকু অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে তত্ত্বাবধায়ক রূপে শম্ভু মিত্র থাকলেও নাট্যসম্পর্কিত আরও নানাবিধ চিন্তাভাবনার রূপকার হিসেবে শাঁওলী মিত্রের নামটি উঠে আসা স্বাভাবিক। কেননা দীর্ঘদিন ধরে শম্ভু মিত্রের পাশাপাশি থাকার সুবাদে তাঁর চিন্তাপ্রণালী ও কার্যনির্বাহের পদ্ধতি সম্পর্কে অন্তর্গূঢ় বোঝাপড়ার ক্ষেত্রটি অনেক বেশি শাঁওলী মিত্রের আয়ত্তাধীন। এই প্রেক্ষিতেই 'রাজা' নাটকটির মঞ্চায়ন সম্পর্কে আলোচনা করব। শাঁওলী মিত্র অবশ্য এ নাটক সম্পর্কে স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন— '১৯৮৭ সালে 'রাজা' নাটকটির যে প্রযোজনা আমরা করেছিলাম তার মান প্রয়োজনীয় উচ্চতা স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু 'রাজা' তো তেমনই একটা নাটক যার আবেদন সর্বকালীন। এই নাটককে 'মিস্টিক' আখ্যা দিয়ে যাঁরা ঠেলে দিতে চান তাঁরা সম্ভবত ঠিক করেন না।'[২২]

'রাজা' শুধু মিস্টিক ভাবনায় জারিত নয়— কোন বার্তা এ নাটককে সর্বকালীন হওয়ার উচ্চতা দিয়েছে বিচার্য সেটাই। বহুরূপী যখন এই নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করে তখন তাদের মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের নাটক অন্য রকমের নাটক। এ-নাটকে ইউরোপীয় নাটকের ব্যাকরণ বা বৈশিষ্ট্য কঠোর কঠিন হিসেবে মানা হয়নি— ইউরোপীয় নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়াসও এখানে নেই। কিন্তু রবীন্দ্র নাটকে আছে আমাদের দেশজ যাত্রা। দেশের সংস্কৃত নাটক, আমাদের দেশজ শিল্পচর্চার ঐতিহ্যে ধরা পড়ে যে ব্যাপ্তি— সাধারণ থেকে প্রতীক, মাটি-আকাশ, স্থূল-সূক্ষ্মের অনুভব— তারই ছবি। তাই বহুরূপী অমোঘ টানে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে রবীন্দ্র নাটকের কাছে। এটাই এ নাটকের মূল নির্যাস। বহুরূপী তাদের 'রাজা' নাটকের স্মরণিকায় লিখেছিল— 'দিনের প্রখর

আলোকের কোলাহল ছাড়িয়ে এক দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে আমরা একক। সেইখানে সেই রহস্যময় অন্ধকারের সঙ্গে আমাদের নিজের নিজের মতো ক'রে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। করতেই হয়। আর সেই সম্পর্কেরই ছায়া এসে আমাদের দিনের আলোর চলাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ... সেই প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর অন্ধকারকে নিজের মধ্যে অনুভব করলেই তবে আলোতে বেরিয়ে এসে এই পৃথিবীর উৎসবকে বুঝতে পারা যায়, তার বাস্তবের লীলার মধ্যে নিজের বাঁচাকেও মিলিয়ে তোলা যায়। রাণী সুদর্শনার আত্মোপলব্ধির সেই তীর্থযাত্রার কাহিনিই এই নাটক।'[২৩] বহুরূপীর মনে হয়েছিল 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কাহিনি বলেছেন। যে অন্ধকারের মধ্যে রাজা আছেন— তা শূন্য নয়। এই রাজা অন্ধকারের রাজা— আর মানুষকে সেই অন্ধকারের কাছে নিবেদন করা শিখতে হয়। সে নিবেদন সহজ নয়। তবে অন্ধকারের সেই রাজাকে না উপলব্ধি করতে পারলে, না চিনতে পারলে বাইরের পৃথিবীর উৎসব আলোর মধ্যে রাজাকে চিনে নেওয়া যায় না। এই রকম এক গভীর অনুভূতির কথা বলে যে নাটক, তার মঞ্চায়ন বড় সহজ ছিল না। 'বহুরূপী'র প্রযোজনাটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল যেমন শিক্ষিত সমাজের কাছে বিষয়গত দিক থেকে তেমনই অভিনয় ও প্রস্তাবনা বা মঞ্চ প্রয়োগের উদ্ভাবনায় চমৎকৃত হয়েছিল দর্শক সমাজ। শুধু শম্ভু মিত্রের নির্দেশনা ব্যতিরেকেও তৃপ্তি মিত্রের রানি সুদর্শনা, অন্ধকারের রাজার নেপথ্য কণ্ঠে শম্ভু মিত্রের নাটক অভিনয়, কুমার রায়ের ঠাকুর্দা, পরবর্তী সময়ে শাঁওলী মিত্রের সুরঙ্গমা, পাগলের ভূমিকায় শোভেন মজুমদারের মুক্ত কণ্ঠে গান 'আমার সোনার হরিণ চাই'— সব কিছু মিলিয়ে এ নাটকের মঞ্চ উপস্থাপনা ছিল দর্শকের কাছে অসাধারণ অভিজ্ঞতা। 'রাজা' নাটকের জনপ্রিয়তা সমকালে বহুরূপীকে ঋদ্ধ করেছে। বহুরূপীর এই মনোগত চিন্তা-ভাবনা পঞ্চম বৈদিকের প্রযোজনার ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হয়েছে। পঞ্চম বৈদিকের ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় 'রাজা' নাটকের সারবস্তু। পঞ্চম বৈদিক কোন ভাবনা থেকে এ নাটকের মঞ্চায়ন ঘটায়, তা তারা ব্যক্ত করেছে তাদের স্মরণিকায়। অন্ধকারের মধ্য থেকে যে আলো উৎসারিত হয়— এ নাটক সেই আলো সেই অন্ধকারের নাটক। 'এ এক অন্তর্মুখী যাত্রার কথা বলে। 'এ জার্নি টুয়ার্ডস ওয়ান'স্ ওন সেল্ফ্'। এ যাত্রা রাণী সুদর্শনার। এই যাত্রা সমস্ত ব্যক্তি মানুষের আত্মোপলব্ধির যাত্রা।'[২৪] বহুরূপী যেখানে শেষ করেছে অর্থাৎ যে বাক্যটি দিয়ে সেখানে বলা হচ্ছে রানি সুদর্শনার আত্মোপলব্ধির তীর্থযাত্রার কথা। পঞ্চম বৈদিক তাদের প্রযোজনা সংক্রান্ত বক্তব্যে জানাল— এই যাত্রা রানি সুদর্শনার। শেষ বাক্যটি লেখা হল, এই যাত্রা সমস্ত ব্যক্তি মানুষের আত্মোপলব্ধির যাত্রা। রানি সুদর্শনার উপলব্ধিকে বৃহত্তর ভূমিতে সমস্ত ব্যক্তিমানুষের উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করা হল।

‘রাজা’ নাটকের কাজ পঞ্চম বৈদিক শুরু করে ১৯৮৭ সাল নাগাদ আর নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯৮৭-র মার্চ মাসে। এই সময় থেকেই তৃপ্তি মিত্র অসুস্থ হয়ে পড়েন আর ১৯৮৯-তে তিনি মারা যান। ‘রাজা’ নাটকের মঞ্চায়ন ও অভিনয় চলাকালীন দিনগুলি শাঁওলী মিত্রের অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে কাটে মায়ের অসুস্থতার কারণে। এ নাটকের প্রস্তুতির পর্ব চলে কখনও সতীশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে। যদিও এ বাড়িটি মহড়া দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ছিল না। ছোট ছোট অন্ধকার ঘর, উঠোন পেরিয়ে স্যাঁতস্যাঁতে বাথরুম— প্রতিবেশীদের অসহযোগিতায় খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি পঞ্চম বৈদিকের সদস্যরা। তার পর- শম্ভু মিত্র গোলপার্কের ফ্ল্যাটটি পাওয়ার পর সেখানে শুরু হয় ‘রাজা’র রিহার্সাল। ১৯৮৭-র পুজোর সময় পার্কসার্কাসের বাড়ি ছেড়ে, পাড়া ছেড়ে শাঁওলী মিত্ররা নতুন ফ্ল্যাট নিয়ে চলে আসেন বকুলবাগানে— সেখানে বিজয়লক্ষ্মী বর্মনের বাড়িতে পঞ্চম বৈদিক কাজ করতে শুরু করে। চলছিল পঞ্চম বৈদিক পরিচালিত নাট্যবিষয়ক নানান বিষয়ে শিক্ষার কাজ। কিন্তু মায়ের অসুস্থতার কারণে শাঁওলী মিত্র খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েন— আগের মতো দায়িত্ব নিতে পারছিলেন না। ফলত কোথায় যেন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে ভাঁটা পড়ছিল— এই অবস্থায় ‘চর্যাশ্রম’ বন্ধ করে দিতে হয়। ১৯৮৯ সালের মে মাসে তৃপ্তি মিত্রের মৃত্যু শাঁওলী মিত্রের মনের ওপর প্রবল চাপ, উপরন্তু পঞ্চম বৈদিকের থেকে কলকাতা দূরদর্শনের জন্য ‘সুভা’ টেলিফিল্মের কাজের ব্যস্ততা— সবটা মিলিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হল তাতে ‘রাজা’ নাটকের প্রযোজনাও বন্ধ করে দিতে হল। কারণ শাঁওলী মিত্রেরা বুঝতে পারছিলেন যে তাঁদের আশানুরূপ প্রযোজনার মাত্রা ছুঁতে পারছে না এই ‘রাজা’ প্রযোজনা। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন ‘রাজা’ তাঁরা ভাল করে করতে পারছেন না। নানান অসুবিধার কারণে প্রযোজনার ওপর যে চাপ পড়ে তাতে প্রযোজনার মান সব সময় ঠিক রাখা যায় না। সেই কারণেই নির্দেশকের সিদ্ধান্তে বা দলগত সহমতে প্রযোজনা বন্ধ করে দেওয়াই শ্রেয়। এ ছাড়া ‘রাজা’র প্রযোজনা নিয়েও নানান সমালোচনা হচ্ছিল— তুলনা এসে যাচ্ছিল ‘বহুরূপী’র প্রযোজনার সঙ্গে। ‘রাজা’র প্রযোজনার পূর্ববর্তী প্রযোজনা ‘নাথবতী অনাথবৎ’-এ শাঁওলী মিত্রের একক অভিনয় আর ‘রাজা’ বহু চরিত্রের সমাবেশ। শম্ভু মিত্র তত্ত্বাবধায়ক হলেও ভাল মন্দের অনেকটা দায়ভার বহন করতে হল মূলত শাঁওলী মিত্রকেই। ‘বর্তমান’ পত্রিকার নাট্যসমালোচক তন্দ্রা চক্রবর্তী লিখলেন: ‘‘তবে মনে রাখার মতো কয়েকটি দৃশ্য বুঝিয়ে দেয়, প্রযোজনার অলক্ষ্যে কতটা শম্ভু মিত্র রয়েছেন। বসন্তোৎসবের দৃশ্যে কোরিওগ্রাফ, পিছনে পর্দায় তার ছায়াপাত এসব পরিকল্পনা সুন্দর ও সার্থক। ...স্বীকার করতেই হবে, পঞ্চম বৈদিক তার ভূমিষ্ঠকালে যতটা শাঁওলী নির্ভর ছিল, আজ তৃতীয় প্রযোজনার সময়েও তা একই মাত্রায় বাঁধা। এতে আপত্তির নিশ্চয়ই কিছু থাকতে পারে না। তবে

দুটি জিনিষ বোধহয় মেনে নেওয়া উচিত যে, দলগত অভিনয়কে যেমন আরও সমৃদ্ধ করা দরকার তেমনি শাঁওলীর ভাবা উচিত, রাজার মতো নাটকের সম্পূর্ণতা দানে তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব থেকে যায়।’[২৫] আনন্দবাজার পত্রিকা (১৫.০৪.১৯৮৭)-য় সমালোচনার ভাষা আরও তীব্র। সেখানে বলা হল, এই নাটকে সুদর্শনার চরিত্রে শাঁওলী মিত্রের নিজস্বতা খুঁজে পাওয়া গেল না। তাঁর উচ্চারণ, অভিব্যক্তি, চলন বলন— কোথাও নতুনত্ব নেই, তা যেন তৃপ্তি মিত্রের জেরক্স কপি। সমালোচকের আক্ষেপ, এই ‘রাজা’ আগের ‘রাজা’র ছায়াতেই আচ্ছন্ন— ভিন্নতর মাত্রা আত্মপ্রকাশে অসমর্থ।

শাঁওলী মিত্র অবশ্য জানতেন সমালোচনা হবেই— তবুও তিনি এগিয়ে ছিলেন। আসলে এ নাটকের বিষয়ভাবনার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ ছিল— তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত, এ নাটকে মানুষের আত্মিক উন্নতির কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। নিজেকে জানার নাটক এই রাজা। রানি সুদর্শনার অনুভূতি নয়— সাধারণ মানুষকেও এই রকম টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আবার আঙ্গিকের দিক থেকে এ নাটকের মধ্যে আছে ভারতীয়ত্ব— প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য এবং যাত্রার ঐতিহ্যই যেন ‘রাজা’ নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত। এই ভাবনাই শাঁওলী মিত্রকে তাড়িত করেছিল। ‘রাজা’র মহড়া শুরু করেন নিজেরাই— তিন-চারমাস মহলার পর তাঁরা শম্ভু মিত্রকে নাটকটি দেখান; তার পরবর্তী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি অবশ্য শম্ভু মিত্রই করেছিলেন। ‘রাজা’র রিহার্সালের সময় থেকেই শাঁওলী মিত্রদের মাথায় ছিল ১৯৬৪-তে বহুরূপী প্রযোজিত ‘রাজা’র কথা। শাঁওলী মিত্র জানিয়েও ছিলেন ‘There will hardly be any changes’ মঞ্চ আলো এমনকী সঙ্গীত একই রকম থাকবে বলে মন্তব্য করেছিলেন। মঞ্চের ভাবনা, আলোর পরিকল্পনা, আবহের চিন্তা---- সবই করেছিলেন শম্ভু মিত্র। কিন্তু সমালোচকদের মন্তব্যের দায়ভার অনেকটাই বহন করতে হয়েছিল শাঁওলী মিত্রকেই। মঞ্চ ও অভিনয় সম্পর্কে অবশ্য প্রশংসামূলক আলোচনাও ‘রাজা’ নাটকের অন্যতম প্রাপ্তি। শাঁওলী মিত্র বহুরূপী প্রযোজিত ‘রাজা’তে সুরঙ্গমার চরিত্রে অভিনয় করতে শুরু করেন সম্ভবত ১৯৭২ সাল থেকে। তাঁর আগে এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন লতিকা বসু ও আরতি মৈত্র। শম্ভু মিত্র, শাঁওলী মিত্রের সুরঙ্গমার চরিত্রায়ণ সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। ‘পঞ্চম বৈদিক’-এর প্রযোজনায় সুরঙ্গমার চরিত্রে অভিনয় করেন বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ এবং সুদর্শনার ভূমিকায় শাঁওলী মিত্র। গৌরকিশোর ঘোষ— প্রখ্যাত সাহিত্যিকের কলমে উঠে এল পঞ্চম বৈদিকের প্রযোজনা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত অনুভব— ০৮.০৫. ১৯৮৭, আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘পঞ্চম বৈদিকের রাজা’ শিরোনামে লিখলেন— ‘রবীন্দ্রসদন দর্শকে একেবারে টইটম্বুর ছিল। ...একটু আগেই কে যেন বলছিল, শম্ভু মিত্র আসবেন না। কিন্তু প্রথম সারির একেবারে

বাঁ দিকের আসনটার উপর নজর পড়ল। শম্ভু বসে আছেন। তৃপ্তি মিত্রকেও দেখলাম, মাথায় ঘোমটা টেনে তিনিও এসে উপস্থিত হয়েছেন। শাঁওলী মিত্রের 'সুদর্শনা' দেখতে শম্ভু-তৃপ্তি আসবেন, এতে অবাক হইনি। যেটা অবাক লাগল, সেটা তরুণতরুণীদের ভিড়। ... শাঁওলীর সুদর্শনার মারাত্মক চঞ্চলতার পাশে বিজয়লক্ষ্মীর সুরঙ্গমার অনড় আত্মস্থতার বৈপরীত্যের মধ্যে হা হা করা সেই ট্রাজেডি গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম, এবার রবীন্দ্রসদনে পঞ্চম বৈদিকের 'রাজা' নাটকের অভিনয়ে। বরং বলা ভাল, শাঁওলী মিত্র এবং বিজয়লক্ষ্মী বর্মণের অভিনয়ে।'[২৬] শম্ভু মিত্রের তত্ত্বাবধানে থাকলেও শাঁওলী মিত্রের সাগ্রহ সক্রিয় অংশগ্রহণ 'রাজা' নাটকটির আলোচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই নাটক যে শাঁওলী মিত্রের অত্যন্ত প্রিয় নাটক তারও প্রমাণ তিনি দিয়েছেন 'রাজার একক পাঠ'— অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। মঞ্চ নাটক হিসেবে 'রাজা'র পুনরাভিনয় সম্ভব নয় জেনেই মনোযোগী হন 'রাজা'র পাঠাভিনয়ে। কারণ শাঁওলী মিত্রের অনুভব---- ''এ আসলে আত্ম-আবিষ্কারের নাটক। যখনই নিজের ভিতরের দিকে তাকাই আমি আর আমার অন্তর্গত সত্তা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। যে সমস্ত অহংকার আর তুচ্ছতা আমাদের জড়িয়ে থাকে,সে-সব ঝরে পড়তে থাকে। যেন অন্ধকারে ডুব দিয়ে আলোর পথনির্দেশ পাই।'[২৭]

মঞ্চভাবনার ক্ষেত্রে এসে পড়ে তুলনামূলক আলোচনা, তবে মঞ্চের ব্যবহার নাটকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যুগান্তর পত্রিকার নাট্য সমালোচকের তাই-ই মনে হয়েছিল। 'ধাপে ধাপে ওঠা অভিনব সেই সেট, উজ্জ্বল পর্দার সামনে মাঝে মাঝে সিল্যুয়েটের ব্যবহার পুরনো প্রযোজনাকেই মনে করিয়ে দেয়। দৃশ্যান্তরে জনবহুল রাস্তাটি কিংবা ঠাকুরদার গল্পের ছলে ভারি ভারি কথা বলাতেও অতীত প্রযোজনা যেন ছায়া ফেলে।'[২৮] প্রশংসিত হয়েছিল সহচরীসহ রানি সুদর্শনাকে দেখানোর রূপকল্পটি— যেন কোনও প্রখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবির মতো এই কম্পোজিশন। অন্ধকার মঞ্চে আলোর বৃত্তের মধ্যে ধরা পড়েন রানি সুদর্শনা। শুধুই দৃশ্যময়তা নয় অভিনয়ে প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে সংলাপের অন্তর্গূঢ় ভাবব্যঞ্জনা। মঞ্চ পরিকল্পনার অভিনবত্ব দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। দর্শক বিস্মিত হয়েছিল ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া মঞ্চ একবার হয়ে ওঠে রানি সুদর্শনার অন্ধকার কক্ষ যেখানে রাজার সঙ্গে তার মিলন হয় আবার পরক্ষণেই তা পথের দৃশ্য হিসেবে তৈরি।

'রাজা' নাটকটির সম্পূর্ণ নির্দেশনার ভার শাঁওলী মিত্রের ওপর বর্তায়নি। মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শম্ভু মিত্র। এই আলোচনায় তবু এ নাটকটি সম্পর্কে আলোচনা করা হল এই কারণেই যে এ নাটক নির্বাচন, চরিত্রানুযায়ী অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন, প্রথম দিকে কয়েক মাস রিহার্সাল করা,

প্রযোজনা প্রস্তুতির যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শাঁওলী মিত্রই। নির্দেশক হিসেবে তাঁর নামটি সরাসরি উল্লেখ করা না হলেও নির্দেশনা সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব ছিল অনস্বীকার্য।

**বিতত বিতংস (১৯৯৬):** এই নাটকের রচনাকার সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়, আবহ : তড়িৎ ভট্টাচার্য, আলো: বাদল দাস, স্বপন আঢ্য (সহযোগী), সম্পাদনা ও নির্দেশনা ছিল শাঁওলী মিত্র-র। প্রথম মঞ্চস্থ হয় : মার্চ,১৯৯৬, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। অভিনয় চরিত্রানুযায়ী— সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায় (অশেষ), বাবু দত্তরায় (বিলাস), শীলা দাস (সমাপিকা), সোমেন মুখোপাধ্যায় (নরেন), পার্থ মুখোপাধ্যায় (গড়ন), দেবকমল মণ্ডল (বিপদ), গৌরীশঙ্কর পাণ্ডা (বিত্তব্রত), রঞ্জনা চক্রবর্তী (পর্ণা), শাঁওলী মিত্র (তিস্তা)। অন্যান্য ভূমিকায়— তুষার রায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, দীপঙ্কর কুণ্ডু, দুর্গা ভট্টাচার্য।

১৯৯৬ সালের প্রযোজনা ‘বিতত বিতংস’ পূর্ববর্তী প্রযোজনাগুলি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। এর আগে শাঁওলী মিত্র মহাভারত কেন্দ্রিক দুটি কাজ করেছেন ‘নাথবতী অনাথবৎ’ ও ‘কথা অমৃতসমান’। এ নাটকগুলির আঙ্গিকগত পরিকাঠামোও প্রচলিত মঞ্চ নাটকের প্রথানুগ নয়। ১৯৮৭ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’ নাটকটি যখন তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়, তখন তিনি অনুসরণ করেছিলেন বহুরূপী প্রযোজিত শম্ভু মিত্র নির্দেশিত ১৯৬৪ সালের ‘রাজা’ নাটকের মঞ্চায়নের কাঠামো। কিন্তু মহাভারত বা রবীন্দ্রনাথের বাইরে বেরিয়ে এসে যখন তিনি গ্রহণ করলেন সমকালের কোনও সমস্যাবিক্ষুব্ধ কাহিনি, তখন তাঁর নির্দেশনার প্রথা-পদ্ধতি তিনি পরিবর্তন করলেন। দর্শক প্রত্যক্ষ করল বিষয়ের পরিবর্তন এবং পরিচালনার অভিনবত্ব।

‘বিতত বিতংস’ এমন একটি নাটক যা বাংলার মঞ্চে প্রথম দূষণের বিরুদ্ধে কথা বলল অন্তত পঞ্চম বৈদিক এমনই মনে করেছে। পঞ্চম বৈদিক তাদের নিজস্ব স্মরণিকায় এই নাটকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তসারে জানাচ্ছে — ‘দমনপুর। প্রস্তাবিত এক তামার খনিকে ঘিরে এ কাহিনীর বিস্তার। খনি ঠিক খনি নয়। এক অন্তঃসারশূন্য কাঠামো। নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যতই সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা হতে থাকে ততই সে চেপে বসে দমনপুর সমাজে। ইকোলজি আর ইকনমির মধ্যে ভারসাম্যের বিন্দু ঠিক কোথায়? যেখানে এই পৃথিবীটা আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারবে? এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মানুষ বুঝতে পারে সে পরিব্যাপ্ত ফাঁদে পড়া এক অস্তিত্ব। আলো-অন্ধকারের মধ্যে এক দিক্‌ভ্রান্ত সময়ের গল্প এই নাটক।’[২৯] এ নাটকের মুখ্য চরিত্র তিস্তা—

শিরদাঁড়া টান করে দাঁড়ানো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, যাবতীয় অব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াকু এক চরিত্র। এ নাটকের শেষে যে অনুভব করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি একজন মানুষকে তার স্বেচ্ছাধীন পথে চলতে দেয় না। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যায় তিস্তা। পরিস্থিতির চাপে তাকে হারতে হয়, কিন্তু অন্যায়ের কাছে সে কখনও মাথা নত করে না। সে চাকরিটাই ছেড়ে দেয় ভবিষ্যতের কথা না ভেবে। পঞ্চম বৈদিক তাই এ নাটকটি উৎসর্গ করে তাদের, যারা প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে যায় যাবতীয় অন্যায় অসমতা অবিচারের বিরুদ্ধে। তিস্তা এ নাটকে প্রথম থেকেই একটা চাপের মুখে— আক্রমণের মুখোমুখি। সেই আক্রমণ সব সময় হয়তো প্রত্যক্ষ নয়— পরোক্ষ আক্রমণও হতে পারে। তিস্তার শ্বশুর তার ছেলের মৃত্যুর জন্য, তিস্তার দেওরের স্ত্রী-র বিয়ে ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কারণে তিস্তাকে দায়ী করে। এ সবের বাইরে পারিবারিক চৌহদ্দি পেরিয়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তিস্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, পরিবেশবিদ হওয়া সত্ত্বেও সে নাকি তার কর্মরত অঞ্চলের উন্নয়নের পরিপন্থী। এই অভিযোগ উঠে আসে সমাজের নানান স্তর থেকে— কখনও শিল্পপতি বা বহুজাতিক সংস্থার পদস্থ কর্মীর কাছ থেকে, কখনও রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে (সরকারের পক্ষে অথবা বিপক্ষে)। পারিবারিক ও কর্মজগৎ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই তিস্তা বসু অবরুদ্ধ হতে থাকে। 'বিতত বিতংস' এই জটিল আবর্তের নাটক। বলা যেতে পারে তিস্তা বসু নামে এক লড়াকু মানবীর এই আবর্তের মধ্য থেকে, অন্যায় অবরোধের জালে জড়িয়ে পড়ার মধ্য থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহসী নাটক। নাট্যকার সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়ের লেখায় উঠে আসে এই নাটক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ' 'বিতত বিতংস' এক নিরন্ধ্র অন্ধকারের মাঝে প্রাণপাত আলোর অনুসন্ধানের গল্প। মানুষের গল্প। ... ঘটনাস্থলটির নাম 'দমনপুর'। এই গল্প শুনতে শুনতে যদি দর্শকের মনে হয় যে আমরা সবাই আসলে এক অদ্ভুত দমনপুরের বাসিন্দা, এই নাটক দেখতে দেখতে যদি তাঁদের চোখের সামনে দমনপুরের সীমান্তরেখাটা সরতে সরতে দিকচক্রবালে গিয়ে ঠেকে তাহলে বুঝবো আধুনিক পৃথিবীর সাম্প্রতিক সময়টাকে প্রতিফলিত করতে পেরেছি আমরা আমাদের কাছে। আমাদের শ্রম ও সন্ধিৎসা সার্থক। এই আধুনিক পৃথিবীর সাম্প্রতিক সময়ের প্রেক্ষিতেই 'বিতত বিতংস'।'[৩০]

এই নাটকের নামকরণের মধ্যেই সমগ্র নাটকের জটিল পরিব্যাপ্ত অদৃশ্য কূট অভিসন্ধির আভাস দেওয়া আছে। 'বিতত বিতংস' অর্থাৎ বিস্তৃত জাল। নাট্যকারের মনে হয়েছে আমরা মানুষেরা সবাই একই 'সময়ে' বেঁচে থাকি। সমকালীন সময়ের নানান স্বপ্ন ও ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকি। এই সময়ের অনুসন্ধান করতে করতে নাট্যকারের মনে হয়েছে মানুষের অস্তিত্ব যেন এক বিস্তৃত জটিল জালে আবদ্ধ

হয়ে পড়েছে। কেমন করে এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হবে মানুষ? মুক্তির একটা দিশা দেখাবারও চেষ্টা করেন নাট্যকার। তাই ‘বিতত বিতংস’ শুধু নিরেট অন্ধকারের নাটক নয়, তা অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলোরও সন্ধানী। ‘দমনপুর’ একটি ছোট্ট গ্রাম। এ গ্রামের সমস্যা শুরু হয় তখনই, যখন খবর রটে এ গ্রামের মাটির নীচে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে বলে। স্বভাবতই উদ্যোগ শুরু হয় তামার খনি বসানোর ব্যাপারে এবং খনি বসাতে গেলে উৎখাত হবে দমনপুরের আদিবাসী মানুষ। যারা খনি বসাতে চায় তাদের কাছে এই সাধারণ গরিব আদিবাসী মানুষগুলো মূল্যহীন, তাই তাদের বসবাসের জমিটুকু কেড়ে নিয়ে সেখানে তামার খনি তৈরি করার ক্ষেত্রে এদের মধ্যে কোনও দ্বিধা নেই, ক্ষমতার জোরে সবাইকে হাতের মুঠোয় আনতে চায় তারা। কিন্তু এই ক্ষমতাদম্ভী মানুষগুলোর, রাজনৈতিক প্রতিপত্তির জোরে সব কিছু কিনে নেওয়া মানুষগুলোর বিপক্ষে এসে দাঁড়ায় তিস্তা— পরিবেশ দফতরের আধিকারিক তিস্তা বসু। ঘটনাচক্রে সে এই গ্রামের বিত্তশালী এক পরিবারের বধূ। যদিও এই পরিবারের সন্তান প্রাণের সঙ্গে তার সামাজিক নিয়মকানুন মেনে বিবাহ হয়নি। ভালবাসার বন্ধনই ছিল তাদের সহবাসের শর্ত। প্রাণের উদ্দাম আবেগ, অতিরিক্ত মদ্যপান, নিজেকে নিঃশেষিত করে দেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার জীবনের গতিকে রুদ্ধ করে দেয়। অসহায়তা ছাড়া তিস্তার আর কিছু করণীয় থাকে না। প্রাণের মৃত্যুর পর সেই তিস্তাই ফিরে আসে প্রাণের বাড়িতে ‘দমনপুর’ গ্রামে। দমনপুর তার বর্তমান কর্মক্ষেত্রও। সেখানে পরিবেশবিদ হিসেবে প্রতিনিয়ত তার কাজ ব্যাহত হতে থাকে দমনপুরের ক্ষমতাসীন মানুষজন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের হস্তক্ষেপে। পরিবেশ দফতরের আধিকারিক তিস্তা বসু দমনপুরে আসে চাকরির সূত্রেই। এখানে একটা তামার খনি হবে কিন্তু তিস্তা বুঝতে পারে এখানে তামা নেই। আদিবাসী গ্রাম মংরাডিহি আর দমনপুরের মানুষকে যখন স্বার্থান্বেষী মানুষগুলো চাকরি ও উন্নয়নের টোপ দিয়ে নিজেরা মুনাফা লাভের চেষ্টা করছে এবং এ কাজে তিস্তা বাধা সৃষ্টি করছে বলে প্রকাশ্য সভায় প্রচার চালাচ্ছে, তখন সেই সভাতে তিস্তা সত্য বিষয়টি প্রমাণসহ প্রকাশ করলে তাকেই উল্টে হেনস্তা হতে হয়। ভাড়াটে গুণ্ডারা তিস্তাকে মারধর করে— তার হাত মুচড়ে দেয়। তাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। তিস্তা লড়াই করেছে— কিন্তু তামার খনি হওয়া আটকাতে পারেনি, পারেনি সাধারণ গ্রাম্য মানুষগুলোকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে। কিন্তু লড়াইয়ের ইতিবাচক দিক— যে তার রাজনীতিবিদ শ্বশুর বিলাস আর আপসে রাজি নন— কিংবা তিস্তার সংগ্রামে সচেতন হয়ে ওঠে আদিবাসী গ্রামের মানুষগুলো। চাকরি ছেড়ে দিয়েও তিস্তা কোথায় যেন জিতে যায়। তার বাঁ দিকের চোখের নীচে ক্ষত— ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে শরীরিকভাবে নির্যাতিত, তিস্তা বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মনে করে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব— বহু বিবর্তনের পর মানুষই তো

পেয়েছে খাড়া মেরুদণ্ড। '...মেরুদণ্ড বেচে মানুষ বাঁচে না, সে জ্ঞান, পেশী বেচতে পারে, মেধাও বেচতে পারে। মেরুদণ্ডটা বেচতে পারে না।' আবার এই মানুষই কিন্তু মানুষকে শোষণ করে। তিনটে স্তরে এই শোষণ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এ নাটকে— (১) নারী (২) আদিবাসী সমাজ (৩) প্রকৃতি।

কত কত মানুষের আবর্তন তিস্তাকে ঘিরে— ক্ষমতাবান প্রতিপক্ষ বিত্তব্রত রায়, খনি মালিকদের দালাল নরেন যেমন তিস্তার বিপক্ষে দাঁড়ায়, আবার অত্যন্ত আপন হয়ে ওঠে গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষজন, আদিবাসী সমাজের প্রতিভূ গড়ন, প্রাণের ছোটভাই অংশু বা অসু। তিস্তার পাশে দাঁড়ায় জিওলজিস্ট বন্ধু পর্ণা। অশেষ বা অসু, প্রাণের ভাই-এর সঙ্গে এক অজানা বন্ধুত্বের বাঁধনে জড়িয়ে পড়ে তিস্তা। আবার একই সঙ্গে চলে প্রতিবাদ লড়াই যাবতীয় অন্যায় অবিচার আর অপশাসনের বিরুদ্ধে। মানুষ নিতান্তই অসহায় ক্ষুদ্র আমাদের সমাজের শাসনযন্ত্র আর বাণিজ্যযন্ত্রের কাছে। তাই তিস্তাকেও হেরে যেতে হয়। কিন্তু হেরে গেলেও সে তার মাথা নীচু করে না। দমনপুরের সর্বনাশ আটকাতে না পারলেও তার মেরুদণ্ডকে কখনো সে নুব্জ করে না। তাকে পা বাড়াতে হয় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর সে জানে না কোথায় যাবে। শূন্য এক খাদের পাশে দাঁড়িয়েও আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দেয় না তিস্তা— বলে মানুষকে পারতে হয় পারতেই হয় কেননা মানুষ তো মানুষ। এই নাটকে তিস্তা প্রতীক হয়ে ওঠে— সমাজের সমস্ত লোভ-রিরংসা-ক্ষমতা-উচ্চাকাঙ্ক্ষার ছড়ানো জালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্তার। দর্শক হিসেবে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান কবি জয় গোস্বামী— '...নাটক দেখে ফিরে আসবার পথে আলো অন্ধকার সঙ্গীত নৈঃশব্দ্য একাকার হয়ে গিয়ে আমার মতো নাট্যশাস্ত্রে দীক্ষাহীন দর্শকের মনে ফিরে আসতে থাকে একটিই সংলাপ : পালাও, পালাও তিস্তা ... দিকচক্রবাল যতক্ষণ না দেওয়াল হয়ে পিঠে ঠেকে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পালাও ... আসলে, পালানো যে কোনো পথ হতে পারে না, ঘুরে যে আমাদের দাঁড়াতেই হয় একদিন— এই নাটক, তার চরিত্র ও সংলাপ নিয়ে, মঞ্চ ও আবহ নিয়ে, তার নির্দেশনা নিয়ে আমাকে জানাতে চায় এই কথাই। নির্দেশক শাঁওলী মিত্র  জানাতে পেরেছেন।'[৩১]

সমাজ-সচেতন নাট্য নির্দেশক হিসেবে শাঁওলি মিত্র তাঁর প্রথম প্রযোজনা থেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর নির্দেশিত তৃতীয় প্রযোজনা এই 'বিতত বিতংস' (১৯৯৬) নাটকটি সম্পর্কেও এই সচেতনতার কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। তাঁর মধ্যে যখন এই প্রশ্ন তাড়িত হচ্ছে যে এই কঠিন সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে কোন থিয়েটারটা করলে থিয়েটার অর্থবহ হয়ে উঠবে— তখন থিয়েটারকে অর্থবহ করে তুলবার তীব্র অভীপ্সায় শাঁওলী মিত্র বেছে নিচ্ছেন এমন একটি বিষয় যা

সব সময়েই শুধু প্রাসঙ্গিক নয় ভবিষ্যকালের কাছে আশঙ্কাজনকও। ভূ-তত্ত্ব ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে টানাপোড়েন, পরিবেশ ও নৈতিক দূষণ রুখতে একটি মেয়ের নিরন্তর লড়াই— এ নাটকের মুখ্য বিষয়। এ নাটকের রচনাকার সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায় বাস্তব সমস্যার প্রেক্ষিতে তুলে আনলেন পৃথিবীর গভীরতর অসুখের কথা। বিষয়ের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যাতে কোনও রকম বিচ্যুতি না ঘটে সে কারণেই পঞ্চম বৈদিক এই নাটকটির উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সাহায্য নিল দু'জন বৈজ্ঞানিকের — ভূ-তত্ত্ববিদ্ শম্ভু সেন এবং পরিবেশ বিজ্ঞানী অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের। 'কথা অমৃতসমান'-এর পরে যে জটিলতাগুলো তৈরি হচ্ছিল সমাজে, সেই কথাগুলো বলবার জন্যেই সেই মনোভাব থেকেই 'বিতত বিতংস' তৈরি করলেন শাঁওলী মিত্র। কি সেই কথা স্বভাবতই এ প্রশ্ন জাগে আমাদের মনে। নাট্যকার জানাচ্ছেন যে— একটা নাটক লেখবার তাগিদ আসে ভেতর থেকে। সোভিয়েট রাশিয়ার পতন বা পূর্ব ইউরোপের পতন তাঁকে প্রচণ্ডভাবে তাড়িত করেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতের মতো এই তৃতীয় বিশ্বের দেশের অবস্থান কোথায়, তা থেকে তাঁর মনের ভেতরে যে চিন্তাভাবনা জারিত হচ্ছিল সেইখান থেকে এ নাটকের জন্ম। কিন্তু নাট্যকারই একটি নাট্যের শেষকথা নয়— নির্দেশকের ভূমিকা এখানে সমান গুরুত্বের। ১৯৯২-র শেষের দিকে এ নাটকের কাজ শুরু হয়— এই সময় নাটকটি সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায় শোনান শাঁওলী মিত্রকে। নাটকটি শুনেই তাঁর মনে হয়েছিল এ নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রস্তুত হয়ে নাটকটি মঞ্চস্থ হতে সময় লেগেছে আরও সাড়ে তিন বছর। পরিবেশ দূষণকে ভিত্তি করে তাঁরা অনুসন্ধান করেছেন সমাজের বিবিধ সমস্যার কারণ। ভয়ঙ্কর ভয়াবহ এই সমস্ত সমস্যা আটকে থাকেনি শুধু মাত্র পরিবেশ দূষণের মধ্যে— তা ছড়িয়ে পড়েছে রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক দূষণের স্তরে স্তরে। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়োচিত বিষয়কেন্দ্রিক নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণের আগে এর কর্ম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন নির্দেশক এবং নাট্যকারকে তিনি অন্যভাবে ভাবার অবকাশ দিয়েছিলেন।

এমন একটা কর্ম এ নাটকের ক্ষেত্রে শাঁওলী মিত্রের কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল যা চিরাচরিত প্রথাবদ্ধ আঙ্গিক নয়। তিনি নাট্যকারকে এমন একটা ফর্ম তৈরি করতে বললেন যার মধ্য দিয়ে বলবার কথাগুলোকে সহজে পৌঁছে দেওয়া যাবে দর্শকের কাছে। এ কাজটা যথেষ্ট কঠিন ছিল কিন্তু নাট্যকারের সৌভাগ্য যে তাঁর চলবার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি নির্দেশকের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শাঁওলী মিত্রের নির্দেশনার যে ধরন সেখানে মহলা দিতে দিতে তিনি ক্রমশ নাটকের শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। শুরু থেকেই প্রায়োগিক বা মঞ্চগত দিকটা ছকে নেওয়া থাকে তা নয়, তবে

একটা গঠনগত পরিকল্পনা বা স্ট্রাকচার থাকে। সেখান থেকে ক্রমশ মহলা দিতে দিতে প্রস্তুতির বিবিধ পথ পেরিয়ে নাট্যনির্মাণের অবয়ব তৈরি হয়। নির্দেশক মনে করেন স্ট্রাকচার-কে অতিক্রম করে কোনও নির্দিষ্ট শিল্পগত স্তরে পৌঁছতে হলে এই প্রস্তুতির পথ অতিক্রম করাটা অত্যন্ত জরুরি। নাটকের মঞ্চভাবনার একটি উদাহরণ নির্দেশক নিজেই উল্লেখ করেছেন তাঁর পছন্দের কম্পোজিশন হিসেবে। নদীর ধারের একটি দৃশ্য বোঝাতে মঞ্চের ওপর দুটো স্লোপ বা ঢাল ব্যবহার করা হয়েছে— তিস্তা মঞ্চের এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে ঘুরে ওই ঢাল বেয়ে গড়নের হাত ধরে নেমে আসে— যেন সে নদীর জলের ধারে পৌঁছল। এই দৃশ্যটি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার জন্য কিন্তু নির্দেশক নদীর জল, গাছপালা, পাথর আনুষঙ্গিক উপকরণ ব্যবহার করলেন না। কিন্তু জলের শব্দ, দূর থেকে ভেসে আসা আদিবাসীদের গানের সুর, মাইমে তিস্তার মুখে জল ছেটানো, পাথর কুড়ানোর মধ্য দিয়ে তৈরি করে দিলেন নদীর পাড়ের পরিবেশ। আদিবাসী গড়ন ও তিস্তার কথোপকথনে উঠে এল আদিবাসী জীবনের নানান সমস্যার কথা। নির্দেশকের উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসী জীবনের ওই সমস্যার বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা— সেখানে মঞ্চ উপকরণ জরুরি নয়। আবার এই নাটকেই পরের দৃশ্যে দমনপুরে তামার সন্ধান মিলেছে বলে খনি তৈরির পরিকল্পনা, সেখানকার পাথরে অভ্র সন্ধান পেয়ে তিস্তা তার শ্বশুর বিলাস ব্যানার্জিকে বোঝাবার জন্য কোনও মূকাভিনয় নয়— সরাসরি পাথর ব্যবহার করে। জিওলজিস্ট পর্ণার চিঠি পড়ার দৃশ্য বা বিত্তব্রত ও নরেনের কথোপকথন দৃশ্যে জোন ব্যবহার করেন নির্দেশক। বলবার কথার প্রয়োজন অনুযায়ী ফর্ম নিয়ে ভাঙচুর করেন নির্দেশক শাঁওলী মিত্র। সেভাবেই তৈরি হয় মঞ্চভাবনা। কোনও নির্দিষ্ট রীতি বা প্রথার মধ্যে বেঁধে রাখতে চাননি নির্দেশক এ নাটকের ফর্মকে, বরং তাকে আরও সহজ ও গতিময় করে তুলতে চেয়েছেন। বিষয়গত দিক থেকে শুধু নয় নির্দেশক মঞ্চকে কীভাবে ব্যবহার করলেন তা সমালোচকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল— ‘In devising a stage that matches the naturalist content of the play and its symbolic dimensions, Mitra has settled for a simplified set. There is no clutter of furniture, only a few handy props that echo the geometry of the stage design. The different levels and fluid blocking allow the shift of action from home to office to riverside, telescoping time and space.’[৩২]

মঞ্চসজ্জার সঙ্গে আলোক সম্পাতের যথাযথ মেলবন্ধনে তৈরি হয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয় দ্বারা সৃষ্ট বিচিত্র নাট্যমুহূর্ত। এ নাটকে বাদল দাসের আলোর ব্যবহার বিষয়ের সঙ্গে যেমন সাযুজ্যপূর্ণ তেমনই নাটকের বিভিন্ন নাট্যমুহূর্ত— কখনও সংঘর্ষ বা কখনও আবেগজনিত অবস্থা

সৃজনেও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। নাট্যে বিষয় (text), অভিনয়, কম্পোজিশন, আলো, আবহ, মঞ্চসজ্জা ও উপকরণ— সব সুরগুলোকে এক তারে বেঁধে ফেলাটাই নির্দেশকের মুনশিয়ানার পরিচয়। 'বিতত বিতংস' নাটকের ক্ষেত্রে এই মেলবন্ধন তৈরি করতে পেরেছিলেন নির্দেশক।

নির্দেশক শাঁওলী মিত্র 'বিতত বিতংস' নাটকের ক্ষেত্রে এমন একটা প্রয়োগগত ফর্ম তৈরি করতে চেয়েছিলেন যা প্রথাগত নয়। বাংলা থিয়েটারে যে জোনাল অ্যাকটিং অর্থাৎ জোন ভাগ করে অভিনয়রীতি প্রচলিত— তেমন করে হয়তো বাড়ি, অফিস, নদীর ধারের কোনও দৃশ্য, জনসভা ইত্যাদি মঞ্চের নানান উপকরণ ও উপাদানের সাহায্য ডিটেলস্-এ দেখানো যেতে পারত কিন্তু নির্দেশক তাও চাননি। বাংলা নাটকের এই বহুল প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করে তিনি নাট্যকারকে এমন একটা ফর্ম তৈরি করতে বলেছিলেন যাতে বিভিন্ন স্থান বা দৃশ্যগুলো একটা গোটা সেটের মধ্যে, নিরাভরণ অথবা প্রয়োজনীয় বাস্তবতার মধ্যে বোনা যায়। অনেক ভাবনাচিন্তা করে এমন একটা ফর্ম তাঁরা তৈরি করতে চাইলেন যেখানে নাটকের মূল বক্তব্য প্রকাশ করাটাই উদ্দেশ্য। 'বিতত বিতংস'-এ বাস্তববাদী প্যাটার্নটা ভেঙে বারেবারে অন্য কোনও মাত্রায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বাস্তবকে ভর করেই বাস্তবকে ছাপিয়ে যেতে হবে, তবেই না একটা নাটক শিল্প হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পথকেই তাঁরা গ্রহণ করেছেন— রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর নাটকে বাস্তব মঞ্চসজ্জার একটা বিকল্প মঞ্চভাবনার জন্ম দিয়েছেন সেই ভাবনা অনুসরণ করেছে বহুরূপীতে— শম্ভু মিত্রের হাতেই এ ধরনের মঞ্চভাবনার প্রয়োগ ঘটেছে। এই পূর্ব অভিজ্ঞতাকে এবং নিজস্ব ভাবনাকে মিলিয়ে এমন ফর্ম তৈরি হল এ নাটকে যা ছিল শাঁওলী মিত্রের প্রার্থিত। নাট্যকারের কাছেও বিষয়টি হয়ে উঠেছিল এক চ্যালেঞ্জ। সে ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে নির্দেশকের প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ তাঁর ভাল লাগা, মন্দ লাগা, তাঁর আবেগ আনন্দের প্রকাশ নাট্যকারকে সাহায্য করেছিল। নাট্যকার বৌদ্ধিক এবং আত্মিক দুই স্তরেই সমর্থন পেয়েছিলেন নির্দেশকের।

**নির্দেশকের সমাজভাবনা:** 'বিতত বিতংস' পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়কেন্দ্রিক নাটক হলেও পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশকে কেন্দ্র করে বহু বিস্তৃত সমস্যা কীভাবে সমাজে প্রভাব ফেলেছে বা উল্টো দিক থেকে দেখলে সামাজিক নানান দুর্নীতি কীভাবে পরিবেশকে ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলছে— তারই আখ্যান এ নাটক। সমাজের অগ্রগতি বা উন্নয়নের আপাত মোড়কের আড়ালে নীতিহীনতার খেলা চলে। সেই মুখোশটাই টান মেরে খুলে দিতে চেয়েছেন নাট্যকার। নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্যর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্দেশকও তাঁর মঞ্চ উপস্থাপনার মূল লক্ষ্য স্থির রেখেছেন এই দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের সভ্যতার

অগ্রগতি বা উন্নয়নের মুখোশের আড়ালে স্বার্থসিদ্ধির, ক্ষমতালাভের ভয়ঙ্কর রাজনীতির ওপর। একটি সৎ, সাহসী, কর্তব্যপরায়ণ, শিক্ষিত সমাজমনস্ক মেয়ের নিরন্তর লড়াই ও তাকে নানান দিক থেকে পিষ্ট করার যে রাজনীতি চলতে থাকে সেখান থেকেই একটা সমাজের মূল চরিত্র প্রকাশিত হয়। এ নাটকের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শাঁওলী মিত্র কোনও এক জ্ঞানী ব্যক্তির মতকে স্মরণ করেছেন— সেখানে বলা হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনও সমাজব্যবস্থা আসলে কতটা সত্য তা ধরা পড়ে সেই সমাজে নারীর অবস্থানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। 'বিতত বিতংস' নাটকে নারীর নিজস্ব সমস্যা নয়— সমাজের উন্নতিকল্পে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সাধারণ বিপন্ন মানুষের বিপদে তাদের সচেতন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া তরুণীকে কীভাবে অজস্র উপায়ে আহত করা হল মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকে, সেই ছবিটাই উন্মোচিত হল এ নাটকে। রাষ্ট্রশক্তি, প্রশাসন, রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, বিত্তশালী শিল্পপতি সবাই চাইছে নানান দিক থেকে তিস্তার প্রগতিশীলতা যা দমনপুরের মানুষদের প্রকারান্তরে উন্নত করবে— তার কণ্ঠরোধ করতে। তিস্তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয় তিস্তাকে। তিস্তার স্বামী প্রাণেশের ভাই অশেষের সঙ্গে তিস্তার অবৈধ সম্পর্কের গল্প তৈরি করে তার ভাবমূর্তিকে কলুষিত করার চেষ্টা, তিস্তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন প্রমাণ করা, তিস্তার শ্বশুরমশাই বিলাসবাবুর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে দল থেকে বহিষ্কার করা ইত্যাদি নানান ঘটনায় নাট্যকার ও নির্দেশক বারবার এই সমাজের আলোর আড়ালের অন্ধকারগুলো চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এ নাটকে তিস্তা সেই 'শক্তি', সমাজের হিতার্থী। তিস্তা প্রতিপক্ষের কাছে হেরে যায়, কিন্তু তার মেরুদণ্ড থাকে দৃঢ়; কারণ সে মানুষ। মানুষকে তো মানুষ হিসেবেই বাঁচতে হবে। শাঁওলী মিত্র এই প্রশ্নটাই স্পষ্ট করেছেন নাটকের মধ্যে।

**এ নাটক করার উদ্দেশ্য কী?** শুধুমাত্র রিয়ালিস্টিক বা বাস্তববাদী নাটক করার জন্য 'বিতত বিতংস'র প্রযোজনা নয়। বাস্তবতা বা রিয়েলিটিকে প্রকাশ করার জন্য শাঁওলী মিত্র মঞ্চে অভিনয় করেন না— অভিনয় করার মূল উদ্দেশ্য সত্যকে প্রকাশ করার জন্যে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এ নাটকের প্রস্তুতি। চারিদিকে যে মূল্যবোধের অভাব— সেই অভাববোধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার দায় অনুভব করেছিলেন শাঁওলী মিত্র। 'একজন নাট্যকর্মী বা নাট্যশিল্পীর কাছে মঞ্চ-ই মাধ্যম, নাট্যই তাঁর অবলম্বন। 'যে মূল্যবোধের অভাব ঘনিয়ে এসেছে আমাদের জীবনে, তার কথাই তো বলতে চেয়েছি বারবার, তা সে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই হোক, বা মহাভারতকে কেন্দ্র করেই হোক। দর্শকের মধ্যে এই সচেতনতাটুকু জাগিয়ে দিতে পারে থিয়েটার, তাই আমার লক্ষ্য হল সেই বন্ধুরা—

যাঁরা টিকিট কেটে কষ্ট করে থিয়েটার দেখতে আসছেন, এঁরা বা এঁদের একাংশও যদি সচেতন হন নাটকটা দেখে, যদি এঁরা ভাবতে শুরু করেন যে চারপাশে যা হচ্ছে তা অন্যায়, তাহলে অন্তত কিছুটা কাজ তো হবেই। এই প্রশ্ন থেকেই আমার 'বিতত বিতংস' করা, বা এতাবৎ নাটক করে আসা।'[৩৩] এ নাটকটা জুড়ে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, যে চরিত্রগুলো উঠে এসেছে, তার মাধ্যমে তিনি সমকালীন ঘটনাকে অবলম্বন করে চিরন্তন সমস্যার কেন্দ্রে আঘাত করতে চেয়েছেন। নাট্যকারেরও মনে হয়েছে এই পৃথিবীতে আবহমানকাল থেকেই সবচেয়ে তীব্র মানবতার সংকট। মানুষ তো শুধুমাত্র কাঠামো নয়। রাজনীতি, অর্থনীতি বা প্রশাসনের কাঠামো নয়— মানুষ হল সজীব সতেজ প্রাণ। যে সমাজে মানুষকে কাঠামো ভিত্তিক হয়ে যেতে হয় সেখানেই তো দেখা দেয় মানবতার সংকট। এই সংকট যেন ফাঁসের মতো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরে মানুষকে। ক্ষমতাসীন মানুষ সব সময়ই নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কখনও বাণিজ্যিক বা আর্থিক লোভের কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে ব্যবহার করেছে পুতুলের মতো। 'বিতত বিতংস' নাটকে মূল প্রোটাগনিস্ট চরিত্র— তিস্তা সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। পারিবারিক ও সামাজিক— উভয়ক্ষেত্রেই। শিল্পপতি, বহুজাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারী, রাজনীতিবিদ্, বিরূপ রাজনৈতিক দল— সবাই-ই তিস্তার বিরুদ্ধে। কিন্তু এ নাটক শুধুমাত্র তিস্তা নামের কোনো এক মানবীর একার কাহিনি নয়— এ যেন এক নিরন্তর লড়াই মানবসত্তার সততার সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশ বিরোধী, মানব উন্নয়নের বিরোধী শক্তির। এ নাটক এমন এক ভয়াল সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় যেখানে মানুষ বুঝতে পারে বিপুল বিরোধী শক্তির চাপ কীভাবে ক্রমশ শিরদাঁড়া টান করে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে ন্যুব্জ করে দিতে থাকে। কিন্তু সবাই তো আত্মমর্যাদা আত্মসম্মান বিসর্জন দেয় না— পিছু হটলেও মেরুদণ্ড সোজা করে বাঁচার সাহস রাখে। তিস্তার মধ্য দিয়ে শাঁওলী মিত্র সেই সাহসী সত্তার প্রকাশ দেখিয়েছেন। সরাসরি পরিবেশ দফতরের অফিসার তিস্তা বসুর চরিত্রে শাঁওলী মিত্রের অনবদ্য অভিনয় 'বিতত বিতংস'-র মূল বক্তব্যকে আরও দৃঢ় করে তুলেছে। নির্দেশক যখন মূল ভূমিকাভিনেত্রী তখন নির্দেশকের কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি আরও সুদৃঢ়ভাবে উপস্থাপিত হয় বিশেষ করে শাঁওলী মিত্রের মতো পরিণত অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে এ কথাটা আরও সুপ্রযুক্ত। নাট্যসমালোচক প্রবীর ঘোষের সমালোচনায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে— 'Director Shaoli Mitra has left it almost wholly to performer Shaoli Mitra's histrionic talents to raise the script from inconsequence to a strong finish. She plays the central character, the widowed scientist daughter-in law, called upon to sanction an environmentally hazardous industrial project under the threat of personal and professioal harassment. Most important, she has added a third

dimension to a stage stereotype. She has balanced some of the stagey sentimentality of her script with the confidence of professional, aware of her risks, unfazed by repeated defeat, prepared to battle on doing the right thing.'[৩৪]

নির্দেশক শাঁওলী মিত্রের অবচেতনে বা চেতনে হয়তো কোথাও 'দশচক্র' নাটকের স্মৃতি লুকিয়ে ছিল। তাই রাজনৈতিক দল, বহুজাতিক সংস্থা, প্রগতিশীল যুবগোষ্ঠী, সাধারণ মানুষ— সবাই যখন ধরে নেয় তিস্তা উন্নয়নের বিপক্ষে— সে যেন গণশত্রুতে পরিণত হয়, তখন দর্শকের মনে পড়ে যাবে ইবসেন রচিত বিখ্যাত নাটক 'এনিমি অফ দ্য পিপ্‌ল্' নাটকের ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহ-র কথা। এই নাটকটি বহুরূপীর প্রযোজনায় রূপান্তরিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়। শম্ভু মিত্রের অভিনয় সমৃদ্ধ 'দশচক্র'-র চরিত্রটির আভাস বা ছায়াপাত ঘটে 'বিতত বিতংস'-এর তিস্তার চরিত্রে একেবারে শেষ দিকে এসে। সে একা। ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে নিজেকে হেঁচড়ে হেঁচড়ে সে মঞ্চের সামনের দিকে চলে আসে— সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি তার নেই— অনেক ঝড় তাকে সহ্য করতে হয়েছে— শারীরিক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তিস্তা এই বিপন্ন অবস্থার মধ্যেও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। সুবিধাবাদী, ভোগবাদী, মুনাফাবাজদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিস্তা শুধু বলতে চেয়েছে 'মানুষ'কে মানুষ হয়েই বাঁচতে হবে। কুঁকড়ে যাওয়া তিস্তার অবয়ব, সারা মঞ্চ জুড়ে আলোর মাধ্যমে ছড়িয়ে যাওয়া জালের ভাবনা নির্দেশনার নতুন ভাবনা। তবে এ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এক সমালোচকের অভিমত 'নাটকের শেষের দিকে বিস্ফোরণের পরে মঞ্চব্যাপী আলো অন্ধকার জাল ছড়িয়ে যাওয়াও একটু অধিকন্তু মনে হয়। পুরো নাটকটিই তো এতক্ষণ ধরে বলে চলেছে জালেরই কথা, ছড়িয়ে থাকা ফাঁদেরই কথা। তাই না? শেষ মুহূর্তে একে কিছু লঘু উপায় বলে বোধ হয়।'[৩৫] এই একজন ব্যক্তিমানুষের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে চেপে ধরা ছড়িয়ে পড়া শোষণের জাল কেমন করে গ্রাস করছে সমস্ত মানুষকে, তারই ছবি তৈরি করলেন নির্দেশক। নির্দেশক কিন্তু অত্যন্ত সচেতনভাবেই এ দৃশ্যের পরিকল্পনা করেছিলেন। নাটকের একেবারে শেষ দৃশ্যে কান্নায় ভেঙে পড়া তিস্তার আর্তনাদের মধ্যেই একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ 'আর তৎক্ষণাৎ আলো বদলে গেছে। মঞ্চ জুড়ে একটা জাল কেমন ঘুরছে! যেন গ্রাস করছে বিস্তৃত হয়ে প্রেক্ষাগৃহতে আমাদেরও। আমরা বুঝতে পারি কোনো পরিত্রাণ নেই আমাদেরও। আমরা কেউই এই জালের বাইরে নেই আর! জালটা বড় হচ্ছে, ঘুরছে।'[৩৬]

**সঙ্গীতভাবনা:** নাট্যে সঙ্গীত প্রয়োগ বা সঙ্গীতের ব্যবহার অপরিহার্য অঙ্গ। এ নাটকে নির্দেশকের মনে

হয়েছিল এ নাটক শুধুই যেন পারিবারিক বৃত্তের মধ্যেই আটকে না থাকে। পারিবারিক সীমানা অতিক্রম করে বৃহত্তর জনমানসের কথা বলে এই নাটক, দর্শককে দাঁড় করিয়ে দেয় অমোঘ সত্যের মুখোমুখি এবং জীবনের নানান জটিলতার স্তরকে উন্মোচিত করে। এমন এক বিষয়কেন্দ্রিক নাটকের শুরুতে এবং বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবহৃত হয় বৈদিক স্তোত্র— নিঃসন্দেহে এটি অভিনব ভাবনা। এই বন্দনাগানের ব্যবহার আমাদের অন্তরাত্মার উদ্ভাসন ঘটায়। এই স্তোত্র কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এবং এর মধ্যে এমন এক সাঙ্গীতিক পরম্পরা আছে যা উচ্চস্তরের ভাবনাকে শিল্পায়িত করতে পারে সেটাই দেখতে চেয়েছেন নির্দেশক। কোনও আঙ্গিক অভিনয়ের চেয়েও সুরের প্রয়োগ নাট্যে কখনও কখনও অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। সংস্কৃতজ্ঞ পরিবেশ বিজ্ঞানী ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় পঞ্চম বৈদিকের অনুরোধে ‘বিতত বিতংস’ নাটকের জন্য ঋক্‌বেদ থেকে স্তোত্র সংগ্রহ করে তার বাংলায় অনুবাদ করে দেন- যা এ নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ে-র অনুমতি সাপেক্ষে এই স্তোত্রের অন্ত্যমিল ঘটিয়ে সুরারোপ করা হয়। নির্দেশক চেয়েছিলেন বুদ্ধং শরণং গচ্ছামির মতো কোনও সুর। কেননা ওই সুরের মধ্যে দিয়ে অহিংসার বাণী মনকে স্পর্শ করে। স্তোত্রের মধ্যে ওই সুরটাই লাগানো হল। এ ছাড়া তিস্তা বা পর্ণা যখন বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষের রোষের মুখোমুখি পড়ে যায়— আহত হয়— তখন ব্যবহৃত হয় আলাপ বা তান। জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে এই ধরনের আবহ নাটকেও একটা উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি করে। আদিবাসী সমাজের প্রতিবেশকে চিনিয়ে দিতে গড়নদের গ্রাম থেকে ভেসে আসা গানে কোনও কথা নয় শুধু সুর ব্যবহার করা হয়েছে। ওই গ্রামের সুরই চিনিয়ে দেয় আদিবাসী জীবনের ছবি।

**পুতুলখেলা (২০০২):** ‘পুতুল খেলা’ প্রথম অভিনয় হয় ১৯ মে, ২০০২- অন্তরঙ্গ নাটমঞ্চে পঞ্চম বৈদিকের প্রযোজনায়। মূল নাটক হেনরিক ইবসেন (১৮২৮), নাট্যরূপান্তর শম্ভু মিত্র, নির্দেশনা শাঁওলী মিত্রের। আবহ তড়িৎ ভট্টাচার্য। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন— শাঁওলী মিত্র (বুলু), বাবু দত্ত রায় (তপন), সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায় (ডা. রায়), সঞ্জয় ভৌমিক (হেমন্ত), স্বপন আঢ্য (কেষ্টপদ), সুপর্ণা মিত্র ভৌমিক (কৃষ্ণা), সুস্মিতা রায় (আয়ি), তিস্তা লাহিড়ী (রন্টু), বহ্নিতা রায় (রিনি),পলাশ দাস (রিকশাওয়ালা); আলো- সুদীপ সান্যাল। এই নাটক সম্পর্কে পঞ্চম বৈদিক স্মরণিকায় লেখা হল— ‘এক পরিবারের গল্প। বুলু তপন তাদের সন্তান পারিবারিক বন্ধু ডা. রায়— সব নিয়ে আনন্দের জীবন। আপাত এই নিশ্চিন্ত শান্তির জীবনেও কোথায় কখন ফাটল ধরে— সেই ফাটল এতই বিরাট হয় যে বুলু বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয় তার পুতুল খেলার ঘর ছেড়ে। এ নাটক শুধু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে

নারীর অসহায়তার কথাই বলে না, মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে সমাজের ক্ষণভঙ্গুর সম্পর্ককে তুলে ধরে।'[৩৭]

হেনরিক ইবসেন ১৮২৮ সালে ইউরোপের নরওয়েতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বলা হয় ইউরোপের বাস্তব-প্রতিম নাটকের জন্মদাতা। পৃথিবীর বহু দেশে বহু ভাষায় তাঁর নাটক অনূদিত হয়েছে— অভিনীত হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরের এই নাট্যকারের 'দ্য ডলস্ হাউস' বহুরূপী মঞ্চস্থ করে— ১৯৫৮ সালে এবং পঞ্চম বৈদিক ২০০২ সালে শম্ভু মিত্রের রূপান্তরে। 'দ্য ডলস্ হাউস' নাটকের বাংলা রূপান্তর 'পুতুলখেলা'। নাটকের নাম, চরিত্রায়ণ, মূল নাটকের বার্তা, সময় এবং অবস্থান— সব ভারতীয়ত্বের কাঠামোয় গেঁথে নেওয়া হয়েছে। যেমন ক্রিস্টমাস হয়েছে পূজা, নাচের জায়গায় পরিবেশিত হয়েছে আবৃত্তি।

এ নাটক শুধুই নারীর অধিকার অর্জনের নাটক নয়। পঞ্চম বৈদিক মনে করে, খুব কাছ থেকে যদি এ সমস্যার ওপর নজর রাখা যায় তা হলে দেখা যাবে ইবসেন-এর মুখ্য ভাবনা ছিল যে, একটা সম্পর্ক কীভাবে কোনও একজনের আধিপত্যের জন্য আহত হয়। এ নাটকের ক্ষেত্রে যদি নোরাও তার স্বামীর ওপর তার আধিপত্য বা ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করত, তা হলে সেখানেও পরিণামে ট্র্যাজেডি-ই ঘনিয়ে উঠত। নাট্যকার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বেঁচে থাকার বিষয়ে গুরুতর শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেননি এ নাটকে। বরং বলা যেতে পারে, অর্থপূর্ণ বা সদর্থক বেঁচে থাকার একটা পথ দেখিয়েছেন। 'পঞ্চম বৈদিক'-এর ইংরেজি সারমর্মে লেখা হল এ নাটক প্রযোজনার অন্তর্কথন। 'If the play studied very closely, it may perhaps, seem the Ibsen's real was to find out how a relationship would be affected if one tried to dominate the other. If Nora had sought absolute dominance over her husband, the play would have reached the same tragic end. Ibsen didn't take on the responsibility of educating us in the nitty-gritty of daily living. One could say that he merely introduced a discourse on conducting our moral life meaningfully.'[৩৮]

২০০২ সালে শাঁওলী মিত্র যখন এ নাটকের নির্দেশনা দেন তখন অনেকেই এ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, এ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়— কারণ এ তো নারী-স্বাধীনতার নাটক এবং এখন অর্থাৎ ২০০২-এর সমকালে নারীরা অনেক উন্নত। তাই নতুন করে নারীর অধিকারের নাটক করা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু সত্যিই কি নারীরা স্বাধীন? তা হলে কেন প্রাত্যহিক সংবাদের পাতায় নারী নির্যাতন-বধূহত্যা-

নারীধর্ষণের সংবাদ উঠে আসে। নির্দেশকের মনে হয়েছিল এ নাটক তো শুধু নারীর অধিকারের কথা বলে না— তার চেয়েও আরও গভীর কোনও সমস্যার মূলে আঘাত করে। একটি পরিবারের কেন্দ্রস্থলে থাকে পুরুষ ও নারী। আরও অগ্রসর হয়ে বলা যায় যে মানবসভ্যতার উৎসমূলে আছে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। শুধু তো নারী বা পুরুষ নয়— সভ্যতার অগ্রগতি, সম্পর্কের জটিলতা, দু'জন ব্যক্তিমানুষের মধ্যেও কীভাবে মিথ্যাচার সন্দেহ ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ভাঙনের সৃষ্টি করে তা অস্বীকার করা যায় না। নারী-পুরুষের বা দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বাস ও মিথ্যাচার প্রবেশে ক্রমশ সম্পর্কের অবনমন ঘটে। এই ভাঙনের কাজ কখন কীভাবে অজান্তে ঢুকে পড়ে, ছড়িয়ে দেয় তার বিষ জাল, তছনছ করে দেয় সুখের সাজানো সংসার, তা বোঝা যায় না। তাই শাঁওলী মিত্রের মনে হয়েছে— 'এ নাটক যদি কেবল নারীমুক্তির কথা বলবার জন্য রচিত হত, তাহলে প্রথম অঙ্কেই প্রধান চরিত্র বুলুর পাশে কৃষ্ণার মতো স্বনির্ভর চরিত্রকে স্থাপিত করা হত না, যে নারী বরাবর নিজের দায় নিয়েছে, সংসারের দায় নিয়েছে একা। আমাদের মনে হয়েছিল এই একবিংশ শতাব্দীতে এই মিথ্যাচার বেড়েছে শুধু, কিছুমাত্র কমেনি। মনে হয়েছিল প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সেই স্বচ্ছতা আবশ্যক যাতে সমাজটা সুস্থ হতে পারে।'[৩৯] এ নাটকে উঠে এসেছে নানান চরিত্র— তাদের চারিত্রিক জটিলতা নিয়ে। যেমন ডা. রায়। তার মধ্য দিয়ে নাট্যকার সমাজের ব্যভিচারের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়েছেন; কেষ্টপদ, যাকে দেখে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলেও তার চরিত্রের কোথাও যেন ইতিবাচক দিকগুলো লুকিয়ে থাকে; তপন— এ নাটকের মূল পুরুষ চরিত্র— বাইরে যতটাই প্রগতিশীল বাক্যবাগীশ, পরিস্থিতির সামনে তার সমস্ত পুরুষত্ব ততই ভঙ্গুর; ইবসেন সৃষ্ট বিখ্যাত নোরার বঙ্গীকরণ বুলু এ নাটকের মুখ্য নারী চরিত্র, যাকে কেন্দ্র করে ঘটনার আবর্তন সেই বুলু নিজের আত্মসম্মানটুকু রক্ষা করার জন্য ছেড়ে চলে যায় তাঁর সাজানো সংসার, তার স্বামী, নাবালক সন্তানদের। স্বাধিকার অন্বেষণ তো শুধু এক নারীর নয়— নারীর মধ্যের মনুষ্য সত্তার।

২০০২ সালে পঞ্চম বৈদিক এ নাটক মঞ্চস্থ করেছিল এই প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করে। তার প্রায় চার দশক আগে 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থা শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় এ নাটকটি মঞ্চস্থ করে— ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে— প্রথম অভিনয় হয় মহাজাতি সদনে। বহুরূপী কেন এ নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিল এ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে তাঁদের কী অভিমত তা উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরি। 'পুতুলখেলা'র সারমর্মে বহুরূপী জানাল 'এ-নাটক যদি কেবলমাত্র নারীজাগরণের বা নারীর

ভোটাধিকারের প্রশ্ন আছে বলে মনে হোত তাহলে আজকের যুগে এ নাটক করার উৎসাহ বহুরূপীর হ'ত না। বহুরূপীর মনে হয়েছে যে এই পুতুলের সংসারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যেন পুতুলখেলার পুতুল। অতীত থেকে যে চিন্তা বংশপরম্পরায় আমাদের মধ্যে শিকড় মেলে বসে গেছে, আমরা তারই হাতের অসহায় পুতুল মাত্র। অথচ আমরা আমাদের সেই পুতুল-সত্তা সম্পর্কে সচেতন নই। সেইটাই এ ট্র্যাজেডির সবচেয়ে ভীতিপ্রদ অংশ।'[৪০] কোথায় সেই ট্র্যাজেডি? ট্র্যাজেডি সেখানেই যেখানে সমাজের সংসারের মূল কাঠামো যে নারী তাকে মানুষ হিসেবে ততটা স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, যতটা পুরুষের অধীন করে রাখা হয়েছে। পুরুষ বলতেই বোঝানো হয় সে নারীর রক্ষাকর্তা, আশ্রয়দাতা আর নারী মানেই আশ্রয়প্রার্থী নির্ভরশীল। পুরুষ সবল, নারী অবলা। সংসারে এই সবল আর অবলার পুতুলখেলা চলে। স্বামীর অহংকারে আঘাত না করে যে নারী মাথা নত করে সংসার করে যায়— সেখানে তৈরি হয় না কোনো সমস্যা। স্বামী স্ত্রীর সহমর্মিতার জায়গায় একপক্ষের ক্ষমতার আগ্রাসন এবং অপরজনকে মুখ বুজে সহ্য করে নেওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটা অসততা লুকিয়ে থাকে। সেটাই ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি। এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই লালিত হয় পরবর্তী প্রজন্ম। ইবসেন-এর নাটকে নোরা তার সাজানো সংসার ফেলে চলে যায়। এ নাটকের বুলুও চলে গেছে তার স্বামী, নাবালক সন্তান-সন্ততিকে ছেড়ে। তার শেষ কথা, সে পৃথিবীটাকে বুঝতে চায়— কেবল মেয়ে হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে। আবার যদি সে বিবাহ করে, সেই বিবাহে নারী পুরুষের মধ্যে ক্ষমতা বা অধিকারের অসমতা নয়— থাকবে শ্রদ্ধা ভালবাসা সহমর্মিতা-সমতার সম্পর্ক। নরনারীর বা দাম্পত্যের সহজ সুন্দর মিলনে জন্ম নেবে যে আগামী ভবিষ্যৎ, সেই দাম্পত্যের ভিত্তি যদি সৎ না হয়, তা হলে আগামী প্রজন্ম কোন নিশ্চয়তার পৃথিবীতে বাস করবে। নরনারীর সম্পর্কের দিকটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল শাঁওলী মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেখানেই এ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা। শাঁওলী মিত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করেছিলেন শম্ভু মিত্রের রূপান্তরিত নাট্যরূপটিই।

উনিশ শতকের শেষে ইবসেন-এর নোরার শব্দময় দরজা বন্ধের আওয়াজে ইউরোপ অনুভব করেছিল বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান কেঁপে উঠছে। শাঁওলী মিত্র এ নাটক যখন অভিনয় করলেন তখন নারী তার অবস্থান সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন, তবুও নারীর অবস্থানগত পরিবর্তন এমন জায়গায় পৌঁছায়নি যে 'পুতুল খেলা'র মতো নাটকের মঞ্চায়ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। 'বহুরূপী'র পুতুলখেলা নাটকের অভিনয় হয়েছে প্রায় কুড়ি বছর ধরে (১৯৫৮-৭৮) এবং এই পর্বে অর্থাৎ যখন পুতুলখেলার মহড়া শুরু হয় তখন শাঁওলী মিত্রের বয়স দশ বছর— এবং আরও কুড়ি বছর ধরে অভিনীত হওয়া

পুতুলখেলা নাটকটির মহলা ও অভিনয় শাঁওলী মিত্র প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর দশ বছর বয়স থেকে ত্রিশ বছর বয়স অবধি। তাঁর বোধের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই নাটকটি দেখা ও বোঝার ক্ষেত্রে ক্রমশ পরিবর্তন ঘটেছে। এটাই স্বাভাবিক। শম্ভু মিত্র নির্দেশিত এই 'পুতুলখেলা' নাটকের বিভিন্ন গতিপথ বিভিন্ন বাঁক— নির্দেশনার পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোযোগ সহকারে দেখবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন এবং এ নাটকের শেষে অভিনয়ের চব্বিশ বছর পরে তিনি 'পুতুলখেলা' নাটকটির পুনরাভিনয় সম্পর্ক সচেতন হন। তখন তিনি ব্যক্তিমানুষ হিসেবেও অনেক পরিণত।

নির্দেশনা ও মুখ্য চরিত্র বুলুর ভূমিকায় শাঁওলী নিজে অভিনয় করেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন নির্দেশনার ক্ষেত্রে বাবা শম্ভু মিত্র এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে মা তৃপ্তি। বিষয়টি কিন্তু একই সঙ্গে সুবিধার এবং অসুবিধার। কারণ নাটকটি সাফল্য পেলে মানুষের মনে হবে শম্ভু মিত্রের ছায়া বা আদলে তৈরি, আবার অসফল হলেও তার সম্পূর্ণ দায় বর্তাবে শাঁওলী মিত্রের ওপর। তাই তিনি একটা নিজস্ব গতিপথ তৈরি করলেন। যদিও তিনি এ নাটকটি তাঁর বাবা-মার উদ্দেশে মঞ্চস্থ করেন রানিকুঠির শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচার-এর ছোট্ট এক প্রেক্ষাগৃহে। যে মঞ্চ পরিকল্পনা করেছিলেন খালেদ চৌধুরী বহুরূপীর প্রযোজনায়, তাই অনুসরণ করলেন শাঁওলী মিত্র সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে। সমালোচকের মনে হয়েছিল 'The set with minor variations, was a replica of the one created by Khaled Chowdhury for the 50s production.'[৪১] অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তিনি বদলে নিয়েছিলেন অভিনয়রীতি। মা তৃপ্তি মিত্রের তুলনায় তিনি এই চরিত্র রূপায়ণে অনেক বেশি সংযত এবং পরিমিত। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে যখন সে মুখোমুখি হয়— তার বিবাহ, তার স্বামী এবং নিজের ভেতরের সত্যের। খুব শান্ত সংযত ভঙ্গিতে সে বোঝায় তার স্বামীকে, কেন তারা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি অভিমত আমরা পাচ্ছি— 'The Telegraph' পত্রিকার সাক্ষ্যে, যেখানে একাত্তর বছরের দীপ্তি চৌধুরী যিনি তৃপ্তি মিত্র অভিনীত এবং শাঁওলী মিত্র অভিনীত দুটি প্রযোজনাই দেখেছেন, তাঁর মনে হয়েছে বুলুর সিঁদুর মুছে ফেলার দৃশ্যে শাঁওলী মিত্র যতটা নিরাসক্ত— তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় সে ক্ষেত্রে অনেক বেশি নাটকীয়। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন ডা. রায় কিংবা তপন শম্ভু মিত্র নির্দেশিত 'পুতুলখেলা'য় পার্টির দৃশ্যে মদ্যপানাসক্ত ছিলেন? শম্ভু মিত্র যদি তাদের মদ্যপানে আকৃষ্ট না দেখিয়ে থাকেন, তা হলে শাঁওলী মিত্রের নির্দেশনায় তাদের সেভাবে দেখানো হল কেন? এর কারণ হিসেবে আমাদের মনে হয় সময়ের ব্যবধানে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে গেছে তারই একটা ধরন দেখানো হয়। সামাজিক বিবর্তনের ছবি তুলে ধরাই হয়তো নির্দেশকের

অভিপ্রেত ছিল। প্রজ্ঞা মৈত্র চট্টোপাধ্যায় যিনি বর্তমানে অধ্যাপিকা এবং মা আরতি মৈত্রের (বহুরূপীর অভিনেত্রী) কন্যা, পূর্বতন পুতুলখেলা নাটকে ছোটবেলায় তৃপ্তি মিত্রের ছোট মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন— তাঁর মনে হয়েছিল দুটি প্রযোজনায় কমবেশি একই ধরনের তবু বর্তমান প্রজন্ম শাঁওলী মিত্রের প্রযোজনা দেখে অনুমান করতে পারবে যে কত গৌরবোজ্জ্বল ছিল অতীত দিনের সেই প্রযোজনা। দিলীপ ঘোষ— বহুরূপীর সদস্য— ১৯৯৪ সালে মঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন— তাঁর অভিমত দুটি প্রযোজনায় মূলত একই ঘরানার, কিন্তু বহুরূপীর পুতুলখেলা ছিল তিন ঘন্টার তাকে শাঁওলী মিত্র অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে ২.১৫ মিনিটে বেঁধেছেন। তিনি বলেছেন 'The Sombhu Mitra gharana is still alive. Saoli does not imitate her parents any longer. They have used music but it is all very disciplined. Overall, the new production is much more detalied and mature.'[৪২]

এ নাটক এক নারীর আত্ম-আবিষ্কারের নাটক। হঠাৎই সে অনুভব করে, সে যেন হাওয়ার ওপর গড়ে তুলেছিল প্রাসাদ। ভেঙে পড়ে তার হাওয়া ইমারত এবং একজন নারীর কাছে সমস্ত দুনিয়াটা শূন্য ফাঁকা হয়ে যায়। বাড়ি ছেড়ে চলে যায় সে সত্যের সন্ধানে— সেই সত্য যা নিজেকে খোঁজার অনুপ্রেরণা যোগায়। 'পুতুলখেলা' প্রশ্ন তোলে এবং সামাজিক নীতি-নিয়ম, মানব-সম্পর্কের স্থায়িত্বর সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। এ নাটকের প্রধান চরিত্র তপন ও বুলু স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্ত। বুলু স্বামীর অসুস্থতার কারণে স্বামীকে লুকিয়ে কিছু টাকা করে এবং এই ধারের কারণ বুলুর বাবার একটি দলিলে সই করার কথা ছিল কিন্তু তার আগেই তিনি মারা যান এবং বুলু বাবার সই জাল করে। যার কাছ থেকে বুলু টাকা ধার করেছিল— সেই কেষ্টপদ-র জীবনের বিপর্যয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পরে বুলুর স্বামী তপন। তপন যে ব্যাঙ্কে ম্যানেজারের চাকরি পায় সেই ব্যাঙ্কের চাকুরে কেষ্টপদকে দুর্নীতির কারণে তপন বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে কেষ্টপদ বুলুর ওপর জুলুম খাটাতে থাকে, ভয় দেখাতে থাকে, কারণ তার জীবনটাও যে খাদের মুখে দাঁড়িয়ে। নাটকে এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে ঘটনা এগিয়ে  যায় চূড়ান্ত পরিণতির দিকে। চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘটনা পৌঁছানোর পথে আরও দুটি চরিত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে— তাঁরা হলেন ডাঃ রায়, তপন ও বুলুর পরিবারের বিশেষ বন্ধু। বুলুর প্রতি তাঁর একটা গভীর নিরুচ্চার আকর্ষণ আছে। সেই সম্পর্ক এই নাটকে চমৎকার বুনে দিয়েছেন নাট্যকার। ডাঃ রায় তাঁর বাবার ব্যভিচারের ভার বহন করেছেন তাঁর অসুস্থতার মধ্য দিয়ে এবং তাঁর জীবনের দিনগুলোও হাতে গোনা। এবং কৃষ্ণা— বুলুর ছোটবেলার বন্ধু। জীবনের ঝড়ঝাপটা সামলে, নানান দায়িত্ব পালন করেও একাকিত্বের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। পরিবারের জন্য সে অনেক দায়

নিয়েছে কিন্তু বর্তমানে নিঃসহায় অবস্থায় বুলুর কাছে এসেছে। বুলু তার স্বামীর মাধ্যমে তার একটা কাজের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে কিন্তু সংকট দানা বেঁধেছে এখানেই। কেষ্টপদকে বরখাস্ত করে কৃষ্ণাকে চাকরি দিতে তৎপর হওয়ায় কেষ্টপদ তার সমস্ত রাগ প্রতিহিংসা বুলুর টাকা ধার করা, সই জাল করা ইত্যাদি গোপনীয়তা ফাঁস করে দেওয়ার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। বুলুর জীবনের এই অন্ধকারময় দিকের সমস্ত ঘটনা চিঠিতে লিখে তপনের লেটার বক্সে ফেলে দিয়ে গেছে। এ চিঠি কিছুতেই যাতে তপনের হাতে না পড়ে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে বুলু। সাহায্য নিয়েছে বন্ধু কৃষ্ণার। এই সাংঘাতিক টানাপোড়েনের মুহূর্তটি নাটকের যে আততি তৈরি করে, তা নাটকীয় মুহূর্ত হিসেবে অনবদ্য। যে অনুষ্ঠানে বুলুর কবিতা বলার কথা, সেই আবৃত্তির মহড়া— ভুল করা— তপনকে আটকে রাখা নাটকের চূড়ান্ত পরিণতির দিকে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে যায়!

আট বছরের সাজানো সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেছে বুলু। ফিরিয়ে দিয়ে গেছে বিয়ের আংটি, মুছে ফেলেছে মাথার সিঁদুর। হিন্দু বাঙালি মেয়ের সিঁদুর মুছে ফেলার দৃশ্য সাংঘাতিক এক অভিঘাত সৃষ্টি করে সারা প্রেক্ষাগৃহে। বুলু চলে যাওয়ার সময় টিনের সদর দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেয়। পর্দা নেমে আসার আগে নাটকের শেষ বাক্যটি প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়— 'সদরের টিনের দরজা বন্ধ করার নির্দয় আওয়াজ।' এই শব্দ, এই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ইউরোপে। এক নারীর সমাজ প্রতিবাদের ধ্বনি; নিজেকে আবিষ্কারের শক্তি থেকে যা উৎপন্ন। সেই প্রতিবাদকে শাঁওলী মিত্র আবারও ফিরিয়ে আনলেন একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়— যখন মেয়েরা অনেক বেশি স্বাবলম্বী প্রগতিশীল। কিন্তু শাঁওলী মিত্রের প্রযোজনায় এ নাটক তো নারীর নয় শুধু— একজন ব্যক্তিমানুষের আত্মমর্যাদাবোধ, আত্ম-উন্মেষণের নাটক। এই জায়গায় নির্দেশক শাঁওলী মিত্রের স্বাতন্ত্র্য দর্শককে ভিন্নবোধে জাগিয়ে তোলে।

মঞ্চভাবনার ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্র নাটকের শুরুতেই যে নির্দেশ দিয়েছেন, বহুরূপী প্রযোজিত 'পুতুলখেলা'য় সেইভাবে খালেদ চৌধুরী মঞ্চ প্রস্তুত করেছিলেন। সেখানে এই নির্দেশ ছিল যে, ঘরটি স্বল্পব্যয়ে অত্যন্ত রুচিসম্মতভাবে সাজানো। স্টেজের বাঁদিকে (actor's left) একটি খিলান যার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ফ্ল্যাটের সদর দরজা, যেটি টিনের কেননা— এই 'দরজা'র একটা ভূমিকা আছে নাটকে এবং টিনের দরজা হওয়ারও কারণ যা বন্ধ করলে একটা নির্মম আওয়াজ সৃষ্টি হবে। মঞ্চের পিছনে আছে— সেটি এ নাটকের অন্যতম মূল চরিত্র তপনের কাজের ঘর যেখানে মক্কেলরা আসে। সেই ঘরের আরেকটি দরজা— যেটি সদর দরজার মুখোমুখি। অবশ্য সেই দরজাটি দর্শক প্রত্যক্ষ করে

না। স্টেজের বাঁ দিকে খিলান ও দরজার মাঝখানে কাঠের আলমারি; আরও সামনে বাঁ দিকে একটি জানালা। জানালার সামনে বইয়ের র‍্যাক, তার সামনে বেতের চেয়ার ও মোড়া। খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জায় শাঁওলী মিত্রের নির্দেশনায় 'পঞ্চম বৈদিক'-এর 'পুতুলখেলা' হয়ে উঠল আরেক সৃষ্টি। পূর্ব প্রযোজনার প্রভাব স্বীকার করে এবং নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়ে 'পুতুলখেলা'কে নতুন অবয়ব দিলেন একবিংশ শতকের এক নারীনির্দেশক। নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যাত হল ইবসেনের 'দ্য ডল্স হাউস' কিংবা শম্ভু মিত্রের 'পুতুলখেলা'। এ কারণে বাংলা মঞ্চে 'পঞ্চম বৈদিক'-এর প্রযোজনাটি পেল স্বতন্ত্র গুরুত্ব।

**রাজনৈতিক হত্যা ও চণ্ডালী :** ২০০২-এর পর শাঁওলী মিত্র পরিচালনা করেন আরও দুটি নাটক পঞ্চম বৈদিকের পক্ষে— একটি 'রাজনৈতিক হত্যা' (২০০৪) এবং অপরটি 'চণ্ডালী' (২০০৫)। এর পর পঞ্চম বৈদিক কিংবা অন্যত্র আর কোনও নাটকের পরিচালকের ভূমিকায় তাঁকে দেখা যায়নি। তিনি মূলত মনোনিবেশ করেছেন একক পাঠাভিনয়ে এবং পঞ্চম বৈদিকের প্রযোজনা 'পশুখামার' (২০০৬)-এ অর্পিতা ঘোষের নির্দেশনায় অভিনয় করেছেন। এই গবেষণাপত্রের সময়সীমা যেহেতু ২০০3 পর্যন্ত তাই উপরোক্ত নাটক দুটির আলোচনা এখানে স্থগিত থাকল।

## ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৪৫)

হিন্দি ভাষায় থিয়েটার করেও বাংলা রঙ্গমঞ্চকে নিরন্তর কাজের মধ্য দিয়ে সচল রেখেছেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়। আশির দশকে শাঁওলী মিত্র, সোহাগ সেন ও ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় কাছাকাছি সময়ে নাট্য নির্দেশনার কাজে যুক্ত হন। শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ নাট্যভাষায় তীব্র ও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভাষার ব্যবধান ভেঙে হিন্দি থিয়েটারকে আপন করে নিল বাঙালি দর্শক। হিন্দি ভাষায় নাটক করেও বাংলার মঞ্চে বাঙালি দর্শকের যে বিপুল সমাদর পেয়েছেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়, তা তুলনারহিত। কলকাতাকেন্দ্রিক থিয়েটার করেও তিনি বাংলা তথা সারা ভারত জুড়ে নিজের নাটকের দর্শক তৈরি করতে পেরেছেন। ভারতের বাইরেও ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত থেকেছেন তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলি নিয়ে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নাটকে ঊষা তাঁর নিজস্ব ধারায় বা পন্থায় উপস্থাপিত করার নিরন্তর যে প্রয়াস চালিয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন তা বাংলার গৌরবই বৃদ্ধি করেছে— অন্য কোনও প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেননি। বিবাহসূত্রে তিনি বাঙালি কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে এই শর্ত ততটা

জরুরি নয় যতটা জরুরি এই যে বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল কলকাতা শহরের মহলাকক্ষে তৈরি হয় তাঁর নাটক, মঞ্চস্থ হয় এই শহরেরেই নানান প্রেক্ষাগৃহে কিংবা নিজের তৈরি স্টুডিও থিয়েটারে, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য বাঙালি দর্শক তাঁর থিয়েটারের নিয়মিত দর্শক। তাই তাঁকে ব্যতিরেকে বাংলা নাট্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ। এই কারণেই একটি মাত্র বাংলা নাটকের নির্দেশনা দেওয়া সত্ত্বেও ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলা নাট্যের একজন নারী নির্দেশক হিসেবে শুধু নয়, এক বলিষ্ঠ নাট্যনির্দেশক হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত করাটা অত্যন্ত জরুরি। ১৯৮৪ সাল থেকে সাম্প্রতিক কাল ২০১৪ পর্যন্ত তিনি নিরন্তর কাজ করে চলেছেন একটানা। এই কারণেই 'বাংলা নাট্য: নির্মাণ ও নির্দেশনায় মেয়েরা (১৯৪৩-২০০৩)' শিরোনামাঙ্কিত গবেষণাপত্রে তাঁর অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

১৯৪৫ সালের ২০ আগস্ট রাজস্থানে ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা নাগেশ্বরপ্রসাদ পাণ্ডে, মা শান্তিদেবী পাণ্ডে। শৈশব ও কৈশোরের বহু সময় অতিবাহিত হয়েছে এলাহাবাদ ও কানপুরে, উত্তর ভারতের জলহাওয়ায়। তারপর কলকাতায়। পড়াশোনা করেছেন ভবানীপুর ও টালিগঞ্জের হিন্দি হাইস্কুলে, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ থেকে হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স নিয়ে স্নাতক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হন ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটিতে। শিল্পীজীবনের শুরু একজন নৃত্যশিল্পী হিসেবে। সঙ্গীত কলামন্দিরের প্রযোজনায় 'মৃচ্ছকটিকম' নাটকের মূল চরিত্র নটী বসন্তসেনার ভূমিকায় অভিনয় করার ডাক পান। ওই চরিত্রটিতে নাচ জানা অভিনেত্রীর প্রয়োজন ছিল। এই অভিনয়ই উষা গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নৃত্য ও নাটক এক জায়গায় মিলে গেল। এর পর অভিনয় করলেন পরপর বেশ কয়েকটি হিন্দি নাটকের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় চরিত্রে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ এই কালপর্বে সঙ্গীত কলামন্দিরের প্রযোজনায় তাঁর অভিনীত নাটকগুলি হল—

| নাটক | চরিত্র | পরিচালক | সাল |
|---|---|---|---|
| মৃচ্ছকটিকম | বসন্তসেনা | বদ্রী তেওয়ারি | ১৯৭০ |
| আষাঢ় কা একদিন | মল্লিকা | ,, | ১৯৭১ |
| কিসি এক ফুল কা নাম লো | কামিনী | রাজেন্দ্র শর্মা | ১৯৭২ |
| ভূমিজা | সীতা | বদ্রী তেওয়ারি | ১৯৭৩ |
| এক ঔর দ্রোণাচার্য | দ্রোণাচার্যের স্ত্রী | ,, | ১৯৭৪ |
| যশমা ওড়ন | যশমা | রাজেন্দ্র শর্মা | ১৯৭৫ |
| যযাতি | শর্মিষ্ঠা | বদ্রী তেওয়ারি | ১৯৭৬ |

ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম বাংলার বাইরে হলেও তিনি বাংলার জলহাওয়ায় সাংস্কৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল কলকাতায় তাঁর বড় হওয়া। প্রথমে নাচ শিখতে শুরু করেন; কত্থক, মণিপুরি ও ভরতনাট্যম— তিনটি বিষয়েই তিনি শিক্ষা নেন। স্কুলের পর কলেজে এসে যখন পরিচয় হল বাংলার শিক্ষিকা অনিতা চক্রবর্তীর সঙ্গে, তাঁরই মাধ্যমে তাঁর সামনে খুলে গেল রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির জগত। বাংলার সংস্কৃতির প্রতি তাঁকে মনোযোগী করে তোলেন এই শিক্ষিকাই। কলেজে থাকতেই ভাঙা ভাঙা বাংলায় আবৃত্তি করেন 'কচ ও দেবযানী'। নৃত্য শিক্ষক জয়দেব চট্টোপাধ্যায় শিখিয়েছিলেন কীভাবে শরীরের আড়ষ্টতা ভেঙে শরীরকে ছন্দ ও লয়ের মেলবন্ধনে মেলে ধরতে হয়। নাচ, গান, আবৃত্তিতে শিক্ষা নিতে নিতে ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ক্রমশ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে। ১৯৭০ সালে সঙ্গীত কলামন্দিরের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে নাচ জানার সূত্রে 'বসন্তসেনা'র চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ যা ঊষাকে নাট্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে দিল। এ ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় কেয়া চক্রবর্তী ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে আরও বেশি করে থিয়েটারের প্রতি আগ্রহী হন ঊষা। সঙ্গীত কলামন্দিরের সঙ্গে বহু নাটকে অভিনয় করেছেন কিন্তু কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা কাজ করছিল। থিয়েটার যে সামাজিক রাজনৈতিক মাধ্যম হিসেবে কতখানি শক্তিশালী সেই ধারণা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়কে তাড়িত করছিল ভিন্ন ধরনের থিয়েটারের প্রতি। থিয়েটারের মাধ্যমে নিজস্ব ধ্যানধারণা ও বক্তব্যকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছনোর গভীর আকাঙ্ক্ষা সঙ্গীত কলামন্দিরের নাট্যচর্চার মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছিল না। '...our audience were more accustomed to light entertainment and were not committed to serious theatre. By 1975 I was quite tired of the limitations of the SKM.'[৪৩]

নাটককে সমাজ জাগরণের জোরালো মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য নিজস্ব দায়বোধ থেকে গড়ে তোলেন নাট্যদল 'রঙ্গকর্মী' ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখে। সামাজিক দিক থেকে থিয়েটারকে অর্থবহ করে তোলবার উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ মানুষ যাতে সচেতন হয়, সমাজের দ্বিচারিতার রূপটিকে তুলে ধরতে 'রঙ্গকর্মী'র প্রতিষ্ঠা। ধীরে ধীরে সেই প্রতিষ্ঠান বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে উঠেছে। নিয়মিত নাট্য প্রযোজনা ছাড়াও থিয়েটার সংক্রান্ত নানান ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন রঙ্গকর্মী সদস্যরা। গড়ে তুলেছেন 'সম্ভাবনা' প্রকল্প এবং তৈরি করেছেন নিজস্ব 'স্টুডিও থিয়েটার'।

বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে ক্রমশ একাত্ম হয়ে গেছেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর নাট্যদল 'রঙ্গকর্মী'। এই প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ছিল শুধু বাংলা নয় ভারত এবং সারা পৃথিবীর দর্শকের কাছে— স্থানগত

ও ভাষাগত সমস্ত বাধা ভেঙে এগিয়ে যাওয়া। ২০১৪ পর্যন্ত রঙ্গকর্মীর ৩৮ বছর বেঁচে থাকা শুধু সময়ের অতিক্রমণ নয়, বিচিত্র ধরনের নাট্য প্রযোজনার মধ্য দিয়ে এক সদর্থক অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং ভারতের বাইরে বাংলাদেশ, জার্মানি, পাকিস্তান, ইউএসএ-র বিভিন্ন স্থানে নাট্যোৎসবে রঙ্গকর্মীর অংশগ্রহণ তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচিতিকে বিস্তৃত করেছে। নিজেদের দলের এবং দলের বাইরের নাট্যকর্মীদের নিয়ে ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং, সমাজের দুঃস্থ শিশুদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'রাঙ্গোলি'র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নাট্যশিক্ষার ব্যবস্থা 'রঙ্গকর্মী'র নাট্য সম্পর্কিত কার্যাবলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে সব সময়। সমাজের অসঙ্গতি, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভিন্ন এক নাট্যভাষা তৈরি করতে পেরেছে 'রঙ্গকর্মী' যা সমাজের সর্বস্তরের সংস্কার ও সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করতে পারে। নিয়মিত নাট্য প্রযোজনার বাইরে এমন কিছু কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে 'রঙ্গকর্মী' যার প্রধান লক্ষ্যই হল নাটকের পরিপূর্ণতা দান। এর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল 'স্টুডিও থিয়েটার' স্থাপন। এই মঞ্চের নামকরণ তারা করেছে বাংলার দুই অভিনেত্রীর নামানুসারে— 'বিনোদিনী কেয়া মঞ্চ'। এর মাধ্যমে বাংলার দুই পর্বের স্বনামধন্য দুই অভিনেত্রীকে যেমন সম্মান জানান হল, তেমনই এই দুই অভিনেত্রীর বাংলা থিয়েটারের প্রতি আত্মোৎসর্গের, অবদানের ইতিহাসকেও সম্মান জানাল 'রঙ্গকর্মী'। 'রঙ্গকর্মী' ও ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় সমার্থক হয়ে যাওয়া একটা মিলিত শক্তি, যা বাংলা থিয়েটারের পরিধিকে ব্যাপৃত করেছে।

এই পর্বে (১৯৭৭-১৯৮৪) আমরা লক্ষ করব ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় মূলত বিশিষ্ট পরিচালকদের নেতৃত্বাধীনে অভিনয় করেছেন। এই সমস্ত পরিচালকের নিজস্ব নাট্যদল আছে এবং তাঁরা 'রঙ্গকর্মী'র আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পরিচালনার কাজটি করেছেন। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর (নান্দীকার) পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়েছে 'পরিচয়', তৃপ্তি মিত্রর (বহুরূপী) নির্দেশনায় 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর মঞ্চসফল নাটক 'পুতুলখেলা'র ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়কৃত হিন্দি অনুবাদ 'গুড়িয়া ঘর'। প্রখ্যাত নাট্যনির্দেশক এম.কে.রায়নার নেতৃত্বে 'মা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই পর্বে ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় একটি মাত্র নাটক মঞ্চস্থ হয়— 'প্রস্তাব'। বিশিষ্ট নাট্যপরিচালকদের নির্দেশনা ও ঊষার অভিনয় বাংলার মঞ্চে হিন্দি থিয়েটারের মধ্য দিয়ে এক নতুন পথের সন্ধান দেয়। 'পরিচয়' নাটকে বীণা, ইবসেন-এর 'দ্য ডলস হাউস' অবলম্বনে 'গুড়িয়া ঘর'-এর মুখ্য চরিত্র মুনিয়া এবং ব্রেখট অবলম্বনে 'মা' নাটকে মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়। 'প্রস্তাব' (১৯৭৭) ঊষা নির্দেশিত প্রথম নাটক। 'চেকভ'-এর 'দ্য ম্যারেজ প্রোপোজাল' নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়— তার-ই হিন্দি রূপান্তর

করেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়। ‘রঙ্গকর্মী’র সূচনা পর্বে ঊষা অনূদিত ও নির্দেশিত প্রথম নাটক ‘প্রস্তাব’। প্রখ্যাত নাট্য পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করতে করতে যে নাট্যশিক্ষা তিনি লাভ করেন তা নির্দেশনার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করার ইন্ধন জোগাল। এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় প্রত্যেক বছর একটি করে নাট্য প্রযোজনা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়েছে। নাট্য প্রযোজনাগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সবসময়ে সোচ্চার থাকতে চেয়েছেন।

অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে, অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে, নারী নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে, প্রথানুগ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রগতিহীনতার বিপক্ষে দাঁড়ালেন তিনি তাঁর নাটক নিয়ে। হিন্দি থিয়েটারের ভূমিকাকে আরও বিস্তৃত করে দিলেন তিনি। রাষ্ট্রীয় ভাষায় থিয়েটার করার জন্য তার সামনে উন্মোচিত হল আরও বড় পৃথিবী। যে বার্তা তিনি পৌঁছে দিতে চাইলেন তা ছড়িয়ে পড়ল শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে-প্রদেশে নয়, ভারতের বাইরে বহির্বিশ্বেও। তিনি নির্বাচন করেছিলেন এমন সব নাট্যকার ও লেখককে যাঁদের লেখায় একই সঙ্গে সাহিত্যগুণ ও সামাজিক রাজনৈতিক ভাবনার সমন্বয় ঘটেছে। যেমন— ইবসেন, ব্রেখট, ওয়েস্কার, দারিও ফো, ফ্রাঙ্কা রামে, বিজয় তেণ্ডুলকর, জয়ন্ত দলভি, মহেশ এলকুঞ্চয়ার, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ। ১৯৮৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে নাট্যনির্দেশনার কাজ করে গেছেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়।

**রঙ্গকর্মী প্রযোজিত ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটকগুলি হল**

মহাভোজ (১৯৮৪), লোককথা (১৯৮৭),অপহরণ ভাইছারে কা (১৯৮৯), হোলি (১৯৮৯), কাশীপুর কা কাসীরাম (১৯৯১), কোর্ট মার্শাল (১৯৯১), রুদালি (১৯৯২), খোঁজ (১৯৯৪), বেটি আয়ী (১৯৯৬), মাইয়ত (১৯৯৭), হিম্মত মাঈ (১৯৯৮), ইন্‌সপেক্টর মাতাদীন চাঁদ পর (১৯৯৯) মুক্তি (১৯৯৯), শোভাযাত্রা (২০০১), অন্তরযাত্রা (২০০২), কাশীনামা (২০০৩),বদমান মান্টো (২০০৪), সারহাদ পার মান্টো (২০০৫), মান্টো আউর মান্টো (২০০৬/২০০৭), খেলনা গাড়ি (২০০৭), ভোর (২০১০), চণ্ডালিকা (২০১১), মানসী (২০১১), হাম মুখতারা (২০১৩) গবেষণা পত্রে ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটকগুলিকে দশক ধরে বিশ্লেষণ করা সমীচীন বলে মনে হয়। কারণ এক একটি দশকে তাঁর নির্দেশিত নাটকের সংখ্যা কম নয় এবং প্রত্যেকটি নাটকই যে সমান জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব পেয়েছে তাও নয়। তাই নাটকগুলির স্বতন্ত্র আলোচনা দশকের সীমানাতেই বেঁধে দেওয়া হল। বিশ শতকের আশির দশকে তাঁর যাত্রা শুরু ‘মহাভোজ’ নাটক দিয়ে। এই দশকে তিনি

চারটি (মহাভোজ, লোককথা, অপহরণ ভাইছারে কা, হোলি), নব্বই-এর দশকে নয়টি (কাশীপুর কা কাশীরাম, কোর্ট মার্শাল, রুদালি, খোঁজ, বেটি আয়ী, মাইয়ত, হিম্মত মাঈ, ইনস্পেক্টর মাতাদীন চাঁদপর, মুক্তি) পরবর্তী শতকের শূন্য দশকে এগারোটি (শোভাযাত্রা, অন্তর যাত্রা, কাশীনামা, মাতাদীন চাঁদপর, মুক্তি, বদনাম মান্টো, সারহাদ পার মান্টো, মান্টো আউর মান্টো, খেলনা গাড়ি, ভোর) এবং দ্বিতীয় দশকে তিনটি (চণ্ডালিকা, মানসী, হাম মুখতারা) নাটকের পরিচালনা করেন। দীর্ঘসময় ধরে একটানা কাজ করে চলেছেন। কোনও নারী নির্দেশকের ধারাবাহিকভাবে টানা ত্রিশ বছর কাজ করার ইতিহাস আছে কি না তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। তবে ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে নাট্যপরিচালনা ও সংগঠনকে দৃঢ় হাতে চালনা করে চলেছেন।

১৯৮৪ সালে প্রযোজনা ঊষা নিদেশিত 'মহাভোজ'— যে প্রযোজনাটি সম্পর্কে 'directorial debut' বলা হচ্ছে— সেই প্রযোজনাটির জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার পান (১৯৮৬-৮৭)। মনু ভাণ্ডারীর লেখা 'মহাভোজ'— ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিত নাটক। সেই সময়টা দলের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিও তাঁকে দৃঢ় হাতে সামলাতে হয়েছে। তিনি দলের প্রধান অভিনেত্রী ও সভানেত্রী। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বলে কিছু ছিল না এবং রঙ্গকর্মীর সদস্য সংখ্যা কিছু কম ছিল না। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সাংগঠনিক কাজে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। একই সঙ্গে অভিনয় ও সংগঠন চালানোটা ছিল দুরূহ কাজ। পাঁচজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল সদস্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল কার্যকরী সমিতি (Excutive Committee)। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় (সভানেত্রী), পুরান জয়সওয়াল (কোষাধ্যক্ষ), ওম পারেখ, চন্দ্রেশ্বর, রাজেশ শর্মা (২১ বছরের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য)।

'মহাভোজ' নির্দেশনার ক্ষেত্রে তাঁর একটা ভয় ছিল যে দর্শক কীভাবে নেবেন এই কাজটা। কেননা হিন্দি থিয়েটার দেখতে যাঁরা আসেন তাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে "actresses don't make good directors" যদিও তাঁদের এই ধারণাকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিতে পেরেছিলেন 'মহাভোজ'-এর নির্দেশক। এটা সম্ভব হয়েছিল যে তিনি 'মহাভোজ'-এর মতো একটা নাটক পেয়েছিলেন। বিষয়গত দিক থেকে শুধু নয়, উপস্থাপনার গুণে বহু শিল্পীকে নিয়ে কাজ করার উন্মাদনায়, যৌবনের উত্তাপে আঙ্গিকগত দিক থেকেও একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছিল 'মহাভোজ'। প্রথমেই একটা বড় মাপের কাজ করার ইতিবাচক দিকগুলো হল আরও অনেকটা পথ সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার একটা প্রেরণা ও শক্তি পাওয়া যায়। এ নাটকে সেই সমস্ত গ্রামের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যা ঊষা প্রত্যক্ষ

করেছিলেন কানপুরের কাছের গ্রামগুলিতে। কাজেই এই ধরনের গ্রামের চিত্রায়ণ খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না তাঁর পক্ষে। এ ছাড়াও এই সমস্ত গ্রামে মন্ত্রীদের সংবর্ধনা জানানো ইত্যাদি দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতা ঊষাকে বিশেষ সাহায্য করেছে। পোশাক, পরিবেশ, পরিস্থিতি সব কিছুর ক্ষেত্রে পরিচালক ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় স্বাভাবিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তাঁর নৃত্যশিক্ষার অভিজ্ঞতা নাটকের ছন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ত ধারাকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। 'মহাভোজ' পরিচালকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটকের পরিচালনা হলেও— নির্দেশক হিসেবে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা এবং অভিজ্ঞতায় তিনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে 'মহাভোজ' সাফল্যের পথ দেখাবে। বাস্তবে তাই-ই ঘটেছিল। আর তিনি পিছনে ফিরে তাকাননি বা অন্য কোনও পরিচালকের নেতৃত্বাধীনে 'রঙ্গকর্মী'র প্রযোজনাকে তুলে দেননি। দীর্ঘসময় ধরে ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি নাট্য প্রযোজনার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। 'মহাভোজ'-এর পরিচালনার অভিজ্ঞতা তাঁর আত্মবিশ্বাসের অন্যতম স্তম্ভ নিঃসন্দেহে।

১৯৮৭ সালের প্রযোজনা 'লোককথা'— বিহারের কোনও একটি গ্রামের লোকজীবনের কথাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এর কাহিনিতে হয়তো অভিনবত্ব নেই। গ্রাম, গ্রামের জমিদারের অত্যাচার, ভোটের রাজনীতি, সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে নস্যাৎ করা, জোর করে বাজারের জিনিসপত্র তুলে নেওয়া— ইত্যাদি বিবিধ ঘটনা মানুষের অপরিচিত নয়। এর মধ্যে থাকে প্রতিবাদী চরিত্র জগন্নাথ, পঙ্গু হলেও তার প্রতিবাদের আগুন সে ছড়িয়ে দিতে থাকে গ্রামবাসীর মধ্যে। সহায়সম্বলহীন দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষগুলো জমিদার ও জমিদারতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে, অবশ্যই তাদের কেন্দ্রে যাকে চামারের ছেলে জগন্নাথ। এ নাটকে ঘটনার তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে যখন চামারের ঘরের নাবালিকা মেয়েকে গণধর্ষণ করে খুন করে জমিদারের লোকেরা। গ্রামসমাজের বিভিন্ন ঘটনা, সমস্যা এ নাটকে তুলে ধরতে চেয়েছেন নাট্য নির্দেশক— হয়তো এর অনেক ঘটনাই আমাদের জানা, কিন্তু সত্যকে যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় তা যেন আরও জ্বলন্ত হয়ে ওঠে। প্রযোজনাগত দিক থেকেও ঊষা এ নাটকে কিছু চমক রেখেছিলেন। নিরাভরণ মঞ্চে কুশীলবরা উঠে আসেন দলবদ্ধভাবে দর্শকের মধ্য থেকে মঞ্চের ওপরে শৃঙ্খলা মেনে। দর্শক ও নাটকের কুশীলব একাকার হয়ে যায়, ফলে নাটকের মূল সমস্যা শুধু কুশীলবরা নয় সমস্ত দর্শককুলের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়— প্রায়োগিক কৌশলে। 'লোককথা'র ঠিক আগে ১৯৮৬-তে ম্যানুয়েল লুটজেন হোরস্ট (Manuel Lutgenhorst) এবং রুস্তাম ভারুচা (Rustam Bharucha)- এই দুই বিদেশি পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন 'রঙ্গকর্মী'র শিল্পীরা। আর 'লোককথা'য় অনেক শিল্পীকে নিয়ে কাজ করার পর পরই বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় একক অভিনয় করলেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় 'ভামা' নাটকে

১৯৯০ সালে। বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশিত নাটক হলেও নাট্য নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিভাগে ঊষা অংশগ্রহণ করেছিলেন অভিনয় ছাড়াও। যে তিনটি গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছিল 'ভামা' সেগুলি হল— (১) ফ্রাঙ্কা রামে-র ওয়েকিং আপ Waking up (২) বের্টোল্ট ব্রেখট-এর দ্য জিউস ওয়াইফ (The Jewish Wife) (৩) দারিয়ো ফো-র অলরিক মেইনহফ (Ulrike Meinhoff)। তিনটির ক্ষেত্রেই (মূল ইতালিয়ান ও জার্মান ভাষার) ইংরেজি অনুবাদ থেকে হিন্দি ভাষায় রূপান্তরণের কাজটি করেছিলেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় নিজে। 'ভামা'-র হিন্দি নাট্যরূপায়ণ শুধু নয় এ নাটকের সঙ্গীত ও পোশাক পরিকল্পনাও ছিল তাঁর। আরও একটি কারণে 'ভামা' উল্লেখ্য— এ নাটকে একক অভিনয় করেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলার মঞ্চে হিন্দি ভাষায় একক অভিনয়ের ইতিহাস তৈরি করেছেন তিনি। বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রী হেলেনে ভাইগেল ১৯৩৮ সালে দ্য জিউস ওয়াইফ-এ অভিনয় করেন। প্যারিসে এ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। ফ্রাঙ্কা রামে অলরিক মেইনহফ-এ অভিনয় করেন। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় এই বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রীদের অভিনীত চরিত্রে অভিনয় করলেন— যা সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের পরিচয়ই বহন করে। নির্দেশনার দায়িত্ব অবশ্য নিজের কাঁধে তুলে নেননি। কারণ হয়তো যেহেতু তিনিই একমাত্র অভিনেতা তাই অভিনয়ের পারফেকশন, খুঁটিনাটি তার নিজের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। তাই তিনি বিভাস চক্রবর্তীর মতো পরিচালককে আহ্বান জানালেন। কিন্তু ঊষা একক অভিনয়ের মোহজালে নিজেকে বেঁধে রাখলেন না। পা বাড়ালেন বহুসংখ্যক শিল্পীকে নিয়ে নিজস্ব ঘরানার নাট্য প্রযোজনার পথে। নব্বইয়ের দশকে তিনি একটির পর একটি সফল প্রযোজনা উপহার দিলেন দর্শককে। বলা যেতে পারে এই পর্ব ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যনির্দেশনার সুবর্ণ-পর্ব।

নব্বইয়ের দশকের গোড়াতেই দুটি নাটক মঞ্চস্থ হল। একটি কাশীপুর কা কাশীরাম (১৯৯১) এবং অন্যটি কোর্টমার্শাল (১৯৯১)। 'কাশীপুর কা কাশীরাম' নাটকটি পরিবর্ধন ও রচনা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের। যদিও এটি পথনাটক হিসেবেই ভাবা হয়েছিল। 'কোর্টমার্শাল' ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়কে নাট্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র জায়গা করে দিল। 'কোর্ট মার্শাল' (১৯৯১)— স্বদেশ দীপকের লেখা। এ নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে একটি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো সমস্যার জটিলতা। 'কোর্ট মার্শাল' শব্দটি আমেরিকান ইংরেজিতে ব্যবহার করা হয়। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল— মিলিটারিদের কোর্টে বিচারসভা বসানো যেখানে সেনাবাহিনীর কোনও সদস্য মিলিটারি নিয়ম ভাঙলে তার বিচার করা হয়। এ নাটকে দেখা যায় এক জওয়ান রামচন্দ্র গুলি করে এক সেনা অফিসারকে হত্যা করলে তার বিচারসভা বসানো হয়। এখানে সাক্ষীদের মাধ্যমে উঠে আসে এমন সব ঘটনা

যা নাটকের নানান অভিঘাত সৃষ্টি করে। জওয়ান রামচন্দ্র— যে হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত সে কিন্তু বাস্তব জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, সুন্দর ব্যবহার এবং খেলাধুলায় পারদর্শী। কিন্তু রামচন্দ্রই যে খুন করেছে সে বিষয়ে কোনও ধন্দ নেই, কারণ এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা যেমন আছে তেমনই রামচন্দ্র নিজেও এই খুনের ঘটনার কথা স্বীকার করেছে এবং এর জন্য যে শাস্তি তার প্রাপ্য তা মাথা পেতে গ্রহণ করতে সে পিছপা হয়নি। কিন্তু রামচন্দ্রের পক্ষের উকিল অত্যন্ত তৎপরতায় খুঁজে বের করে এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে শুধু শুধু রামচন্দ্র এই হত্যা করেনি— ক্যাপ্টেন কাপুর দিনের পর দিন রামচন্দ্রের ওপর মানসিক পীড়ন চালিয়েছে, তাকে উত্যক্ত করেছে। নাটকের ঘটনা আরও তীব্র হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় রামচন্দ্রের শাস্তির আদেশ ঘোষণা করার আগে ব্রিগেডিয়ার সুরাট সিং নিজের বাড়িতে একটা পার্টি দেন। রামচন্দ্রকেও সেখানে আমন্ত্রণ জানান। উৎসবের আনন্দে পার্টি যখন মেতে ওঠে তখন সেখানে আসেন ক্যাপ্টেন কাপুর কিন্তু সুরাট সিং তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করেন। কাহিনি ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যায় যখন পার্টি থেকে বহিষ্কৃত অপমানিত ক্যাপ্টেন কাপুর নিজেই নিজের রাইফেল চালিয়ে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু রামচন্দ্রের শাস্তি মকুব হয় না। ব্রিগেডিয়ার সুরাট সিং অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে জওয়ান রামচন্দ্রের ফাঁসির আদেশ ঘোষণা করেন। প্রথমে তাকে কাছে টেনে নেন— সে নিচু জাতের ঘরের ছেলে, তাকে সামাজিক সমতার জায়গায় টেনে নিয়ে হাতে মদের পাত্র তুলে দিয়ে, একসঙ্গে মদ্যপান করে ফাঁসির আদেশ ঘোষণা করেন। রামচন্দ্র এই শাস্তি অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করেছে এবং মৃত্যুতে তার কোনও ভয় নেই। সমগ্র নাটকটি শুধুমাত্র পুরুষ চরিত্রের টান টান অভিনয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। স্বভাবতই বিষয়ের দিক থেকে আবারও অভিনবত্ব এবং ঋজু দৃঢ় ভাবনার প্রকাশ কোর্ট মার্শল-এ। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, তিনি একজন নারী হয়েও শুধুমাত্র মেয়েদের সমস্যা, মেয়েদের কথাকেই একমাত্র বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেন না নাটকে। নারীরা তাদের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার নিয়ে উঠে এসেছেন ঊষা নির্দেশিত নাটকে— বিস্তার করেছেন তাঁদের একাধিপত্য। কিন্তু পুরুষসমাজ ও তাদের কর্মক্ষেত্রের সেখানে নানা রাজনীতি, দলন পীড়ন, জাতপাতের সমস্যা— সব কিছুকেই গুরুত্ব সহকারে নাটকে বিশ্লেষণ করেছেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়। দৃষ্টিভঙ্গির নিরপেক্ষতাও তাঁর আরেক বৈশিষ্ট্য। মূল চরিত্রে রাজেশ শর্মার অভিনয় এ নাটকের মূল সম্পদ। পরবর্তী সময়ে এই অভিনেতা বাংলা এবং মুম্বই-এর চলচ্চিত্র জগতে নিজের জায়গা করে নেন। কিন্তু তাঁর অভিনয়ের সূত্রপাত 'রঙ্গকর্মী'র সঙ্গে, ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনয় ক্ষমতা ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়েছে এ কথা অনস্বীকার্য।

'কোর্ট মার্শাল'-এর পরেই 'রুদালি'র (১৯৯২) প্রযোজনা রঙ্গকর্মীর বড় পদক্ষেপ। মহাশ্বেতা

দেবীর ছোটগল্পের হিন্দি নাট্যরূপায়ণ ঘটিয়ে মঞ্চস্থ করেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২ সালে। ভাড়াটে কাঁদুনেদের নিয়ে এ নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এ কাহিনিতে তাদের জীবনের দুঃখ-কান্না, চাওয়া-পাওয়া, ভালবাসা-মমতা দিয়ে মোড়া। মহাশ্বেতা দেবীর মূল কাহিনি অবলম্বনে কল্পনা লাজমীর পরিচালনায় একটি হিন্দি ছবি নির্মিত হয়েছিল 'রুদালি' নামেই। চলচ্চিত্র বা নাটকের তুলনামূলক আলোচনা এক্ষেত্রে জরুরি না হলেও 'রুদালি'র নাট্যরূপায়ণের সার্থকতা, ফিল্মের জনপ্রিয়তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল— এ কথা অনস্বীকার্য। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় পুরোপুরি মহাশ্বেতা দেবীর কাহিনিকে গ্রহণ করেছিলেন। এক ঝাঁক পরিশ্রমী, বলিষ্ঠ, দায়বদ্ধ শিল্পীর প্রয়াসে গড়ে উঠেছিল এই নাট্য প্রযোজনা। এ নাটকটির প্রযোজনার নেপথ্যে রয়েছে অনেকগুলো স্তর। দীর্ঘ সময় ধরে ওয়ার্কশপ করে নানাবিধ কর্মকৌশলের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল 'রুদালি'। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর মুখোপাধ্যায়, সমর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এবং শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্দেশক ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ও অভিনেতা নরেন্দ্র রায়ের উপদেশ ও সহায়তায় প্রযোজনার কাজটি চলতে থাকে। দক্ষিণ বিহারের কোনও এক অঞ্চলের মেয়ে শনিচরী, দারিদ্র্য অভাব তাদের নিত্য সহচর। এরই মধ্যে ভেঙে যায় তার সংসার। বহুদিনের পুরোনো বন্ধু ভিখানির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার। সে-ও পরিবার থেকে বিতাড়িত। ভিখানির পরিবার তাকে ছেড়ে চলে গেছে। শনিচরী ও ভিখানি একসঙ্গে বাঁচার একটা পথ বার করে। নতুন এক পেশা তারা খুঁজে নেয়। কোনও ধনীগৃহে কেউ মারা গেলে তারা ভাড়াটে কাঁদুনি হিসেবে সেখানে উপস্থিত হয়ে শোক প্রকাশ করে— হয়তো ধনীগৃহে সবাই ব্যস্ত, শোক প্রকাশের সময় তাদের নেই বা শোক করার মতো কেউ নেই। এই পেশায় মধ্যবয়সিনী এই দুই নারী পেল প্রথম স্বাধীন স্বতন্ত্র এবং মেরুদণ্ড সোজা করে বেঁচে থাকার আস্বাদ। ক্রমশ এই স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে বেঁচে থাকা নতুন পেশায় মেয়েদের সংখ্যা বাড়তে থাকে— যাদের বলা হয় রুদালি। সমাজের এক ভিন্ন মুখ এই রুদালির দল। পেটের খিদে মানুষকে কতটা নির্মম-রুক্ষ করে তুলত পারে তার নিষ্করুণ প্রতিচ্ছবি 'রুদালি'। শনিচরী যখন পতিতালয়ে গেল আরও বহু মেয়েদের কাজে লাগানোর সন্ধানে, তখন দেখা পেল বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া পুত্রবধূ পার্বতীয়ার। কিন্তু কত দিন এই নির্মম পেশায় নিজের মমতা স্নেহ ভালবাসা ভাল লাগাকে দূরে সরিয়ে রেখে কলের মতো কান্না সরবরাহ করা? ভিখানি ফিরে যায় তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার মৃত্যু হল খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে। শনিচরীও ক্রমশ অবসন্ন ক্লান্ত এই পেশায় লড়াই করতে করতে। সে নিতে পারে না কোনও পারিশ্রমিক এই কাজের জন্য। ইতি টানে সে এই পেশায়। তবে অভাব দারিদ্র্য বঞ্চনা প্রতারণা নারীকে সমাজে কীভাবে যন্ত্রণা দেয় আর সেই যন্ত্রণার পরিমাণ কত তীব্র হতে পারে মহাশ্বেতা

দেবীর 'রুদালি'— সেই অস্থির অবস্থার দলিল। আর সমাজও মেয়েদের কোন জায়গায় ফেলে রেখেছে তারই এক যাপনচিত্র এই নাটক। এ নাটকে উঠে এসেছে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ— (১) সমাজে মেয়েদের অবহেলার ছবি; (২) সমাজে অবাঞ্ছিত থেকেও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে মেয়েদের বেঁচে থাকার লড়াই। (৩) দারিদ্র্য অবহেলা কতটা অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখতে পারে মেয়েদের। (৪) বেঁচে থাকার জন্য নির্মম পেশা তাদের বেছে নিতে হয় (৫) ধনী সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সহানুভূতিহীনতার প্রকট ছবি। কাহিনির চেনা ছক ভেঙে এমন একটি বিষয়কে নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের নাট্যরূপায়ণ সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের ধরনটাই এমন— চেনা গণ্ডি ভেঙে নিরীক্ষামূলক কাজের ঝুঁকি নেওয়া। প্রযোজনার জন্য তাই পূর্ব প্রস্তুতি তাঁকে যেমন নিতে হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সমাজের নির্দিষ্ট পেশার রীতিনীতি, আচার-আচরণ, প্রথা ব্যবহার সব কিছু নিখুঁতভাবে উপস্থাপনার জন্য যে বিপুল পরিশ্রম করতে হয়, এবং নির্দেশকের ওপরেই সেই দায়িত্ব বর্তায়। তিনি তাঁর কাজকে সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য তাই একটি টিম যেমন তৈরি করেছিলেন তেমনই অভিনেতা অভিনেত্রীদের তৈরির জন্য ওয়ার্কশপভিত্তিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

'রুদালি' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শনিচরী— ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়, ভিখানি— সন্ধ্যা চক্রবর্তী/যামা শ্রফ; পার্বতীয়া— ববিতা তেওয়ারি, মাধো সিং— জয়প্রকাশ গুপ্তা, বচন সিং— বলরাম দাস, ভৈরো সিং— মহম্মদ সাফিকুর রহমান, গম্ভীর সিং— করণ কুমার প্রমুখ; এই নাটকটির মূল গল্প মহাশ্বেতা দেবী, আলো— বাদল দাস, আলোক নিয়ন্ত্রণ— শশাঙ্ক মণ্ডল, মঞ্চ ব্যবস্থাপক— বলরাম দাস, উপকরণ ব্যবস্থাপক— দীপেশ রজক, রূপসজ্জা ও পোশাক— সুরাজ সিং। সঙ্গীত প্রয়োগ— দীপক রজক, মঞ্চ ব্যবস্থাপনা ও প্রযোজনা নিয়ন্ত্রক— জয়প্রকাশ গুপ্তা। 'রুদালি' নাটক পরিচালনার জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার পান ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯৩ সালে। উল্লেখ্য পরের বছরই ১৯৯৪-তে প্রযোজিত হয় 'খোঁজ'। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম লেখা। ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে পর পর দুটি মুক্তমঞ্চের জন্য নাটক প্রযোজনা করেন ঊষা। বিজয় দলভির লেখাকে পরিমার্জিত করে পথনাটকের ফর্মে উপস্থাপিত করেন 'মাইয়ত' (১৯৯৭) এবং জ্যোতি মহাপেশকর-এর লেখা 'বেটি আয়ী' (১৯৯৬)। এ নাটকের বিশেষত্ব এইখানেই যে এ নাটকের সমস্ত কুশীলবই নারী। যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন শ্বেতা পাণ্ডে, মিনাল পারীক, রূপা ঘোষ, সোহিনী চক্রবর্তী, মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, সোমা দাস, তলাত পারভিন, নন্দিনী রায়, আলপনা চক্রবর্তী, রমলা বাসু, রত্না রায়চৌধুরী, লক্ষ্মী সিং, মঞ্জু ব্রহ্মচারী এবং ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়। এ নাটকের নির্দেশনা

ও পরিকল্পনা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের। প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তর্ক-যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ নারীরা নিজেরা নিজেদের অধিকার ও আত্মসম্মানকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। একটি মেয়েরও যে স্বতন্ত্র ভাবনা বা নিজস্ব বক্তব্য আছে তাকে দৃঢ় করার জন্যই তারা একত্রিত। সমবেত গানের মধ্য দিয়ে এই একত্রিত জোটবদ্ধ নারী সমাজের ভাষা-ভাবনা রূপ দিয়েছে। গানের দলের শিল্পীরাও ছিলেন সকলেই মহিলা— শ্রাবণী দাস, রোশনারা বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া মুখোপাধ্যায়, পুরোধা ঘোষ, রাখী ঘোষ, অর্চনা ভট্টাচার্য। যন্ত্রীদের মধ্যে অবশ্য পুরুষের আধিপত্য— নির্মল শীল, সুমন দাস, অনুপম ঘোষ, রাকেশ ত্রিপাঠী, হরিশঙ্কর প্রমুখ। প্রস্তুতি নিয়ন্ত্রক মনোজ চৌধুরী/রত্না চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনা জ্যোতি মহাপেশকর ও ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়। আলোক পরিকল্পনা করেছিলেন বাদল দাস। মূল থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করেন পণ্ডিত বসন্তদেব। এ নাটকের মূল বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে লেখা হল 'ভারতে নারীর জীবন ও অস্তিত্ব ঘিরে যে বিচিত্র সমস্যাগুলি বহুদিন ধরে তাকে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ হতে দেয়নি, তারই অনেকগুলি 'বেটি আই' নাটকে উপস্থাপিত করা হল। অভিনেত্রীমণ্ডল তাঁরা এসেছেন বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, স্তর, অভিজ্ঞতা থেকে। কিন্তু এ নাটকে তাঁরা জোটবদ্ধ ভগিনী সমাজ...।'[৪৪] সমাজে কোনও প্রচলিত প্রথা বা হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা যখন নারীর সম্মান-অধিকার-মর্যাদাকে বিনষ্ট করতে চায়, পুরুষের সঙ্গে নারীর বৈষম্য সৃষ্টি করে, তখনই তো নারীর জেগে ওঠার সময়। এ নাটকের জোটবদ্ধ নারীরা চেয়েছে— পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, রাস্তায়, বাড়িতে, প্রাত্যহিক জীবনে স্বামী কিংবা পুরুষ সহকর্মী, সহযাত্রী, মালিক পক্ষ, উপরওয়ালা, প্রতিবেশী যখন তাকে অপমান করে, যন্ত্রণা দেয় তখন তাদের মুখোশগুলো খুলে দিতে। একজন নয়, অনেক মেয়েই একই যন্ত্রণার অংশীদার, তাই তারা নাটকে জোটবদ্ধ। তাদের প্রতিবাদের লক্ষ্য সেই পুরুষসমাজ যারা নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান তো দেয়ই না, উপরন্তু নরকযন্ত্রণা ভোগ করায়। নারীরা সংঘবদ্ধ বলেই এ নাটকে প্রতিবাদের ভাষা এত জোরালো ও বলিষ্ঠ। শুধু বিষয়গত দিক থেকে নয়, প্রযোজনায় অভিনেত্রীদের দলগত অভিনয় বা টিম্ ওয়ার্ক বিষয়বক্তব্যকে আরও দৃঢ় করে তোলে। হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না— এ কথা উল্লেখ করা যে, এ নাটকে উনিশ জন অভিনেত্রীর মধ্যে মাত্র তিন জন অবাঙালি অভিনেত্রী। 'বেটি আয়ী' প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে পরিচালক জানিয়েছিলেন—এ নাটকে অবাঙালির তুলনায় বাঙালি অভিনেত্রীর সংখ্যাই বেশি। হয়তো ঊষা বলতে চেয়েছেন 'রঙ্গকর্মী'র বাতাবরণ বা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছত্রচ্ছায়ায় কাজ করতে মেয়েরা বেশি স্বচ্ছন্দ।

বের্টোল্ট ব্রেখ্ট-এর জন্মশতবর্ষে 'রঙ্গকর্মী' ব্রেখ্ট-এর 'মাদার কারেজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন'

অবলম্বনে মঞ্চস্থ করে নাটক 'হিম্মত মাঈ' (১৯৯৮)। নাটকটি রচিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন— ১৯৪১-এ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে। 'রঙ্গকর্মী' এ নাটক নির্বাচন করেছিল শুধু ব্রেখ্‌টের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে ধর্মের নামে যে হিংসা যুদ্ধ হানাহানি চলছে তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। ধর্মে ধর্মে, বর্ণে বর্ণে যে বিভেদ, সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের নৃশংসতা, মানুষের অধিকারকে অসম্মান, মনুষ্যত্বের বঞ্চনা— এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল 'রঙ্গকর্মী' এই নাটকটিকে হাতিয়ার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রেখ্‌ট রচনা করেছেন এ নাটক। তাঁর সামনে উদ্যত প্রশ্ন— কেন যুদ্ধ করে মানুষ? সভ্যতার সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্রেখ্‌টও যেন বুঝতে পারেন না 'যুদ্ধ কি শৃঙ্খলা? Order of Chaos?'— ইউরোপীয় যুদ্ধবিধ্বস্ত সময়কালে নিজের গাড়ি নিজেই ঠেলে নিয়ে যাওয়া এক অতি সাধারণ ফেরিওয়ালির কাহিনি এ নাটকের মূল অবলম্বন। যুদ্ধের বাজারে সে গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করে, একে একে হারিয়ে ফেলে তার সন্তানদের— তার সমস্ত আশা ভরসার অবসান ঘটে, তবু সে ছাড়ে না তার ভাঙাচোরা ঠেলাগাড়িটি। এই গাড়িটা যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রতিবাদের স্মারক। নাটকটি রূপান্তর করেন প্রখ্যাত হিন্দি কবি নীলাভ। মঞ্চ: মনু দত্ত, আলো: বাদল দাস, পোশাক: জারিন চৌধুরী, সেট ডিজাইন ও সঙ্গীত ভাবনায় ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়।

উৎপল দত্ত 'মাদার কারেজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন'-এর রূপান্তর করেছিলেন 'হিম্মত মাঈ' নামে। বহরমপুরের একটি নাট্যদল এই নাটকের বাংলা রূপায়ণ ঘটিয়েছিল 'মা অভয়া' নামে। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় উৎপল দত্তের দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত হয়েছিলেন— নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রে। পি.এল.টির প্রযোজনায় শোভা সেন মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন আর ব্রেখ্‌টের নিজস্ব প্রযোজনায় 'অনসম্বল' থিয়েটারে মাদার কারেজের ভূমিকায় হেলেনে ভাইগেল-এর চরিত্রায়ণ তো কিংবদন্তি! ফলত ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে শুধু নির্দেশক হিসেবে নয় হিম্মত মাঈ-এর ভূমিকায় অভিনয়ের ক্ষেত্রেও একটা চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছিল। নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি সব সময় ব্রেখ্‌টীয় রীতিকে গ্রহণ করেননি। প্রযোজনার সুবিধার্থে তিনি কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। 'প্রি-কনসেপ্টেড হয়ে তিনি নির্দেশনা দেন না। মহড়া কক্ষে অনবরত উদ্ভাবনার মধ্যেই নাট্যদৃশ্য তৈরি হয়। এ নাটকেও দেখা যাবে কোনও রকম ব্রেখ্‌টিয়ান স্টাইলাইজড অভিনয় নেই। এ ক্ষেত্রে 'রিয়ালিটি' এবং 'স্টাইলাইজেশনের' মধ্যবর্তী প্রয়োগশৈলীই অনুসৃত হয়েছে।'[৪৫] অর্থাৎ ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় পুরোপুরি ব্রেখ্‌টীয় রীতি গ্রহণ করেননি। হিম্মত মাঈ-এর ভাঙাচোরা গাড়িটি যেটি বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি—

মঞ্চের মাঝখানে থাকে। এ গাড়িটি তার সংসারও বটে— হাজারো প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সে গাড়িটি ছাড়ে না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে এ গাড়ি প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে থাকে। যুদ্ধের পরিণাম কত ভয়াবহ আজকের সময়েও তা দেখানো কতটা প্রাসঙ্গিক সে কারণেই এ নাটকের নির্বাচন। 'Himmat Mai is a continuation of Rangakarmee's exploration of forms of exploitation and social injustice arising, in this instance, from question of caste, gender, religion and feudal authority prevalent in rural India working within its own well defined style, the production, however, ensures the operation of a critical intelligence, as Brecht desired.'[৪৬] 'হিম্মত মাঈ' মঞ্চস্থ হওয়ার অনেক আগে থেকেই শহর কলকাতায় ব্রেখ্‌ট চর্চিত হয়ে আসছেন। ১৯৬৯-এ নান্দীকারের প্রযোজনায় 'তিন পয়সার পালা' (The Three penny Opera), 'ভালো মানুষ' ১৯৭৪ (The Good Person of Setzuan) পরবর্তী সময়ে 'শঙ্খপুরের সুকন্যা' নামে; খড়ির গণ্ডি ১৯৭৮ (The Caucasian Chalk Circle); শেখর চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ১৯৭৫ অভিনীত হয় 'পন্ত লাহা' (Herr Puntilla); সারা ভারতের বিখ্যাত নাট্যপরিচালকেরা ব্রেখ্‌টের নাটক নিয়ে চর্চা করার পর ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম কাজ করলেন ব্রেখ্‌ট নিয়ে। তাঁর ওপর বিশেষ একটা দায়িত্ব তো ছিলই। নির্দেশনার ক্ষেত্রে ব্রেখ্‌টীয় অন্ধ অনুসরণ না করে একটি শক্তিশালী রূপান্তরিত নাটক— সমৃদ্ধ অভিনয়ে বাংলা মঞ্চে ব্রেখ্‌ট চর্চাকে আরও খানিকটা গতি দিল— তার কৃতিত্ব অবশ্য নির্দেশক ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। তাই বলা হল 'As director, Ganguli also underplays courage's cynicism and all instances of textual irony.'[৪৭]

'হোলি' (১৯৮৯) একই বছরে আরও একটি প্রযোজনা হোলি। গ্রামজীবন থেকে একেবারে সাম্প্রতিককালে ছাত্রসমাজের মূল সমস্যাকে ধরতে চাইলেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়। এ নাটকের নাম 'হোলি' আর ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতেও আছে 'হোলি'। হঠাৎই স্কুলের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে হোলিতে স্কুল খোলা থাকবে। হঠাৎ এই সংবাদে ছাত্ররা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কারণ 'হোলি'র দিনের আনন্দ উপভোগের পথে এসে পড়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুশাসন। ছাত্রদের মধ্যেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় বিভাজন। সমস্যাটি নাট্যনির্দেশকের বিশ্লেষণে ভিন্ন মাত্রা পায়। শুধু কর্তৃপক্ষের সমালোচনা নয়, একই সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যেও যে বিভাজন, হিংসা, মৃত্যু, ছাত্রের আত্মহত্যা ছাত্রসমাজকে কলুষিত করছে, সাম্প্রতিক এই ঘটনাগুলো সমাজের ব্যাধির মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে, তারই একটি ছবি 'হোলি' নাটকে তুলে ধরতে চাইলেন নাট্যকার ও নির্দেশক। স্পষ্টতই সমাজমনস্কতা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্য নির্বাচনে গুরুত্ব পাচ্ছে এবং তা শুরুর সময় থেকেই লক্ষ করা যায়।

ঊষার নির্দেশনা না হলেও 'ভামা' নাটকটির উল্লেখ এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত জরুরি। বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় 'ভামা' নাটকে ঊষা একক অভিনয় করলেন ১৯৯০ সালে। দশকের শেষ প্রান্তে এসে একই বছরে দুটি নাটক মঞ্চস্থ করল 'রঙ্গকর্মী' ১৯৯৯ সালে। পথ নাটক 'ইনসপেক্টর মাতাদীন চাঁদ পর' এবং মহাশ্বেতা দেবীর গল্প অবলম্বনে 'রঙ্গকর্মী'র প্রথম বাংলা নাটক 'মুক্তি'। 'ইনসপেক্টর মাতাদীন চাঁদ পর'--— পথ নাটকের নির্দেশনা ও সঙ্গীত ভাবনা ছিল ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের কিন্তু তিনি নিজে এ নাটকে অভিনয় করেননি। হরিশঙ্কর পরসাই-এর গল্প অবলম্বনে 'Study Group'-এর প্রকল্পে নাটকটি প্রস্তুত করা হয়। প্রায় আঠারো জন কুশীলব এ নাটকে অংশগ্রহণ করে। এটি স্যাটায়ার ধর্মী রচনা— সাম্প্রতিক প্রশাসন ও পদ্ধতি যা চলছে তাকে কেন্দ্র করে হরিশঙ্কর পরসাই ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে নাটকটি রচনা করেন। মাতাদীন একজন অফিসার যিনি সুন্দর ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার বার্তা চন্দ্রগ্রহে প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে চাঁদে যান। কিন্তু সেখানেও নিজের অধিকার ও ক্ষমতা বা শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নানান গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা অনাচার ছড়িয়ে দেন যা চাঁদের পরিবেশকেও কলুষিত করে তোলে, আর এই দূষণ তো পৃথিবী থেকেই বহন করে নিয়ে গেছেন। এই নাটকে এই প্রশ্নটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে যে মানুষ আর কত দিন তার চারপাশের পরিবেশকে এইভাবে দূষিত ভাবনায় কলুষিত করে চলবে? Study Group-এর প্রকল্পের অধীনে প্রস্তুত এ নাটক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বার্তা এ নাটকের মধ্য দিয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছে মানুষের কাছে। যদিও প্রযোজনাগত দিক থেকে শৈল্পিক নৈপুণ্য এ নাটকে আশা করা যায় না, কেননা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে শিক্ষানবিশ নাট্যকর্মীদের প্রযোজনা ছিল এ নাটক।

একই বছর 'রঙ্গকর্মী'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রজত জয়ন্তীবর্ষে মঞ্চস্থ হয় প্রথম বাংলা নাটক 'মুক্তি' (১৯৯৯)-এ নাটকটির আলোচনা বিস্তৃতভাবে করা হবে কেননা এটিই 'রঙ্গকর্মী'র এ পর্যন্ত (২০১৩) অভিনীত একমাত্র বাংলা নাটক। কেন বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করলেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ২৫ বছর পর? একটি পত্রিকার সাক্ষাৎকারে নির্দেশক জানাচ্ছেন যে 'রঙ্গকর্মী'র পঁচিশ বছর পূর্তিতে ঊষা গাঙ্গুলির মনে হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গের এত মানুষ তাঁদের সম্মান দিয়েছেন, 'রুদালি' দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে, গ্রাম থেকে মানুষ ছুটে এসেছেন, এত লোকের এত সম্মান 'রঙ্গকর্মী' ও ঊষা গাঙ্গুলিকে আপ্লুত করেছে। ভাষা কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি— বাংলার কাছ থেকে এত কিছু পেয়েছেন তাঁরা তাই 'মুক্তি' বাংলাতেই করবেন বলে স্থির করেন। বাংলার মানুষের ভালবাসাই তাঁকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।' 'মুক্তি' মহাশ্বেতা দেবীর 'নিজের মতো' গল্পের নাট্যরূপায়ণ।

এ নাটকের কেন্দ্রে আছে এক অসহায়, নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল বৃদ্ধা মুক্তির কাহিনি। এর আগে মহাশ্বেতা দেবীর ‘রুদালি’ গল্প অবলম্বনে ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ১৯৯২ সালে মঞ্চস্থ হয় ‘রুদালি’ নাটক। সাত বছর পর আবার কেন মহাশ্বেতা দেবীর সৃষ্টির কাছে ফিরে আসা? আমাদের মনে হয় বা এ রকম অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে মহাশ্বেতা দেবীর রচনার মধ্যে যে সমাজভাবনা; জীবন সম্পর্কে তীক্ষ্ণধী বিশ্লেষণ, তা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের মানসিকতার সঙ্গে কোথায় যেন এক সুরে বাজতে থাকে। রুদালিদের নির্মম জীবনযন্ত্রণার ব্যাখ্যান এখানে নেই কিন্তু আছে অসহায় বার্ধক্যের প্রতি নির্দয় ব্যবহারের সমালোচনা এবং নিঃসহায় নিঃসম্বল জীবনপ্রান্তিক মানুষের জন্য গভীর সহানভূতি। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে যে নাটকীয় উপাদান থাকে তার অন্বেষণ এবং মঞ্চে তার যথাযথভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঊষার মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ কাজ করে। এর আগে ‘রুদালি’তে গল্পের মধ্যের নাটকীয় সম্ভাবনার বীজ মঞ্চের জমিতে চমৎকার বুনে দিয়েছিলেন নির্দেশক। ‘মুক্তি’র ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাংলা গল্পের হিন্দি নাট্যরূপায়ণের ক্ষেত্রে ভাষার বেড়াজাল কোনও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি এমনকী পূর্ব বাংলার ডায়ালেক্টে সংলাপ রচনাও নাট্যভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অবশ্য সে সময় একটা বিতর্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল নাট্য রূপান্তরকে কেন্দ্র করে। পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবীর মুখোপাধ্যায় চুক্তিবদ্ধ হন ‘মুক্তি’ নাটকের নাট্যরূপান্তরের জন্য ১০ অক্টোবর, ১৯৯৯, আর নাটক লেখার পর রিহার্সালে নাটকটি পরিমার্জিত সংশোধিত হতে থাকে, অবশেষে দু'মাস পরে ১৯৯৯-এর ১০ ডিসেম্বর ‘মুক্তি’ মঞ্চস্থ হয়। প্রচারপত্রে অবশ্য ইংরেজিতে লেখা হল Play Development Partha Bandopadhay/Sudip Mukherjee, ‘Play Design’ ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়— প্রশ্ন তুলেছিলেন ৫২ এ হাজরা রোড, কলকাতা ১৯ থেকে পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠির মাধ্যমে তাঁদের অভিযোগ ছিল কেন ‘Dramatization’ লেখা না হয়ে বিভ্রান্তি ছড়াবার জন্য লেখা হল ‘Development’; ‘Design’ বা নকশা বলতে তাদের মনে হয়েছিল দৃশ্যবিভাগসহ একটি নাট্যপ্রকল্প বা খসড়া যা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তুত করেছিলেন ৪-৫ পাতার একটি নোট আকারে। নাটক রূপান্তর কেন্দ্র করে এইরকম একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও বিতর্কের থেকেও দর্শককুলকে আগ্রহী করে তুলেছিল নাট্যপ্রযোজনাটি।

এ নাটকের কেন্দ্রে আছে এক অসহায় নিরাশ্রয় বৃদ্ধা মুক্তির কাহিনি। পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে তার জীবন আবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন ঘটনাবর্তের মধ্য দিয়ে। ধনী আত্মীয়র বাড়িতে থাকাটাও কতটা অপমানজনক, আত্মমর্যাদাহীনতার তার পরিচয় এ নাটকের নানান ঘটনার অভিঘাতে

নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে। বাইরের ঘাত-প্রতিঘাত মুক্তিকে ততটা বিচলিত করে না, কেননা তিনি বেঁচে থাকতে চান স্মৃতির জগতে। তাঁর স্মৃতিপটে উঠে আসে পূর্ববঙ্গে তাঁর ফেলে আসা জীবন, লোকগান, তাঁর ব্যর্থ বৈবাহিক জীবন এবং অন্তরালে লুকিয়ে থাকা এক ভালবাসার গল্প—স্বদেশ নামে একটি মানুষের সঙ্গে মুক্তির ভালবাসার কাহিনি। জীবন-সায়াহ্নে মনসার মেলায় গিয়ে তাঁদের দেখা হয়। জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্বদেশ মুক্তিকে একসঙ্গে থাকার প্রস্তাব দেন। মুক্তি কি উড়ে যেতে পারবেন স্মৃতির অর্গল ভেঙে স্বপ্নের উড়ানে? স্বদেশ প্রস্তাব দেন জীবনের সাঁঝবেলায় আবার নতুন করে জীবনটা শুরু করতে। ধনী আশ্রয়দাত্রী স্বামী পরিত্যক্তা রিমার সঙ্গে মুক্তির দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে রিমার মেয়ে নীলাই তার দিদিমাকে উৎসাহিত করে স্বদেশের কাছে ফিরে যেতে। মুক্তি পিসির জীবনে মুক্তির আলো যখন সমাগত অর্থাৎ বৃদ্ধা যখন প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁর ভালবাসার মানুষটির কাছে ফিরে যেতে, তখন হঠাৎ-ই ভিন্ন এক অনুভূতি গ্রাস করে তাঁকে। তাঁর হাত থেকে পড়ে যায় টিনের তোরঙ্গ—চারিদিকে ছড়িয়ে যায় এত দিনের সঞ্চয়! দৃশ্যটি এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তৈরি করেছিলেন নির্দেশক। মহাশ্বেতাদেবীর গল্পে স্বদেশ ও মুক্তির মিলন দেখানো হয়েছিল, কিন্তু নাটকে ঊষা তা না দেখিয়ে অনেক বেশি জোর দিলেন মুক্তির আত্মবোধের ওপর। পুরুষ-নির্ভরতার বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে এক নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইকে স্থায়িত্ব দিতে চাইলেন। গল্পকারের থেকেও আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন নাট্যপরিচালিকা। এক নারীর একক লড়াই একাকী বাঁচার লড়াইটা আরও জোরালো হল। এই নাটকের বিষয়বস্তু বা মঞ্চায়নের পরিকল্পনা রুদালি বা কোর্ট মার্শালের উৎকর্ষতার সমকক্ষ না হলেও প্রযোজনার গুণগত মান অনেকখানি সম্মান এনে দিল বাংলা থিয়েটারে।

এ নাটকের বড় সম্পদ মুক্তির ভূমিকায় বর্ষীয়ান কেতকী দত্তের অসামান্য অভিনয়। বাল্যবিধবা মুক্তি আশ্রয় পান বড়লোক শিক্ষিত আধুনিক রিমার সংসারে। রিমার সঙ্গে মুক্তির মানসিক মিল হয় না— বরং অনেক বেশি সখ্য গড়ে ওঠে রিমার মেয়ে নীনার সঙ্গে। গল্পের নাটকীয় উপাদান সঠিকভাবে নাট্যে প্রয়োগ করলেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়। কখনও কখনও দর্শকের মনে হতে পারে গল্পের থেকে নাটক প্রযোজনার গুণে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ব্যস্ত-রুক্ষ-কঠোর কঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী রিমার কাছে মায়ের কোমল সাহচর্য স্নেহ না পাওয়া কিশোরী নিনা—যুবতী নিনার পরম আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠেন এই ছিন্নমূল আশ্রয়প্রার্থী বৃদ্ধা নারী—মুক্তিপিসি। অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি মুহূর্ত তৈরি করেন নাট্য পরিচালক যখন মা ও মেয়ের কথা কাটাকাটির মধ্যে হঠাৎ করেই এসে পড়ে বাবার ব্যভিচারের সংবাদ, সবাই কেমন চুপ করে যায়, এই রকম অস্বস্তিকর পরিবেশকেও সহজ করে

তোলার জন্য স্নেহের সুরে মীমাংসার পথটি বাতলে দেন বৃদ্ধা— 'মাঝে মাঝে দু-দিকেই সামাল দিতে হয়।' বৃদ্ধা তাঁর জীবনে অনেক কিছু হারালেও নিজের আত্মসম্মান আত্মবোধ কখনও তিনি বিসর্জন দেন না। পুরোনো মূল্যবোধ সংস্কৃতি মানবিকতাকে বুকের মধ্যে আগলে নিয়ে থাকেন, বাঁচিয়ে রাখেন নগরায়নের কুশ্রীতা থেকে, আগ্রাসন থেকে। গ্রামবাংলার বুকে বেড়ে ওঠা বৃদ্ধার স্মৃতি জুড়ে থাকে তার অতীত। বৃদ্ধার আরও এক বৈশিষ্ট্য জীবনের চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ভেঙে পড়েন না, নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দেন না বা আত্মমর্যাদাকে বিক্রয় করেন না। এমনই এক দৃঢ়চেতা গ্রামীণ দেশজ সংস্কৃতির জলহাওয়া গায়ে মেখে আবাল্য বৈধব্যের সঙ্গে সহবাস করা নারীর আত্মকথার উন্মোচনে খুলে যায় নাটকীয়তার পরত। নাটকের মঞ্চনির্মাণ নাটকীয়তাকে মূর্ত করে তোলে। অশোক ভৌমিকের আঁকা দৃশ্যপট চমৎকার পরিবেশ তৈরি করেছে এ নাটকে। সঙ্গীত ভাবনার ক্ষেত্রে ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় দেশজ মাটির সুর ব্যবহার করেছেন। দৃশ্যবদলের সময় এবং বৃদ্ধার কণ্ঠে লোকগীতির প্রয়োগ নাটকের আবহটাকেই বদলে দেয়। নাটকের দৃশ্যপটটিও গতানুগতিকতার বাইরে ভিন্ন চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটায়। পিছনের সাইক্লোরামায় ক্যানভাসে আঁকা অনেকগুলো নারীমুখ কিন্তু নাটকটিকে নারীবাদী নাটক আখ্যায় গোষ্ঠীভুক্ত (Secterized) করে না। পুরুষবর্জিত এ নাটক মানবিক সম্পর্কের নাটক হয়ে ওঠে; হয়ে ওঠে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা সমাজ বিশ্লেষণের নাটক। মহাশ্বেতা দেবী, ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়, কেতকী দত্তসহ অনেকগুলি নারীচরিত্রের রসায়ন এ নাটককে অবশ্য নারীকেন্দ্রিক সমস্যাদীর্ণ নাটক হিসেবেই চিহ্নিত করে।

মুখ্য চরিত্র বৃদ্ধা মুক্তিপিসির ভূমিকায় কেতকী দত্তের অভিনয় এ নাটকের সম্পদ। এমন চরিত্রায়ণ দেখে মনে হয় হয়তো কেতকী দত্তকে দেখেই এই নাটকটি মঞ্চায়নের সিদ্ধান্ত নেন নির্দেশক। পরাশ্রয়ী, বাল্যবিধবা, জীবনের টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠ স্নেহশীল মানবিকতায়, কারুণ্যে উজ্জ্বল। পুরোনো ঘরানার থিয়েটারকর্মী কেতকী দত্তের অভিনয়, ফরিদপুরের বাঙাল ভাষা উচ্চারণ, সকণ্ঠে সপ্রতিভ দেশজ লোকগান, গল্পকথন— সমস্তটা মিলে তৈরি হয় অনন্য এক চরিত্র— বৃদ্ধাই এ নাটকের নায়িকা। 'মুক্তি'-র আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নিনা যার সঙ্গে অসমবয়সি এক গভীর সখ্য তৈরি হয় মুক্তি দিদার। পুরোনো ও নতুন এই দুই সময়কালের প্রতিনিধিত্ব করছে বৃদ্ধা মুক্তি পিসি ও নিনা। কিশোরীবেলা পেরিয়ে যৌবনে পা দেওয়া নিনার বয়সোচিত রাগ-দুঃখ-অভিমান-আদর্শ ক্ষেদ-সহমর্মিতা (বন্ধুর আত্মহত্যায়) প্রতিবাদ (মা দিদিমা পিসিমাদের ব্যবহারে) উজ্জ্বলতা-ভালবাসা, বাবার সঙ্গে অন্য নারীর সম্পর্কের কারণে নিস্পৃহতা, অভিনেত্রী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর সর্বোপরি

তাদেরই বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া বৃদ্ধা দিদার প্রতি মমত্ববোধ, অকৃত্রিম ভালবাসা নিনার অভিনয়ে প্রজাপতির মতো বিচিত্র রঙে রেখায় ডানা মেলে। নিনাই তো প্রতিবাদ জানায় তার দিদার প্রতি অমানবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে। তার মা বৃদ্ধাকে বিনে মাইনের কাজের লোকের মতো পরিশ্রম করায়। শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই শোষিত বৃদ্ধার পক্ষ নিয়ে লড়াই করে নিনা। কিন্তু রিমার আপাত রুক্ষতার মধ্য থেকেও বেরিয়ে আসে আরেকটা মানুষ। মুক্তিপিসি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানানোর পর রিমার কঠিন দৃঢ় বাস্তবতার মধ্যে থেকে উচ্চারিত হয় অসহায় কণ্ঠস্বর— সবাই আমাকে ফেলে চলে গেছে, এখন তুমিও যাচ্ছ। রিমার অন্তর্মোচনে মুক্তি অনুভব করেন তাঁর ভেতরের শূন্যতা ও একাকিত্ব। তবে এ নাটকের সমালোচনা হয় সেখানে বা দুর্বলতা বলে মনে হয়— তা হল নাটকের শুরুর দিকে মুক্তি পিসির প্রতি রিমার মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুর ব্যবহারে। নিনার চরিত্রে প্রথমে অভিনয় করেন মালিনী রায়চৌধুরী। নিনার মায়ের ভূমিকায় সুরঞ্জনা দাশগুপ্তর রুক্ষ কঠিন কঠোর ব্যক্তিত্ব মুক্তি পিসির বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী রূপে দ্বান্দ্বিক পরিবেশ তৈরি করে। রক্তমাংসের দরিদ্র অভাবী আশ্রয়হীন বৃদ্ধার চরিত্রে কেতকী দত্ত, প্রখ্যাত অভিনেত্রী প্রভাদেবীর কন্যা স্বাভাবিক অভিনয়ে মুগ্ধ করেন বাঙালি দর্শককে।

অভিনয় ভিন্ন নাটকের অন্যান্য বিভাগের প্রতি সব সময়ই তীক্ষ্ণ নজরদারি থাকে ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের— প্রযুক্তিগত দিকগুলির দায়িত্ব অর্পণ করেন যোগ্য মানুষদের হাতে। নাটকের মঞ্চ নির্মাণ করেছেন উজ্জ্বল ঘোষ ও মিথিলেশ সিং; আলো : বাদল দাস, রূপসজ্জা : সুকান্ত গুহরায় ও রত্ন রায়চৌধুরী। আবহসঙ্গীত পরিচালনা : ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়।

নাটকের শেষ দৃশ্যটি পরিচালকের মুনশিয়ানায় নাটকটিকে ভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেয়। শেষ দৃশ্যে মুক্তির হাত থেকে পড়ে যায় তাঁর টিনের তোরঙ্গ— চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে জিনিসপত্র— অজস্র স্মৃতির ভাণ্ডার ঘিরে ধরে তাঁকে। আর যাওয়া হয় না তাঁর। কী করবে সে? এই প্রশ্নচিহ্নে দর্শককে বিচিত্র উত্তর খোঁজার হদিশ দিয়ে যায়। মূল গল্পে মুক্তি নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু নাট্যপরিচালক মুক্তিকে এক আশ্রয় থেকে আরেক আশ্রয়ে স্থানান্তরিত না করে আত্মপ্রতিষ্ঠার মর্যাদায় উন্নীত করলেন। আর এইখানেই নাটক গল্পকারের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে পরিচালকের সৃষ্টি হয়ে ওঠে।

'মুক্তি' নাটকের নামকরণের পিছনেও আছে পরিচালকের অনুসন্ধিৎসা। তিনি আবিষ্কার করতে করতে গেছেন কীভাবে এক নারী ঘটনার দ্বান্দ্বিকতাকে অতিক্রম করে, নিজের ভিতরের কামনা বাসনার বন্ধনকে ছিন্ন করে, সমাজের পীড়ন শোষণের বেড়াজাল ভেঙে মুক্ত করতে পারে নিজেকে। এ তো

শুধু নারীমুক্তির নাটক নয়— মনুষ্যত্ববোধ ও মানবিকবোধের জাগরণের নাটক। 'মুক্তি' নাটকে একটা গোটা সমাজের বিভিন্ন নারী চরিত্রদের অবস্থান যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনই তাদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের ছবি বোনা হয়েছে। মুক্তি পিসিকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকা চরিত্রগুলো— নিনা, রিমা, জয়া, নীলিমা, রিমার মা, দাশুর মা— সমাজের এক-একটা অবস্থানগত রূপ, বাস্তব চরিত্র। দর্শক নিজের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারে। পুরুষচরিত্রগুলি মঞ্চে না এসেও চরিত্রের আলোচনায় যেন প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয়। কিশোরী জয়ার আত্মহননের দুর্বিষহ বেদনাহত পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারে না নিনাও; তার দুঃখের বন্ধু-সাথী হন মুক্তি দিদাও। আবার নিনারই অনুপ্রেরণায় পুরোনো নিভে যাওয়া জীবনকে নতুন আলোয় প্রজ্জ্বলিত করতে উদ্যোগী হন জীবনপ্রান্তে দাঁড়ানো বৃদ্ধা। ভালবাসা বা প্রেমের কাছে বয়স মাথা নত করে। ছেলেবেলার প্রেমকে স্বীকৃতি না দিয়ে বাবার পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করার মাশুল দিতে হয়েছে মুক্তিপিসিকে সারাজীবন। জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে সেই পুরোনো প্রেম যখন দু'হাত বাড়িয়ে আশ্রয় দিতে চায় মুক্তিপিসিকে, তখন ভিন্ন এক বোধের আলোতে উজ্জীবিত হন মুক্তি-পিসি। আর বন্ধন নয়— এ বার মুক্তি— নিজের জন্য বাঁচা। 'নিজের জন্য' 'মুক্তি'র মন্ত্র শিখে নেন মুক্তিপিসি।

স্মৃতি রোমন্থনের চমৎকার স্ট্রাকচারে গোটা নাটককে বেঁধেছেন নির্দেশক। বাস্তব আর অতীতের চলাচল সারা নাটক জুড়ে। মুক্তি পিসির মুখে বাঙাল ভাষার সংলাপ এ নাটকের সম্পদ। আঙ্গিকগত দিক থেকে অভিনব— গতিময়ও। পরিচালকের মূল রশির টানে মঞ্চের চরিত্ররা কুশীলব নয়, হয়ে ওঠে জীবন্ত বাস্তব রক্তমাংসের মানুষ। তবে সেখানে নির্দেশকের ভূমিকা থাকে নিরুচ্চার। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন— সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (নীলিমা), মায়া মুখোপাধ্যায় (দাশুর মা), সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত (রিমা), মিনাল পারিখ (জয়া), রত্না রায়চৌধুরী (রিমার মা) এবং ছোট নিনা উপাসনা বসু। এ নাটকের অবহেলিত মুক্তি পিসিরা তো বাংলার ঘরে ঘরে, তাই বাংলার দর্শক খুব সহজেই মুক্তিপিসিকে চিনে নিতে পারেন। ''মুক্তি' নাটকের নির্দেশিকা কখনও উচ্চকিত হন না। স্বাভাবিক অনুভবকে সহজ ও সুন্দর করে তোলেন। আর আশ্চর্য এক টিমওয়ার্ক মুক্তির এই হয়ে ওঠাকে সম্ভব করে।"[৪৮]

এত দিন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর হিন্দি থিয়েটারগুলি নিয়ে একটা উচ্চতায় পৌঁছতে চেয়েছিলেন। 'মুক্তি'র ক্ষেত্রে তাঁকে দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হল— তাঁরই সৃষ্ট হিন্দি নাটকগুলি এবং সমসাময়িক বাংলা নাটকগুলি। দুটি ক্ষেত্রেই 'মুক্তি'র তুলনামূলক আলোচনা জরুরি। পত্রপত্রিকা

ও দর্শকের বিচারে 'কোর্ট মার্শাল' বা 'রুদালি'র উচ্চতায় পৌঁছতে না পারলেও 'মুক্তি' ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃজন সম্ভারে অবশ্যই মাইলস্টোন।

'মুক্তি'র অভিনয়ে নব্বই-এর দশক শেষ হয়। নতুন দশকের সূচনাতে ঊষা এমন একটি নাটক পরিচালনা করলেন যেখানে স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের একটা ছবি উঠে এল। নাটক 'শোভাযাত্রা' (২০০১)— নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে এক শোভাযাত্রার পরিকল্পনা। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মাফিয়া ডন 'ভাইয়া' এই শোভাযাত্রার আয়োজক। তারই ডাকে সাড়া দিয়েছে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, উকিল, শিক্ষিকা— যাঁরা সাজবেন কেউ গান্ধীজী, কেউ বাল গঙ্গাধর তিলক, কেউ জওহরলাল নেহরু, নেতাজী, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ কিংবা মহারাষ্ট্রের দেশনায়ক গেনু। সমাজের তথাকথিত উঁচুতলার মানুষেরা কেউ আপত্তি জানায় না ভাইয়ার ডাকে সাড়া দিতে, কেননা শাসকশ্রেণির মদতপুষ্ট মাফিয়া ডনের ক্ষমতা ও আধিপত্যের সীমানা যে দূরব্যাপী। শিক্ষিকা— ঝাঁসির রানি সাজতে রাজি হন কারণ তাঁর স্কুলের সেক্রেটারি হলেন ভাইয়া। গান্ধীজীর বেশ ধারণ করতে বাধ্য হন আর.এস.এস.-এর সমর্থক বাপ্‌ত কেননা ভাইয়ার গোপন জাতকর্মের সঙ্গে তাঁরও যোগাযোগ। অধ্যাপক, বেশ ধারণ করতে সম্মত হন কেননা তিনি প্রশ্নপত্র ফাঁসের অপরাধের সঙ্গে জড়িত। অপরাধ জগতের সাকরেদ সাজলেন নেহেরু যিনি আবার শিক্ষয়িত্রীর প্রতি প্রেমাসক্ত। ভাইয়ার অপরাধকে আইনসম্মত ব্যাখ্যা দেন যিনি সেই আইনজীবী যাদব, রূপ নিলেন নেতাজির। আর গো-ডাউনের কর্মী বাবু হলেন মহারাষ্ট্রের ক্ষুদিরাম 'গেনু'। কী সাংঘাতিক দ্বান্দ্বিকতা মূল চরিত্র ও বেশধারী চরিত্রের মধ্যে। সিরিও কমিক নাটক 'শোভাযাত্রা'র নাট্যকার শাফৎ হোসেন ব্যঙ্গ বিদ্রুপের শাণিত অস্ত্রের মাধ্যমে বিচার করলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত শ্রদ্ধেয় দেশাত্মাদের পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষগুলোর দ্বিচারিতাকে। আসলে এও এক দুর্বৃত্তায়ন। 'শোভাযাত্রা' নাটকের ভাবনার মধ্যে এই রাজনৈতিক আধিপত্যের, ক্ষমতায়নের নেতিবাচক দিকগুলোর সমালোচনা করা হয়েছে। বিদেশি মহিলা সাংবাদিকের দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে সত্য ছবি। নেহরু-গান্ধীজী-নেতাজী-তিলক-গেনু- ঝাঁসির রানি-র পোশাক সাজসজ্জার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে তাদের হিংসাদীর্ণ, সমস্যা জর্জরিত, লোভ-ঈর্ষা-দ্বিচারিতার টানাপোড়েন।

মূল মারাঠি নাটকের হিন্দি রূপান্তর 'শোভাযাত্রা'র নাট্যকার শাফৎ খান। নাট্যকার ভারতীয় রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের ছবিটা সামনে রেখে এই নাটকের ঘটনাবস্তু স্থাপন করেছেন ভারতের নির্দিষ্ট একটি শহর মুম্বই-তে। মুম্বই না হয়েও এই নাটকের পটভূমি হতে পারত ভারতের যে কোনও স্থান।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা অপেক্ষা করছেন আগের রাত থেকে এমন একটা জায়গায় যেখানে বে-আইনি অস্ত্রশস্ত্র গোপনে রাখা হয়। নাট্যকার মহাত্মাদের বেশধারীদের অপেক্ষারত স্থানটির নির্বাচনেও একটা তির্যক ভঙ্গি গ্রহণ করলেন। নাট্য নির্দেশক ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় সাম্প্রতিক সময়ের (যে সময়ে এ নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে) রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় আঘাত হেনেছেন। এ নাটকে পুরোনো মূল্যবোধের অবনমন, দেশপ্রেমের অন্তঃসারশূন্যতা, আদর্শের ক্ষয় ও বিপন্নতার কথা উঠে এসেছে শোভাযাত্রার বাহ্যিক আভরণের মধ্য দিয়ে। অনেকেই ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ধরনের চিন্তাভাবনার একপেশে রাজনৈতিক বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকারও করেছেন বক্তব্যের শুষ্কতা শুধু নয়— শিল্পের রস সৃষ্টিতেও তিনি কতটা পারঙ্গম। ‘আজ মনে হয় তাঁর ছবির রঙ সাদা কালো। রাজনৈতিক মতবাদের বেড়াজালে আটকে পড়েছেন। মানবিক চিত্রগুলো ঢাকা পড়েছে মতবাদী লড়াইয়ে।... কিন্তু ঊষা গাঙ্গুলি বরাবর তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের প্রতি দায়বদ্ধ এবং তাঁর মননের আগুনে কিছু কিছু মুহূর্তকে বাস্তব করে এক অদ্ভুত অনুভূতির জগতে পৌঁছে দেয়— হয়ে ওঠে শিল্প-এটাই বা কি কম পাওনা।’[৪৯]

এ নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের। বস্তার ওপর বস্তা সাজিয়ে অপরিচ্ছন্ন গুদাম ঘরটি যেন স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন পরিস্থিতির প্রতিরূপ। কাগজের শিকলি, এলোমেলো পড়ে থাকা নেতাদের কাট আউট, বস্তা দিয়ে সাজানো বাস্তবসম্মত গুদাম ঘরের পরিকল্পনা প্রশংসা অর্জন করে। ‘Ganguli designs an impressive set which makes uncommon use of heigh above a wall of sandbags, but metaphorically conveys India as a dank, dark interior space hemmed in by corruption.’[৫০] বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছিলেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ— ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়, বাপু বা মহাত্মা গান্ধী— রাজারাম যাজ্ঞিক, তিলক— ওম পারিখ, নেহরু— নরেন্দ্র রায়, গেনু— উজ্জ্বল ঝাঁ, ছোটু— দীপক রজক, বিদেশি সাংবাদিক— সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়।

নারী শক্তিবর্ষে ঊষার নিবেদন ছিল ‘অন্তরযাত্রা’ (২০০২)। এ নাটকে তিনি তাঁর জীবন ও নাট্যমঞ্চের যাত্রাপথের কাহিনিকে তুলে ধরলেন একঘণ্টা সময়ব্যাপী একক অভিনয়ের মাধ্যমে। নাটকের শুরুতেই পর্দা খোলার আগেই বেজে ওঠে বিসর্জনের বাজনা। দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের ঢাকের আওয়াজ তাঁকে মনে করিয়ে দেয় ভিনরাজ্যে তাঁর জন্ম হলেও বাংলার মাটির টান তাঁর অন্তরের গভীরে। এই বাংলায় তাঁর বড় হয়ে ওঠা, দুর্গাপুজোয় ছোটবেলায় নতুন জামার জন্য আবদার— আজও নতুন পোশাকের জন্য আশা করে থাকা। টালিগঞ্জের বাড়ি, স্কুল জীবন, কলেজ জীবন, ইউনির্ভাসিটি, কফি

হাউস, আড্ডা, নাট্য-অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হওয়া, থিয়েটারের জগৎ তাঁর সামনে খুলে যাওয়া— এই রকম জীবনের বিভিন্ন সময়ের মুহূর্ত জুড়ে জুড়ে তৈরি হয় নাটক 'অন্তরযাত্রা'— এর মধ্যে অভিনয় করে যেতে থাকেন তাঁর স্মরণীয় নাটকগুলির খণ্ডাংশ। কেয়া চক্রবর্তীর মাধ্যমেই পরিচয় হয় তৃপ্তি মিত্রের। তৃপ্তি মিত্র, কেয়া চক্রবর্তী, কেতকী দত্ত-র মতো অগ্রজ অভিনেত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তাঁর অন্তরলোকের ব্যাপ্তির উদ্ভাসন। এই নাটকে একটি গানের (এই লভিনু সঙ্গ তব...) মধ্য দিয়ে স্পর্শ করেন রবীন্দ্র প্রসঙ্গ— শান্তিনিকেতন কথা। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাঁর অভিনয় জীবন। 'অন্তরযাত্রা' নাটকের মূল ভূখণ্ড জুড়ে তাই চিত্রিত হয় ঊষা অভিনীত দর্শক অভিনন্দিত জীবনের বিভিন্ন পর্বে অভিনীত হওয়া নাটকগুলির নির্বাচিত অংশ। প্রথমেই উল্লেখ করেন অভিনয় জীবনের গোড়ার দিকে অভিনীত 'পরিচয়' (Wesker's 'Root' অবলম্বনে) নাটকের প্রসঙ্গ দিয়ে। সেখানে তিনি বীণার চরিত্রে অভিনয় করেন। এ নাটকের নির্দেশক ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। 'রঙ্গকর্মী' প্রতিষ্ঠার পর বিশিষ্ট নির্দেশকদের পরিচালনায় যখন কাজ করছিলেন, সেই পর্বে তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় 'গুড়িয়া ঘর' নাটকে মুখ্য চরিত্র মুনিয়ার ভূমিকা তাঁর আন্তরিক অভিনয়ের স্বাক্ষর। 'অন্তরযাত্রা'র অভিনেতার বাঁদিকে (actor's left) তেকোনা ফ্রেমের ওপারে দাঁড়ান মুনিয়ারূপী ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়। গায়ে জড়িয়ে নেন ফ্রেমের একপাশে রাখা সাদা ওড়না বা হালকা চাদর; গায়ে জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়ান ফ্রেমের ওপারে। মনে হয় একটা জানলার ওপারে তিনি তৈরি হয় একটা দূরত্ব— অপূর্ব এক দৃশ্যায়ন। বলতে থাকেন সিঁদুর মুছে ফেলে আত্মগ্লানি থেকে মুক্ত মুনিয়ার আত্মসম্মানবোধে উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনি। ভারতীয় নারীর সিঁদুর মুছে ফেলার মতো দুঃসাহসিক কাজ; স্বামী সন্তান ছেড়ে মুনিয়ার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া— মুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শককেও দাঁড় করিয়ে দেয় কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। মুনিয়া মনে করে সে মানুষ— এটাই তার সব থেকে বড় পরিচয়— আত্মসম্মান তার কাছে অনেক মূল্যবান বস্তু প্রাত্যহিক সুখ স্বাচ্ছন্দের চেয়ে। মুনিয়ার প্রসঙ্গ থেকে এসে পড়ে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ কাহিনি অণিমাদির কথা। স্বামী পরিত্যক্তার কাহিনিতে বাজতে থাকে নিজস্ব বেদনার সুর। ব্যক্তিজীবন অভিনয় জীবন একসঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় যে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আস্থা রাখেন সেই জায়গা থেকে নির্বাচন করেন ব্রেখ্ট-এর 'মাদার কারেজ অ্যান্ড হার চিলড্রেন' অবলম্বনে 'হিম্মত মাঈ'। এই নাটকের খণ্ডাংশ অভিনয়কালে মঞ্চের 'actor's right'-এ গিয়ে স্টেজ থেকে তুলে নেন লাল পতাকা, জড়িয়ে নেন নিজের গায়ে। এই অংশ অপূর্ব এক দৃশ্য হয়ে স্মরণে থাকে শুধু তা-ই নয়, কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি তাঁর বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে পথ চলেন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিম্মত মাঈ-এর

লড়াই আরও অনেক অনেক মেয়ের লড়াইয়ে পৌঁছে যায়, যখন তিনি একঝাঁক থিয়েটার কর্মী নিয়ে তৈরি করেন 'বেটি আয়ী'। এ নাটকের শুরুতেই মঞ্চের ডান দিকে ত্রিকোণ ফ্রেমের একপাশে ঝোলানো হলুদ ওড়না তুলে নিয়ে তাকে ছোট্ট এক বাচ্চার আকারে কোলে নিয়ে শুরু করে দেন 'বেটি আয়ি' নাটক। 'মুক্তি'— ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশিত একমাত্র বাংলা নাটক। বাঙালি দর্শকদের ভালবাসার অনুরোধে তাঁর উপস্থাপনা 'মুক্তি'। 'মুক্তি'র প্রসঙ্গে তাঁর স্মরণে আসে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী কেতকী দত্তের কথা— যিনি ছিলেন এ নাটকের মুখ্য চরিত্রাভিনেত্রী। নির্দেশকের সঙ্গে অভিনেত্রীর কাজের ক্ষেত্রটা এতটাই সম্মানের ছিল যে বর্ষীয়সী এই অভিনেত্রী বয়সে অনেক ছোট ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়কে অকপটে বলেন 'যা বলবে তাই করব'। কেননা পুরোনো থিয়েটারের জল হাওয়ায় বড় হয়ে ওঠা কেতকী দত্ত একজন নির্দেশকের মর্যাদাকে অস্বীকার করেননি। নির্দেশক ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর দল 'রঙ্গকর্মী'র সঙ্গে কেতকী দত্তের সম্পর্ক যে কি অকৃত্রিম তা ব্যক্ত করেছেন কেতকী দত্ত নিজেই তাঁর স্মৃতিকথায়: 'রঙ্গকর্মী এবং ঊষা গাঙ্গুলি, এদের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র আমার শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। দীর্ঘদিন ধরে রঙ্গকর্মীর নাটকের কথা শুনে আসছি। এত গ্রুপের সঙ্গে আমার পরিচয়, কিন্তু এদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি কেন? মনে হয় সব কিছুর একটা সময় আছে। তাই সেই সময় আসতেই সামনাসামনি পরিচয়টা হল। আর ঊষাকে প্রথম দেখাতেই মনে হল, ওর সঙ্গে কোথায় যেন আমার একটা আত্মিক যোগসূত্র আছে। -তা না হলে ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে কোথায় যেন বলে উঠল, এদের সঙ্গে কোনো কাজ করা যায় না? ভাবলাম, না, তা কী করে হবে? এরা তো হিন্দি নাটক করে। আমি তো হিন্দি বলতে পারি না। মনটা কেমন যেন হয়ে গেল আমার। ... তাই ঊষা যখন ওর মনের কথা, আমাকে নিয়ে নাটক করবে, প্রকাশ করল, তখন আমার যে কী আনন্দ হয়েছিল, তা বলে বোঝাতে পারব না।'[৫১]

নির্দেশক ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের মাইল ফলক 'রুদালি'। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়ার রীতি এ নাটকে গ্রহণ করেছিলেন নির্দেশক। তাই 'মুক্তি' ও 'কেতকীদি'র প্রসঙ্গ ছেড়ে আবার ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ঢুকে পড়েন তাঁর নির্দেশনা জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা 'রুদালি'র প্রসঙ্গে। গায়ে জড়িয়ে নেন কালো চাদর, উচ্চকিত কান্নার দৃশ্য এক মুহূর্তে তৈরি করে দেয় 'রুদালি'র পরিবেশ। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় হয়ে ওঠেন শনিচরী।

'অন্তরযাত্রা'য় নারী চরিত্রগুলির চিত্রায়ণ পর্যায়ের চূড়ান্ত মুহূর্তটি তৈরি হয় যখন ঊষা মঞ্চে নিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণালকে। মধ্যমঞ্চে এসে দাঁড়ান। এক প্রতিবাদী নারী চরিত্র।

তখন তাঁর গায়ে আকাশ-নীল ওড়না। সমুদ্রের ধারে একাকী এই নারী তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল একটি পত্রে— পত্রের প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি, অক্ষর, বর্ণের মধ্যে সেই নারীসত্তার আত্মসম্মান বোধের গরিমা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় আজও— '...তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ। ... মীরাবাঈও আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল— তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয়নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে। মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু।'[৫২] মৃণালের প্রতিবাদিনী সত্তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়। 'অন্তরযাত্রা'র যে Folder টি তৈরি করেছে রঙ্গকর্মী তার ডিজাইন বিশেষ তাৎপর্যবাহী ও শিল্পসম্মত। এই Folder-এর চারটি ভাঁজে মোট আটটি পাতা। ৬ x ৬ সাইজের— প্রথম পাতাতেই নাটকের নামটির লিপি অঙ্কনে লক্ষ করা যায় 'antar yatra' শব্দটি লেখা হয়েছে এইভাবে— antar-yatra ;— এই t বর্ণটিকে লাল রঙে একটি সরলরেখায় অঙ্কিত করার মধ্য দিয়ে দৃঢ় দৃপ্ত প্রতিবাদের এক ভঙ্গি যেন চিত্রিত করা হয়েছে। এ নাটকের পরিকল্পনা রচনা ও নির্দেশনা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় আকর্ষক বাক্যবন্ধ (Catch Line)-এ লেখা "in dialogue with my characters"। আলোক পরিকল্পনা করেছিলেন তাপস সেন, মঞ্চসজ্জা খালেদ চৌধুরী; folder-এর পরিকল্পনা ও অঙ্কন হিরণ মিত্র, folder-টিতে নাটক ও মঞ্চভাবনাকে স্মরণে রেখে অসামান্য কিছু স্কেচ করেছেন হিরণ মিত্র। 'অন্তরযাত্রা'— ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়কে দেশে-বিদেশে প্রভূত সম্মান এনে দিয়েছে। এই নাটক নিয়ে তিনি যোগদান করেছেন পাকিস্তানে— লাহোরে অনুষ্ঠিত 'জেনানী' উৎসবে। 'জেনানী' শব্দের অর্থ হল নারীত্ব।

ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের দীর্ঘ নাট্যজীবনের অভিজ্ঞতা এবং নির্দেশনার কাজে তাঁর মনোনিবেশের ফলশ্রুতি 'অন্তরযাত্রা'। এই যাত্রা তাঁর নাট্যজীবনের এবং সমান্তরালভাবে ব্যক্তিজীবনেরও। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রঙ্গকর্মী-র ২৬ বছরের পথচলার সঙ্গে তিনি জড়িয়ে আছেন ওতপ্রোতভাবে। মানুষের নিজস্ব অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চায় যে সমস্ত শক্তি, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ঊষা— এই 'অন্তরযাত্রা'র যাত্রাপথেও সেই সমস্ত শক্তিদের বিরুদ্ধে-ই তিনি প্রকারান্তরে লড়াই চালিয়ে গেছেন। ইবসেন, গোর্কি, ওয়েস্কার, ব্রেখ্‌ট, ফ্রাঙ্কারামে। মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখের সঙ্গে মিলিয়ে ঊষা তাঁর জীবনের এমন একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেন যেখানে তাঁর অপমানিত ব্যক্তিসত্তা সমাজে নারীদের চরম অপমানের কারণে জর্জরিত হয়ে ওঠে। 'অন্তরযাত্রা' তখন হয়ে ওঠে শুধু এক নারীর বা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন বা নাট্যজীবনের বৃত্তায়ন নয়— আরও অনেক অনেক নারীর অন্তর্জগতের উন্মোচিত

পৃথিবী, তাদের পৃথিবী যারা এখনো সমাজে ‘Second Sex’ বন্ধনীতেই পর্দানসীন। এ নাটকে নাট্যকার-নির্দেশক তুলে ধরেন জোহরা বিবির কথা, যে জোহরা বিবি খেলনা বিক্রি করে পেট চালায়। সংবাদপত্রের সাম্প্রতিক ঘটনা হয়ে ওঠে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু। ‘অন্তরযাত্রা’য় ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অভিনয় জীবনে বা ব্যক্তিজীবনে যে সমস্ত সম্মাননীয় অভিনেত্রী এসেছেন, যাঁদের কাজ তাঁকে প্রাণিত করেছে, যাঁদের সঙ্গে কাজ করে তিনি সমৃদ্ধ হয়েছেন যেমন তৃপ্তি মিত্র, কেয়া চক্রবর্তী, কেতকী দত্ত প্রমুখ, তাঁদের প্রতি এ নাটকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অগ্রজের প্রতি অনুগামীর এই শ্রদ্ধা যেমন তাঁর নমনীয় মনের পরিচায়ক তেমনই প্রয়োজনে তিনি প্রতিবাদী। তাই ২০০২ সালের প্রযোজনা আবারও ২০১৪-য় মঞ্চস্থ করেন। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ‘অন্তরযাত্রা’ যখন অভিনয় করেন তখন এই প্রযোজনা দেখতে দেখতে দর্শক অনুভব করেন আজও এ নাটক কতটা সাম্প্রতিক। বারো বছরের অভিজ্ঞতা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের মঞ্চ উপস্থিতিকে আরো দৃপ্ত করেছে— এক ঘন্টাব্যাপী একক অভিনয় প্রমাণ করে শৈথিল্য শব্দটি তাঁর অভিনয়-অভিধানে বহির্ভূত।

২০০২ সালে ‘অন্তর যাত্রা’য় তিনি একা অভিনয় করেন আর তার ঠিক পরের বছরই ২০০৩-এ তিনি ‘কাশীনামা’ নাটকে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে দীর্ঘসময় মহলা দিয়ে প্রযোজনাটি মঞ্চস্থ করেন। অন্তরযাত্রার প্রেক্ষাপট ছিল নির্দিষ্ট কয়েকটি নাটকের অভিনয় অংশ এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন সময়ে কিছু অবিস্মরণীয় ঘটনাবলীর চিত্রণ। কিন্তু এক বছরের মধ্যে অনেক বড় প্রেক্ষাপটে সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বা বলা যেতে পারে একটা দেশের আর্থ-সামাজিক সংকটকালীন পরিস্থিতি উঠে এল নাট্য পর্যালোচনায়। নাটকের বিষয়বস্তু বা নাটক নির্বাচন থেকে নিখুঁতভাবে নাটক উপস্থাপনার পর্ব পর্যন্ত এক দীর্ঘ যাত্রাপথের কাহিনির মধ্যে নির্দেশকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা প্রত্যক্ষ করি— ক) নির্দেশক ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় এক বৃত্তের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে রাজি হন। (২) নির্দেশকের কাছে অত্যন্ত জরুরি বর্তমান প্রেক্ষিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সমালোচনা। ৩) সমকালীন সম্পর্কে, রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি সম্পর্কে ঊষার সচেতনতা, মেধা ও মনন তাঁকে এই ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত— প্রযোজনায় চালিত করে। ‘রঙ্গকর্মী’র নিজস্ব ফোল্ডারে ‘Director’s Note’ শিরোনামাঙ্কিত কলামে তাঁর অন্বেষণ পদ্ধতি ও ভাবনাচিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সেখানে লক্ষ করা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানান অনুশাসন এবং তদুপরি গোটা রাষ্ট্রের বা দেশের নৈতিক মানবিক অবক্ষয়ের পর্যালোচনা বা সমালোচনা করার ক্ষেত্রে যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন— তা তিনি আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। এই রকমই একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি ‘কাশীনামা’ প্রস্তুত করেন।

ডঃ কাশীনাথ সিং রচিত 'কাশীনামা' নাটকটি ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় ২০০৩ সালে। প্রায় চল্লিশ জনের (চরিত্রাভিনেতার নাম পাওয়া যাচ্ছে পরিচয় লিপিতে ৩৪ জনের নাম এবং অন্যান্য বিভাগেও যুক্ত আছেন অনেকে) দলগত শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যে নাচ, গান, দৃশ্যায়নের মধ্য দিয়ে নাটকের মূল বক্তব্যকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী বারাণসী শহরের ধর্ম, ধর্মীয় ক্ষমতালিপ্সু মানুষদের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় ভণ্ডামি, বিশ্বায়ন, বাণিজ্যিকীকরণ---- এই বিষয়গুলি 'কাশীনামা'র মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন নাট্যকার। 'কাশীনামা' মূলত গ্লোবালাইজেশনের বিরুদ্ধে কথা বলতে চেয়েছে। নাট্যকার ডঃ কাশীনাথ সিং হিন্দি সাহিত্য সমাজে অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম। তাঁর বিভিন্ন গল্পে উঠে এসেছে বারাণসীর জীবনচিত্র হাস্যরস ও ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে সহজ সরল কথোপকথনে; বৈপরীত্যের সমাহারে শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত বর্তমান হিন্দি সাহিত্যের বাইরে এক ভিন্ন জগতে গড়ে তুলতে  চান কাশীনাথ সিং। তাঁর 'পাণ্ডে কৌন কুমতি তোহে লাগি' গল্পের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে নাটক 'কাশীনামা'। বারাণসী শহরের একটা নিজস্বতা আছে, চিরাচরিত ধারায় বয়ে চলা গঙ্গার ধারে গড়ে ওঠা পুরাতন এই শহরের আপাত ঐতিহ্যের নেপথ্যে নিরন্তর কত বদল ঘটে চলেছে সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে— তার-ই ছবি উঠে এসেছে এ নাটকে। সারা পৃথিবীব্যাপী যে পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে তার প্রভাব থেকে মুক্ত নয় বারাণসী। এই গল্পে সমস্ত রাষ্ট্রের ছবিটাই প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে রাজনীতি বা রাজনৈতিক মৌলবাদী ধার্মিকরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। রাজনীতি আর ধর্মের এক অশুভ আঁতাত সেখানে। শুধু তাই নয় দুরন্ত গতিতে বিশ্বায়নের আগ্রাসন কীভাবে গ্রাস করছে সাধারণ মানুষের সরল জীবন— জন্ম নিচ্ছে লোভ, রিরংসা, অসততা— তার-ই একটা চিত্র 'কাশীনামা'য় দেখানো হয়েছে। এ নাটকে এ প্রশ্নটাই অত্যন্ত দৃপ্তভঙ্গিতে উঠে এসেছে যে বিশ্বায়নের জোরালো শক্তি এবং প্রাচীন ভারতের চেতনা— তারা কি সত্যি সত্যিই পরস্পর বিরোধী? না কি একই মুদ্রার দু'দিকের দুটো পিঠ— একই সঙ্গে কাজ করে চলেছে?

'রঙ্গকর্মী'র 'কাশীনামা' নাটকের পরিচয়লিপিতে উদ্ধার করা হয়েছিল কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি 'কাশীনামা' দেখার পর যে মন্তব্য করেছিলেন তারই আলোতে বিষয়টি পর্যালোচনা করা যেতে পারে—

১. ''কাশীনামা'' দেখেছিলাম মধুসূদন মঞ্চে। ... ধর্ম শব্দটি ক্রমান্বয়ে লোভ, সংকীর্ণতা, জিঘাংসা, ''আমার ধর্মই সঠিক, পরধর্ম অবলম্বীকে বিনাশযোগ্য বলেই সক্রিয় হওয়া উচিত।'' এমতো বিশ্বাস ও আচরণ ধর্মকে করে তুলেছে স্বৈরতন্ত্রীদের হাতিয়ার।''

(মহাশ্বেতা দেবী)

২. সমবেত প্রযোজনা চমকপ্রদ। গোষ্ঠীবদ্ধ ধর্মের পরিকল্পিত মত্ততা কতটা আগ্রাসী হতে পারে— তা-ও বুঝেছি এ নাটক দেখে। এই মত্ততার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার যোগ অতীব নিবিড়। প্রশ্ন হল, পরিত্রাণ কোন পথে? ধর্মের পোশাকী রূপান্তরে, না, সুস্থ গণচেতনার বিকাশে? (শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত)

৩. By Watching 'Kashinama' my mind was disturbed with the blind belief of the innocent pilgrims and the exploitation of the clever Pandit's roaming over the several 'ghats', and the pitiable situation of the Holy water of Ganga! (P. Govindan Kutty)

দর্শক এবং বিশিষ্টজনের কাছে 'কাশীনামা' এই বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিল যে ধর্ম এবং বাণিজ্য এই উভয়ের যোগাযোগ সমাজে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা মানুষের হিতসাধন তো নয়-ই অনিষ্টকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে। সেই দিক থেকে বিচার করলে 'কাশীনামা' হয়ে ওঠে সমকালের রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় সমস্যামূলক নাটক যা একই সঙ্গে নাটকের নান্দনিক শৈল্পিক দিকটিকেও অস্বীকার করে না। ধর্মীয় উন্মাদনা কতটা আগ্রাসী হতে পারে যদি তার সঙ্গে বিশ্বায়ন ও বাণিজ্যিক বুদ্ধির যোগসাজশ ঘটে।

বিষয়গত দিক থেকে নয়— কীভাবে এ নাটকটি তৈরি হয়ে উঠেছিল তার আলোচনাও জরুরি এ ক্ষেত্রে। 'রঙ্গকর্মী'র রেপার্টরির সদস্যরা নিয়মিত নাটক সংক্রান্ত নানান কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রাখে। নিয়মিত গল্প বা নাটক পড়া এ কাজের মধ্যে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। এই কাজের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে পড়া হয় ডঃ কাশীনাথ সিং-এর লেখা 'পাণ্ডে কৌন কুমতি তোহে লাগি'— যা আলোড়িত করে দেয় ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়কে। এই গল্প থেকেই তিনি পেয়ে যান তাঁর নাটকের সারবস্তু। কিন্তু একটি গল্প পড়েই একজন রচনাকারের মানসিকতা বোঝা যায় না বলেই নির্দেশক পড়তে শুরু করেন ডঃ কাশীনাথ সিং-এর অন্যান্য রচনা। তাঁর নিজের বোধ বা জানার জায়গাটা আরও পরিষ্কার করে নেবার জন্য। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমী ভাবনাচিন্তার প্রভাব আমাদের সমাজের ওপর পড়েছে তার প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে প্রোথিত হয়ে গেছে— খুব সহজেই হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধ, নৈতিকতা— ক্রমশ অবনমন ঘটছে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ভাবনার জগতে। এই মন ও মানুষের দৈন্য তাড়িত করছিল ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়কে— তাই তিনি তুলে ধরতে চাইছিলেন দেশের এই অবক্ষয়িত পরিস্থিতিকে। 'কাশীনামা'র প্রেক্ষাপটে পুরো বিষয়টিকে তুলে ধরা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ— তবু তাঁর মন বলছিল— 'I could smell the nerves and pulse of Nation. I started varanasi again

and again walking down the lanes of Kashi, its simplicity, its slyness as well as its carelessness.'[৫৩] ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের সামনে তখন একটা বৃহৎ জিজ্ঞাসা আলোড়ন তুলেছিল— সাংঘাতিক এই আগ্রাসনের মুখ থেকে— বিধ্বংসী আক্রমণের সামনে কি করে নিজেদের রক্ষা করা সম্ভব? কোথায় এই লোভী পণ্যসর্বস্ব সংস্কৃতির অবসান? তাই নির্দেশকের মনে জাগে 'What is the result of this change? For whose sake? whose benefit? Whose luxury? And at whose cost?'[৫৪] এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে তাঁর ভাবনায় এল এই নাটক উপস্থাপনার এক অভিনব আঙ্গিক— যা এই নাটকের জন্য ছিল অত্যন্ত জরুরি। বারাণসীর সংস্কৃতিকে পুরোপুরি তুলে ধরতে গেলে অবশ্য গান ও সঙ্গীতের মাধ্যমে উপস্থাপিত করাটা যেমন নান্দনিক তেমনই অভিনব। তৈরি হল গান। বাদ্যযন্ত্র বা সঙ্গীত আয়োজনের ব্যবস্থা হল মঞ্চের উপরেই— প্রায় চল্লিশ জন উদ্যমী পরিশ্রমী প্রাণবন্ত ছেলেমেয়ে মাসের পর মাস পরিশ্রম করে, নিখুঁত কোরিওগ্রাফির যথাযথ উপস্থাপনায় মঞ্চস্থ করল 'কাশীনামা'। প্রায় আটমাস অক্লান্ত যুদ্ধজয়ী পরিশ্রমান্তে জন্ম হল 'কাশীনামা'র। যাঁরা এ নাটকে মঞ্চে অভিনয় করলেন— পাণ্ডাইন-ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়, পুরোহিত ও পাণ্ডে ধর্মনাথ শাস্ত্রী— রমাশঙ্কর দুবে; সূত্রধার, বদকা, নাট—হরিশঙ্কর দাস; চুটকী— রেশমা মিশ্র, মুন্না— মোহিত মিশ্র, বাবলু—সুমিত মৈত্র; বাদকী— সোমজিতা ভট্টাচার্য; কান্নি— রাজেশ শর্মা/বিজয় রায়; মাণ্ডেলিন (Mandeleine) কল্পনা ঠাকুর/ বিশ্বশ্রী মিত্র; সূত্রধার/ঘুন্নি/মালহার— মনোজ চৌধুরী, সূত্রধার/দুবেজী/মহাবীর/শিবা— পার্থসারথি সরকার; তান্ত্রিক/সুমন/রামজী রায়— ছবিলাল রামশঙ্কর; সূত্রধার/ গজানন— বিজয় রায়, মাচুয়ারা/নাট লিডার/ওয়েস্টলার (Wrestler) — উদয়ভগৎ প্রমুখ। ঊষার সহযোগী নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছিলেন— মনোজ চৌধুরী, পার্থসারথি সরকার; মঞ্চসজ্জা— বিজয় রায় ও দীপেশ, শঙ্কর ও সোমনাথ। এ নাটকের আলোক-ভাবনা ছিল তাপস সেনের। গানের কথা— ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ও অরবিন্দ চতুর্বেদ; পরিচয় লিপি ও পোস্টারের পরিকল্পনা ও চিত্রণ করেছিলেন হিরণ মিত্রের মতো প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। সমগ্র নাটকের পরিকল্পনা, সঙ্গীত, নির্দেশনা— ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের। এতজন মানুষকে নিয়ে এত বড় মাপের কাজ করার ঝুঁকি দৃঢ়তা নিজের কাঁধে নেওয়ার সাহস বাংলার মঞ্চে কিন্তু রেখেই চলেছেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়।

নির্দেশক ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ নাটকগুলির পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর নির্দেশক সত্তার কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে—

(১) ঊষা একই সঙ্গে নির্দেশক এবং দলের অন্যতম প্রধান সংগঠক। 'রঙ্গকর্মী'র সাংগঠনিক

বিষয়টি তাঁকে দায়িত্ব সহকারে সামলাতে হয়। তাই প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বদানের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা গেছে। এ ছাড়াও তিনি 'রঙ্গকর্মী'র প্রধানতম অভিনেত্রী। অনেকগুলি নাটকের মূল কাঠামো নির্মাণে তাঁর অভিনয়ের একটা বড় ভূমিকা থাকে। সেখানেও সম্পূর্ণ নাটকের লিড ক্যারেক্টর বা মুখ্য চরিত্রের দায়িত্ব থাকে নাটকটিকে দৃঢ় বাঁধনে বেঁধে রাখার। সাংগঠনিক শক্তি এবং অভিনয়ের দৃঢ়তা তাঁকে  নির্দেশক হিসেবে অনেকটা সাহায্য করে। এই ত্রিবিধ শক্তির জোর তাঁর নির্দেশক সত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২) উষা গঙ্গোপাধ্যায় যৌবনের শক্তিতে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন যত দিন 'রঙ্গকর্মী'র মধ্যে এই যুবশক্তির প্রাধান্য থাকবে তত দিন কোনও ভয় নেই। যে যুবশক্তি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারে, তারা যেমন উষা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেরণাস্থল তেমনই তিনি নিজেও ক্লান্তিহীন পরিশ্রমে (মেধা ও শরীর— উভয়তই) কাজ করার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকেন। মনন ও শরীরের প্রতিনিয়ত চর্চা তাঁর নির্দেশক সত্তার বৈশিষ্ট্য।

(৩) সাহস যদি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাহলে সেই বৈশিষ্ট্য শুধু মহলা কক্ষে বা থিয়েটার এরিনায় সীমায়িত নয়। জীবনের নানান সংকট মুহূর্তে, আপৎকালে সেই সাহসী মনোবৃত্তি তাঁকে নেত্রীর স্থানে উন্নীত করে। ২৯ আগস্ট ২০০5 আনন্দবাজার পত্রিকার 'কলকাতার কড়চা'য় তাঁর ষাট বছরের জন্মদিন প্রসঙ্গে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হল একটি ঘটনার কথা— লখনউ থেকে অভিনয় করে ফেরার পথে দলের ছেলেদের ওপর আক্রমণ হয় ট্রেনের ভিতরেই। উষাদি দুটো সিটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'হাত আগলে দাঁড়ালেন এবং বললেন 'আমাকে না মেরে ওদের গায়ে হাত দিতে পারবে না।'  দলের সদস্যদের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ থাকলে কতটা আত্মপ্রত্যয়ী হলে এই রকম একটা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়। শুধু তো মহলা কক্ষের নির্দিষ্ট নাটকের সংলাপ ও কম্পোজিশনের বা সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নয়— নির্দেশক থিয়েটারের ঘরে ও বাইরে। তাই এই প্রতিবেদনে তাঁর সম্পর্কে লেখা হল— 'থিয়েটারকে ভালোবসে বুঝি এমন সুন্দর থাকা যায়— এমন করে মাথা তুলে আপসহীন, কিন্তু নম্র।' এও তাঁর নির্দেশক সত্তার আরেক প্রকাশভঙ্গি।

৪) উষা গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটকগুলির ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়ই লক্ষ করা যায়— অনেক চরিত্র নিয়ে কাজ করার প্রবণতা। 'মহাভোজ' তার নির্দেশিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা থেকে ২০১৩-য় 'হাম মুখতারা' পর্যন্ত প্রায় সমস্ত নাটকেই (অন্তরযাত্রা, বামা/ভামা একক অভিনয়) তিনি বহু চরিত্র নিয়ে কাজ করেছেন। ১৯৮৪-২০১৬, এই দীর্ঘ সময় প্রায় বত্রিশ বছর ধরে তিনি যে  অসংখ্য

থিয়েটারকর্মীর সঙ্গে কাজ করেছেন ও করে চলেছেন, তা নির্দেশক হিসেবে দুটি দিক চিহ্নিত করে—

ক) একসঙ্গে অনেক মানুষকে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা তাঁর আছে,

খ) বেশিসংখ্যক অভিনেতা অভিনেত্রীকে নিয়ে কাজ করতে গেলে সমস্যার ক্ষেত্রগুলিও বাড়তে থাকে— তা মোকাবিলা করার শক্তি তাঁর আয়ত্তাধীন। সমস্যা নানাবিধ— যেমন দৃশ্য পরিকল্পনা, প্রত্যেকের অভিনয়ের প্রতি সজাগ থাকা, দলগত মতবিরোধ, মনোমালিন্য ব্যক্তিমানুষ হিসেবে কোনও মানসিক সমস্যা ইত্যাদি।

৫) নির্দেশক হিসেবে ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কাজকে শুধু নির্দিষ্ট একটি নাটকের গণ্ডিতেই সীমায়িত করেন না— চরিত্র নির্বাচন থেকে শুরু করে, নাটকের পোস্টার এবং ফোল্ডার সব দিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ মনোযোগী দৃষ্টি থাকে। লক্ষ করলে দেখা যাবে— ‘রঙ্গকর্মী’র পোস্টার এবং ফোল্ডারগুলি সযত্নে যোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়।

৬) দল প্রতিষ্ঠার সময় থেকে যাঁদের সঙ্গে ঊষা কাজ করেছেন— তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সম্পর্ক অটুট থেকেছে। হয়তো মতানৈক্যের কারণে অনেকে দল ছেড়ে চলে গেছেন তবে সিনিয়র পুরোনো মানুষদের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার জায়গা আছে। তাপস সেন (আলো), খালেদ চৌধুরী (মঞ্চ, সঙ্গীত), হিরণ মিত্র (শিল্পভাবনা), মহাশ্বেতা দেবী (সাহিত্য) প্রমুখের মতো গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখা শুধু নয়, বিভিন্ন প্রযোজনায় তাঁদের চিন্তাভাবনাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করার মতো মানসিকতা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে লক্ষ করা যায়। বয়স ও অভিজ্ঞতায় গৌরবময় পুরাতন ও নবীনের মেলবন্ধন ঘটিয়ে কাজ করার যে মেধা এবং আন্তরিকতা তা নির্দেশক উষা গঙ্গোপাধ্যায়ের অবশ্যস্বীকার্য এক বৈশিষ্ট্য।

৭) নির্দেশক হিসেবে তিনি পুরুষ না নারী এ প্রশ্ন তাঁর কাজের ক্ষেত্রে ওঠেনি কখনও। তাঁর ব্যক্তিত্ব— বিশাল পটভূমিকায় কাজ করার প্রবণতা, সাম্প্রতিক বিষয়কে মঞ্চায়নের সাহস তাঁকে ক্রমশ অভিজ্ঞ ও ঋদ্ধ করেছে। থিয়েটারের জন্য কোনও কিছুর সঙ্গে আপস করতে তিনি নারাজ।

৮) নারী নির্দেশক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে কতটা দ্বিধান্বিত ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় তা অনুসন্ধান করা যেতেই পারে। কিন্তু একজন নারী হিসেবে তিনি যখন নির্দেশনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন, তখন সমাজের অনেক শিল্পী কাজ করেন যে দলে, তাতে মেয়েদের সংখ্যা তুলনায় বেশি। হিন্দি ভাষার থিয়েটারেও বহু বাঙালি মহিলা শিল্পীর লক্ষণীয় উপস্থিতি। ‘রঙ্গকর্মী’তে একই সঙ্গে কেতকী দত্ত, সন্ধ্যা চক্রবর্তী প্রমুখ প্রতিভাময়ী বয়স্ক শিল্পীর সঙ্গে কাজ করার মধ্যে যে সহৃদয়তা ও অনুভবী মানসিকতা প্রতিফলিত হয়, তা নির্দেশক ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের মুকুটের আরও একটি পালক।

নারী নির্দেশক হিসেবে শুধু নয়, মেয়েদের শক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী ঊষা।— তাঁর মতে, 'Sincerity level of woman is very high. They are very honest because they have struggled to create their own space and know how tough it is.'[৫৫]

## সোহাগ সেন (১৯৪৬)

আশির দশকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম নারী নির্দেশক সোহাগ সেন। অভিনয়ের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে নাটকের সংযোগ ঘটে। ১৯৬৯ সালে তিনি উৎপল দত্তের পরিচালনায় প্রথম অভিনয় করেন। কিন্তু তাঁর নাট্যসন্ধিৎসু মন শুধুই অভিনয় জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। অভিনয় ছাড়াও পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি তিনটি ভাষাতেই তিনি নাট্য নির্দেশনার কাজ করেছেন। শুধু নাট্যজগৎ নয়, টেলিভিশন মাধ্যমে চিত্রনাট্য রচনা, টেলি-সিরিয়াল পরিচালনাও তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার ভিন্নমুখ। যেহেতু একজন নাট্য-পরিচালককে নাট্যসম্পর্কিত বিভিন্ন বিভাগের প্রতি সজাগ থাকতে হয়—সোহাগ সেনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায় তিনি নাটকে অভিনয় ছাড়াও মঞ্চ, আলো, সংগীত সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এই আগ্রহই তাঁকে প্রণোদিত করল নাট্য পরিচালনায়। তিনি সরাসরি একটি সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন— I loved every aspect of theatre, loved thinking about the stage, lights, music. So I had an overview. May be because I was not just spending my time thinking of acting, I could think of directing, perhaps it just came to me. It took guts but went off pretty well.'[৫৬] প্রত্যেক শুরুর আগেই একটা শুরু থাকে। সোহাগ সেন সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়বার সময় থেকেই নাটকে অংশ নিয়েছেন। ১৯৬৯ সালে যুক্ত হন উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার গ্রুপের (LTG) সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে এই দল পরিচিত হয় পি.এল.টি. বা পিপল্‌স লিটল থিয়েটার নামে। উৎপল দত্ত পরিচালিত এলটিজি প্রযোজিত 'লেনিনের ডাক' নাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতেন। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী অপর্ণা সেন সম্পর্কে বৌদি (সোহাগ সেনের দাদা সঞ্জয় সেন অপর্ণা সেনের প্রথম স্বামী) অপর্ণা সেনের মাধ্যমে উৎপল দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ হয় সোহাগ সেনের। 'গুরু' ছবির শ্যুটিং-এর সময় অপর্ণা সেনের অনুপস্থিতির কারণে তাঁর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সোহাগ সেনকে নিয়ে আসা হয় উৎপল দত্তের কাছে। ১৯৬৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'লেনিনের ডাক' নাটকে অভিনয়ের জন্য মঞ্চে ওঠেন তিনি এবং এই নাটকের বহু অভিনয়

করেন। কিছুদিন পর এল.টি.জি. থেকে বেশ কিছু নাট্যকর্মী চলে এসে নতুন নাট্যদল গঠন করেন অসিত বসুর নেতৃত্বে CPTA বা ক্যালকাটা পিপল্স আর্টস থিয়েটার নামে। সোহাগ সেনকে এই নাট্যদলে যুক্ত হওয়ার অনুরোধ জানানো হয় এবং তিনি রাজিও হন। সে সময় ম্যাক্সমুলার ভবনের পক্ষ থেকে বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের ৮০তম জন্মদিনে উৎসবের আয়োজন করা হয়। সোহাগ সেনের ওপর দায়িত্ব পড়ে নাট্য পরিচালনার। সোহাগ সেন পরিচালনা করেন ব্রেখ্‌টের নাটক 'Informer' অবলম্বনে 'গুপ্তচর'। ১৯৭৮ সাল। 'In 1978, I directed The Informer, a one-act play by Bertolt Brecht. I was with CPAT (Calcutta People's Art Theatre) at that time. Max Mueller Bhavan had invited me to direct the play for them.'[৫৭] তাঁর পরিচালনার শুরু এইখান থেকেই। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৩-তে 'অনসম্বল' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্পূর্ণ নাট্য পরিচালনার কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। ধারাবাহিকভাবে ১৯৮৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ প্রায় ৩৩ বছর ধরে নিয়মিতভাবে নাট্য পরিচালনার কাজ করে চলেছেন। শুধু নাট্য পরিচালনা নয়, তার পাশাপাশি চলচ্চিত্রে অভিনয়-প্রশিক্ষক হিসেবে সোহাগ সেন নিজস্ব একটা জায়গা তৈরি করেছেন। টেলি সিরিয়াল পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনার কাজও করেছেন। কিন্তু সোহাগ সেনের মূল সংরাগ ঘনীভূত হয়েছে নাট্য-পরিচালনাকে কেন্দ্র করেই।

গত শতাব্দীর আশির দশকে যে তিনজন মহিলা নাট্য পরিচালক উঠে এলেন তাঁদের মধ্যে দুজন—ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ও সোহাগ সেন এসেছিলেন নাচের জগৎ থেকে। সোহাগ সেন ছিলেন ভরতনাট্যম-এ কালু শংকরের ছাত্রী। যদিও প্রথাগত নাটকের শিক্ষা তাঁর ছিল না।

কাজ শিখেছেন হাতে-কলমে; অন্যের কাজ দেখতে দেখতে কাজ শিখেছেন। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় ও সোহাগ সেন—দুজনেরই নৃত্য-প্রশিক্ষণের প্রেক্ষাপট থাকার ক্ষেত্রে একটা সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের প্রযোজনার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়— সোহাগ সেন নিজেই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন এইভাবে— ''ঊষার গতি দুর্বার, আমার মন্থর। ওর নাটকে আবেগ বহির্মুখী, আমার নাটকে প্রায়শই অন্তর্মুখী। ওর নাটক মানুষের মনকে নাড়া দেয়। আমার নাটক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটা পাশ্চাত্যধর্মীয় দূরত্ব বজায় রাখে। বুঝে নেবার দায়িত্ব দর্শকের কাছেই গচ্ছিত থাকে।''[৫৮]

১৯৮৩ সালে নিজস্ব নাট্যদল 'অনসম্বল' প্রতিষ্ঠার পর সোহাগ সেন পরিচালনা করেন বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের দুটি অনূদিত নাটক। Informer অবলম্বনে 'গুপ্তচর' এবং 'Jewish wife' অবলম্বনে 'ইহুদি স্ত্রী'। বছর দুয়েক পরে বিদেশি নাট্যকার বোথো স্টাউসের নাটক অবলম্বনে 'আবার দেখা হবে' এবং ১৯৮৬-তে ফ্রাঙ্কা রামের দুটি নাটক ইংরেজিতে অভিনয় করান 'ওয়েকিং আপ' এবং

'মাই ভয়েস ইজ গন'। বের্টোল্ট ব্রেখ্ট বাঙালি দর্শকের কাছে পরিচিত নাম হলেও বোথো স্ট্রাউস বা ফ্রাঙ্কা রামের স্বল্প পরিচিত বা অনেকের কাছে প্রায় অপরিচিত। ১৯৮৩-১৯৮৭ এই সময়-পর্বে মূলত একাঙ্ক নাটকের প্রযোজনা করেছেন সোহাগ সেন। ১৯৮৯ সালে 'উত্তরাধিকার'-এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি যে সমস্ত নাটকগুলি পরিচালনা করলেন তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করি—

(ক) এই পর্বের (১৯৮৩-১৯৮৭) নাটকগুলি সবই অনূদিত অথবা রূপান্তরিত নাটক। কোনও মৌলিক বাংলা নাটক পরিচালনা করেননি।

(খ) সব ক'টি নাটকই এই পর্বের একাঙ্ক নাটক। কোনও পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক এই তালিকায় নেই।

(গ) প্রত্যেকটি নাটকেরই অভিনয়-সংখ্যা সীমিত। সংগঠনের শুরুর দিকে চার বছরে তিনটি নাটকের মোট অভিনয়-সংখ্যা অত্যন্ত কম। সাকুল্যে মাত্র ১৪টি।

(ঘ) নাটক নির্বাচনের তালিকার দিকে লক্ষ রাখলে স্পষ্টতই বোঝা যায় সোহাগ সেন রঙ্গমঞ্চে নতুন কিছু করার জন্য সচেতন হয়েই এসেছেন।

(ঙ) বাংলা মঞ্চে বিষয়গত দিক থেকে অভিনবত্ব আনার একটা চেষ্টা রয়েছে তাঁর নির্বাচিত নাটকগুলির মধ্যে।

নাট্য পরিচালনায় নারীপুরুষে ভেদাভেদকে গুরুত্ব দিতে চাননি সোহাগ সেন। তাঁর স্পষ্ট অভিমত থিয়েটারের পরিচালকদের মধ্য থেকে মহিলাদের আলাদা করে ফেলাতে আদতে তাঁদের হেয় করা হয়। সামগ্রিকভাবে নাট্য পরিচালকদের কাজের মূল্যায়ন করতে গেলে সেখানে পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকলের কাজকেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মূল বিষয় হল নাটক— তার পরিচালক নারী না পুরুষ সে প্রশ্ন অবান্তর। দর্শক নাটক দেখতে আসেন, তার পরিচালক নারী না পুরুষ তা দেখতে আসেন না। — এই রকম একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজের ক্ষেত্রটি বিচার করতে চেয়েছেন সোহাগ সেন। তাঁর জীবনচর্যায়, নাট্যচর্চায় এমনই একজন স্পষ্টবক্তার স্বীকারোক্তি। অর্থাৎ মন ও মানসিকতার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বিভেদের কোনও আলাদা সুবিধা নিতে নারাজ সোহাগ সেন। তাই তাঁর পরিচালিত নাটকগুলির বিষয়বস্তু নারীপুরুষ নির্বিশেষে মানবিক সম্পর্কের ওপরেই গুরুত্ব দিয়েছে। নির্দেশনার ক্ষেত্রে তাঁর আসাটা কোনও পরিকল্পনাজনিত বিষয় ছিল না। মূলত অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটাও ছিল ঘটনাচক্রে এসে পড়া।

সোহাগ সেন মনে করেন নির্দেশনায় আসাটা দুঃসাহস দেখানো নয়, কারণ যখন তিনি নির্দেশনায় আসেন, নাটকের অন্যান্য দলের মেয়েরা প্রায় কেউ-ই নির্দেশনার কাজটি করেন না

একমাত্র তৃপ্তি মিত্র ছাড়া। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—‘আমার থিয়েটারে আসাটা অ্যাকসিডেন্ট, ডিরেকটর হওয়াটাও অ্যাকসিডেন্ট।’[৫৯] তাঁর মতে হয়তো অ্যাকসিডেন্ট কিন্তু তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ রাখলে দেখা যায় ছোটবেলা থেকেই সৃজনশীল কিছু করবার আগ্রহ, নাটক দেখা এবং পরবর্তী সময়ে উৎপল দত্তের সঙ্গে নাটক করার অভিজ্ঞতা তাঁকে নাটকের প্রতি মনোযোগী করেছিল। ‘লেনিনের ডাক’ যখন করতে এসেছিলেন উৎপল দত্তের পরিচালনাধীনে, তখন থিয়েটারের পদ্ধতি বা প্রথানুগ শিক্ষা কিছু ছিল না। ‘লেনিনের ডাক’-এ অভিনয় করার জন্য যে রিহার্সাল হয় সেখানে তিনি খুব একটা স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। বরং কিছুটা আড়ষ্ট-ই ছিলেন। উইংসের আড়াল থেকে দেখেছিলেন ১০টার মতো অভিনয়। আর ‘লেনিনের ডাক’-এ ম্যারিনা মিথাইলোর চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৬০/৬৫ মতো শো। এই সময় থেকেই শুধু মঞ্চের সামনে আসা বা অভিনয় ছাড়াও থিয়েটার কীভাবে হয়— এই বিষয় আগ্রহ দানা বাঁধতে শুরু করে। মঞ্চের নেপথ্য কাজ (back stage) থেকে থিয়েটারের সব কিছু সোহাগ সেনের ভাল লাগতে থাকে। তখন থেকে মনে হতে থাকে যে থিয়েটারে একা কিছু হয় না— সবাই মিলে কাজটা করতে হয়। যদি অভিনেত্রী হিসেবে তখন অত ডাক না পেতেন, তা হলে তিনি back stage-এর কাজেই নিজেকে নিয়োজিত করতেন। এই যে অভিনয় ছাড়াও থিয়েটারের অন্যান্য অঙ্গগুলি সম্পর্কে আগ্রহ এবং ‘লেনিনের ডাক’-এ এতগুলো অভিনয়— এ-সবই তাঁকে থিয়েটারের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে তুলেছিল। নির্দেশনার পক্ষেও এই অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহায্য করেছিল নিঃসন্দেহে। সেই সময়ে— যে সময়ে সোহাগ সেন অভিনয় জীবনে আসেন অর্থাৎ সত্তরের দশকে, তখন তাঁদের জন্য কোনও প্রথাগত শিক্ষা বা formal training ছিল না। সবটাই নিজে দেখে অনুভব করে শেখা। তা ছাড়া ‘লেনিনের ডাক’-এর এতগুলো শো-এ অভিনয় করা মানুষকে তৈরি করে দেয়। দর্শকের মুখোমুখি হতে হতে যে অভিজ্ঞতা হয় পরবর্তী সময়ে নির্দেশনার ক্ষেত্রেও তা কাজে লাগে। আর ডিসিপ্লিন তৈরি হয়। ২/১ টা নাটকে অভিনয় করে চলে গেলে ওই ডিসিপ্লিনটা তৈরি হত না। ‘মাথা বোধহয় স্পঞ্জ-এর মতো ছিল। ঢুকে যেত। সেইভাবে থিয়েটারে ঢুকে পড়া।’[৬০]

আরও একটি ঘটনা তাঁর নির্দেশনার পথ প্রশস্ত করল বলে অনুমান করা যায়। এল.টি.জি.-র পর যখন পিএলটি তৈরি করলেন উৎপল দত্ত, তখন তাঁর-ই পরিচালনায় ‘সূর্যশিকার’ নাটকে একটি ছোট চরিত্রে মহাশ্বেতার ভূমিকায় অভিনয় করেন সোহাগ সেন। তখন অভিনয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ। এই সময় পি.এল.টি. থেকে একঝাঁক শক্তিশালী অভিনেতা অভিনেত্রীর দল বেরিয়ে এসে তৈরি

করেন CPTA-ক্যালকাটা পিপল্‌স থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন। সেখানে ছিলেন অসিত বসু, জগন্নাথ গুহ প্রমুখ নাট্যকর্মীরা। সোহাগ সেন নিজস্ব কোনও দল গড়তে চাননি। কারণ যত সুন্দর করেই দল চালানো হোক না কেন, একটা না একটা সমস্যা তৈরি হয় বলেই সোহাগ সেন নিজস্ব দল গড়ার ক্ষেত্রে বিরত ছিলেন। কিন্তু অসিত বসুদের ডাকে যুক্ত হলেন CPTA-তে এবং অলঙ্কৃত করলেন প্রেসিডেন্টের পদ। তিনি কখনওই শুধু মাত্র একজন অভিনেত্রী হয়ে দলে থাকতে চাননি। শুধুই দলকে দূর থেকে দেখা নয়— একেবারে ভেতরে ঢোকা। তা ছাড়া তাঁর মধ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ শক্তি কিছু ছিল, সেই প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁকে দলের প্রেসিডেন্ট পদেই শুধু উন্নীত করেনি— যখন প্রয়োজন পড়ল তখন তাঁর ওপরেই পরিচালনার দায়িত্বও অর্পিত হয়— কারণ অসিত বসু দল ছেড়ে তখন চলে গেছেন।

প্রথমেই তিনি বাংলায় রূপান্তরিত করে মঞ্চস্থ করলেন ব্রেখ্‌ট-এর Informer অবলম্বনে ‘গুপ্তচর’ আর Jewish wife অবলম্বনে ‘ইহুদী স্ত্রী’ যার মঞ্চ ভাবনা করেছিলেন সোহাগ সেন। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কোনও আলাদা সাহস বা একাধিপত্যকে প্রাধান্য দিতে চাননি সোহাগ সেন পরিচালনার ক্ষেত্রে। বিষয়টাকে তিনি এইভাবে দেখেছেন যে একটা দল যেখানে সবাই একসঙ্গে কাজ করবে সবাই সবার কথা শুনবে। সেইজন্যই তিনি নবনির্মিত দলের নাম দিলেন ‘অনসম্বল’। অর্থাৎ সবাইয়ের একত্রে মিলবার জায়গা— তা ছাড়া ব্রেখ্‌টের আদর্শ অনুগামী সোহাগ সেন ব্রেখ্‌টের Ensemble নামটিও মাথায় রেখেছিলেন। একসঙ্গে সবাই মিলে কাজ করলেও নাটকের সংগঠনে একজন ডিরেক্টরের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনের কারণেই সোহাগ সেনকে নব্যপ্রতিষ্ঠিত দলের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। প্রথমে অবশ্য এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সুব্রত নন্দীকে— কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলেন না। তবে নাটকের অনুবাদ, রূপান্তর, পরামর্শদাতা হিসেবে দীর্ঘদিন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছেন সুব্রত নন্দী।

যেহেতু নাট্য প্রযোজনার কেন্দ্রস্থলে থাকেন একজন নাট্যনির্দেশক, সে ক্ষেত্রে দলের অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সোহাগ সেন প্রথম থেকেই একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই সময় অর্থাৎ যখন তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন— দেখেছিলেন বহু ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী অন্ধের মতো নির্দেশককেই অনুসরণ করে বা কপি করে। এই জায়গা থেকে তিনি অনসম্বল-কে আলাদা করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন অভিনেতাদের অবিকল নকল করার প্রবণতা থেকে বার করে আনতে। কেউ যেন তাঁর নির্দেশিত

নাটকে কুশীলবদের দেখে না বলে, সবাই তো সোহাগ সেন। এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়েই নির্দেশক হিসেবে তাঁর পথ চলার শুরু।

থিয়েটারের সঙ্গে সোহাগ সেনের যুক্ত হয়ে পড়াটা খুবই আকস্মিক। সাধারণত নৃত্যশিল্পের সঙ্গেই তাঁর যোগ ছিল; ভরতনাট্যম শিখতেন সুরঙ্গমায়। সেখানকার পরিচালক ছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। রবীন্দ্রনৃত্যের শিক্ষাগ্রহণ করেন 'আশ্রমিক সংঘ' শান্তিনিকেতন থেকে। এই সময় তিনি থিয়েটার-সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেন, কেননা তাঁর মনে হত অনেক কথা থিয়েটারে বলতে হয় যেগুলো বলতে গেলে তিনি ভুলে যাবেন। কিন্তু থিয়েটার দেখতে তিনি খুব ভালবাসতেন। সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়ার সময় বিখ্যাত সব নাট্য অভিনেতারা যেমন শেখর চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, এন. বিশ্বনাথন-এর কাছে পড়াশোনা করেছেন। সেই সময় প্রত্যেকটি সেশনের শেষে অনেকগুলো করে নাটক হত। শুধু এক দিনের অভিজ্ঞতার কথা তিনি ব্যক্ত করছেন ১৯৫৭ সালে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে। দাদা সঞ্জয় সেন অভিনয় করছেন জয়সিংহ-র ভূমিকায়। গুণবতীর অনেক সখীর দলে সোহাগ সেন ঢুকে পড়েছিলেন স্কার্ট ব্লাউজের ওপর একটা শাড়ি জড়িয়ে। পরিচালকও অবাক। এটাই ছিল ছেলেবেলায় তাঁর প্রথম স্টেজে ওঠা। কলেজে সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন অমিত মিত্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন প্রমুখ বন্ধুদের যাঁরা পরবর্তী সময়ে স্বনামে পরিচিত হন।

অভিনয় নয়, নির্দেশনার কাজটাই সোহাগ সেনকে বেশি আনন্দ দেয়। নির্দেশনার বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সোহাগ সেনের কাছে, তা তাঁর পূর্ব বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে যখন তিনি নিজেই গড়লেন তাঁর দল 'অনসম্বল', সেখানেও তিনি নির্দেশকের ভূমিকায়— ১৯৮৩ থেকে ২০১৬ দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে তিনি এই কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছেন শুধুই দায়িত্ব পালনের জন্য নয়, দায়িত্ববোধের কারণেই।

**সোহাগ সেন পরিচালিত নাটক**

**অনসম্বল প্রযোজিত**

| সময় | নাটক | নাট্যকার | রূপান্তর/অনুবাদ |
|---|---|---|---|
| ১৯৮৩ | ইহুদী স্ত্রী (বাংলা) | বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট | অনু. পবিত্র সরকার |
| ১৯৮৩ | গুপ্তচর (বাংলা) | ,, | |
| ১৯৮৫ | আবার দেখা হবে (বাংলা) | ,, | |
| ১৯৮৬ | ওয়েকিং আপ (ইং.) | ফ্রাঙ্কা রামে | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | মাই ভয়েস ইজ গন (ইং.) | ,, | |
| ১৯৮৭ | একা (বাংলা) তিনটি একাঙ্ক; | | |
| | (ক) উইক এন্ড | | |
| | (খ) দেড় ইঞ্চি ওপরে | | |
| | (গ) এক টুকরো রোদ | নির্মল ভার্মা | ‘ধূপ কা টুকরা’ গল্প অনুসারে |
| ১৯৮৯ | উত্তরাধিকার (বাংলা) | মহেশ এলকুঞ্চয়ার | |
| ১৯৯০ | পার্টি (বাংলা) | ,, | |
| ১৯৯২ | মানুষী তিনটি একাঙ্ক তিনটি ভাষায় | | |
| | (ক) মা (বাংলা) | মহাশ্বেতা দেবী | সুব্রত নন্দী (নাট্যরূপ) |
| | (খ) ধূপ কা এক টুকরা (হিন্দি) | নির্মল ভার্মা | |
| | (গ) ওয়েকিং আপ (ইং.) | | |
| ১৯৯৩ | মহানির্বাণ | | মারাঠি নাটকের ইংরজি অনুবাদ থেকে রূপান্তরিত/অনূদিত |
| ১৯৯৪ | উত্তরপুরুষ (বাংলা) মূল নাটক *Magna Talia Kate* (মারাঠি) | মহেশ এলকুঞ্চয়ার | রূপান্তর সুব্রত নন্দী |
| ১৯৯৫ | গোমুখ | সম্পা. ও পরি. সোহাগ সেন | |
| ১৯৯৮ | পাপ মূল নাটক 1998 Seven Deadly Sins | | ব্রেখ্‌টের জার্মান নাটক থেকে ইংরেজি অনুবাদ নাট্যরূপ : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ২০০০ | নাটকীয় | | |
| ২০০২ | অপরাধ (Aids-এর ওপর) | | |
| ২০০৩ | প্রতি ছয় সেকেন্ডে (*Aids*-এর ওপর) | | ওয়ার্কশপ ভিত্তিক প্রযোজনা |
| ২০০৩ | বংশগত | সতীশ আলেকার | মারাঠি নাটকের অনুবাদ |

২০০৩-এর পরেও তিনি নিয়মিত নাট্য নির্দেশনার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। তাঁর পরবর্তী প্রযোজনাগুলি হল—

| | | |
|---|---|---|
| ২০০৫ | সিঁড়ির নীচে | ওয়ার্কশপ ভিত্তিক প্রযোজনা |

| | | |
|---|---|---|
| ২০০৮ | সোনাটা | মর্ডান ইংলিশ-এ লেখা<br>মহেশ এলকুঞ্চয়ারের নাটক |
| ২০১০ | বিষাক্ত | উৎপল দত্তের ‘নীলকণ্ঠ’ অবলম্বনে<br>পরিকল্পনা: সোহাগ সেন |
| ২০১১ | লাল বাক্স | সন্ত্রাসবাদের ওপর ভিত্তি করে<br>ওয়ার্কশপ ভিত্তিক নাটক |
| ২০১৪ | হায় হায়া | ওয়ার্কশপ ভিত্তি নাটক<br>বিষয় ‘ধর্ষণ’ |

**ইহুদী স্ত্রী (১৯৮৩):** অনসম্বল নাট্যগোষ্ঠী সূচনাতেই প্রযোজনা করল দুটি বিদেশি নাটকের অনুবাদ। বের্টোল্ট ব্রেখ্ট-এর ‘জিউস ওয়াইফ’ অবলম্বনে পবিত্র সরকার অনুবাদ করেন ‘ইহুদী স্ত্রী’। অনসম্বল প্রথমেই থিয়েটার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাননি। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে দর্শকের কাছে পৌঁছনো। সেইজন্য প্রথমেই তাঁরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামনে না এসে ছোট প্রেক্ষাগৃহে স্বল্প সংখ্যক দর্শকের সামনে নিজেদের প্রকাশিত করতে চেয়েছেন। পৌঁছে যেতে চেয়েছেন দর্শকের বোধ ও চেতনার কাছে। সে জন্যই প্রথম দিকে বেশি দীর্ঘ নয় এমন কিছু স্বল্প দৈর্ঘ্যের প্রযোজনার মাধ্যমে নিজেদের ব্যক্ত করেছেন। ছোট ছোট প্রেক্ষাগৃহ তাঁদের কাজের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। এমনকী কলকাতার কোনও একটি বইয়ের দোকান কিংবা জামশেদপুরের কোনও নাচের স্কুলের ঘরে পর্যন্ত অভিনয় করেছেন। তাঁদের নারীর যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনকথা ব্যক্ত করাও ‘অনসম্বলে’র প্রথম দিকের নাট্যভাবনার একটা দিক। প্রথম পর্বে নিরীক্ষা নয়, আত্মপ্রকাশ-ই ছিল প্রাথমিক শর্ত। এইভাবে কয়েক বছর চলতে চলতে তাঁরা পৌঁছে গেছেন বৃহৎ সমাজ-ভাবনার নাটকে। তুলে ধরেছেন দেশের সাবেকি ধাঁচের সংসার জীবন, সম্পর্কের টানাপোড়েন, সাবেকি যাপন ক্ষেত্রে আধুনিক জীবনের সংঘাতময় পটভূমিকায়—‘উত্তরাধিকার’ থেকে অনসম্বলের এই বৃহত্তর ভাবনা ও বহু চরিত্রের সমাবেশ সমৃদ্ধ নাটকের শুরু।

‘অনসম্বল’ নাট্যগোষ্ঠী সচেতনভাবে ভাল থিয়েটার করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা ব্যক্ত হয়েছে সূচনাতেই তাঁদের দুটি প্রযোজনার মধ্য দিয়ে। সেপ্টেম্বর ২৩ তারিখে কলামন্দিরের বেসমেন্টে তাঁদের দুটি প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয়। ‘রিজেন্ট কিং’ সিগারেট কোম্পানির সহযোগিতায় (Co-sponsored) ‘অনসম্বল’-এর প্রযোজনা দুটি প্রমাণ করে থিয়েটারের জগতে তাদের মান্যতা।

১৯৩৬ সালে ব্রেখ্‌ট লেখেন 'The Fears and Miseries of the Third Reich' সেখান থেকে দুটি দৃশ্য গ্রহণ করে বাংলায় অনুবাদ করেন পবিত্র সরকার— এই নাটকেই ব্রেখ্‌ট নিজস্ব কেন্দ্রীভূত ভাবনার জগৎ— যেখানে তিনি মনে করেন সবাই স্বার্থপর, আত্মমুখী। সেই পরিবেশকেই তুলে ধরা হল। নাৎসি জার্মানির ভয়ঙ্কর পরিবেশ বাস্তবতা ফিরে এল 'ইহুদি স্ত্রী' নাটকে। হিটলারের জার্মানিতে কখনওই ইহুদি স্ত্রী রাখা যাবে না— ভালবাসার বন্ধন থাকা সত্ত্বেও। যে ভালবাসা, স্নেহ দুটি মানুষকে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে বেঁধে রাখে তা রক্ষা করা আর সম্ভব হয় না হিটলারের শাসনের অত্যাচারের পেষণে। অনসম্বলের প্রথম প্রযোজনাতে এই বেদনাদীর্ণ পরিবেশটাই উঠে এল। সোহাগ সেনের মেধাবী অভিনয় এবং নির্দেশনায় 'অনসম্বল'-এর প্রথম পদক্ষেপ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ব্রেখ্‌ট-এর Informer অবলম্বনে 'ইহুদি স্ত্রী'র সঙ্গে অভিনীত হয় 'গুপ্তচর' (১৯৮৩)।

**আবার দেখা হবে (১৯৮৫):** ব্রেখ্‌টের দুটি নাটকের নির্দেশনার পর সোহাগ সেন আবারও নির্বাচন করলেন জার্মান নাট্যকার বোঠো স্ট্রাউসের লেখা নাটক। মূল জার্মান নাটক 'Trilogic des widersehus'-এর অনসম্বল প্রযোজনা 'আবার দেখা হবে'। বাংলায় রূপান্তর করলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। স্ট্রাউসের নাটকের বৈশিষ্ট্য হল, তা শুধুই গল্পকেন্দ্রিক নয় আবার শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথেও হাঁটে না। আবার অ্যাবসার্ড নাটকের মতো বস্তুবিচ্ছিন্নতাবাদও প্রচার করে না। সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি মুহূর্তের যে আচার-আচরণ বা সংলাপ, তার কিছু বিচ্ছিন্ন ছবি তুলে এনে নাটক তৈরি করা হয়। মানুষের চলমান প্রাত্যহিক জীবনে স্রোতে চোরা স্রোতের মতো লুকিয়ে থাকে অনেক মূল্যবান সময়খণ্ড। সেই মুহূর্তগুলো আমাদের অলক্ষ্যেই থেকে যায়। হয়তো আলাদা করে চোখে পড়ে না। বোথো স্ট্রাউস আলোকপাত করেন সেখানেই, তাকেই তুলে ধরেন তাঁর নাটকে। মানুষ তখন সেই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে থাকে। যেমন চলতি পথে দেখা হয়ে যাওয়া দুজন মানুষ— তাদের কথা কাটাকাটি হয়, মারপিট হয়, সংঘর্ষ হয়— তার পর তারা যে যার পথে চলে যায়— পড়ে থাকে শুধুই স্মৃতি। বোঠো স্ট্রাউসের নাটকে ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের সমাহার— গতি, আকর্ষণ এবং উৎকণ্ঠা। দর্শকদের সঙ্গে নাটকের চরিত্রদের এমন একটা সংযোগ তৈরি করে দেন নাট্যকার যে, দর্শকরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে শিরদাঁড়া টান করে বসে থাকেন দর্শকাসনে।

'আবার দেখা হবে' নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে এক শিল্প প্রদর্শশালা। শিল্পী, শিল্পজগৎ আর শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে ফ্যাসিবাদের ক্ষমতায়নের ছবি এবং তার বিরুদ্ধাচরণ ও সংগ্রাম এ-নাটকের উপজীব্য হলেও এর মধ্যে চলে প্রবহমান প্রেমের উপাখ্যান। সোহাগ সেন নির্দেশক হিসেবে সেই সব নাটকই বেছে নেন যেখানে মানুষের সম্পর্কের গুরুত্ব থাকে। তাঁর কাছে মানুষের পারস্পরিক

সম্পর্কের দাম অনেক। তাই তাঁর নাট্য নির্বাচন তালিকায় ক্রমশ যুক্ত হতে থাকে মানবিক সম্পর্ক-কেন্দ্রিক নাটক। 'আবার দেখা হবে'—সাম্প্রতিককালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনায় রূপায়িত হল—সেখানে মানুষ পাশাপাশি চলে যাচ্ছে কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে না— এক প্রকার নির্বিকারত্ব বা উদাসীনতা—যা সমাজের ব্যাধি, যা শুধু নাটক রচনার সমকালে নয় পরবর্তী সময়েও। এ নাটকে অভিনয় করেছিলেন জয়তী বসু ও তাপস ঠাকুর। এ ছাড়া প্রায় আঠারো-উনিশ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁরা সকলেই আবার 'অনসম্বল'-এর সদস্য ছিলেন না। অভিনয় করার জন্য এসেছেন, অভিনয় করার পর চলে গেছেন। আসলে সারা বছর কাজ না দিয়ে শুধু বসিয়ে রাখাটাও নির্দেশক হিসেবে পছন্দ করেন না। নির্দেশক হিসেবে এটাও তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য। ওয়েকিং আপ (ইংরেজি) ও মাই ভয়েস ইজ গন (ইংরেজি) ১৯৮৬ সালে এই দুটি নাটক সোহাগ সেনের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। বোঠো স্ট্রাউস-এর মতো ফ্রাঙ্কা রামে-র এই দুটি নাটক মঞ্চস্থ করে বাংলার দর্শকের সঙ্গে এই নাট্যকারের পরিচয় করান সোহাগ সেন। দুটি নাটকই ইংরেজি ভাষায় অভিনয় করান নির্দেশক এবং তার যথেষ্ট কারণও ছিল। ফ্রাঙ্কা রামে ব্যতিক্রমী নাট্যকার। তাঁর নাটকে উঠে আসে নারীর শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সংগ্রাম চিত্র। ফ্রাঙ্কা রামের 'My Voice is Gone' নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী নাটক। এ কাজটা কাউকে দিয়ে করাতেই পারতেন। কিন্তু এ নাটকে একটি ধর্ষিতা মেয়ের কথা বলেছেন নাট্যকার। বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে মেয়েটি নাটকে তার নিজের কথা বলে। বাংলার দর্শকদের কাছে বাংলায় উচ্চারিত এই কথাগুলি বলানোর ঝুঁকি নিতে চাননি নির্দেশক। ইংরেজিতেই সমস্ত সংলাপ এবং মেয়েটির চরিত্রে অভিনয় করতেন সোহাগ সেন। এর পর দলের মধ্যে ক্রমশ সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তাদের বসিয়ে না রেখে—একটা টিম স্পিরিট তৈরির জন্য জোর দেন দলগত অভিনয়ের দিকে।

**একা (১৯৮৭) :** তিনটি একাঙ্ক নাটকের মিলিত প্রযোজনা 'একা'। 'উইক এন্ড', 'দেড় ইঞ্চি ওপরে' এবং 'এক টুকরো রোদ'। নাট্যকার নির্মল ভার্মার মূল হিন্দি নাটক 'তিন একান্ত'-এর অনুবাদ করেন উজ্জ্বল গুপ্ত এবং সম্পাদনা করেন সোহাগ সেন। এই নাটকের আলোক পরিকল্পনা করেছিলেন নবীন কিশোর এবং সংগীত ভাবনা ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। সহকারী নির্দেশক প্রদীপ অরোরা। সহযোগীরা ছিলেন—সুব্রত বক্সি, উজ্জ্বল গুপ্ত এবং জয়ৎ সেন ভট্টাচার্য, অর্জুন সেন, বেঞ্জামিন জাকারিয়া, প্রদীপ অরোরা, পিনাকী ভট্টাচার্য প্রমুখ। ১৯৮৭ সালের ১২ এবং ১৩ কলামন্দিরের বেসমেন্ট-এ এই নাট্যাভিনয়ের সে অনুষ্ঠান সূচি প্রকাশিত হয় সেখানে প্রথমে উল্লিখিত হয় 'উইক এন্ড'-নাটকটির কথা, যে নাটকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন সোহাগ সেন, এর পর সাত মিনিট

বিরতি দিয়ে শুরু হয় নাটক ‘দেড় ইঞ্চি ওপরে’—যার মুখ্য অভিনেতা তাপস ঠাকুর। আবারও সাত মিনিট বিরতি দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় শেষতম একাঙ্কটি—‘এক টুকরো রোদ’ অলকানন্দা রায়ের একক উপস্থাপনায়।

‘একা’—এই নামকরণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই তিনটি একাঙ্ক নাটকের মূল বিষয় মানুষের একাকিত্ব। সত্যিই তো কোনও মানুষ কি খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারে যে সে একাকী নয়। প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে কোথাও না কোথাও লুকোনো থাকে একাকিত্বের গহ্বর; যা আমাদের অপছন্দের তা-ই আমাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তা থেকে বাঁচতেই মানুষ ক্রমশ ‘একা’ হয়ে যেতে থাকে। এই নাটকে তিনজন ব্যক্তি-মানুষের কথা বলা হয়েছে। এই একাকী নিঃসঙ্গ মানুষদের সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনও না কোনও সময়ের দেখা হওয়া মানুষদের সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই একাকিত্বের সমস্যা তো শুধু পশ্চিমী দেশগুলোর নয়— আমাদের দেশেও ক্রমশ বাড়ছে এই একাকিত্বের যন্ত্রণা। আধুনিক জীবনপ্রবাহে, নগরায়নে এই সমস্যা নানান রূপে নানান আকারে দেখা দিচ্ছে— যাকে এড়ানো কঠিন। আধুনিক ভারতীয় জীবনে শুধু শহর নয়, গ্রামের মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে একাকিত্বের সমস্যা। তাই ‘অনসম্বল’ প্রযোজিত ‘একা’ নাটক প্রযোজনা নিঃসন্দেহে এক বিশেষ মূল্য বহন করে। দর্শকচিত্তে আলোড়ন তোলে। তিনটি নাটকে তিনজন অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয় নাটককে সচল করে রাখে। ‘উইক এন্ড’ নারীর চরিত্রে সোহাগ সেনের দৃপ্ত অভিনয় এবং ‘দেড় ইঞ্চি ওপর’-এ পুরুষ চরিত্রে তাপস ঠাকুরের মঞ্চ-উপস্থিতি এবং ‘এক টুকরো রোদ’-এ অলকানন্দা রায়ের কিঞ্চিৎ উচ্চকিত অভিনয়— তিনটি নাটকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত প্রয়োগ একাকিত্বের চমৎকার পরিবেশ তৈরি করে দেয়। তবে ‘একা’-ই এই পর্বের শেষ নাটক। এর পর দলে সদস্য বা অভিনেতা অভিনেত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকলে সোহাগ সেন আরও বড়ো মাপের বহুল সংখ্যক চরিত্রের নাটক নির্বাচনের দিকে মনোযোগী হলেন।

**উত্তরাধিকার (১৯৮৯) :** বাঙালি দর্শকের কাছে আরও একজন নাট্যকারকে নিয়ে এলেন সোহাগ সেন— তিনি হলেন মারাঠি নাট্যকার মহেশ এলকুঞ্চয়ার। বিজয় তেণ্ডুলকরের পর মারাঠি থিয়েটারের নবীন নাট্য প্রবক্তা মহেশ এলকুঞ্চয়ার। সোহাগ সেন তাঁর নির্দেশনা জীবনে বারবার ফিরে ফিরে এসেছেন এই নবীন নাট্যকারের কাছে। শুধু ‘উত্তরাধিকার’ নয়, মহেশ এলকুঞ্চয়ারের অনেকগুলি নাটকের বঙ্গীকরণ মঞ্চস্থ হয়েছে সোহাগ সেনের নির্দেশনায়। কিন্তু মহেশ এলকুঞ্চয়ার তাঁর নাটক ‘Flower of Blood’ রচনার পর থেকে নাট্য রচনায় বিরত থেকেছেন ব্যক্তিগত কারণেই।

দীর্ঘ বিরতির পর লিখলেন ‘ওয়াড়া চিরেবন্দী’, ইংরেজিতে ‘Old Stone Mansion’ থেকে বাংলায় রূপান্তর হল ‘উত্তরাধিকার’। এই পর্বের নাটকগুলিতে পারিবারিক পরিবেশ- প্রতিবেশকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর আগে অ্যাবসার্ড নাটক লেখার প্রতি মনোযোগী ছিলেন তিনি। তাঁর ১৯৭০-১৯৭৫ পর্বের নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয় বিভিন্ন সময়ে— কখনও বিজয়া মেহেতা কখনো সত্যদেব দুবে, কখনও অমল পালেকর, শ্রীরাম লাগুর মতো বিশিষ্ট নাট্য পরিচালকদের পরিচালনায়। তাঁর নাটক নিয়ে নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে মহারাষ্ট্রে। ‘শুধু ভাষাগত অনুবাদ না করে পটভূমির রূপান্তর ঘটানো (প্রাথমিক ভাষান্তর উজ্জ্বল গুপ্ত, রূপান্তর সুস্নাত নন্দী) নাটকটিকে আমাদের নিজেদের পারিবারিক নাট্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া সহজ হয়েছে আরও।’[৬১] কোনও কোনও সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনীহা বা অপরিপূর্ণতার ব্ল্যাক হোল দেখা দেয়। মহেশ এলকুঞ্চয়ারের নাটক লেখার পর্বে ১৯৭৫-১৯৮৩ সময়কাল সেই ‘কৃষ্ণগহ্বর’। তাঁর মনে হচ্ছিল যা তিনি লিখেছেন তা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। এত দিন তিনি যা চাইছিলেন তা পেলেন। তাঁর মনে হল ‘কৃষ্ণগহ্বরে’-এর সময়কাল পেরিয়ে বন্ধ্যা মেদিনী পেরিয়ে উপনীত হলেন সৃজনশীল উপত্যকায়। ঠিক প্রচলিত পন্থার নাট্যকার নন মহেশ এলকুঞ্চয়ার। ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি তথাকথিত পন্থায় পথ চলেন না। তাঁর নাটকে উঠে আসে সামাজিক ভাবনা, সমাজ, মানুষের নিঃসঙ্গতা— পাপ, দ্বন্দ্ব, লজ্জা। জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি থেকে তিনি নাট্যচিত্রে তুলে ধরেন মানবিক সংকট অস্থিরতার ছবি। জীবনের প্রতি এতটাই মনোযোগী যে জীবনের বিচিত্র বাঁকগুলোকে ধরতে চান তীক্ষ্ণ অথচ আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। হয়তো আপাতদৃষ্টিতে তা খুব স্পষ্ট নয়, তবু নাটকের বিভিন্ন স্তরে সূক্ষ্মভাবে জড়িয়ে থাকে এই আবেগ অনভিজ্ঞতার বিচিত্র অনুরণন। অনেকেই মহেশ এলকুঞ্চয়ারের নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন— (১) অ্যাবসার্ডিটি (২) সুররিয়ালিজম (৩) যৌন মনস্তত্ত্ব।

মহেশ এলকুঞ্চয়ারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল ‘হোলি’—যৌবনের আবেগ ও বিপথগামিতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে নাট্যভাবনা। তাঁর পরবর্তী নাটকগুলির মধ্যে প্রতিবিম্ব (১৯৮৭) হাস্যকর নীতি এবং মানুষের একাকিত্বের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। আত্মকথা বা Autobiography (১৯৮৮) পারিবারিক নাটক-সাহিত্য শিল্প সম্পর্কিত ভাবনায় সম্পৃক্ত। এখানে সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার, বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক এবং অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরের সম্পর্কও রূপায়িত হয়েছে।

মহেশ এলকুঞ্চয়ার প্রফেশনাল স্টেজের নাট্যকার নন— পরীক্ষামূলক নাট্যচর্চাই তাঁর আগ্রহের জায়গা। তবে ব্যবসায়িক থিয়েটারেও তাঁর মূল্য কিছু কম নয়। বিজয়া মেহেতা, সত্যদেব দুবে, অমল

পালেকর, শ্রীরাম লাগু, গোবিন্দ হিলাসিং প্রমুখের পরিচালনায় তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। শুধু মঞ্চ নয়— তাঁর নাটক বেতার দূরদর্শন, চলচ্চিত্র বিভিন্ন মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। 'অনসম্বল'-র মাধ্যমে সোহাগ সেন বাঙালি দর্শকদের সঙ্গে মারাঠি নাট্যকার মহেশ এলকুঞ্চয়ারের সেতুবন্ধন করলেন। সোহাগ সেন পরিচালিত মহেশ এলকুঞ্চয়ারের নাটকের সংখ্যা চারটি— উত্তরাধিকার (১৯৮৯), পার্টি (১৯৯০), উত্তরপুরুষ (১৯৯৪), সোনাটা (২০০৮, ইংরেজিতে লেখা)। মহেশ এলকুঞ্চয়ারের সব থেকে পরিণত কাজ হল আধুনিক মারাঠি— থিয়েটারের ট্রিলজি 'বীরাসত' *(Birasat)* -এর মধ্যে আছে 'ওয়াড়া চিরেবন্দি' (Old Stone Mansion ১৯৮৫), 'মাগনা তাল্যকাঠি' 'যুগান্ত' (১৯৯৪)— তিনটি প্রজন্মের মধ্য দিয়ে সমালোচনাত্মক অথচ সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রথা-নিয়ম, ভাঙন-স্থবিরতা। এই পর্বের 'ওয়াড়া চিরেবন্দি' নিয়ে মহেশ এলকুঞ্চয়ারের সঙ্গে পথ চলা শুরু হল সোহাগ সেনের। নাটক তৈরি হল 'উত্তরাধিকার'।

বের্টোল্ট ব্রেখ্ট, বোথো স্ট্রাউস, ফ্রাঙ্কারামে-এর পাশাপাশি সোহাগ সেন মঞ্চে নিয়ে এলেন মারাঠি নাটকের নব্যরীতির নাট্যকার মহেশ এলকুঞ্চয়ারকে। সোহাগ সেনের নির্বাচিত নাট্যকারদের মধ্যে জীবনদৃষ্টি বা নাট্যরীতির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য থাকলেও এঁরা সকলেই কিন্তু মানুষের সম্পর্কের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন— প্রেক্ষাপট জুড়ে আছে সমাজ ভাবনার চালচিত্র। 'ওয়াড়া চিরেবন্দি'র বাংলা রূপান্তর করেন সুব্রত নন্দী, সম্পাদনা সোহাগ সেনের। এক সময়ের জমিদার ব্যানার্জি পরিবারের গৃহকর্তার মৃত্যুর পর তার পরিবারের মধ্যে ভাঙন টানাপোড়েনই এ নাটকের মুখ্যবস্তু। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে উচ্চশিক্ষিত মেজ ছেলে মুম্বাইতে থাকার কারণে পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কম। অনেকটা বহিরাগতের মতোই রমেন্দ্রনাথ মুম্বই থেকে দেশের বাড়িতে আসার পর সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। বড় ভাই মহেন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম পেয়ে সপরিবার এসে পড়লে বাড়ির পরিবেশে জটিলতা দানা বাঁধতে থাকে। মূল সংঘাত তৈরি হয় পিতৃশ্রাদ্ধের আর্থিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে দশদিন অশৌচ চলাকালীন নানান ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে। দুই ভাইয়ের বিবাদ-বিতর্কে যোগ দেয় বড় বৌ পদ্মাবতী ও অবিবাহিত বোন স্বর্ণলতা। এই অশান্তির অবসান ঘটাতে মা তাঁর সঞ্চিত অর্থ তুলে দেন ছেলেদের হাতে। কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়, তাই সম্পত্তির অধিকার মহাজনের কাছে বন্ধক রেখে পিতৃশ্রাদ্ধের কাজ সম্পূর্ণ হয়। বাড়ির একমাত্র বোন অবিবাহিত স্বর্ণলতার ক্ষোভ মাঝে মাঝে তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। বনেদি বাড়ির গৃহস্বামী সংস্কার আর আভিজাত্যের মোড়কে অনড় হয়ে সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকে নিজের মেয়েকে পর্যন্ত শিক্ষার প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বঞ্চিত রেখেছে। বাবার সংস্কারের কারণে আজ সে ঘরমুখো,

বিবাহের সুখ বা শান্তি তার জীবনে আসেনি। মাঝে মাঝেই সে তার নিজের মাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে। এ কি শুধু আবেগ না কি ক্ষোভের কারণ। ক্ষোভের প্রকাশ কিছু অস্বাভাবিক নয়। কেননা মেধাবী ও বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও তার উচ্চশিক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পিতৃতান্ত্রিক শাসন, সংস্কার আর বংশমর্যাদা। তাই তার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে সাবলীলতা স্বতঃস্ফূর্ততা। ক্ষোভ আর হতাশা নিয়ে সে বেঁচে থাকে। পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ নিয়ে সে নিজের শিক্ষার কাজে তা ব্যয় করতে চায়।

এই পরিবারের আরেক সদস্য অবিবাহিত ছোট ভাই হীরেন্দ্রনাথ— একেবারেই নির্বিরোধী নির্বিকার। মাথা নীচু করে ঘাড় গুঁজে মুখ বন্ধ করে বাড়ির সকলের কাজ সে করে যায়। কোনও বিবাদ নেই কারও সঙ্গে, কোনও প্রতিবাদ নেই। যাবতীয় ক্ষোভ, রাগ, প্রতিবাদ হিংসার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে থাকে; নিশ্চুপ, নৈঃশব্দ্যই তার এক রকম প্রতিবাদ। এতখানি নির্বিকার থাকা সত্ত্বেও তার মনের গহীনে লুকিয়ে থাকে ছোট্ট একটা স্বপ্ন। স্বপ্ন— একটা দোকান করার—যদিও বাড়ির আভিজাত্যের সঙ্গে এই স্বপ্নের বিস্তর ফারাক। বড় ভাই মহীন্দ্রনাথের দুই সন্তান; দুজনেই নিজস্ব জগতে স্বার্থকেন্দ্রিক গণ্ডিতে আবদ্ধ। মেয়েটির গৃহশিক্ষক মাঝে মাঝেই তাকে শিস দিয়ে ডাকে; খুবই সাংঘাতিক ইঙ্গিতবাহী এই শিস্‌ধ্বনি। এই গৃহশিক্ষকের সঙ্গে পৈতৃক গয়নাগাটি নিয়ে পালিয়ে যায় মেয়েটি। এবং পরে আবার ফিরেও আসে। বাড়ির মেজ বৌ— যে এসেছে মুম্বই থেকে। শহুরে উপস্থিতিতে সে এই পরিবারে বহিরাগত হয়েই রয়ে যায়। আরও একজনের কণ্ঠস্বরের উপস্থিতি সমস্ত নাটকে আবহের মতো জেগে থাকে— তিনি ঠানদি। বাড়ির সামনে অথচ দর্শকের দৃষ্টির অগোচরে থাকা গৃহকর্তার কেনা ট্রাক্টর যা কোনও কাজে লাগে না— সেও যেন অদৃশ্য থেকেও মানবসত্তা না হয়েও—এই সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের নিগড়ে বাঁধা সংসারের সদস্য হয়ে অনড় নিশ্চল বসে থাকে। নিজে এই ধরনের সংস্কার ও আভিজাত্যের শাসনের দৃঢ়তায় বাধা পড়া সংসারের সদস্য হয়েও দূরে থাকার কারণে মহেশ এলকুঞ্চয়ার নিরাসক্ত ভঙ্গিতে ধরতে পেরেছেন শহুরে সভ্যতার আঁচ বাঁচিয়ে চলা এই জীবনপ্রবাহকে। অথচ নির্লিপ্ততার মধ্যেও সম্পৃক্তির স্পর্শ কিন্তু উপস্থিত থাকে। নাটকের সূচনা অংশটি সোহাগ সেন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সৃজন করেছেন। নাটক শুরু হয় অন্ধকার মঞ্চে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে। অন্ধকার আর নৈঃশব্দ্যকে কেমন করে ব্যবহার করতে হয়, নির্দেশকের মুনশিয়ানায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নারী নির্দেশক হিসেবে নয়, সমকালীন বাংলা নাট্যে সোহাগ সেনের 'উত্তরাধিকার' একটা নিজস্ব স্থান অধিকার করে থাকে। 'সহজ থিয়েটারি কলাকৌশল কিংবা জটিলতর থিয়েটার বিন্যাসের বাইরে শুদ্ধ শক্তিতে শক্তিমান এক থিয়েটার বাংলায় ফিরে আসছে

দেখে আশান্বিত ও উৎসাহ বোধ করি।'[৬২] এই সময়ের প্রযোজনাগুলি লক্ষ করলে দেখা যায় কলকাতার থিয়েটারে সোহাগ সেন খুব ঝটপট কিছু করে নজর কাড়ার পরিবর্তে সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছেন। এ নাটকের মোট দশটি চরিত্রের মধ্যে ছয়জন মহিলা চরিত্র। তার মধ্যে ঠানদি জড়বৎ— শুধু বেঁচে থাকে তার চিৎকার —'কটা বাজে'। এই চরিত্রে অবশ্য অভিনয় করেছেন একজন পুরুষ। বিষয়টি হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন অবস্থানে থাকা মহিলাদের টানাপোড়েন, মন-মানসিকতাকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরতে চেয়েছেন সোহাগ সেন তাঁর পরবর্তী নির্দেশনায়।

**পার্টি (১৯৯০):** আবারও মহেশ এলকুঞ্চয়ারের নাটক নির্বাচন করলেন সোহাগ সেন। নাট্যকার ও নির্দেশকের মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রটা ক্রমশ উন্নততর হতে থাকল। পার্টির পটভূমি একেবারেই মেট্রোপলিটান—শহরকেন্দ্রিক। 'উত্তরাধিকার'-এর মতোই এ নাটকে মহেশ এলকুঞ্চয়ার জীবনকে দেখেছেন বিশ্লেষণ করেছেন একেবারেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে। 'পার্টি' নামকরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই নাটকের কেন্দ্রস্থলে আছে এমন একটা শ্রেণি যাদের প্রতিনিয়ত আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করতে হয় না। মুম্বই-এর উচ্চবিত্ত সমাজের একটি নির্দিষ্ট সীমায়িত শ্রেণি সমাজকে নিয়ে লেখা—যাদের সাক্ষাৎ এই কলকাতা শহরেও দুর্লক্ষ্য নয়। তাই ১৯৭৪-এ লেখা নাটকটিকে বাংলার পটভূমিতে রূপান্তরণে কোনও অসুবিধা হয় না নির্দেশকের। এই সমাজের মানুষজনদের কথাবার্তায় আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে উঠে আসে না দুঃস্থ বা শ্রমজীবী মানুষদের কথা, তাদের আর্থিক অনটন ক্লিষ্ট জীবনপ্রবাহের প্রসঙ্গ। তাদের মূল লক্ষ্য নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি— তাই আলোচনার মুখ্যবস্তু নিজেদের সমাজ-রাজনীতি-নারীপুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়কেন্দ্রিক। সান্ধ্যকালীন পার্টিতে মাঝেমাঝেই ছায়া ফেলে ব্যক্তিগত লোভ, ঈর্ষা স্বার্থপরতা; ভেঙে যায় সম্পর্ক, আবার তা জোড়াও লাগে। তবু গতানুগতিক এই পার্টির মধ্যে দেখা পাওয়া যায় একটু অন্য রকমের ভাবনাচিন্তাসমৃদ্ধ মানুষজনেরও। এই নাটকে এঁদের মধ্যে পাই— একজন ডাক্তার, একজন কুমারী জননী এবং সেই যুবককে—যাকে ঘিরে পরিবর্তিত হয়ে যায়, গতানুগতিক পার্টির ছবিটাই। অপূর্ব হল সেই যুবক যে আদর্শনিষ্ঠ, নিজের স্বার্থের জন্য তার লড়াই নয়—বৃহত্তর অবহেলিত মানুষদের জন্য যে জীবনকে উৎসর্গ করে নির্দ্বিধায়। আদিবাসী সমাজের তথাকথিত প্রান্তিক মানুষদের পাশে থেকে তাদের জন্যই তার লড়াই—হয়তো সে ব্যতিক্রমী পন্থার পথিক, তবু ব্যতিক্রমীরাই তো সমাজকে চালিত করে, সমাজের ভারসাম্য বা ব্যালান্স রক্ষা করে।

এ নাটকের অন্যতম মুখ্য চরিত্র দময়ন্তীর বাড়িতে নিয়মিত 'পার্টি'র আয়োজন হয়। তার

স্বামী ডাক্তার তিনি স্পষ্টবাদী— তার মনের ভাবনাকে তিনি মাঝেমাঝেই প্রকাশ্যে অকপটে বলতে দ্বিধা করেন না। দময়ন্তী ব্যাপারটা ভালভাবে নিতে পারে না। আবার তারও আছে এক গোপন সম্পর্কের জায়গা— সাহিত্যিক দিবাকর। মালিনী— যিনি চলচ্চিত্র জগতের গ্ল্যামারকেন্দ্রিক জীবন ছেড়ে সাহিত্যিক দিবাকরের সঙ্গে জীবন বাঁধতে চেয়েছিলেন, তিনি যখন বোঝেন যে তিনি একমাত্র আকর্ষণ নন দিবাকরের কাছে, তার জীবনেও আগমন ঘটেছে অন্য এক নারীর, তখন মালিনীর মধ্যেও শুরু হয় অনিশ্চয়তার ভঙ্গুরতা। দিবাকর প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি চান আরও খ্যাতি যশ বিদেশযাত্রার সুযোগ। দময়ন্তীর বাবা যেহেতু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্রখ্যাত আইনজীবী তাই দিবাকরের প্রয়োজন হয় দময়ন্তীকে। এই কারণেই তিনি যোগ দেন দময়ন্তীর বাড়িতে। আবার হঠাৎই নামডাক হয়ে যাওয়া লেখক— যিনি প্রতিষ্ঠানের কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন তাকেও দেখা যায় এই পার্টিতে। দেখা যায় নারীসঙ্গ অভিলাষী নাট্যকার ইন্দ্রজিৎকে। তাঁর নাটক যথেষ্ট জনপ্রিয় রঙ্গমঞ্চে; এ নাটকের ব্যতিক্রমী চরিত্রগুলির অন্যতম কুমারী জননী সোনা। যে তার নিজস্ব মতামতে অনড়—আপাতস্বাভাবিক জীবনযাপনের বাঁধা ছকে পথ চলতে সে নারাজ। তার দৃঢ় অনমনীয় মানসিকতায় গতানুগতিক জীবনের বাইরে বেরিয়ে এসে ভিন্ন ধরনের জীবনযাপনে সে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। লোকনিন্দা, সমাজব্যঙ্গকে তুচ্ছ করার মতো উদাসীন দৃঢ়তা তার আছে। এ নাটকের সবচেয়ে আলোচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অপূর্ব— যদিও মঞ্চে তাকে দেখা যায় না। প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও তার অপ্রত্যক্ষ উপস্থিতি এতটাই শক্তিশালী যে, তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সাহিত্য ও রাজনীতির ওপর তার আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও অপূর্ব তার জীবনকে উৎসর্গ করে প্রান্তিক অবহেলিত মানুষদের জন্য। এই পার্টিতেই অপূর্বর মৃত্যু-সংবাদ এসেছে সাংবাদিক অরুণের মারফত। পুলিশের গুলিতে তার এই মৃত্যুর সংবাদ পার্টির সমস্ত পরিবেশকে একেবারে বিপরীত মেরুতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যে মানুষগুলোকে এতক্ষণ দর্শক হিসেবে দেখা যাচ্ছিল, তাদের ভেতরেও একটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এতক্ষণ যারা নিজেদের স্বার্থ আর লোভ আর ক্ষমতার তাড়নায় দৌড়চ্ছিল— তারাই কেমন অসাড় হয়ে যায়। এ নাটকে নরেন্দ্র ও সান্ত্বনা তাদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে যেমন পরিস্থিতিকে হালকা করেছেন তেমনই সমাজের আসল চেহারাটাকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। কতকটা ভঙ্গুর, আপাত সুস্থতার অন্তরালে কতকটা অসুস্থ, অবক্ষয়িত জীবনযাপন করে মানুষ, তারই ছবি 'পার্টি' নাটকের মধ্যে কৌশলে বুনে দিয়েছেন নাট্যকার। নাট্যকারের মুনশিয়ানাকে যথাযথভাবে মঞ্চ রূপান্তরের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন সোহাগ সেনও।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন— দময়ন্তী-অলকানন্দা রায়, ডাক্তার স্বামী-বুদ্ধদেব

সমাদ্দার, সাহিত্যিক দিবাকর তাপস ঠাকুর, চিত্রাভিনেত্রী মালিনী, ডলি বসু, জনপ্রিয় নাট্যকার— রজত সেনগুপ্ত, কুমারী মা সোনা (সংগীতা চক্রবর্তী), নরেন্দ্র (সুব্রত ধীমানী) ও সাংবাদিক (দীপক ঘোষ)। একটি বিশেষ চরিত্র যে একদা কমিউনিস্ট ছিল সেই বৃন্দা চরিত্রের অসহায়তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন সোহাগ সেন।

মঞ্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্দেশক নিজস্ব ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন। নাটকের বিভিন্ন মুহূর্তকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে একটি সেটের বিভিন্ন অংশকে বিভাজিত করে। ঘর, বাইরের খোলা বাগান, দরজা— একটি সেট-এর মধ্যেই তিনটি জোনে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। মূল মঞ্চকে ড্রইং রুম, বেডরুম ও দোলনা ঝোলানো পোর্টিকোতে বিভক্ত করা হয়েছে। সেই অংশের ওপর আসা আলো, পাত্রপাত্রীদের উপস্থিতিতে গুরুত্ব পায় যখন যেখানে অভিনয় চলতে থাকে। তবে অন্য অংশের আলো মূল ঘটনা চলাকালীন সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে না। এই কাজটি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কারিগরি দিক থেকে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন আলোক শিল্পী তাপস সেন। এই স্থানগত বিভাজন বিন্যাস ও চরিত্রের নানান ভাঙাচোরাকে আলোর সাহায্যে প্রকাশ করেছেন তাপস সেন। বিষয়গত দিক থেকে ‘পার্টি’ নাটকের মধ্যে সোহাগ সেনের একটা বিশেষ মনোগত অভিপ্রায় ধরা পড়ে। তাঁর সমকালীন অন্যান্য নাটকে গ্রুপ থিয়েটারের প্রয়োজনায় যখন রাজনৈতিক বক্তব্য খুব স্পষ্ট বা রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত, তখন সোহাগ সেন তা এড়িয়ে গেছেন বা পরিহার করেছেন। তাঁর ভাবনার জগৎ বা নির্বাচনে নাটকের প্রেক্ষাপটে থাকে সমাজ ও সমাজের উচ্চকোটির মানুষ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। যাদের বাস্তবিক জীবনে আর্থিক সংকট তেমন নেই, নেই সমাজে বেঁচে থাকার লড়াই-দ্বন্দ্ব কিন্তু তাদের অবস্থানগত সংকট; চরিত্রের অন্তদ্বর্ন্দ্বের সংঘাত অনেক বেশি তীব্র। চরিত্রের অন্তরের টানাপোড়েন, প্রতিক্রিয়া, নৈতিকতা-অনৈতিকতার দোলাচলতা ইত্যাদি সংঘাত সোহাগ সেন নাটকের মধ্য দিয়ে বলতে চান।

‘পার্টি’ নাটকের সময়কাল সত্তরের দশকের গোড়ার দিক। ‘পার্টি’ অনুষ্ঠিত হয় উচ্চবিত্ত মধ্যবয়সিনী বিধবা দময়ন্তীর বাড়িতে। মদ্যপানের আসরে উপস্থিত ব্যক্তিদের পরিচিতির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এঁরা কেউ-ই প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধের সৈনিক নয়। উপস্থিত থাকেন— সাহিত্যিক দিবাকর— তারই পুরস্কার প্রাপ্তিতে এই ‘পার্টি’। ‘পার্টি’তে উপস্থিত দিবাকরের স্ত্রী একদা অভিনেত্রী বর্তমানে মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রী মালিনী, বাণিজ্যসফল নাট্যকার ইন্দ্রজিৎ, নতুন রীতির সম্ভাবনাময় নাট্যকার ভাস্কর, উজ্জ্বল স্বভাবের মালবিকা, এবং তার ঘুমকাতুরে বয়ফ্রেন্ড নরেন্দ্র, সমাজকর্মী বৃন্দা এবং সাংবাদিক অরুণ। দময়ন্তীর বন্ধু নিরপেক্ষ মানুষ— স্বল্পবাক ডাক্তার এবং দময়ন্তীর ‘কুমারী

জননী’ কন্যা সোনা। স্পষ্টই বোঝা যায় এরা সকলেই মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্য এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তবে ‘পার্টির কেন্দ্রবিন্দুতে যে থাকে সে কিন্তু এই শ্রেণিভুক্ত নয়; সাহিত্য ও রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধ যুবক, যে সংসদীয় রাজনীতিতে আস্থা হারিয়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে আদিবাসী সমাজের উন্নতিকল্পে; শামিল হয়েছে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। এক দিকে ‘পার্টি’তে উপস্থিত মানুষগুলোর কৃত্রিম মুখোশ পরা চেহারা, অন্য দিকে তাদেরই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা সৎ, আদর্শনিষ্ঠ যুবক অপূর্বের উপস্থিতি। এই মেরুকরণের মধ্য দিয়েই নাটক চূড়ান্ত পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে। অপূর্ব-র মৃত্যুসংবাদ সেই পরিণতিকে আরও তীব্র করে তুলেছে। অপূর্বর আকস্মিক মৃত্যু এবং নাটকীয়ভাবে সেই মৃত্যুসংবাদ যখন আসে, ভেঙে যায় পার্টি— সবাই শোকস্তব্ধ— দোষারোপ করতে থাকে আদিবাসী সমাজের ওপর। তারা সিদ্ধান্ত নেয় শোকসভা করবে— কিন্তু দর্শকমনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, এই শোকসভা যারা করবে তারা কতটা অপূর্ব এবং তার কাজের প্রতি সহানুভূতিশীল? যারা শুধু সাজানো কথার জাল বোনে তারা কি সম্মান ও মর্যাদা দিতে পারবে অপূর্বর দায়বদ্ধতা ও আদর্শের প্রতি? এই রকম একটা প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বের মধ্যে নাটকের নাটকীয়তা যেমন তীব্র হয়েছে, প্রকট হয়েছে সমাজের মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত মানুষগুলোর আপাতদৃষ্ট চেহারার আড়ালের অন্তঃক্ষরণগুলো। নির্দেশকের ট্রিটমেন্ট নাটককে এই জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরেছে। নাটক যদি হয় নাট্যকারের প্রথম ভাষ্য—তবে নাট্য হয়ে ওঠে নির্দেশকের মস্তিষ্ক চালনা। তারই সঙ্গে যুক্ত হয় অভিনয় বা চরিত্রচিত্রণ।

শুধু নির্দেশকের নির্দেশ নয়— অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিজস্ব অনুভব-দীপ্ত অভিনয় অত্যন্ত জরুরি নাটকের সফল মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে। ‘পার্টি’তে দময়ন্তী চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষা হতাশাকে সার্থক রূপ দিয়েছেন অলকানন্দা দত্ত। দিবাকরের ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে তাপস ঠাকুরের চরিত্র রূপায়ণে। বুদ্ধদেব সমাদ্দারের ডাক্তার নিরপেক্ষ ভাবভঙ্গিমায় আকর্ষক। বৃন্দার চরিত্রের উজ্জ্বলতা এবং দৃঢ়তা একই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন সোহাগ সেন। তবে ইন্দ্রজিৎ চরিত্রে রজত সেনগুপ্ত পার্টির মূল স্রোতের অনুকূল নয়, দর্শকমুখী সংলাপ প্রক্ষেপণেও কোথায় যেন কৃত্রিমতা লক্ষ করা যায়। ডলি বসুর উপস্থিতি যথাযথ হলেও সংবাদপত্রে তার অভিনয়ের বিরূপ সমালোচনাও হয়। কোথাও কোথাও নাটকের টিমওয়ার্ক সম্পর্কে প্রশস্তির বদলে হতাশাব্যঞ্জক মতামতই পাওয়া যায়।

নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও সমালোচকদের একাংশে সমালোচনার ঝড় ওঠে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত ‘পার্টি’ নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে অপূর্ব চরিত্রটির নির্মাণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছে এই ধরনের চরিত্রসৃষ্টি অনেকটাই কাল্পনিক—অভিজ্ঞতালব্ধ

নয়। সত্তরের দশক জুড়ে এই ধরনের বহু চরিত্র গল্পে উপন্যাসে সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সাহিত্যিকরা তাদের ঠিকমতো চিনতে পারেননি। এই অপূর্বদের মতো চরিত্ররা হয়ে উঠেছে বুদ্ধিজীবীদের 'আলোচনার মুখরোচক খাদ্যবস্তু', 'হাততালি পাবার কমোডিটি'। শুধু উচ্চবিত্ত মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা দেখাবার জন্য কেন প্রতিপক্ষ বা আদর্শ হিসেবে অপূর্বদের ব্যবহার করা হবে? এখানেই সমালোচকের আপত্তি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, নাট্যকার যদি মনে করেন একটা বিপরীত আদর্শের কথা বলবেন একটা কনট্রাস্ট সৃষ্টি করার জন্য, তা হলে অপূর্ব হল সেই চরিত্র যার মাধ্যমে এই দৃঢ় আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন নাট্যকার। তার আলোচনা পার্টিতে উঠে আসছে এটাই তো তার জোর। না থেকেও কত ভয়ঙ্কর তার উপস্থিতি তা টের পাইয়ে দেন নাট্যকার। এইভাবেই উচ্চবিত্ত মানুষদের বৃত্তে ঢুকে পড়ে পুরো System-টাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে অপূর্বরাই। তাই অপূর্বর মৃত্যু সংবাদ হয়ে ওঠে প্রতীকী নতুন বিপ্লবের সূচনা। মৃত্যুতেই বোনা হয় জন্মের বীজ। মহেশ এলকুঞ্চয়ারের নাটকে মৃত্যুর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 'হোলি'-তে যেমন মৃত্যু ঘটে স্টেজের বাইরে— এবং এই খবর আসে মঞ্চে, 'পার্টি'তেও অপূর্বর মৃত্যুসংবাদ আসে এবং 'পার্টি'তে যারা এতক্ষণ অর্থহীন সংলাপে মত্ত ছিল, তাদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পায় সমাজকর্মী অপূর্ব— মানুষের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে যায় তার আদর্শ।

সোহাগ সেন ও উজ্জ্বল গুপ্ত দুজনেই মূলের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠ থাকতে চেয়েছেন। ১৯৭৪ সালে লেখা এই নাটকটি মূল মারাঠি ভাষায় অনিকেত-এর প্রযোজনায় এবং অমল পালেকরের পরিচালনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৬-এ। ১৯৮৪-তে এই নামেই (পার্টি) হিন্দি চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন গোবিন্দ নিহালনি। সোহাগ সেনের পরিচালনায় প্রত্যেকটি চরিত্রই নাটকে চ্যালেঞ্জিং ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়— তাপস ঠাকুর, কিংবা অন্তর্মুখী স্বভাবপ্রবণ গৃহকর্ত্রী দময়ন্তীর ভূমিকায় অলকানন্দা দত্ত কিংবা দময়ন্তীর কুমারী জননী মেয়ের চরিত্রে সঙ্গীতা চক্রবর্তী তাঁদের দায়িত্ব পালনে অবশ্যই সার্থক। তবে কয়েকটি চরিত্র অবশ্য এই 'পার্টি'র পরিবেশের সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠতে পারেননি। তথাপি আশির দশকের একবারে প্রান্তে দাঁড়িয়ে এমন একটি অভিনব প্রযোজনা দর্শকদের উপহার দিয়ে নাট্য পরিচালকদের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে ওলটপালট করে দিয়েছিলেন সোহাগ সেন।

**মানুষী (১৯৯২) :** তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষার একাঙ্ক নাটক নিয়ে 'অনসম্বল'-র প্রযোজনা মানুষী। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' অবলম্বনে 'মা' (বাংলা) নাট্যরূপ দেন সুব্রত নন্দী; হিন্দিতে নির্মল ভার্মার 'ধূপ কা এক টুকরা' এবং ইংরেজিতে অভিনীত হয় ফ্রাঙ্কা রামের 'ওয়েকিং আপ'। এর আগে ১৯৮৬-তে তিনি ফ্রাঙ্কা রামের 'ওয়েকিং আপ' ইংরেজি এবং ১৯৮৭-তে 'একা' শিরোনামে

তিনটি একাঙ্কের মধ্যে নির্মল ভার্মার 'ধূপ কা এক টুকরা'-র অনুবাদ 'এক টুকরো রোদ' মঞ্চস্থ করেন। আবারও তিনি 'মানুষী'তে এই দুটি নাটক ফিরিয়ে আনলেন। কারণ হয়তো সময়ের ব্যবধানে তাঁর মনে হয়েছিল এই নাটক দুটির প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর ভাল লাগার প্রশ্নটি অস্বীকার করা যায় না।

এই তিনটি একাঙ্ক একত্রে পরিবেশিত হল 'মানুষী' শিরোনামে। নামকরণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট 'হয়ে ওঠে' এই তিনটি নাটকেই সোহাগ সেন মানুষ সম্পর্কিত ভাবনাকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। তিনজন মানবীর একাকিত্ব— একক জীবনযাপনের ছবি সংক্ষিপ্ত পরিসরে উঠে এসেছে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাটকে ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতায় ও মেজাজে।

প্রথম নাটক 'মা'—মহাশ্বেতা দেবীর অত্যন্ত আলোচিত ও বহুপঠিত উপন্যাস 'হাজার চুরাশির মা' অবলম্বনে। নাট্যরূপ দিয়েছেন সুব্রত নন্দী। তবে নাট্যরূপের দুর্বলতার কারণে অভিনেত্রী মমতা চট্টোপাধ্যায় নিজেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলে ধরতে কোথায় যেন দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি তাঁর বাচনের স্বতন্ত্রতায় হেম চরিত্র ও সমুর মায়ের চরিত্র রূপায়ণে সফল ও স্বচ্ছন্দ, বরং নন্দিনী চরিত্রে যেভাবে ইংরেজি মিশ্রিত কথোপকথনে যে স্মার্টনেস প্রয়োজন বা কণ্ঠস্বরে যে সজীবতা প্রার্থিত বয়সজনিত কারণে তা সম্পূর্ণ দিতে পারেননি মমতা চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ে একটা পদ্ধতি আছে কোনও আবেগঘন মুহূর্তে বাক্য সম্পূর্ণ না করে হঠাৎ থেমে গিয়ে আবেগের প্রকাশ ঘটানো— এ নাটকে সব সময় তা মনোগ্রাহী বা আকর্ষক হয়ে ওঠে না। এ নাটকেও এই রকম কিছু কিছু মুহূর্ত তৈরি হয়েছে। তবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে মমতা চট্টোপাধ্যায় বাড়াবাড়ি না করে সংযত থেকে যে মুহূর্তগুলো তৈরি করেছেন তা নিসন্দেহে একজন বড় মাপের অভিনেত্রীর পক্ষেই সম্ভব। নির্দেশক একক চরিত্রের অভিনয় ভাবনাকে প্রয়োগ করবেন বলেই ছেলের উপস্থিতিকে ব্যবহার করেছেন টেপরেকর্ডারে ধৃত কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে। হয়তো কিছু সাজানো মনে হতে পারে কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না নির্দেশকের। মঞ্চে টেপ রেকর্ডার আর ছেলের গলার স্বর বাজছে মঞ্চের পিছনের সাউন্ড ট্রাকে— বিষয়টি অত্যন্ত কৃত্রিম। 'মা'-এর মঞ্চসজ্জায় তেমন কোনও বাড়তি আড়ম্বর রাখেননি নির্দেশক এবং আলোকসম্পাতেও স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মহাশ্বেতা দেবীর এই রাজনৈতিক উপন্যাসের যে জোরালো বক্তব্য, স্বল্প পরিসরে তাকেই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন নির্দেশক। পুলিশি এনকাউন্টারে প্রাণ হারায় ব্রতী। 'মা'র সূচনাতেই ছেলের মৃত্যুতে মায়ের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার সুরের আবহ। নকশাল আন্দোলনের সেইসব কঠিন দিনের প্রেক্ষাপটে ছেলের মৃত্যুর দুঃখ-প্রলেপে আঁকা হয় 'মা'-এর চালচিত্র। দুটি নাটকের ক্ষেত্রে দু'জন অত্যন্ত জেদি নারীবাদী

লেখিকাকে গ্রহণ করেছেন সোহাগ সেন। মহাশ্বেতা দেবী ছাড়াও ফ্রাঙ্কা রামের নাটকে থাকে নির্মম সত্য— নির্মম বাস্তব। এর আগে বাংলার মঞ্চে চেতনা জালান করেছেন 'মা'— আর ফ্রাঙ্কা রামের 'ওয়েকিং আপ' ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাবনায় মঞ্চস্থ হয়। তবে এই দুটি নাটকের ক্ষেত্রেই সোহাগ সেনের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্রভাবে ভাবনার একটা জগৎ তৈরি করেছে। এই দুটি নাটকের মাঝে থাকে নির্মল ভার্মার একটি ছোটগল্প থেকে নাট্যরূপায়ণ 'ধূপ কা এক টুকরা'। মূল হিন্দিভাষা থেকেই নাটকটি মঞ্চে উপস্থিত করা হয়েছে। এ নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে এক নারী আর তার সহযোগী এক শিল্পী যিনি নির্বাক। মূল চরিত্রে অভিনয় করেন ডলি বসু। নির্বাক সহশিল্পী ছিলেন ভাস্কর রায়। এই তিনটি নাটক যেন তিনটি প্যানেলে তিনটি পেন্টিং-এর মতো।

**মহানির্বাণ:** মহেশ এলকুঞ্চয়ারের 'উত্তরাধিকার' এবং 'পার্টি'-র পর আবারও মারাঠি নাটকের প্রতি দৃষ্টি ফেরালেন সোহাগ সেন— নির্বাচন করলেন সতীশ আলেকরের একটি উল্লেখ্য নাটক— 'মহানির্বাণ'। এ নাটকে নাট্যকার থিয়েটারের পূর্ব-সংস্কৃতি বা পূর্ব-নির্ধারিত ধ্যানধারণাকে ভেঙেচুরে নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছেন। শুধু বিষয়-ভাবনা নয়, আঙ্গিকগত দিক থেকেও নতুনভাবে উপস্থিত করেছেন সতীশ আলেকর এই নাটককে। ব্ল্যাক কমেডির আদলে পালা বেঁধে ধর্মীয় সংস্কারের মূলে ধাক্কা দিয়েছেন নাট্যকার। ১৯৭৩-তে পুনের থিয়েটার অ্যাকাডেমিতে প্রথম অভিনীত হয় 'মহানির্বাণ'। কুড়ি বছর পর যখন বাংলায় নাটকটি অনূদিত হয়, তখন অবশ্য সমকালীন প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে নতুন কোনও তাৎপর্য যুক্ত করেননি নির্দেশক। কাব্যও অপরিবর্তিত রেখেছেন নাট্য নির্দেশক। প্রৌঢ় রবি রায় যিনি মরে গিয়েও বেঁচে থাকেন। কারণ তাঁর জেদ 'কর্পোরেশনের টেন্ডারে ডাকা (নতুন) শ্মশানে পুড়ব না।' ঐতিহ্যবাহী পুরোনো শ্মশানে পবিত্রভাবে পুড়তে চায় মানুষটি। ঘটনার সূত্রপাত এই বিষয়টি ঘিরে। ঘটনা প্রবাহ দুই খাতে বইতে থাকে। একদিকে রবির মধ্যবয়সি স্ত্রী রমা ও তার যুবক পুত্রের নানান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, অন্যদিকে রবি নতুন করে চিনতে থাকে তার পরিবার প্রতিবেশী ও তাঁর জীবিত থাকাকালীন জীবনটাকে। দর্শকরাও এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে চলতে থাকেন— সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা সম্বলিত জীবনকে বিশ্লেষণ করতে করতে। মৃত্যু নিঃসন্দেহে এ নাটকে খুব বড় একটা ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু মৃত্যু-ই মূল বিষয় নয়। মৃত্যুর পর মৃত্যুকে ঘিরে যে, অশৌচপর্ব অনুষ্ঠান সর্বস্বতা তার সমালোচনা করা হয়েছে এ নাটকে। নাট্যকার সতীশ আলেকর খুব স্পষ্টভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, মানুষের মৃত্যুতে শোকের চেয়েও মানুষ কতটা ব্যস্ত হয়ে পড়ে পরবর্তী যাবতীয় শোকপর্ব নিয়ে। রবির মৃত্যুর পর তার স্ত্রী পুত্র যতটা শোকার্ত তার চেয়েও বেশি মুক্ত। বন্ধনগুলো কেমন শিথিল হয়ে পড়ে। ব্ল্যাক কমেডির আদলে নাট্যকার ঠাট্টাচ্ছলে

জীবনের বন্ধনগুলোকে অহেতুক হিসেবে দেখিয়েছেন।

বিষয়বস্তুগত দিক থেকে যেমন অভিনবত্ব এনেছিল 'মহানির্বাণ'-এ সংগীত প্রয়োগেও ছিল প্রথানুগ চিন্তাবহির্ভূত ভাবনা। মূল নাটকে এবং বাংলা রূপান্তরে সংগীতের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। ঢোল ও হারমোনিয়াম সহযোগে কীর্তনাঙ্গের গান ব্যবহার করার মধ্যে ছিল অভিনব ভঙ্গিমা। সংগীতে, কোরাসের ব্যবহার মূল বিষয় ও সংলাপের অন্তর্গত ভাবপ্রকাশে বিশেষ সহায়তা করেছে। নির্দেশক সোহাগ সেন মঞ্চকে ব্যবহার করেছেন খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিমায়। অতিরিক্ত আড়ম্বর পরিহার করে মঞ্চকে তিনি নিরাভরণ রাখতেই প্রয়াসী হয়েছেন। মঞ্চের মতো আলোর প্রয়োগ অত্যন্ত পরিমিত। নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীদের শরীরী অভিনয় 'অনসম্বল'-এর প্রযোজনায় নতুন সংযোজন। নাটকে 'ফিজিক্যাল অ্যাকটিং' গুরুত্ব অনেক নির্দেশকই মানতে চান না। মহানির্বাণের পূর্বে এই কুশলতা হয়তো অনসম্বলের প্রযোজনায় দৃষ্ট নয়, কিন্তু পাত্রপাত্রীদের শরীরী কুশলতায় সৃষ্ট নানা রকমের কোরিওগ্রাফ নাটকের আঙ্গিকে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ নাটকে গানের সুর করেছেন অভিজিৎ বসু। সুরের ক্ষেত্রে পদাবলি, কালীকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন আবার কখনও বা বেদমন্ত্রের সুরও ব্যবহৃত হয়েছে। গানের কথাতেও প্রচলিত শব্দপ্রয়োগ করা হয়নি খানিকটা অভিনবত্ব সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। যেমন একটি গানে বলা হচ্ছে— (ক) আয় আয় কাক, তোরা পিণ্ড খেয়ে যা (খ) যা করেছে বাপ ঠাকুর্দা, তোদেরও তাই করতে হবে কিংবা (গ) কালো মেঘ উড়ে যাবে সূর্য উঠবে বিশ্ব জুড়ে ইত্যাদি। গানের কথা, সুর প্রয়োগ নিঃসন্দেহে অভিনব। বিষয় এবং সংগীত ভাবনায় নির্দেশক যতটা সৃজনশীল অভিনয় শিক্ষা বা শিল্পী নির্বাচনে তিনি তাঁর ভাবনা চিন্তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি। সামগ্রিক অভিনয় তেমন জোরালো নয় এবং কৌতুক অভিনয় অনেক সময়ই ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত হয়েছে। মাঝে মাঝে অভিনয়ে ঝলসে উঠেছেন রবির ভূমিকায় তাপস ঠাকুর এবং রমার ভূমিকায় মধুছন্দা ঘোষ— তুলনায় দেবাশিস সিংহ চিত্রিত রাণা চরিত্রটি অত্যন্ত দুর্বল। তবে প্রচলিত নাট্যভাবনার বাইরে বেরিয়ে এসে 'মহানির্বাণ'— দর্শকচিত্তে ভিন্ন অনুভূতির জন্ম দেয়। দার্শনিক সেই ভাবনা নাটক রচনার কুড়ি বছর পর কতটা সমকালীন তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ নাটকের মধ্যের বিষয়বস্তু ১৯৭৩ সালে মহারাষ্ট্রে যতটা গ্রহণযোগ্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গে কুড়ি বছর পরে সেই বিষয় ততটা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিষয়বস্তুর খামতিটুকু ঢাকতেই কি তাই নির্দেশক নাট্যচিত্রণের ডিজাইনকে ঢেলে সাজালেন— আবহ-সংগীতে, ভাবনায় অভিনয়ে? এই নাটকের আলোচনার পরিসমাপ্তি টানা যায় এই কথা বলে যে আলেকার যতই ব্যঙ্গ করুন, শোক কি সব সময় মিথ্যা? শুধুই বাহ্য আচরণের বালুতে মুখ গুঁজে মূল শোকপ্রবাহকে বিস্মৃত হওয়া? বোধহয় না। জন্মসুখ ও মৃত্যুশোক এই প্রবাহে মনুষ্যজীবন চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

'মহানির্বাণ'কে তাই শুধু প্রহসন গোষ্ঠীভুক্ত না করে তার থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হয়। নাটকের চলমানতাই নাটকের প্রাণ— দর্শক চিত্তের অনুকরণেই নাট্য প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। মহানির্বাণ— সোহাগ সেনের সেই অভিনব নাট্য প্রক্রিয়া।

**উত্তরপুরুষ (১৯৯৪):** মূল নাটক: 'মাগনা তালিয়া কাটে'; নাটক মহেশ এলকুঞ্চয়ার; নির্দেশনা: সোহাগ সেন; আলো: জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়; মঞ্চ: খালেদ চৌধুরী, ধ্বনি: শ্রীপতি দাস।

মারাঠি নাট্যকার মহেশ এলকুঞ্চয়ারের সঙ্গে বাঙালি দর্শকের পরিচয় করিয়েছিলেন সোহাগ সেন 'উত্তরাধিকার' নাটকের মাধ্যমে। তারই দ্বিতীয় পর্ব 'উত্তরপুরুষ'। মহেশ এলকুঞ্চয়ারের যুগ্মনাট্যের এটি দ্বিতীয় পর্ব। বাংলায় বহু বিদেশি নাটকের সার্থক রূপান্তরের ঐতিহ্য প্রবহমান। কিন্তু তেমন করে অন্যান্য প্রদেশের নাটকের সঙ্গে বাঙালির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়েছে 'অনসম্বল' অন্তত রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাপনের সত্যনিষ্ঠ ছবি তুলে ধরেছেন মহেশ এলকুঞ্চয়ার। একটি পরিবার সময়ের ব্যবধানে কীভাবে বদলে গেল তারই বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ এ নাটকের উপজীব্য। মানুষের অন্তরের সম্পর্কগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেখতে চান, দেখাতে চান নাট্যকার। কত আলোছায়ার খেলা সেই সম্পর্কের অলিতে গলিতে। মহেশ এলকুঞ্চয়ারের নাট্য ইমেজে তাই প্রভাব রাখেন চেকভ, তাঁর বিধুর জগতের আলো-আঁধারের খেলা চলে এলকুঞ্চয়ার সৃষ্ট চরিত্রের অন্তরালে।

'উত্তরপুরুষ'-এর মঞ্চসজ্জাও খালেদ চৌধুরীর তবে— এ নাটকে তিনি আগের পর্বের 'উত্তরাধিকার'-এর মঞ্চসজ্জাকে সামান্য বদল ঘটিয়ে সময়ের ব্যবধানকে ধরে দিতে চেয়েছেন। নির্দেশক সোহাগ সেনও চরিত্রগুলির চলনে দক্ষতার সঙ্গে বদল ঘটিয়ে সময়টাকে ধরে দিতে চেয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনার দৃশ্যায়নে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন একই সঙ্গে দর্শক দেখতে পায় ঘরের মধ্যে ছেলে বউ নাতি নাতনির উত্তেজনাপূর্ণ সংলাপ এবং বাড়ির বারান্দায় একাকী বৃদ্ধার অস্তিত্ব। আবার মা-মেয়ে নাতনির মেঝেতে বিছানা করে শুতে যাওয়ার দৃশ্যের সমানতালে বউকে গহনা পরিয়ে দিয়ে তার কাছে নিজেকে নিবেদন করার দৃশ্য। অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে নির্দেশনার কাজটি করেছেন সোহাগ সেন। নতুন নতুন চিন্তাভাবনাকে রূপায়িত করেছেন দৃশ্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। নাটকের মূল ভাববস্তুকে দৃশ্য রচনার মধ্য দিয়ে বুনতে বুনতে গেছেন নির্দেশক। যে মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে নাটকের মূল কাহিনিবস্তু বা পারিবারিক ছবি— তাকে যথাযথভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সোহাগ সেনের নির্দেশনাজনিত ভাবনা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। তবে অনেক সময় বাস্তবগ্রাহ্য হয় না কোনও কোনও দৃশ্য। যেমন মঞ্চের পিছনে স্বর্ণর সঙ্গে কথোপকথন দৃশ্য

যথাযথভাবে চিত্রিত নয়। স্বর্ণর অস্তিত্বের বিশ্বাসযোগ্যতাও ভঙ্গ হয়।

মঞ্চ নির্মাণে খালেদ চৌধুরীর যে ভাবনা, তা অনবদ্য! মঞ্চ বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি এমনভাবে সেট-কে ব্যবহার করেছেন যা আলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। অভিজ্ঞ, দীর্ঘদিন মঞ্চ স্থাপত্যে যাঁর একাধিপত্য সর্বজনস্বীকৃত সেই খালেদ চৌধুরীর পাশে আলোক পরিকল্পনায় যিনি ছিলেন তিনি— বয়সে তরুণ, তাঁর চিন্তাভাবনা প্রয়োগে অভিনব সব পরিকল্পনা উদ্ভুত হলেও অভিজ্ঞতার নিরীখে তিনি নবীন। তাই খালেদ চৌধুরীর মঞ্চসজ্জার সহায়তা তাঁর আলোক প্রয়োগ ও পরিকল্পনাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। নবীনে-প্রবীণের মেলবন্ধন মঞ্চ ও আলোর প্রয়োগে অভিনব, সৃজনশীল।

অভিনয়ে প্রথম পর্বের মতো দ্বিতীয় পর্বেও সময়জ্ঞান, সংলাপোচ্চারণ, অভিনয়ের পরিমিতিবোধে স্বপ্না মিত্র মায়ের ভূমিকায় অনবদ্য। জীবন্ত রক্ত মাংসের মানুষ হিসেবে নজর কাড়েন মধুচ্ছন্দা ঘোষ। বড় বৌ-এর চরিত্রায়ণ এতটাই স্বাভাবিক যে সত্যি বলে ভুল হয়। বাইরে দজ্জাল কিন্তু ভেতরে ভেতরে নরম, ভালবাসার প্রত্যাশায় বড় বৌ অত্যন্ত পরিচিত মুখ— প্রত্যেক সংসারেই এঁদের দেখা পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনের সংসারে দুর্লক্ষ্য নয় সমুর মতো প্রাণবন্ত, বাউন্ডুলে পথভ্রষ্ট যুবকেরা। এ নাটকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল সুব্রত নন্দীর রূপান্তরে মারাঠি নাটকের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায় বাংলার নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের চৌহদ্দিতে। পরিবর্তিত হয়ে যায় আচার আচরণ, পরিবেশ প্রতিবেশ। চরিত্রগুলির চলাফেরা, কথা বলার ধরনে বাঙালিয়ানার প্রয়োগ যথেষ্ট কঠিন ছিল তা দক্ষ হাতে সামলেছেন সুব্রত নন্দী। নির্দেশক সেই রূপান্তরকে মঞ্চে প্রয়োগ করেছেন তাঁর চিন্তাশৈলীর মাধ্যমে। পাঠ্য থেকে নাট্যের যে যাত্রা— সেই যাত্রায় নির্দেশকই তো কর্ণধার! সোহাগ সেন সেই কর্ণধারের কাজটিই করেছেন সুচারু ভাবে।

**গোমুখ (১৯৯৫) :** ১৯৯৫ সালের ২৫ আগস্ট প্রথম মঞ্চস্থ হয় 'গোমুখ'। যে সোহাগ সেনের নির্দেশনায় বাংলার দর্শক প্রত্যক্ষ করেছে বোথো স্ট্রাউস, ফ্রাঙ্কা রামে, ব্রেখ্‌ট কিংবা মহেশ এলকুঞ্চয়ার, সতীশ আলেকার-এর মতো নাট্যকারদের বাংলায় রূপান্তরিত নাটক 'গোমুখ' কতটা তাঁদের মনের গভীরতাকে স্পর্শ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অনেকের কাছেই নাটকটি হালকা বা লঘুসুরে বাঁধা বলে মনে হতে পারে। তা ছাড়া এই নাটকটি কোলাজধর্মী নাটক— কোনও টানা কাহিনি বা কাহিনির উত্থানপতন এ নাটককে নিয়ন্ত্রিত করেনি। মূল কাহিনির ভিত্তি একটি পাড়ায় বসবাসকারী চারটি বাড়ির নানা ধরনের বাসিন্দাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মঞ্চকেও সেই মতো চারটি ভাগে ভাগ করে এক-একটি বাড়ির দৃশ্য অভিনয়ের জন্য ভাবা হয়েছে।

এক-একটি অংশ এক-একটি বাড়ির অভিনয়ের জন্যই নির্ধারিত। আলো ও আবহের ভাবনা সেইভাবেই করা হয়েছে। যেমন (১) একটি বাড়ির বাসিন্দা রমেন মল্লিক— সাধারণ মধ্যবিত্ত চাকরির অবসরের প্রান্তে দাঁড়ানো একটি মানুষ। তাঁর অসুস্থ স্ত্রী বিমলা। নাটকের শুরুতেই আছে রমেনবাবু মিনিবাসের তলায় পড়ে গিয়ে প্রায় মৃতপ্রায়। সেই অবস্থা থেকে বেঁচে ওঠেন—আস্তে আস্তে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। নিজের বাড়ির ছাদে বাগান করতে শুরু করেন। স্ত্রী বিয়োগের পরেও তাঁর জীবনে বিশেষ বদল আসে না। গাছপালা নিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব ভুবন। (২) আরেকটি বাড়ির বাসিন্দা—রীতা ও শঙ্কর নবীনতর প্রজন্মের দম্পত্তি। সন্তান না স্বচ্ছলতা— এ বিষয়ে দ্বিধাভিন্ন। তাদের আলোচনার মধ্যে এসে পড়ে নানান বিষয়— আর্টফিল্ম, রাজনৈতিক হতাশা ইত্যাদি। রীতা ও শঙ্করের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়, যখন শঙ্কর স্কুটার দুর্ঘটনায় একটি পা হারায়। নিজেকে সে একেবারে গুটিয়ে নেয়—গড়ে নেয় নিজস্ব জগৎ। নিজের পঙ্গুত্বকে মেনে নিতে পারে না সে। পঙ্গুত্বের সঙ্গে সহাবস্থান করে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে সে অনাগ্রহী। স্বামীর এই মানসিকতা রীতাকে যেমন দগ্ধ করে—তেমনই আরও তীব্র হয়ে ওঠে তার যন্ত্রণা, যখন রীতার এক সহকর্মীর সাহায্যকে সহানুভূতি বা দয়া মনে করে শঙ্কর নির্বাক অথচ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে এই বন্ধুত্ব-সহমর্মিতা। (৩) আরেকটি বাড়ির বাসিন্দা— অ্যাংলো ইন্ডিয়ান শিক্ষয়িত্রী মিসেস গোমস। একাকিত্বের সঙ্গে বসবাস করতে করতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে যান। সময় বা নিঃসঙ্গতা তার জীবনে আপাত কোনও ছাপ ফেলে না। তিনি তাঁর পুরোনো জীবনের পালাপার্বণ মেনেই দিন অতিবাহিত করেন। অবশ্য ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে একাকিত্বের ভার— তিনি আত্মহত্যা করেন। (৪) চতুর্থ অমৃতা— এক কল গার্ল তার প্রেমিক অল্পবয়সি সাংবাদিক যুবক সুব্রত-র সঙ্গে থাকে আরেকটি বাড়িতে। সুব্রত চায় বর্তমান জীবনের গুটি কেটে অমৃতাকে বিবাহ করে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। প্রজাপতির আনন্দ-সুখ দিতে প্রস্তুত সে তার প্রেমিকাকে। কিন্তু কোথায় যেন বাধা তৈরি হয়। সুব্রতর যাবতীয় ইচ্ছা প্রচেষ্টা বিফলে যায়। অমৃতাকে নিয়ে গোমুখ যেতে চাইলে অমৃতা বাড়ি ছেড়ে—শহর ছেড়ে দূরে চলে যায়। দুটি খালি বাড়িতে লোকেদের আনাগোনা হতে থাকে। কিন্তু তারা কেউ-ই গোমুখ যাওয়ার কথা বলে না। ভাবেও না।

প্রশ্ন জাগে— কেন এই নাটকটির নাম গোমুখ? 'গোমুখ' শব্দটি প্রয়োগ করে নাট্যকার কি বিশেষ কোনও অর্থের প্রতি দর্শককে আকৃষ্ট করতে চাইলেন? তা হলে বলতে হয় এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ কেননা এ নাটকে সুব্রত ছাড়া আর কেউ গোমুখ নিয়ে তেমনভাবে উৎসাহী হয় না। হয়তো নাট্যকার গোমুখকে একটা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ধরতে চাইলেন। কিন্তু কীসের প্রতীক? যা নাটকে প্রতিবিম্বিত হয় না? পরিচালক কি এই বিষয়টি সম্পর্কে তেমন করে ভেবেছেন? মঞ্চ ও আলো

সম্পর্কে নির্দেশক যতটা সজাগ, নাটকের মুখ্য বিষয়টিকে চারিটি বাড়ির চারটি পরিবারের মধ্যে সাযুজ্য মূল সূত্রে গ্রথিত করতে অপারগ। তবে এ দায় শুধু নির্দেশকের নয়, নাট্যকারেরও। নির্মাণের ক্ষেত্রে সোহাগ সেন আরও সচেতন হলে নাটকের গতিমুখ আরও স্পষ্ট ও দৃঢ় হত। নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রে গোমুখ শব্দটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে মনে হয় নাট্যকার উৎস মুখে ফিরে যাওয়ার একটা ব্যঞ্জনা রাখতে চেয়েছেন। বিধ্বস্ত, যন্ত্রণাদীর্ণ মানুষগুলোর জীবনে কোথাও যেন শান্তির উৎস সন্ধানে তীর্থযাত্রা করে এমন কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকলেও থাকতে পারে নাট্যকারের মনে— এমনই একটা ভাবনা আমরা অনুমান করতে পারি।

গোমুখ নাটকের সম্পাদনা, নির্দেশনা ও পরিকল্পনা— সোহাগ সেন। আলো প্রক্ষেপণ-জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। শব্দ প্রক্ষেপণ শ্রীপতি দাস; অভিনয়ে তাপস ঠাকুর, মধুছন্দা ঘোষ, সংগীতা চক্রবর্তী, দেবাশিস সিন্‌হা, রবীন দাস, বাবুলাল কুণ্ডু, মতিলাল সেন, জয়তী গাঙ্গুলী, স্বপন বড়ুয়া, অশোক ঘোষ, উৎপল ঘোষ, মৃণালকান্তি দাস, নিবেদিতা ভট্টাচার্য, দোলা চক্রবর্তী।

**পাপ (১৯৯৮) :** ব্রেখ্‌ট-এর ‘The Seven Deadly Sins’ অবলম্বনে রচিত নাটক (অনুবাদ সমীর দাশগুপ্ত, নাট্যরূপ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়)-প্রথমে মঞ্চস্থ হয় ম্যাক্সমুলার ভবনে।

পরবর্তী সময়ে আবারও এ নাটকের মঞ্চায়ন ঘটল সোহাগ সেনের নির্দেশনায় ‘অনসম্বল’-এর প্রযোজনায়; ‘পাপ’ শিরোনামে। স্ক্রিপ্ট রচনা সোহাগ সেনের-ই। ব্রেখ্‌টের লেখা ‘সেভেন ডেডলি সিন্‌স অব পেটি বুর্জোয়া,— কোনও নাটক নয়, ব্যালের জন্য লেখা স্ক্রিপ্ট। সেখান থেকেই অনুবাদ করেন সমীর দাশগুপ্ত নাটকের আঙ্গিকে। বিষয়বস্তু ছিল এই রকম : মার্কিন মেয়ে অ্যানা শহরে আসে অর্থ উপার্জনের জন্য— সে-অর্থে প্রতিপালিত হয় তার সংসার। অ্যানার পরিবার সব সময় প্রার্থনা করে, অ্যানা যেন পাপকে এড়িয়ে চলতে পারে। সাতটি দৃশ্যে অ্যানা ক্রমশ ধনী হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটি দৃশ্যের শেষে দেখি অ্যানার পরিবারের মানুষেরা প্রার্থনা করছেন। সাতটি দৃশ্যকেই অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে একই সূত্রে গেঁথে নেওয়া হয়েছে। নাটকীয় সংঘাত বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটককে গতিশীল করে রাখে। যেমন একটি দৃশ্যে দেখা যায় হলিউডের স্টার অভিনেতার গালে চড় মারে অ্যানা— কেননা সেই অভিনেতা একজন অসুস্থ একস্ট্রার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল। অ্যানার চরিত্রে নির্দেশক দুজন অভিনেত্রীকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন—অ্যানা চরিত্রের দুটি সত্তাকে প্রকাশ করার জন্য। অথবা অনেক অনেক অ্যানা-ই কীভাবে পণ্য হয়ে ওঠে তারই প্রতিরূপ

দেখানোর উদ্দেশ্যে। দুজন অ্যানা দু'রকম। একজন যেন মুখ আরেকজন মুখোশের আড়ালে থাকা মুখ। একজন বিক্রেতা অ্যানা, অন্য জন পণ্য হয়ে যাওয়া অ্যানা— ট্র্যাজিক পরিণতির শিকার। অর্থ উপার্জনের জন্য সে পাপের সঙ্গে সহবাস করতে দ্বিধা করে না। এই নাটকের বিষয়বস্তু একেবারে সরল-একরৈখিক। প্রযোজনার মুনশিয়ানা ধরা পড়ে উপস্থাপনার কুশলতায়। দলগত অভিনয় আর গান হয়ে ওঠে এ নাটকের সম্পদ। তবে একক চরিত্রে রজতাভ দত্ত ও সুদীপা বসুকে অ্যানা দর্শক মনে রাখবে অনেক দিন। এইভাবেই সোহাগ সেন ক্রমশ এক ভাবনা থেকে আরেক ভাবনা, এক বিষয় থেকে ভিন্ন বিষয়ে তাঁর নির্দেশনার মেধাকে সচল রাখেন।

২০০০ সাল থেকে অনসম্বল-এ একটা ফর্মাল ওয়ার্কশপ আরম্ভ হয়। গান শেখানো, হাঁটা-চলা শেখানো, নাচ শেখানো ইত্যাদি। এই কাজটা করতে করতে তাঁরা একটা পদ্ধতিগত জায়গায় যখন পৌঁছন, তখন মনে হয় যে, যে-পথে তাঁরা এগোচ্ছেন তা ঠিক পথ কি না? এত দিন তাঁদের যা শেখানো হল তা কতটা তাঁরা গ্রহণ করলেন সেটা জানার পথটা কি? দর্শকই একমাত্র বিচার করতে পারে তাই ওয়ার্কশপ থেকে তৈরি হওয়া নাটকগুলি নিয়ে দর্শকের মুখোমুখি 'অনসম্বল'। ২০০০ থেকে একটির পর একটি ওয়ার্কশপ ভিত্তিক প্রযোজনা উপহার দিতে থাকল 'অনসম্বল'। এর মধ্যে আছে— নাটকীয় (২০০০), অপরাধ (২০০২), প্রতি ছয় সেকেণ্ডে (২০০৩), সিঁড়ির নীচে (২০০৫), লাল বাক্স (২০১১) এবং হায় হায়া (২০১৪) ইত্যাদি। যারা নতুন দলে আসে তাদেরই মূলত ওয়ার্কশপের নাটকগুলিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পুরোনো সদস্যরাও অভিনয় করেন। যারা অভিনয় করেন তাঁরাও নানান রকম ইমপুট্স দিতে দিতে যান। তারপর দর্শকদের সামনে পরীক্ষিত হয়ে গেলে তার একটা জায়গা তৈরি হয়। এইভাবে তৈরি হওয়া প্রযোজনাগুলি সোহাগ সেনের কাজে নতুন একটা দরজা খুলে দিল। প্রযোজনার একটা নতুন পথ আবিষ্কার করলেন সোহাগ সেন। এ ছাড়া ওয়ার্কশপ ভিত্তিক নাটকগুলির মধ্য দিয়ে আরও একটা উদ্দেশ্য সাধন করল 'অনসম্বল'। আমাদের দেখা এই জগৎটার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে এমন সব ইস্যু যা আমাদের ভাবায়। হয়তো সেই রকম বিষয়কেন্দ্রিক নাটক পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু মঞ্চ থেকে এই কথাগুলো বলা অত্যন্ত জরুরি। তাই সবার থেকে নানান ভাবনা নিয়ে— তা জুড়ে জুড়ে তৈরি হল নাটক। সমাজের অনেক ঘটে যাওয়া ঘটনা সেগুলো নিয়ে নাটক করতে চান তাঁরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে সব সময় হয়তো লিখিত নাটক পাওয়া যায় না। ওয়ার্কশপে— সেই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে নাটক গড়ে ওঠে, তৈরি হয় সমাজের সাম্প্রতিক জ্বলন্ত বিষয়কেন্দ্রিক নাটক। এইভাবেই তৈরি হয় নাটকীয় এবং তৎপরবর্তী ওয়ার্কশপভিত্তিক নাটকগুলি।

**নাটকীয় (২০০০):** শতাব্দী শেষ হল 'অনসম্বল'-এর নাট্য প্রযোজনার ভিন্ন চিন্তার বাঁকে। তাঁরা সব সময়ই নাটক সংক্রান্ত নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পথ হেঁটেছেন। দু'মাস ধরে নাটকের ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তৈরি হল তাঁদের প্রযোজনা 'নাটকীয়'। 'পরিকল্পনা এবং নির্দেশনায় সোহাগ সেন আরও একবার প্রমাণ করলেন নিজের অভিনবত্বে। সবচেয়ে যা আকষর্ণীয় তা হল সমস্যা সমাধানের কোন ধৃষ্টতা দেখায় নি।'[৬৩] এই নাটকের নানান গঠনমূলক কাজে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরাই আবার নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। মূলত নাটকের দলগুলির (গ্রুপ থিয়েটার) যে সমস্যা তাই নিয়েই এই নাটক। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সৃজনশীল সমস্যায় দলিত হয়ে নাটকের দলগুলি যে কতটা বিব্রত আর নাটক তার জন্য কতটা বিপাকে পড়ে তারই একটা ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। হয়তো সমস্যা সমাধানের ধৃষ্টতা নেই, আছে নিজেদের বিশ্লেষণ করার সাহস— নিজেদের দোষ-গুণ বিচার করার মানসিকতা। এই জায়গা থেকে নাটকটি তৈরি করেছেন অনসম্বল-এর কুশীলবরা। তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অবস্থা শোচনীয় হলেও, নানাবিধ সমস্যার জালে গ্রুপ থিয়েটারের নাভিশ্বাস উঠলেও নাটক চলছে চলবেও— এই ভাবনায় তারা বিশ্বাসী। 'অনসম্বল' গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শ বহন করে অস্তিত্ব রক্ষায় প্রয়াসী। তাই প্রত্যেক মুহূর্তে তাদের যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে হয় তা আরও পাঁচটা দলেরও সমস্যা। ফলে গ্রুপ থিয়েটারের বাস্তব সমস্যাগুলি বাস্তব সম্মতভাবে উঠে এসেছে 'নাটকীয়'তে।— এ নাটকের মধ্যেই চলে নাটকের রিহার্সাল। একটা নাটক মঞ্চস্থ করার পদে পদে যে কত বাধা কত সমস্যা তার-ই ছবি এ নাটকের প্রতিটি দৃশ্যে। প্রত্যেক দৃশ্যেই উঠে আসে একেক ধরনের বিপত্তির ছবি। সম্পূর্ণভাবে নাটকটি মঞ্চস্থ করার পদে পদে সৃষ্টি হতে থাকে নানা ধরনের বাধার। প্রত্যেকের মধ্যে তৈরি হতে থাকে হতাশা নৈরাশ্য। অভিনেতা অভিনেত্রীরা ভাবতে থাকে এ নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আর বোধহয় সম্ভাবনা নেই। কী ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয় দল?

(ক) স্পনসরের চাপে টিভি সিরিয়ালের শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করানোর প্রতি কটাক্ষ এবং এ নিয়ে নানান চাপান-উতোর সমালোচনা তর্ক-বিতর্কে দলের মধ্যে। (খ) পরিচালকের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন, (গ) স্বামীর আপত্তির কারণে দলের অন্যতম প্রধানা অভিনেত্রীর দল ছেড়ে চলে যাওয়া, (ঘ) টিভি সিরিয়ালের শ্যুটিং-এর জন্য রিহার্সালে অনিয়মিত উপস্থিতি, (ঙ) নানান বিষয়ে দলের মধ্যে মতানৈক্য কেন ঘনিয়ে ওঠে এই সংকট? তা কি শুধু মেধা বা চেতনার অভাবজনিত কারণে নাকি অগভীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানসিকতার কারণে? আসলে এই কারণগুলো ছাড়াও রয়েছে পরিশ্রম না করার প্রবণতা। নাটকের দলগুলির কর্মসংস্কৃতির অভাব কতটা ক্ষতিকারক হয় তারও ছবি

পাওয়া যায় নাটকে। এখান থেকেই টুকরো টুকরো শৃঙ্খলাহীনতার জন্ম হতে থাকে যা সংকটাবস্থার সৃষ্টি করে।

এ নাটকের মূল লক্ষ্যই ছিল গ্রুপ থিয়েটারের অভ্যন্তরীণ অবস্থার এক দৃশ্যায়ন। আজকের সময়ে দাঁড়িয়েও গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করার জন্য ছেলেমেয়েদের নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পারিবারিক অনুমোদন না পাওয়ার অন্যতম কারণ আর্থিক কোনও নিরাপত্তা দিতে পারে না গ্রুপ থিয়েটার। বাহ্যিক কারণ ছাড়াও থাকে নাট্যদলের মধ্যে তীব্র সংকট অন্তর্দ্বন্দ্ব। আর্থিক কারণে যেখানে স্পনসরের মুখাপেক্ষী হতে হয় সেখানে বাণিজ্যিক স্বার্থকে নস্যাৎ করা যায় না। বাংলার গ্রুপ থিয়েটারগুলোর যখন এই অবস্থা, তখন তা প্রত্যক্ষ করানোর দায় নিয়ে 'অনসম্বল' সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাজটিও করল শিল্পচর্চার সমান্তরালে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ওয়ার্কশপ ভিত্তিক এই প্রযোজনা একই সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব পালন ও আত্মসমালোচনার দরজাটা খুলে দিল। নাটকের ঘটনাবস্তু অনুসরণে দেখা যায় একটি নাট্যদল একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে চলেছে। স্যাটায়ারধর্মী নাটকে উঠে এসেছে প্রাক স্বাধীনতা পর্বের কয়েকজন ব্যক্তিত্বের কথা এবং টুকরো টুকরো ঘটনা। কোলাজের আকারে বাঁধা হয়েছে বিষয়টিকে। নাটকের শুরুতেই তৈরি হয় এক দ্বন্দ্ব। স্পনসরের চাহিদায় নাটকে টিভির পর্দার গ্ল্যামারসর্বস্ব অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে আসার কারণে দলের মধ্যে তৈরি হয় বিরুদ্ধ মানসিকতা। পরিচালকের (এ নাটকে তিনি মহিলা) কর্মযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই যোগ্যতা বিচার কি পুরুষ বা মহিলা অর্থাৎ লিঙ্গবৈষম্যের নিমিত্তে করা হয়। দেখা যায় পুরুষতন্ত্রের নানান অধিকারবোধের বহির্প্রকাশ। স্বামীর জেদের কারণেই দলের গুরুত্বপূর্ণ অভিনেত্রীকে দল ছাড়তে হয় মাঝপথে। টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করার জন্য রিহার্সালের ক্ষতি হয়ে যায়। এইরকম নানাবিধ সমস্যার চৌকাঠ পেরিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবুও সমস্ত বিপত্তি পেরিয়ে নাটকটি যখন মঞ্চস্থ হওয়ার জন্য প্রস্তুত, তখনই চূড়ান্ত সংবাদটি শোনা যায় যে, নাট্যকারের অনুমতি পাওয়া যায়নি নাটকটি অভিনয় করার জন্য। এই চূড়ান্ত সমস্যাই কিন্তু নাটকের দলটির মনোভাবকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিল। চরম ব্যর্থতার মুখে পড়ে দলটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যেমন করে হোক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাটকটি মঞ্চস্থ করতে হবে। মহড়ার সময় যাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল বিশৃঙ্খলতা, অমনোযোগ, কেরিয়ার গোছানোর তাগিদ, সেই তরুণ সদস্যদের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল— তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক বন্ধন তৈরি হল। সবার ভেতরে একটা জেদ কাজ করতে লাগল। সমস্ত সদস্যদের মধ্যে তৈরি হয় ঐক্য। সেটিই তাদের পূর্ণোদ্যমে কাজ করে নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল। তারা প্রতিজ্ঞা করল পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে

নতুন নাটক তারা মঞ্চস্থ করবেই। এই প্রতিজ্ঞা, শপথ দায়বদ্ধতা দলকে দেয় একটা চালিকা শক্তি, একসঙ্গে কাজ করার উদ্দীপনা। সোহাগ সেন সেই উদ্দীপনা—কর্মভাবনার-বীজটি বপন করার পথটি দেখিয়ে দিলেন 'নাটকীয়'তে একেবারেই নিজস্ব পরিকল্পনাপ্রসূত পন্থায়। তাই 'নাটকীয়' শুধুই ওয়ার্কশপ ভিত্তিক আউটপুট না হয়ে, হয়ে ওঠে যথার্থ সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে প্রাপ্ত এক নাট্যক্রিয়া। নাটকীয় — নাটক — 'অনসম্বল' ওয়ার্কশপভিত্তিক; আলো বাবলু সরকার, ধ্বনি—সন্দীপ দে; রূপসজ্জা — মানিক বণিক, নির্দেশনা ও পরিকল্পনা— সোহাগ সেন; চরিত্রায়ণ : তাপস ঠাকুর, সঙ্গীতা চক্রবর্তী, কৌশিক বসু, জয়ৎসেন ভট্টাচার্য, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখী ঘোষ, পলাশ বড়াল, অভিজিৎ দাস, সন্দীপ বসু, দীপক ঘোষ, স্বপন বড়ুয়া, সুদেষ্ণা নন্দী, নীলাঞ্জনা বেরা, সন্দীপ দে, স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়, গৌতম সরকার, মৃগাঙ্ক মজুমদার, ভাস্কর ঘটক প্রমুখ।

২০০২-এ আবারও একটি ওয়ার্কশপভিত্তিক প্রযোজনা 'অপরাধ'। ছোট নাটক এবং এর বিষয় ছিল এইডস নিয়ে। এইড্স বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে আবারও তার পরের বছর ২০০৩-এ করালেন 'প্রতি ছয় সেকেন্ডে'। নাটকে সামাজিক সমস্যাগুলিই প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন সোহাগ সেন। এবং সেই উদ্দেশ্যেই যদি ওয়ার্কশপভিত্তিক প্রযোজনাগুলি মঞ্চস্থ হয়, তা হলে প্রশ্ন উঠতেই পারে পূর্ণাঙ্গ বা একাঙ্ক নাটক সেখানে প্রতিফলিত করা যায় না সামাজিক সমস্যাগুলি? এর উত্তরে বোধহয় বলা যায় পূর্ণাঙ্গ বা একাঙ্ক নাটকে কোনও কাহিনির আড়ালে থাকে সমস্যাগুলি। সে ক্ষেত্রে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে গড়ে ওঠা নাটকে সামাজিক সমস্যাগুলি সরাসরি উপস্থাপিত করা যায়। 'অনসম্বল' প্রযোজিত সোহাগ সেন পরিচালিত এই প্রযোজনাগুলি বাংলা রঙ্গমঞ্চে যেমন নিজস্ব জায়গা তৈরি করে নিল— দর্শকদের কাছেও গ্রহণীয় হয়ে উঠল ক্রমশ।

**বংশগত (২০০৩):** সোহাগ সেন পরিচালিত সতীশ আলেকারের 'পিড়িজাত' মূল মারাঠি ভাষার নাটকের অনুবাদ। তিনটি প্রজন্মের ছবি এঁকেছেন সতীশ এই নাটকে— এই মানুষগুলো আমাদের পরিচিত সীমানার মধ্যেরই মানুষ। সংলাপ-নির্ভর এ নাটকের দৈর্ঘ্য তুলনায় দীর্ঘ। তিন প্রজন্মের প্রথম প্রজন্ম মৃত দাদু, দ্বিতীয় প্রজন্ম বাবা, রাধার ব্যর্থ স্বামী এবং বর্তমান বা তৃতীয় প্রজন্মের আশুতোষ। দাদুর ভূমিকায় দুলাল লাহিড়ীর উপস্থিতি মঞ্চে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাঁর কণ্ঠস্বরের দাপট, জোরালো, অভিনয়, শরীরী উপস্থিতি সব মিলিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। দুলাল লাহিড়ী চিত্রিত দাদু এ নাটকে মৃত— তিনি মাঝে মাঝেই ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসেন— পরিবারের মানুষজনের সঙ্গ চান। মৃত অবস্থায়ও তিনি পরিবারের জন্য চিন্তা করেন, তাঁদের মঙ্গল কামনায় উৎসুক। তাঁর সময় থেকেই পরিবারে শুরু হয়েছিল মূল্যবোধের যে অবক্ষয় তা ক্রমশ

বাড়তে থাকে। তিনি এই অবক্ষয়ের হাত থেকে পরিবারকে বাঁচাতে দৃঢ়কল্প সচেষ্ট। মৃত মানুষদের নাটকের মধ্যে সজীব করে তোলা, তাদের মধ্য দিয়ে সমাজের অবক্ষয় রোধ করার প্রবণতা, পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা— সতীশ আলেকারের নাট্যবৈশিষ্ট্য, যা আমরা 'মহানির্বাণ'-ও লক্ষ করেছি। নাট্যকার দেখিয়েছেন দাদুর সময় থেকেই পরিবারের মধ্যে অন্তঃসারশূন্যতা, সম্পর্কের অবনতি বা ক্ষরণের শুরু এবং তা ক্রমশ বর্ধমান। কী করে এই অবক্ষয় রোধ করা যাবে— সেই প্রচেষ্টায় নাট্যকারের যন্ত্র বা হাতিয়ার হয়ে ওঠে মৃত মানুষেরা— তাদের মধ্য দিয়ে সংশোধনের একটা প্রক্রিয়া বজায় রাখেন নাট্যকার। 'বংশগত'র ক্ষেত্রেও দেখা যায় মৃত দাদুর জীবন্ত উপস্থিতি। যখন-তখন ছবির ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসে কখনও ছেলে, কখনও বাড়ির বৌ কখনও বা নাতির সঙ্গে আলাপচারিতায় মুক্তি খোঁজেন। প্রজন্মের সঙ্গে প্রজন্মের ব্যবধানজনিত সমস্যা বিষয়ে কথা বলেন। যখন তিনি মর্ত্যজীবনে ছিলেন তাঁর জীবনেও দুর্নীতির প্রলোভন ছিল যা তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। দর্শকদের মনে হতেই পারে হয়তো নাট্যকার জন্ম ও মৃত্যুর এই প্রান্তের অন্ধকারময়তাকে ধরতে চেয়েছেন অতীত ও বর্তমান দুই ক্ষেত্রেই তিনি অন্ধকার দেখছেন। তবে জীবন কি এতটাই হতাশাব্যঞ্জন? জীবনের আরও অনেক দিক আছে যা আমাদের হতাশার অন্ধকার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে —তবে সেই সমস্ত দিকগুলো উন্মোচিত হল না নাটকে। তাই এ নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে দর্শক সন্তুষ্ট থাকলেও নাটকের মূল বক্তব্য ও পরিণতি বিষয়ে দর্শকের কিছু অপ্রাপ্তি থেকেই যায়। নাট্যকার সতীশ আলেকার এ বিষয়ে দায় এড়াতে পারেন না। অভিনয়, দৃশ্যায়ন বা নাট্য পরিকল্পনার দিকে নয়, দর্শকের মূল অভিযোগ নাটকের বিষয় বক্তব্যের খামতির প্রতি। শিল্পমূল্য ও সাহিত্যগুণ এ নাটকে অতটা শক্তিশালী নয় বলেই অন্যান্য বিষয়গুলি জোরদার হওয়া সত্ত্বেও নাটকটি উচ্চমানে পৌঁছতে পারে না। অভিনয় এ নাটকে অত্যন্ত শক্তিশালী, তাই এই অভিনয়ই বিষয়বস্তুজনিত ত্রুটিগুলিকে ঢেকে ফেলতে সক্ষম হয়। মৃত দাদুর পরিবারের প্রতি টান— পরিবারের সকলের সঙ্গে মিলবার আকাঙ্ক্ষা যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, হালকা চালে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় সাবলীল দুলাল লাহিড়ীর শরীরী অভিনয়ে তা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক নেতার ভূমিকায় দীপক ঘোষ চরিত্রটিকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। সবথেকে কঠিন ও জটিল ছিল দ্বিতীয় প্রজন্মের বধূ আশুতোষের মা রাধার চরিত্রায়ণ। বাইরে সে হাস্যোজ্জ্বল কিন্তু ভেতরে লুকিয়ে রাখে এক বেদনাহত হৃদয়। রাধা নরম মনের মানুষ। তার ছেলের জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে থাকে। কিন্তু এ নাটকে ছেলে ও মাকে কখনও মুখোমুখি দাঁড় করান না নির্দেশক, তা হয়তো দর্শকমনে একটা কৌতূহলকে জিইয়ে রাখার জন্য। পরিচালকের এটাও একটা প্রক্রিয়া। রাধার চরিত্রে অভিনয় করেন শুচিতা রায়চৌধুরী যিনি একই সঙ্গে পরিচালকের শিক্ষা ও নিজস্ব অভিনয় ক্ষমতাকে এক সূত্রে গেঁথে দিতে পারেন।

এই ধরনের জটিল চরিত্রের রূপায়ণ সহজ নয়, কিন্তু শুচিতা রায়চৌধুরীর অভিনয় চরিত্রের জটিলতাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এ নাটকে বহু নতুন মুখ অনসম্বলের নবীন সদস্যরা অভিনয় করেছে। নতুনদের দিয়ে কাজ করানোটাও পরিচালকের কৃতিত্ব।

সোহাগ সেনের পরিচালন শক্তি এক-একটি নাটকে একেক রকমভাবে প্রতিফলিত। এ নাটকেও মঞ্চসজ্জা, কোরিওগ্রাফি, নতুন পুরাতনের অভিনয় ক্ষমতা নাটকটিকে বেঁধে রেখেছে। সোহাগ সেন মঞ্চের পরিসরকে চমৎকারভাবে ব্যবহার করতে পারেন। কখনও তিনি পুরো মঞ্চটাকে ছোট ছোট জোন্ (Zone)-এ ভাগ করে নাটকের গতিকে সচল রাখেন আবার কখনও বা সমস্ত মঞ্চ জুড়ে বিস্তৃত মঞ্চসজ্জা করেন। তাঁর পরিচালিত 'পার্টি' , 'মহানির্বাণ' বা 'উত্তরাধিকার'-এ এভাবেই মঞ্চকে ব্যবহার করতে দেখেছে দর্শক। কিন্তু এ নাটকে তিনি মঞ্চকে ছোট ছোট জোনে ভাগ করে দৃশ্যগুলি সাজিয়েছেন। যা তাঁর প্রথম দিকের প্রযোজনা যেমন বোথো স্ট্রাউস-এর অনুবাদ 'আবার দেখা হবে'-র স্মৃতিকে উসকে দেয়। তবে অনেক সময় পরিচালকের মুনশিয়ানাও নাট্যবস্তুর কাছে হার মানে। 'বংশগত' নাটকের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে। নাট্যকার বা অনুবাদকের আরও বেশি সচেতনতার অবকাশ ছিল এ নাটকের ক্ষেত্রে। সে প্রত্যাশা পূরণে 'বংশগত' সার্থক হয়নি।

**নির্দেশক সোহাগ সেনের নির্দেশনার রীতিপদ্ধতি:** একটি নাট্য প্রযোজনার পশ্চাতে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেন নির্দেশক এবং তাঁর নিজস্ব রীতি-পদ্ধতিতে গড়ে ওঠে নাট্যের পূর্ণরূপ। এ কারণেই নির্দেশকের স্বাতন্ত্র্যে নাট্য প্রযোজনাগুলিই আলাদা আলাদা রূপ নেয়। প্রথমেই বলা হয়েছে তিনি অভিনয়ের অভিজ্ঞতা থেকে নাট্যনির্দেশনার কাজটি করেছেন। যদিও নির্দেশকের ভূমিকায় তাঁকে অবতীর্ণ হতে হয়েছে ঘটনাচক্রে। তবে তাঁর অভিনয়-অভিজ্ঞতাই নির্দেশনার প্রথম সোপান। কোনও ফর্মাল ট্রেনিং তাঁর ছিল না অভিনয়ের। উৎপল দত্তের পরিচালনাধীনে 'লেনিনের ডাক'-এ ম্যারিনা মিথাইলো-র চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৬০-৬৫ টি প্রদর্শনী অভিনয়ে। এই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে একটা শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা হয় তাঁর যা তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের মধ্যে চালিত করেন। দিনের পর দিন বহু দর্শকের মুখোমুখি হওয়ার কারণে দর্শকের ইম্‌পালস বা মানসিক চাহিদা বোঝবার একটা ক্ষমতা তৈরি হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে CPTA-তে ঢোকবার পর প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁকে যে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় তার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় দল পরিচালনার অভিজ্ঞতা। এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ম্যাক্সমুলার ভবনে ব্রেখ্‌টের দুটি নাটক (একাঙ্ক নাটক) পরিচালনা করেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর নিজস্ব দল 'অনসম্বল' প্রতিষ্ঠার পর তাঁকেই ঘটনাচক্রে যখন নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব তুলে নিতে হয়, তখন তিনি নির্দেশনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব পথটি খুঁজে নেন। সেই সময় তিনি বহু নাটক দেখতেন

এবং এই সব নাটকে প্রত্যক্ষ করেছেন বহু ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয়। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল এঁরা বেশির ভাগই Director-কে follow করে। ডিরেক্টরের ছায়াটা পুরোপুরি গ্রাস করে অভিনেতা অভিনেত্রীদের। যা ছিল তাঁর অপছন্দের। 'that is one thing that was different from Ensemble.'[৬৪] তাই তিনি সরে দাঁড়ালেন অভিনয় করে দেখিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি থেকে। ''আমি কাউকে সত্যি কথা অভিনয় করে দেখাই না।'[৬৫] সেইজন্য কেউ নাটক দেখে বলে না সোহাগ সেনকে দেখা গেল অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে।

প্রথমে চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। যে নাটকটা করা হবে এবং যারা অভিনয় করবে তাদের কাছে দরজাটা খুলে রাখা হয়— তারা ইচ্ছে মতো ইনপুট্স্ দিতে পারে এবং অনেক সময় তারা এত ভালো ভালো ইনপুট্স্ দেয় যা নাটকের জন্য অত্যন্ত জরুরি। অন্ধভাবে নির্দেশককে অনুসরণ করার বিপক্ষে থাকেন সোহাগ সেন। এইভাবে জিনিসটা যখন একটা সম্পূর্ণ আকার ধারণা করে তখন শুরু হয় *internalisation* এই আত্তীকরণ না করলে অভিনয় করা সম্ভব নয় বলেই মনে করেন সোহাগ সেন। তিনি বিশ্বাস করেন শুধুমাত্র বাইরের জেসচার পসচারের মধ্য দিয়ে অভিনেতার অভিনয়সত্তাকে প্রকাশ করা যায় না। একটা দল হয়ে যাবার পর এই সন্ধানটাই তিনি করেছেন এবং একটা চরিত্র হয়ে ওঠার প্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁর পরিচালনাধীন অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে। পরিচালনার সময় লক্ষ করেছেন অনেকেই হয়তো চরিত্রটার মধ্যে ঢুকে গেছে— চরিত্রটা নিয়ে ভাবছে কিন্তু অনেক সময় তারা larger matrix-টা ভুলে যায়। larger matrix-এ কী দরকার সেটা জানাটা অত্যন্ত দরকারি। তখন সোহাগ সেন নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে তাদের এই শিক্ষাটাই দেন যে এই চরিত্রটা larger matrix-এ কীভাবে আছে। তার আসল কাজটি কী? কেন এই পুরো ম্যাট্রিক্সে সে আছে। এই সমস্ত কারণগুলো খুঁজে বার করে দেখিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় অভিনেতা অভিনেত্রীরা চরিত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ে— সেটা ভুলে যায়। সোহাগ সেনের বক্তব্য ''আমার কাজটা হচ্ছে পুরোটা Visualise করে দেখা। এটা ওদের কাজ নয়। ওদেরকে line-এ নিয়ে আসাটাই আমার কাজ।" অভিনেতা অভিনেত্রী তৈরির সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে— কমপোজিশন্ বা ব্লকিং-এর কাজ। সে ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিকভাবে যেটা মাথায় আসে সেটাই করেন। খুব চিন্তাভাবনা করে কিছু করেন না। রিহার্সাল করতে করতে movement গুলো তৈরি হতে থাকে। অপ্রয়োজনীয় হাঁটাচলা— তিনি বিশ্বাস করেন না। হয়তো অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখতে পারেন দুটো চরিত্রকে। যেটা তাঁর চোখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয় সেইভাবেই ব্লকিংগুলো করা হয়। কিন্তু যখন কোনও কোরিওগ্রাফি বা নাচের কোনও দৃশ্য তৈরি করা হয় তখন আগে থেকে ভেবে রাখা হয় composition। আর যখন কোনও পার্ক বা জনপদ তৈরি করা হয় অর্থাৎ সেখানে অনেক লোক আসছে যাচ্ছে— যেখানে

রাস্তা মেলা, সেখানে প্রচুর লোকজনের ভিড় তখন অঙ্কের মতো লিখে লিখে দৃশ্য তৈরি করেন সোহাগ সেন, বাড়িতে বসে সেটা করে নেন। প্রথমে দেখে নিয়ে তার পর পুরো জিনিসটার ছক কষে কমপোজিশনগুলো অভ্যাস করানো হয়। নাটক নির্বাচনের পর সবাইকে বসিয়ে নাটক পড়ানো হয়— প্রচুর ‘reading rehearsal’ হয়— সেই সময় কণ্ঠস্বর তৈরির কাজও হতে থাকে। কোনও চরিত্র কীভাবে কথা বলবে বা চলাফেরা করবে সেই কারণগুলোও ক্রমশ বুঝিয়ে বলা হয়। নাটকের উদ্দেশ্যটা কী সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার পর এই নাটকে সেই নির্দিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রয়োজনীয়তাটুকুও সম্পর্কে তাদের সচেতন করা হয়। সোহাগ সেন সবসময় তাঁর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্বচ্ছন্দ রাখতে চান— কোনও রকম আড়ষ্টতা যেন তাদের মধ্যে না থাকে। কেননা স্টেজের ওপর এই অভিনেতা অভিনেত্রীরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নির্দেশক হিসেবে সোহাগ এই রকম পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তবে যান্ত্রিকভাবে নয় স্বচ্ছন্দভাবেই কাজটি করতে তিনি ভালবাসেন। সোহাগ সেনের কাছে motivation-টাই মূল কথা। কুশীলবদের মধ্যে এবং নাটকের অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একটা উৎসাহ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আগ্রহ সঞ্চারিত করতে পারাটাই পরিচালকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন।

বহু নাটকের নির্দেশই মূল চরিত্রে অভিনয় করেন। সোহাগ সেনের কাছে নিজের নির্দেশিত নাটকে অভিনয় করাটা খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় নয়। হয়তো স্টেজে ঢুকলেন— তখন দেখলেন কোনও চরিত্রের ওপর আলোটা ঠিক পড়ছে না, সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশক সোহাগ সেনের মনস্কতা তীব্র হয়ে ওঠে। যাঁরা সেই সময় নির্দেশক সত্তার সুইচ অফ্ করে শুধুমাত্র অভিনেতা হিসেবে কাজ করে যেতে পারেন, তাঁদের প্রতি সোহাগ সেনের আলাদা একটা শ্রদ্ধার জায়গা আছে। কিন্তু নিজে তিনি এটা পারেন না। তবে একই সঙ্গে নির্দেশনা ও অভিনয় যে করেননি তা নয়। ‘উত্তরাধিকার’-এ তিনি স্বর্ণলতার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সাম্প্রতিককালে ‘সোনাটা’ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় করতেন এবং চরিত্রে অভিনয় করার সময় অন্য কিছু তিনি মাথায় রাখতেন না। হয়তো ৭/৮ মিনিট মঞ্চে থাকতেন কিন্তু তাঁর mood change ছিল প্রায় ৩০-৪০ বার। নিজে করতে চাননি— তবে উপযুক্ত অভিনেত্রী না পেয়ে নিজেই করেন—একটি পঞ্চাশোর্ধ্ব অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলার চরিত্রে।

অন্যান্য নাট্য নির্দেশকের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা বড় বড় চরিত্রে অভিনয় করেন। কিন্তু সোহাগ সেন চরিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে জোর দেন চরিত্রটির বাইরের দর্শনের ওপর। অর্থাৎ যদি চরিত্রটিতে অভিনেতাকে মানিয়ে যায় তা হলে সোহাগ সেন মনে করেন ৫০ শতাংশ নম্বর অভিনেতা পেয়ে গেলেন। একশো শতাংশে পৌঁছানো তো সম্ভব নয় তাই আর ৩০-৪০ শতাংশ অভিনয় দিয়ে

ভরিয়ে দিলে অভিনেতা সাফল্যের অনেকখানি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। যেমন ‘উত্তরাধিকার’ নাটক মঞ্চায়নের পর অনেকে সোহাগ সেনকে বাড়ির বড় বৌ-এর চরিত্রটিতে অভিনয় করার কথা বলেছিলেন কিন্তু পদ্মাবতীর মধ্যে যে লক্ষ্মীশ্রী আছে সোহাগ সেন মনে করেছিলেন তাঁর মধ্যে তা নেই। তাই নিজেকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করেন অলকানন্দা দত্তকে। কারণ তাঁর মুখশ্রীর মধ্যে নির্দেশক তাঁর প্রার্থিত লক্ষ্মীশ্রী খুঁজে পেয়েছিলেন। স্বর্ণলতার চরিত্রে কখনও অভিনয় করেছেন জয়তী বসু, কখনও স্বরূপা কখনও নির্দেশক নিজে। তবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সন্ধান যে নির্দেশক একাই করেন তা নয়— দলের সবাই মিলে বা অনেককে বলে রাখলে তারা সবাই মিলে সন্ধান করতে থাকে। এইভাবে ‘উত্তরাধিকার’-এর বড় ভাই-এর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য খুঁজে বার করা হয়েছিল অতি দাসকে, যিনি নান্দীকারে অভিনয় করতেন। অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও অনেকখানি গুরুত্ব দেন ‘internalisation’-এর ওপর। চরিত্রটা হয়ে উঠতে হবে— কপি করা নয়, বা শুধু বাইরের জেসচার পসচার করে নয়, একেবারে ভেতর থেকে হয়ে ওঠা।

নির্দেশককে শুধু অভিনয় শিক্ষণ নিয়ে নয়, মঞ্চসজ্জার ব্যাপারেও তাঁর ভাবনাচিন্তাকে প্রতিফলিত করতে হয়। প্রথম দিকে শুরুর সময়ে যে ছোট একাঙ্ক নাটকগুলি করেছিলেন সোহাগ সেন, সেখানে মঞ্চসজ্জার তেমন বাহুল্য ছিল না। তিন একান্ত—বা ‘একা’-তে একটা টেবিল দুটো চেয়ার আর দুটো বেঞ্চি— সামান্য কিছু আসবাবের ব্যবহারে পুরো নাটকের বিষয়বস্তুকে ধরা হয়েছিল। এখানে ব্যাকড্রপ কিছু ছিল না। বোথো স্ট্রাউসের নাটক যখন করা হল— ‘আবার দেখা হবে’ — তখন সেখানে একটা আর্ট গ্যালারির ব্যাপার ছিল এবং সুনীল দাস তাঁকে ৩৯টা ক্যানভাস দিয়েছিলেন—এবং এ নাটকের সেট্‌ করেছিলেন নির্দেশকই। তার পর থেকে প্রায় সব নাটকের সেট বা মঞ্চসজ্জা করেছেন সোহাগ সেন। কিন্তু ‘উত্তরাধিকার’-এ এসে অনসম্বল খালেদ চৌধুরীকে মঞ্চ স্থাপত্যের দায়িত্ব অর্পণ করল। খালেদ চৌধুরী ছিলেন দলের আপনজন। তিনি ছাড়া দলের বাইরের কাউকে দিয়ে মঞ্চসজ্জার কথা ভাবেননি সোহাগ সেন। ‘উত্তরাধিকার’-এ অসাধারণ মঞ্চ পরিকল্পনা ছিল খালেদ চৌধুরির। মূলত প্রথম যখন ‘বিজয়া মেহেতা নির্দেশিত নাটক ‘ওয়াড়া চিরে বন্দি’ দেখেন, তখন সোহাগ সেনের মনে হয়েছিল এত বড় সেট-টা যেন হাঁ করে গিলতে আসছে। তাই কিন্তু খালেদ চৌধুরীর তৈরি করে দেওয়া মঞ্চের গঠনে ছিল শহরতলির একটি ক্ষয়িষ্ণু বাড়ির আদল। সেখানে দাঁড়াতেই অনুভব হত এই বাড়ির পরিবেশ— যা নাটকের বিষয়বস্তুর আলোচনায় বলা হয়েছে। লম্বা টানা বারান্দা ও তার পিছনে কয়েকটি ঘর। ‘উত্তরাধিকার’-এ পরবর্তী পর্বের গল্পানুসারে লিখিত মহেশ এলকুঞ্চওয়ার রচিত ‘উত্তরপুরুষ’-এর মঞ্চ ভাবনার ক্ষেত্রে ‘উত্তরাধিকার’-এর মঞ্চসজ্জাকে একটু বদল করে নিয়েছিলেন নির্দেশক নিজেই খালেদ চৌধুরীর তৈরি করা মঞ্চের মূল

কাঠামোকে সামনে রেখেই। এই ভাবেই নাটকের সঙ্গে মঞ্চসজ্জার বা সেট-ডিজাইনের যথার্থ যোগাযোগে একটি নাটক দৃশ্যসফল হয়ে ওঠে।

গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়কালের (২০০৩ পর্যন্ত) পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে নির্দেশনার ইতিহাস তৈরি করেছেন সোহাগ সেন। ওয়ার্কশপভিত্তিক নাটক এবং পূর্ণাঙ্গ নাটকের মঞ্চায়ন ও নিয়মিত অভিনেতা অভিনেত্রী প্রস্তুতিকরণের মধ্য দিয়ে অনসম্বল-এর কাজের ধারাকে অব্যাহত রাখতে পেরেছেন তিনি। সোহাগ সেন যে অভিনেতা গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন তাঁরা শুধু থিয়েটার নয়, অন্যান্য মাধ্যমেও নিজেদের যেমন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, পরবর্তী সময়ে তেমনই তাঁদের অনুপস্থিতিতে ‘অনসম্বল’-এর জন্য নতুন অভিনেতাগোষ্ঠীও তৈরি করে নিয়েছেন সোহাগ সেন। তাঁর কৃতিত্ব এইখানেই যে, তিনি মাটির তাল দিয়ে প্রতিমা নির্মাণের কৌশলে পারদর্শী। সোহাগ সেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের একজন পরিচালক হিসেবে শুধু নন, একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে একটি নাট্যদলের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখা, নাট্য নির্মাণ ও নির্দেশনার মধ্য দিয়ে নাট্যদলকে সচল রাখার কৃতিত্ব শুধু মহিলাদের মধ্যে কেন— পুরুষদের মধ্যেও খুব বেশি সংখ্যক নেই। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট নারীনির্দেশক হিসেবে তাই সোহাগ সেন একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

## তথ্যসূত্র


১. শাঁওলী মিত্র, *মুকুরে মুখ না মুখোশ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৪, পৃ. ৯৫

২. শাঁওলী মিত্র, *নাথবতী অনাথবৎ, কথা অমৃতসমান*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, কার্তিক, ১৪১৯, কলকাতা, পৃ. ৩৬

৩. তদেব, পৃ. ৬২

৪. তদেব, পৃ. ৭০

৫. তদেব, পৃ. ১৯

৬. শাঁওলী মিত্র, *মুকুরে মুখ না মুখোশ*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫৮

৭. তদেব, পৃ. ৫৮

৮. শাঁওলী মিত্র, ‘কেন অভিনয় করি’, *দৃদিক্ষা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯২, কলকাতা, পৃ. ৫৮

৯. শাঁওলী মিত্র, 'নাথবতী অনাথবৎ, কথা অমৃতসমান: কিছু প্রশ্ন, কিছু আপত্তি', *দিদৃক্ষা*, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৮৮

১০. শাঁওলী মিত্র, 'নাথবতী অনাথবৎ, কথা অমৃতসমান, *দৃদিক্ষা*, পূর্বে উল্লিখিত, তদেব, পৃ. ৩৭

১১. তদেব, পৃ. ৪৮

১২. পঞ্চম বৈদিক প্রযোজিত 'কথা অমৃত সমান' নাটকের অভিনয়পত্রী

১৩. শাঁওলী মিত্র, '১৩৯৮, আশ্বিন— প্রথম সংস্করণের ভূমিকা', *কথা অমৃতসমান*, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৮৯-৯০

১৪. শাঁওলী মিত্র, *কথা অমৃতসমান*, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১০৭

১৫. তদেব, পৃ. ১৪৮

১৬. তদেব, পৃ. ১৭৩

১৭. তদেব, পৃ. ১৭২

১৮. শাঁওলী মিত্র, 'সামাজিক প্রেক্ষিতে নাট্যের অবস্থান', *মুকুরে মুখ না মুখোশ*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৯ ('বিতত বিতংস'-র প্রযোজনা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের জন্য লিখিত। মার্চ ১৯৯৬)

১৯. শাঁওলী মিত্র, 'চিন্তন', *মুকুরে মুখ না মুখোশ*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৭৯, (১৯৯৪-এ সানন্দাতে প্রকাশিত)

২০. শাঁওলী মিত্র, 'নাট্যনির্মাণে প্রাসঙ্গিকতা', *মুকুরে মুখ না মুখোশ*, পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ২০

২১. 'রাজা' নাটকের অভিনয়ের টিকিটের ভাষ্য।

২২. 'শাঁওলী মিত্র', 'নাট্যনির্মাণে প্রাসঙ্গিকতা', *মুকুরে মুখ না মুখোশ*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২০-২১

২৩. ১৯৬৪ সালে 'বহুরূপী' প্রযোজিত রাজা নাটকের অভিনয়পত্রী।

২৪. ২০০৩ সালে 'পঞ্চম বৈদিক' এর ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পুস্তিকায় 'রাজা' নাটের সারবস্তু।

২৫. তন্দ্রা চক্রবর্তী, *বর্তমান* পত্রিকা, ১৯৮৭

২৬. গৌরকিশোর ঘোষ, 'পঞ্চম বৈদিকের রাজা', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ০৮/০৫/৮৭

২৭. শাঁওলী মিত্র, 'অন্ধকারের ভাষা', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২০.০৮.১১

২৮. 'নতুন আলোয় আবার রাজা', *যুগান্তর*, ৪মে ১৯৮৭।

২৯. 'পঞ্চম বৈদিক' নাট্যসংস্থার ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা।

৩০. সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়, *পটভূমি*, ১৯৯৬

৩১. জয় গোস্বামী, 'অগ্নি বলয়ে আমরা', *দেশ পত্রিকা*, কলকাতা, ১৫.০৬.৯৬

৩২. Rita Dutta, ‘Questioning Civilisation’, *The Economic Times*, Calcutta, Saturday, 25 May 1996.

৩৩. শিলাদিত্য সেন, ‘শাঁওলী মিত্রের মুখোমুখি’, *প্রতিবেশ সাহিত্য*, জুলাই ১৯৯৬, পৃ. ৬৮

৩৪. Prabir Ghosh, ‘Raising a Safe and Politically Currect Script : Mitra a la Mode?’ The Arts, The Asian Age, 10.05.1996

৩৫. জয় গোস্বামী, অগ্নিবলয়ে আমরা, *দেশ পত্রিকা*, ১৫.০৬.১৯৯৬

৩৬. শাঁওলী মিত্র, ‘নাট্যের অন্তিম মূর্ছনা’, *মুকুরে মুখ না মুখোশ*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৪৫

৩৭. পঞ্চম বৈদিক ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা,

৩৮. পঞ্চম বৈদিক ‘পুতুল খেলা’ প্রযোজনার ইংরেজী সারমর্ম থেকে উদ্ধৃত।

৩৯. শাঁওলী মিত্র, ‘নাট্যনির্মাণে প্রাসঙ্গিকতা’, *মুকুরে মুখ না মুখোশ*, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৪

৪০. স্বপন মজুমদার, বহুরূপী ১৯৪৮-৮৮, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৬-২৭

৪১. ‘Action Replay After decades’, *The Telegraph*, Kolkata, 25.05.2002

৪২. তদেব

৪৩. Srimati Lal, ‘Democratising Hindi Theatre’, The Art, *Business Standard*, Sunday 24 March, 1985

৪৪. রঙ্গকর্মী প্রযোজিত ‘বেটি আয়ী’ প্রযোজনার পরিচয় লিপি।

৪৫. কামালউদ্দিন কবির, ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, *মানব জমিন পত্রিকা*, বাংলাদেশ, শনিবার, ২৫ জুলাই, ১৯৯৮

৪৬. ‘Father Courge’, *The Asian Age*, Calcutta, 14.06.98

৪৭. Ananda Lal, ‘Smothering Courage’, *The Telegraph*, 17.07.98

৪৮. মলয় দাশগুপ্ত, ‘নাট্যসমালোচনা, রঙ্গকর্মীর বাংলা নাটক’, *কালান্তর*, কলকাতা, ১৯.০৫.২০০০।

৪৯. কৃষ্ণা বসু, ‘দ্রৌপদী’, *সানন্দা*, কলকাতা, ১.৩.২০০১

৫০. Ananda Lal, ‘Impeceable acting, Kackneyed Knowledge’, *The Telegraph*, Kolkata, 30.03.2001

৫১. কেতকী দত্ত, ‘রঙ্গকর্মী’, *কেতকী দত্ত : নিজের কথায়, টুকরো লেখায়*, থীমা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১০২-১০৩

৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্ত্রীর পত্র, *গল্পগুচ্ছ*, সপ্তম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ৬৪৭-৬৪৮

৫৩. রঙ্গকর্মী ‘কাশীনাথ’ প্রযোজিত নাটকের অভিনয়পত্রী, Director’s Note.

৫৪. তদেব

৫৫. Leading Lady’, *The Indian Express*, Chandigarh Newsline, Monday, 20 Sept 2004

৫৬. Sohag Sen, An Interview by Sohini Sen, *The Telegraph*, Kolkata, 04.08.95

৫৭. Sohag Sen, An Interview by Ranjan Ghosh, *The Telegraph $T^2$*, Friday 6 June 2014, p. 17

৫৮. সোহাগ সেন, ‘আমি এবং কয়েকজন’, *আনন্দলোক পূজাবার্ষিকী*, কলকাতা, পৃ. ১৭৬

৫৯. সোহাগ সেনের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক: গবেষক, ২০১৪

৬০. তদেব

৬১. সুরজিৎ ঘোষ, ‘নৈঃশব্দ্যের উত্তরাধিকার’, *দেশ*, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, পৃ. ১০৪

৬২. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাস্তবের শক্তিতে শক্তিমান ‘উত্তরাধিকার’, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, কলকাতা, ৭-০৪-১৯৮৯

৬৩. মানব মজুমদার, ‘আধুনিক গ্রুপ থিয়েটারের চালচিত্র নাটকীয়’, *সংবাদ প্রতিদিন*, কলকাতা, ২০-০৭-২০০১

৬৪. সোহাগ সেনের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক: গবেষক, ২০১৪

৬৫. তদেব

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# নির্মাণ ভাবনার ভিন্নমুখ

**(জয়তী বসু, সীমা মুখোপাধ্যায়, ডলি বসু)**

বাংলা নাট্যের নির্দেশনায় যে ধারাবাহিকতা তৈরি করলেন নারীনির্দেশকরা সেই পথেই নব্বই-এর দশকের নির্দেশকদের মধ্যে যে তিনজন নির্দেশক নির্মাণ ভাবনার ক্ষেত্রে ভিন্ন পথের সন্ধান করলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জয়তী বসু (১৯৫৩), সীমা মুখোপাধ্যায় (১৯৫৯) এবং ডলি বসু (১৯৫৬)। এঁদের নির্দেশনায় আসার সময়কালের নিরিখে আলোচনার ক্রম নির্ধারিত হল। নাট্যভাবনার ক্ষেত্রে এঁরা স্বতন্ত্র হলেও এই তিন নাট্যনির্দেশক তাঁদের নির্মাণকর্মে নারীবাদী মানসিকতাকে সোচ্চারে প্রকাশ করার কোনও চেষ্টা করেননি—এই দিক থেকে তাঁদের মধ্যে একটা মিল দেখা যায়। জয়তী বসু পরিচালনা শুরু করেছিলেন যথেষ্ট শক্তিশালী পদক্ষেপে কিন্তু ক্রমশ তিনি পরিচালনা ও নাট্যাভিনয় থেকে সরে দাঁড়ান যদিও নাট্যচিন্তা থেকে অবসর গ্রহণের কোনও লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। ডলি বসু কোনওদিন ভাবেননি তিনি নির্দেশক হবেন অথচ পরিস্থিতি তাঁকে এই পথে চালিত করল এবং তিনি নির্দেশক হিসেবে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছেন। ডলি বসুর নাট্যভাবনা ভিন্নধর্মী শিশুদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পরবর্তী জীবনে। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শিশু কিশোরদের মধ্যে প্রাণময়তা সঞ্চার করার জন্য তিনি থিয়েটার থেরাপিকে কাজে লাগিয়ে নাট্যক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে আরও সুদৃঢ় করে তোলেন। আর সীমা মুখোপাধ্যায় নাটক রচনা থেকে নির্দেশনায় পৌঁছে গিয়ে ক্রমশ পরিণত থেকে পরিণততর হয়ে উঠেছেন এবং একটানা কাজ করে যাবার (নাট্যনির্দেশক) দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মেয়েদের মধ্যে। সর্বোপরি এই তিনজনই বলিষ্ঠ অভিনেত্রী এবং নাট্য তাঁদের কাছে নিজেদের জনপ্রিয় করার মাধ্যম নয়, আরও বৃহৎ আরও মহৎ কার্যের মাধ্যম। নাট্য র্নিমাণের ক্ষেত্রে তাঁরা তৈরি করলেন একটা ভিন্নপথ।

## জয়তী বসু (১৯৫৩)

বাংলা নাট্যের যে তিনজন নবীন পরিচালক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত তাঁদের মধ্যে এক ব্যতিক্রমী নাট্যপরিচালক ও স্বতন্ত্রধারার নাট্যনির্দেশক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন জয়তী বসু। তাঁর নাট্যনির্দেশনার পরিসর বা কালসীমা সংক্ষিপ্ত এবং তাঁর নির্দেশিত নাটকের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। নিজেকে তিনি ক্রমশ সরিয়ে নিয়েছেন নাট্যনির্দেশনার ক্ষেত্র থেকে তবু স্বল্প সময়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তা, নাট্য পরিকল্পনার

রীতি-পদ্ধতি, নাটক নির্বাচনে অভিনবত্ব এবং সর্বোপরি গ্রিপস্ থিয়েটার ফর্মের সঙ্গে বাংলার মঞ্চের যোগাযোগ ঘটানোর কৃতিত্ব জয়তী বসুকে নাট্যনির্দেশক হিসেবে একটা স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে।

বহু নাট্য অভিনেত্রীর জীবনেই লক্ষ করা যায় যে অভিনয় জীবন দিয়ে শুরু করে তাঁরা নাট্যনির্দেশনার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন। জয়তী বসুর ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটেছে। অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যজীবন শুরু করে তিনি নাট্যজগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন নাট্যপরিচালক হিসেবে। অবশ্য তাঁর জীবনের শুরুতে নাটকের সঙ্গে সঙ্গে ছিল নৃত্যশিক্ষার অভিজ্ঞতাও। জয়তী বসুর জন্ম ১৯৫৩ সালের ২৭ এপ্রিল। তাঁর শিক্ষাজীবনের মূলপর্ব অতিবাহিত হয় শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাঁর অভিনয় জীবনে শুধু নয় সামগ্রিক জীবনে বিশেষ প্রভাব রেখে গিয়েছে। জীবনের যা কিছু করণীয় বা বেঁচে থাকা তার মূল উৎসভূমি ছিল—শান্তিনিকেতন। তাঁর শৈশব কেটেছে ধুবুলিয়ায় শিক্ষয়িত্রী মায়ের সাহচর্যে। তখন তার বয়স তিন অথবা চার— সেই ছোটোবেলাতেই তাঁর নাট্যজীবনের সূচনা হয়। ‘হলদে ঝুঁটি মোরগটি’ নাটকে অভিনয়ের সূত্রে। এরপর কলকাতায় এসে ভর্তি হন ‘ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন স্কুল’-এ। কয়েক বছর মাত্র কলকাতায়, তারপর ১৯৬৩-তে দশ বছর বয়স থেকে শান্তিনিকেতন-পর্ব (১৯৬৩-১৯৭০)। সেখানে একটা আলাদা জগত, আলাদা পরিবেশ। প্রথম সেখানে গিয়েই অভিনয় করেছিলেন ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’য়। মহলা দেখতে গিয়ে হঠাৎ করেই তাঁকে নির্বাচন করা হয়—তারপর প্রত্যেক বছর কোনও না কোনও নাটকে অভিনয়, সাহিত্যসভার আয়োজন করা নানান ধরনের কাজে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনিবেশ, নিজেকে প্রকাশ করার আনন্দ অভিজ্ঞতা তাঁকে তাঁর বর্তমান সময়েও প্রাণিত করে। তিনি মনে করেন ‘শান্তিনিকেতনের জীবনের সময়টা শুধু আমার base নয় আমার Survival করার একটা base-ও। এই যে আজকে আমি টিঁকে আছি— যা কিছু ঘটনা ঘটছে যা কিছু হয়েছে— সেটা একটা Spirit-The entire spirit—শান্তিনিকেতনে সলতে পাকানোর কাজ খুব ভালো হয়েছিল।’[১] শান্তিনিকেতনে তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিজেকে মেলে ধরার সময়টা আজও তাঁকে দিশা দেখায়, সাহস যোগায়। শান্তিনিকেতনে প্রত্যেক বছর যেমন নাটক করেছেন তেমনি কলকাতায় আসার পর যখন মুরলীধর গার্লস কলেজে ভর্তি হলেন সেখানে অভিনয় করেন বাদল সরকারের ‘কবিকাহিনী’তে।

১৯৭৩ সালে মুরলীধর গার্লস কলেজ থেকে স্নাতক এবং এরপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৩ সালে নাটক নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি ১৯৮০-৮৩-তে গবেষণার জন্য ভারত সরকারের Young Talent’s Scholorship অ্যাওয়ার্ড পান। নাটক নিয়ে পড়াশুনার আগেই অবশ্য তাঁর নৃত্যশিক্ষা শুরু হয়ে যায়। ১৯৭০-এ তিন বছর ধরে উদয়শংকর ইন্ডিয়া কালচার সেন্টার-এ নাচের

প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। এরপর আরও একবছর ১৯৭৩-১৯৭৪ প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী থাঙ্কুমণি কুট্টির কাছে বিশেষভাবে শিক্ষাগ্রহণ করেন 'কলামণ্ডলম'-এ। নাচের পাশাপাশি অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ তাঁকে নিয়ে আসে নাটকের জগতে। প্রথমে পার্ক সার্কাস ইনস্টিটিউশন-এর প্রযোজনা 'বিসর্জন'-এ অপর্ণার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এখানে অভিনয়ের সূত্রেই কবি, প্রকাশক সুরজিৎ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় এবং বিবাহ হয়। গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে তিনি তেমন সচেতন না হলেও এই সময় বহু দলের অভিনয় দেখতে দেখতে তাঁর মধ্যে থিয়েটার সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাতে থাকে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ এই সময়টাতে 'বহুরূপী', শ্যামল ঘোষ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের প্রযোজনাগুলি তাঁকে আলোড়িত করে। পরবর্তী সময়ে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এ বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে, 'সুন্দরম'-এ মনোজ মিত্রের পরিচালনায়, 'অনসম্বল'-এ সোহাগ সেনের নির্দেশনায় কাজ করতে করতে তাঁর নাট্যঅভিজ্ঞতা ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে এবং নাটক সম্পর্কে তাঁর চিন্তার জগতও পরিণততর হতে থাকে। স্বামী সুরজিৎ ঘোষ তাঁর প্রথম জীবনে একবারে শুরুর দিকে নাটকের বিষয়ে তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন। এছাড়াও জার্মান ভাষা শিক্ষাকে কেন্দ্র করে ম্যাক্সমুলার ভবনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নাটকে অংশগ্রহণ জয়তী বসুর অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৭৬ সালে, জয়তী বসুর বয়স যখন ২৩ বছর, 'আলিবাবা' নাটকের সূত্রে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এর। যদিও 'আলিবাবা' সে সময় মঞ্চস্থ হয়নি। কিন্তু 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এর বেশ কয়েকটি প্রযোজনায় জয়তী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৭৫-এ 'রাজরক্ত', ১৯৭৬-এ 'নরক গুলজার', ১৯৭৮-এ 'মহাকালীর বাচ্চা' ইত্যাদি প্রযোজনায় কাজ করেন। এই সময়ে অভিনয় করতে করতে জয়তী বসুর থিয়েটার সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে ক্রমশ একটা পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। তিনি অনুভব করেন যে থিয়েটার মানে শুধু অভিনয় নয়, আরও কিছু। তাঁর মধ্যে টোটাল থিয়েটারের ভাবনার উন্মেষ হয়। তিনি থিয়েটারের যাবতীয় কাজ— সেট্, আলো, পোশাক, সংগীত, আবহ, মেক-আপ সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠতে থাকেন। অভিনয় ছাড়াও থিয়েটারের এই দিকগুলি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য সেই ভাবনা থেকে জয়তী বসু যখন 'টোটাল থিয়েটার' সম্পর্কে সচেতন এবং সেই সচেতনতা থেকেই কাজটা করতে চাইছেন সে সময়ই তাঁকে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' ছাড়তে হয় মতবিরোধের কারণে।

এ সময় ভারত সরকারের Department of Culture থেকে যে Young Talent's Scholarship পেয়েছিলেন সেটি বন্ধ হবার উপক্রম ঘটে। কেননা Scholarship-এর সঙ্গে একটি দলে সংযুক্ত থাকার একটা কারণ থাকে। তাঁর আগে এই বৃত্তি পেয়েছিলেন শাঁওলী মিত্র ও পরে রমাপ্রসাদ বণিক ও আরও

অনেকে। জয়তী বসুকে নির্দেশ দেওয়া হয় দিল্লির ‘ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা’ অথবা পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত হতে। তাঁর বয়স তখন পঁচিশ এবং কন্যা সন্তানও ছোটো। তিনি দিল্লিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নাকচ করেন। রবীন্দ্রভারতী থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। জীবনের ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর ভাঙন-পর্ব শুরু হয়। সুরজিৎ ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পর্কে ছেদ পড়ে। জয়তী বসু এক নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন বিষয়টি। তাঁর মনে হয়েছিল তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে থিয়েটারটা করতে চাইছেন বলেই হয়তো তাঁর ওপরে বাইরের থেকে একটা চাপ আসছে। কিন্তু তিনি অনড় থেকেছেন নিজ সিদ্ধান্তে—সিরিয়াস থিয়েটার করার সঙ্কল্পে। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন ‘থিয়েটার এই সমাজটাকে বদলাতে পারে। পেশা নয় থিয়েটারটা আমি সিরিয়াসলি করার কথা ভাবছি।’[২]

থিয়েটার ওয়ার্কশপ ছাড়ার পর কিছুদিন তিনি কাজ করেছেন মনোজ মিত্রের রচনা ও নির্দেশনায় ‘সুন্দরম্’ নাট্যগোষ্ঠীতে। সেখানে ‘মেষ ও রাক্ষস’ (১৯৮১) এবং ‘সাজানো বাগান’ (১৯৮১) দুটি প্রযোজনায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। দু’জন বিশিষ্ট পরিচালকের নির্দেশনায় কাজ করার পর জয়তী বসু এমন একজন নাট্যনির্দেশকের পরিচালনাধীনে অভিনয় করলেন— যিনি হয়ে উঠলেন জয়তী বসুর পরিচালক সত্তার অন্যতম সহায়ক। তিনি সোহাগ সেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল ‘অনসম্বল’-এর প্রযোজিত ‘আবার দেখা হবে’ (১৯৮৫) এবং মহেশ এলকুঞ্চয়ারের মারাঠী নাটক ‘ওয়াড়া চিরেবন্দী’র বাংলা রূপান্তর ‘উত্তরাধিকার’-এ একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় (মেয়ের চরিত্র) অভিনয় করে বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাঙালি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের কেন্দ্রে চলে আসেন জয়তী বসু। সোহাগ সেনের সঙ্গে কাজ করার মধ্যে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন তিনি। সেক্ষেত্রে মনে হয় একজন অভিনেত্রী কি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন একজন নারী নির্দেশকের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে। তবে জয়তী বসু, সোহাগ সেনের পরিচালনা সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে ইতিবাচক অভিমত দিয়েছেন— ‘সোহাগের কাছে যখন এসেছি তখন ও ম্যাচিওরড্। সোহাগ Criptic, Specific, একটা সাহেবিয়ানা ছিল। সোহাগের Silence-এর ব্যবহার Dialogue-এর ব্যবহার এবং totality-এই juncture-এ এসে আমার খোঁজা আর সোহাগের Maturity কোথাও একটা ট্রিগার করেছে।’[৩]

‘অনসম্বল’ নাট্যগোষ্ঠীতে অভিনয় করার কিছুদিন পর ১৯৯০-তে ‘সূত্রপাত’ নাট্যদল গঠন করে জয়তী বসু। এই নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক ও কর্ণধার তিনিই। জয়তী বসুর পূর্বসূরীদের মধ্যেও এই প্রবণতাই লক্ষ করা যায় সে তাঁরাও নিজস্ব নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করে নাট্যনির্দেশনার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। পূর্ববর্তী দশকেই সোহাগ সেন, শাঁওলী মিত্র ও ঊষা গাঙ্গুলি এইভাবেই নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন ভাবনায় নির্দেশনার কাজ করেছেন। জয়তী বসুর নাট্যদল গঠনের ক্ষেত্রে যে কারণটি মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হল

তিনি শুধুমাত্র তাঁর অভিনেত্রীসত্তার ঘেরাটোপে নিজেকে আটকে রাখতে চাইছিলেন না। যে কথাটা তিনি বলতে চান বা সমাজের কাছে যে বার্তাটা পৌঁছে দিতে চাইছেন একজন অভিনেত্রীর সেই ক্ষমতাটা থাকে না। কারণ নাটক নির্বাচনের দায়িত্ব থাকে অভিনেত্রীর ওপর নয়, নির্দেশকের ওপর।

কিন্তু কেন তিনি একটি দল তৈরি করলেন— ? থিয়েটারের কর্মী হলেও জয়তী বসু কোনওদিনই থিয়েটারকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেননি। হয়তো তিনি থিয়েটারকে কাজে লাগিয়ে উপার্জন করেছেন। দিল্লির 'ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা'-র সঙ্গে কাজ করেছেন কিন্তু পুরোপুরি সময়ের থিয়েটার কর্মী হতে চাননি। এছাড়াও নিজস্ব থিয়েটার দল থাকলে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতকে প্রতিষ্ঠা করতে অনেক শক্তি অর্জন করা যায় বলে বিশ্বাস করেন। ১৯৭৫-১৯৭৯ সেই সময়েই তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন জাগতে থাকে। থিয়েটার যে শুধুমাত্র বিনোদন নয় একটা বড়ো মাধ্যম সেই কথাটাই তাঁকে ধাক্কা মারতে থাকে। সেই সঙ্গে থিয়েটারের অন্যান্য উপাদান— মঞ্চনির্মাণ, আলো, পোশাক, রূপসজ্জা, আবহ, অভিনয় ইত্যাদি— এইসবগুলো নিয়ে যে সম্পূর্ণতা বা টোটালিটি সেটাই খুঁজতে চেয়েছেন জয়তী বসু। নাট্যদল গঠন করে নাট্যনির্দেশনার মধ্য দিয়ে এই অন্বেষণের তাগিদ তাঁকে চালিত করেছে। এই তাগিদটা 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এ কাজ করার সময় থেকেই তাঁর মধ্যে কাজ করেছে। সত্তরের দশকের বিপুল স্রোতটা তাঁর নাট্যচেতনাকে পুষ্ট করেছে নব্বই-এর দশকে এসে। এরও দীর্ঘ সময় পর নাট্যদল গঠন করলেও সলতে পাকানোর কাজটা শুরু হয়েছিল ওই সময়েই। পরবর্তী সময়ে তিনি বিভিন্ন নাট্যদল ও নাট্যনির্দেশকের সঙ্গে কাজ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। অভিনেত্রী জয়তী বসুকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হচ্ছে যখন তিনি নিজস্ব দল গঠন করে নাট্যপ্রযোজনা করছেন। কারণ অভিনেত্রী হিসেবে যে কথাগুলো তিনি বলছেন সেগুলো হয়তো বলতে চাইছেন না। 'দেখলাম অভিনয় করলাম চলে এলাম এই রোলটা আমাকে আর টানছিল না। I want to get involved in totality.'[৪] এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই 'সূত্রপাত'-এর প্রতিষ্ঠা।

সূচনাপর্ব ছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বর। কেননা যে অর্থনৈতিক সংগতি ও দল তৈরির জন্য পরিকাঠামো প্রয়োজন তা তাঁদের ছিল না। নতুন প্রজন্মের চারজন সদস্যকে সঙ্গী করে দুঃসাহসিক কাজে নেমেছিলেন জয়তী বসু। তিনি এই নাট্যদলের নির্দেশক এবং তাঁরই নেতৃত্বাধীনে বাংলা মঞ্চ লাভ করল আরও এক নারী নির্দেশককে।

জয়তী বসুর নির্দেশিত নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে—

| নাটক | প্রথম অভিনয় | নাটককার | প্রযোজনা |
|---|---|---|---|
| প্রতিবিম্ব | ১৯৯১ | মহেশ এলকুঞ্চওয়ার | সূত্রপাত |
| বাকি ইতিহাস | ১৯৯২ | বাদল সরকার | ,, |
| Care করি না | ১৯৯৩ | ফোলকার লুডভিগ | ,, |
| রোবট কুপোকাৎ | ১৯৯৪ | ,, | ,, |

গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়কাল (১৯৪৩-২০০৩)-এর পরবর্তী সময়েও আরও কয়েকটি প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয়েছে তাঁরই নির্দেশনায়। যেমন 'নো ফিউচার নো ব্যাঙ্ক ইউ', 'আকাশ মাটি জল হাওয়া' 'হেড ইয়ে টেল' (Head ya Tail), 'ঝক্কাস', 'আমিও সুপারম্যান' ইত্যাদি। এই প্রযোজনাগুলির আলোচনা স্থগিত থাকল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে।

'সূত্রপাত' প্রযোজিত প্রথম নাটক জয়তী বসু নির্দেশিত মহেশ এলকুঞ্চওয়ার রচিত 'প্রতিবিম্ব' (১৯৯১)। প্রথম নাটকটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন জয়তী বসু কারণ এ নাটকটি সাধারণ আর পাঁচটা নাটকের মতো জনপ্রিয় হবার মতো নাটক ছিল না। মূল মারাঠী নাটক থেকে ইংরেজি অনুবাদ করেন শান্তা গোখলে 'Reflection' নামে; ইংরেজি থেকে বাংলায় জয়তী বসুর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রথম অভিনয় নয় ১৯৯১ সালের ২২ মে কলামন্দির (বি) প্রেক্ষাগৃহে। কুশীলবরা ছিলেন রাহুল সেনগুপ্ত (সে), জয়তী বসু (মহিলা), কুণাল সেনগুপ্ত (ঝাণ্ডা) মধুমিতা ঘোষ (মেয়েটি)। সহযোগীরা ছিলেন রাহুল বসু, শিশির মুখার্জী, রবি মিত্র, তরুণ দাস, রূপা দে। মঞ্চ ও পোশাক : নভেন্দু সেন, সংগীত : মুরারি রায়চৌধুরী, আলো : জয় সেন এবং আলোক নিয়ন্ত্রণ : বাদল দাস। একটি নতুন নাট্যদল এবং কুশীলবরা কেউ তেমন নামীদামী প্রতিষ্ঠিত শিল্পী না হলেও যৌবনের স্পর্ধার জোরে 'প্রতিবিম্ব' প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিল। পত্রপত্রিকায় প্রশংসিত হয় এই নাটকটি— 'একটি নতুন নাট্যদলের কাছ থেকে এতখানি সংবদ্ধ প্রযোজনা দেখতে পাওয়া আশার কথা।'[৫]

মহেশ এলকুঞ্চওয়ারের নাটক রচনার প্রথম পর্বে লিখিত এই নাটকটি তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের নাটকগুলির মতো পরিণত না হলেও এবং নাটকটির কিছু কিছু দুর্বলতা থাকলেও প্রযোজনার গুণে সেই দুর্বলতাগুলি ঢাকা পড়ে গেছে। এই নাটকটির প্রথম প্রযোজনা হয় হিন্দি ভাষায় সত্যদেব দুবের পরিচালনায় 'পদাতিক' গোষ্ঠীর প্রযোজনায়। নাট্যকারের অন্যান্য নাটকে যে বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গি লক্ষ করা যায় এ নাটকে তা অনুপস্থিত এবং এখানে সবকিছুই ব্যাখ্যাত হয়েছে প্রতীকের মধ্য দিয়ে সেই প্রতীকগুলি যথাযথ উন্মোচিত হয় না।

আসলে আধুনিক ভাবনায় প্রতিবিম্ব হারানোর সমস্যা ঠিক মতো দানা বাঁধতে পারেনি কারণ মানুষের জীবনপ্রবাহ বিশেষ করে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্যক্তির যে বিচ্ছিন্নতাবোধ যে জটিলতম আকার ধারণ করে তা ওই প্রতিবিম্ব হারানোর ব্যাখ্যানে কিছুটা যেন স্থূলতার পরিচয় দেয়। এই নাটকটির ক্ষেত্রে যে সমস্যা, তা হল এ নাটকের মধ্যের জটিলতা। যেমন এ নাটকে বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন চরিত্রের মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে — এমনকি নিজের মনের মধ্যেও। এ ধরনের জটিলতা কাটিয়ে এক ধরনের মজা লুকিয়ে আছে 'প্রতিবিম্ব'র মধ্যে। সেই মজাটা ধরতে পেরেছিলেন বলেই সূত্রপাত-এর অভিনেতা অভিনেত্রীরা নাটকটি অভিনয় করার মধ্যে ভিন্নতর আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন।

এই নাটকটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন কাজল সেনগুপ্ত — 'সূত্রপাত'-এর সদস্য ও অভিনেতা। এ নাটকে 'সে' চরিত্রটিকে বাকি চরিত্ররা যেভাবে হেনস্থা করে বা দুর্বল বোকাবুদ্ধির মানুষ চিহ্নিত করে— বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় 'সে' চরিত্রটি বাকি চরিত্রগুলির মতো ছলনা বা ভান আশ্রিত নয়। যেমন 'মহিলা' বলে চিহ্নিত চরিত্রটি সবসময়ে সব কিছু পরিষ্কার করে চলেন কিন্তু তিনি নিজেই অপরিচ্ছন্নতায় আবৃত; আবার 'মেয়েটি' চরিত্রটি অনর্গল প্রেমের কথা বললেও আসলে সে নিজেই প্রেমহীনতায় বাস করছে; ঝাণ্ডা চরিত্রটি আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার পন্থী হলেও নিজেই আদর্শহীনতার শিকার। অর্থাৎ এই তিনটি চরিত্রই যা প্রতিভাত ভেতরে ভেতরে আচরণগত দিক থেকে তার বিপরীত। 'সে' চরিত্রটি বাকি চরিত্রদের কাছে অপাংক্তেয়, বোকা বা 'মাথামোটা' অর্থাৎ সমাজ তাকে তেমনই দেখে। 'সে' অনুভব করে অন্যান্যদের কাছে নিজেকে সে প্রতিবিম্বিত করতে পারছে না। 'সে' বুঝতে পারে কোথায় এদের অন্তঃসারশূন্যতা। তখন সে নিজেকেও ব্যঙ্গ করে তার অস্তিত্বকে ব্যঙ্গ করে এবং আত্মহত্যা করে। মূল জায়গাটা হল এ নাটক সমাজ ও ব্যক্তিমনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব যা খানিকটা ব্যঙ্গের ছলে, ফার্সের আকারে বিধৃত। প্রশ্ন উঠতেই পারে, কেন নাটককার এ নাটকটিকে 'ট্রাজেডি ফার্স' হিসেবেই চিহ্নিত করলেন। আসলে একটা মজার মোড়কে কতটা সত্যি ও ট্র্যাজিক সত্যি প্রকাশ করা যায় তারই একটা পরীক্ষামূলক চিত্র তৈরি করতে চেয়েছেন নাট্যকার। অ্যারিস্টটলীয় বিধিনির্দিষ্ট বাঁধনে বোধহয় এই নাটকটির শ্রেণি বিভাজন সম্ভব নয় কারণ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে সমাজব্যবস্থা। ব্যক্তিমনের নানান ভঙ্গিমায় কোনও একটি নির্দিষ্ট খাতে যেমন প্রবাহিত হয় না জীবন — তেমনি প্রবাহিত হয় না নাট্যের সীমানা।

নির্দেশক কেন এই নাটকটির প্রতি আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন? নির্দেশকের মনে হয়েছিল— সবাই যেন দৌড়চ্ছে। ইঁদুরদৌড় যেন। সেখানে যে মানুষ নিজের achievement-কে সবচেয়ে বড়ো করে দেখায় সেখানেই তার অস্তিত্ব। আর কেউ যদি বলে সে কিছুই করছে না সেখানে তার যেন কোনো গুরুত্বই নেই। এই জিনিসটাই

নির্দেশকের কাছে খুব সময়োপযোগী বলে মনে হয়েছিল। আর ‘প্রতিবিম্ব’-তে এইটেই ছিল মূল জায়গা। জয়তী বসু মনে করেন কেন এত কিছু বলে একজন মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন হয়। নাট্যকার-ও এ নাটকের মূল চরিত্র ‘সে’ চরিত্রটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে, ‘The Protagonist of *Reflection* may not be as big a name as Koestler or Zweig  or plath, he may not be able to translate his Spiritual agony as effectively as any of them, but that does not make him a lesser human being than kafka or any of them, or his tragedy any less than theirs.’[৬]

‘প্রতিবিম্ব’ জয়তী বসুর নির্দেশিত প্রথম নাটক (‘সূত্রপাত’ প্রযোজনা) হলেও  পত্রপত্রিকাগুলি যথেষ্ট সজাগ ছিল এই নাটকটি সম্পর্কে। স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রখ্যাত সমালোচক ধরনী ঘোষ নির্দেশক জয়তী বসু প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন—‘Basu should also realize that a pair of enormous feet extending into a room, almost driving out the occupants, is at once funny and frightening. The theatre of the Absurd boils down to tragic farce, no matter what Elkunchwar may say, and Basu has to lend a sinister edge to the game of the tenant, his landlady, trade unonist friend and importunate female admirer getting into each other’s minds.[৭]

‘প্রতিবিম্ব’ নাটকটি অভিনয় সংখ্যা ছিল ৫-৭টি। তবে এই প্রযোজনাটি নাটককারের বিশেষ পছন্দ হয়েছিল। সত্যদেব দুবে— বিখ্যাত নাট্য পরিচালক তিনি ‘পদাতিক’-র হয়ে এই নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর পরিচালিত প্রযোজনার সঙ্গে নবীন পরিচালক জয়তী বসুর ‘প্রতিবিম্ব’-র প্রতিতুলনায় শেষোক্ত প্রযোজনাটির অধিক প্রশংসা করেছিলেন অনেকেই। এই নাট্য প্রযোজনায় জয়তী বসুর নির্দেশনাপন্থার যে ধরন— তারও প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি সবসময়ই তাঁর অভিনয় সত্তার যে শক্তি সেটাই প্রয়োগ করেন নির্দেশনার ক্ষেত্রে। তিনি ডিজাইনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন না এবং তিনি এ নাটকে মঞ্চসজ্জা নিয়েও বিশেষ কিছু করেননি। কিন্তু একজন অভিনেতা হিসেবে যে সময়ের পরিমিতি বোধ অর্থাৎ timing, যে ছন্দ, যে পরিসর (space)-এর জ্ঞান সেইগুলি প্রযোজনাটিতে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখনও তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ পরিচালক হিসেবে নিজেকে হয়তো প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কিন্তু নির্দেশক জয়তী বসু মনে করেন তাঁর মূল শক্তি হল অভিনয়। যদি ভাল অভিনয় হয় তাহলে আলো কতটা ভাল হল বা সেট কতটা ভাল হল তার দরকার হয় না। প্রথম প্রযোজনা হিসেবে ‘প্রতিবিম্ব’-জয়তী বসুকে নির্দেশকরূপে প্রতিষ্ঠা দেবার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

‘প্রতিবিম্ব’ ছিল সমসাময়িক নাট্যকার মহেশ এলকুঞ্চয়ার রচিত এক আধুনিক ভাবনার নাট্য রূপায়ণ। ‘সূত্রপাত’ দ্বিতীয় প্রযোজনায় নিয়ে এল আধুনিক বাংলা নাট্যের অন্যতম প্রবক্তা বাদল সরকার রচিত ‘বাকি ইতিহাস’ (রচনাকাল : ১৯৬৭) নাটকটি। বাদল সরকার পরবর্তী সময়ে মূলত থার্ড থিয়েটার ফর্মকে গ্রহণ করলেও ‘বাকি ইতিহাস’ রচিত হয়েছিল প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্যই। এর মধ্যে ছিল অ্যাবসার্ড নাটকের ভাবনার রসদও। জয়তী বসুর নির্দেশনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯৯২ সালে। এই নাটকের কাহিনির মধ্যে ছিল অভিনবত্ব। নাটকের মূল কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে দুটি চরিত্র শরদিন্দু ও বাসন্তী। এই দুটি চরিত্রের মুখে দুটি কাহিনি সৃষ্টি হয়—কণা ও সীতানাথ দুটি কাল্পনিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে।

শরদিন্দু—কণা ও সীতানাথ। বাসন্তী— কণা ও সতীনাথ।

কাহিনির দিক থেকে এই নাটকটি যেমন অভিনব তেমনি নাটকীয়তার ক্ষেত্রেও কাহিনির বিভিন্ন স্তরবিভাজন লক্ষ করা যায়। ১৯৬৭ সালে ‘বহুরূপী’ নাট্যসংস্থা প্রথম এই নাটকটি মঞ্চস্থ করে এবং দর্শকদের প্রশংসা আদায় করে। ‘বহুরূপী’র প্রযোজনায় শরদিন্দু ও বাসন্তী, কণা ও সীতানাথ (শরদিন্দু ও বাসন্তী কথিত দুটি ভিন্ন ভিন্ন গল্পে)-এর চরিত্রে একই সঙ্গে অভিনয় করতেন— তৃপ্তি মিত্র ও কুমার রায়। জয়তী বসু ‘বহুরূপী’-র এই প্রযোজনার বাইরে গিয়ে নিজস্ব ভাবনায় গেঁথে দিলেন নাটকটিকে। প্রযোজনার ক্ষেত্রেও নানান ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করার কথা ভাবলেন। প্রথমত, তিনি চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে একজনমাত্র অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে দিয়ে সবকটি চরিত্রে অভিনয় করালেন না। তৃপ্তি মিত্র ও কুমার রায় ‘বহুরূপী’র দীর্ঘদিনের অভিনেতা-অভিনেত্রী কাজ করতে করতে তাঁদের মধ্যে যে সমঝোতা তৈরি হয়েছিল তাকে মঞ্চের ওপর রূপ দিয়েছিলেন তাঁদের অভিনয় দক্ষতায় ও নাট্যবোধে। এক্ষেত্রে জয়তী বসু ‘সূত্রপাত’-এর অনভিজ্ঞ অল্পবয়সীদের দিয়ে যে কাজটা করেছিলেন সেখানে তাদের এককভাবে তিনটি বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার অভিনয় সহজসাধ্য ছিল না। তাছাড়া আরও দুটি কারণে জয়তী বসু তিনটি কাহিনির তিন জোড়া চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন করেছিলেন। কারণ—(১) শরদিন্দু ও বাসন্তী দুইজনার গল্পের দৃষ্টিভঙ্গি দুরকম, একটি নারীর দৃষ্টিতে দেখা অপরটি পুরুষের দৃষ্টিতে দেখা। এ কারণে চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। (২) শরদিন্দু ও বাসন্তীর কাহিনি ছাড়াও শরদিন্দু বর্ণিত কাহিনিতে বুদ্ধিগ্রাহ্যতা এবং বাসন্তী বর্ণিত কাহিনিতে আবেগময়তার প্রাধান্য। অতএব মূলগত দুটি গল্পের যথাযথ নাট্যরূপায়ণের জন্য নির্দেশক আলাদা আলাদা অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন করেছিলেন।

মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে মঞ্চসজ্জার জন্য অতিরিক্ত কিছু করার প্রবণতা নির্দেশকের মধ্যে লক্ষ করা যায়নি।

বাড়িতে ঢোকার ক্ষেত্রে কুশীলবের মনোভঙ্গি দেখাবার জন্য তিনি সামান্য একটু সময় ও পরিসর (time and space) ব্যবহার করেছিলেন। যেমন সাধারণত বাড়িতে ঢুকলে উইংস-এর পাশ দিয়ে ঢোকা হয়। এক্ষেত্রে জয়তী বসু একেবারে উইংস-এর পাশে নয়, স্টেজের একটু ভেতরে, একটা দরজার ফ্রেম রেখে দিয়েছিলেন আর দুটো ধাপের একটা সিঁড়ি। যে চরিত্রে যখন বাইরে থেকে ঢুকছে উইংস-এর পাশ দিয়ে এসে দরজায় আসা পর্যন্ত তার মনের গতির একটা সন্ধান করা যায়। মনের পরিবর্তনটা দেখানো হত। সে যে টেনশনে আছে কি নেই? ফ্রেমে দাঁড়ালে বেল বাজত এবং বেল বাজানোর কোনো অভিনয় করা হত না। ওই ট্রানস্লেশনটার দরকার নেই বলেই মনে করেছিলেন নির্দেশক। বিষয়টি এই ভাবে আধুনিক দৃষ্টিতেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রযোজনার ক্ষেত্রে মঞ্চ, আলো, পোশাক ইত্যাদির চেয়ে অভিনয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন জয়তী বসু। 'বাকি ইতিহাস' নাটকেও একটাই সেট-এর মধ্যে আলো ও অন্ধকারকে ব্যবহার করে এক একটি গল্পের দৃশ্যপট তৈরি করেছেন। সেট্টা ছিল শরদিন্দু বাসন্তীর বাড়ির। যখন শুরু হত বাসন্তী কথিত কণা সীতানাথের গল্প তখন সেট্টা সরত না। 'অদল-বদলও হত না বা হত। Stage right-এ (স্টেজের ডানদিকে) যে জিনিসগুলো রাখছি Stage Left-এ যে জিনিসগুলো রাখছি তার মধ্যে একটা অবস্থানগত তফাৎ থাকছে। সেটা আবার Match-ও করে যায় শরদিন্দুর বাড়িতে। বাসন্তীর গল্পে কণা ও সীতানাথ একটু ঘরোয়া তাই তাদের আসবাবের মধ্যেও একটা সাধারণ পরিবারিক আদল থাকে। আর শরদিন্দু বর্ণিত গল্পে সীতানাথ ও কণার সামাজিক অবস্থান তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী পরিবারের ধরনটা থাকে। যখন বাসন্তী লিখতে শুরু করল তখন পুরোটা অন্ধকার শুধু বাসন্তীর ওপর আলো। আস্তে আস্তে আলোটা কমে গিয়ে নতুন গল্পের আলোর মুড চলে আসে।'[৮] কুশীলবরাও ভিন্ন ভিন্ন বলে গল্প শুরু করতে বেশি সময় লাগে না। বাসন্তীর লেখা গল্পে আলোর মধ্যে একটা রঙিন ভাব থাকে যেহেতু গল্পের মেজাজটা তাই। আর শরদিন্দুর গল্পে মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাপ্রসূত তাই মঞ্চেও থাকে আলো-আঁধারি পরিবেশ। শরদিন্দু কথিত গল্পের কণার চরিত্রে অভিনয় করতেন জয়তী বসু। সেক্ষেত্রে চরিত্রটিকে বাস্তব করে তুলতে তিনি অনেক সময়ই Pause, Silence ব্যবহার করেছেন। সীতানাথের সঙ্গে তার বাইরে আসা — যে আশ্লেষ তা তিনি অনুভব করে প্রকাশ করতেন। অভিনয় করতে করতে ওই মুহূর্তটাকে তৈরি করার মধ্যে আনন্দ পেতেন অভিনেত্রী নির্দেশক জয়তী বসু। সেই বিবাহ পরবর্তী সময়ের কণার আশ্লেষকে ধরবার চেষ্টা করতেন দশ বছর পর যখন আবার সেই গল্পটা বলতেন তখন। তাঁর অভিনেত্রীসত্তা প্রায়শই নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁর নির্দেশকসত্তাকে — একথা তিনি যেমন স্বীকার করেন তেমনি তাঁর নাট্যকর্মের মধ্যে দিয়েও তা প্রকাশ পায়।

জয়তী বসু বাংলা মঞ্চে নির্দেশক হিসেবে নিজের জায়গাটি আরও দৃঢ় করে তুললেন বাঙালি দর্শকের কাছে গ্রিপস থিয়েটারের ধারাকে পৌঁছে দিয়ে। জয়তী বসুর নাট্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে গ্রিপস থিয়েটার ফর্ম একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। তিনি যেমন বাঙলার দর্শকের সঙ্গে এই ফর্মের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন তেমনি জার্মানির আমন্ত্রণে সে দেশের থিয়েটার ফর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন— পরপর দুবার তিনি গ্রিপস থিয়েটার সংক্রান্ত কাজে ভ্রমণ করেছেন সেই দেশ।

জার্মানিতে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে গ্রিপস নাট্যধারার উদ্ভব। একঝাঁক যুক্তিবাদী রাজনৈতিক লেখককুল, সঙ্গীতকার, কুশীলব একত্রিত হয়ে তৈরি করেছিলেন গ্রিপস্ থিয়েটার ধারা। এঁদের মূল লক্ষ্য ছিল শিশুদের সমস্যাকে তুলে ধরা। ফোলকার লুডভিগ এই ধরনের অনেকগুলো নাটক লিখলেন এবং পরিচালনা করলেন। তাঁর মতো মানুষেরাই নেতৃত্বে দিলেন এই নাট্য আন্দোলনকে। জার্মানিতে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়টাতে শিশুরা ছিল সবচেয়ে চাপে থাকা সম্প্রদায়, দমিয়ে রাখা, অবহেলিত, অযত্নে বড়ো হওয়া, স্কুলের রুটিনের চাপে দমবদ্ধ হওয়া শিশুর দল। জার্মান ভাষায় গ্রিপস্ থিয়েটার এই অর্থই বহন করে যে Grappling with Problem—যার লক্ষ্য হল ছোটোদের যা প্রাপ্য তা ফিরিয়ে দেওয়া। তাদের প্রশ্ন করার, প্রত্যুত্তর দেবার, ভুল করার অধিকার আছে। তাদের জগতে যে পরীরা ছিল, রাক্ষস খোক্ষসের দল ছিল তারা আর রইল না। গ্রিপস থিয়েটার শিশুদের বদলে দিল অনেক কিছুই। তাদের জীবনের অনেক জরুরি বিষয় উঠে এল মঞ্চে। ছোটোদের নাটকে জায়গা করে নিল বাবা-মায়েরা, শিক্ষক, পুলিশ প্রমুখ বিচিত্র ধরনের মানুষ। নাটক মানেই আর রূপকথার জগত নয়— অন্য আরেক জগৎ, চেনা অথচ অচেনা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা জগত। এই থিয়েটার ফর্ম মূলত ছোটোদের পৃথিবীটাকে নিয়েই চিন্তাভাবনা করে। বড়রা তাদের ইচ্ছে মতো বেড়ে উঠতে দেয় না— তাদের মতো করে বড়ো হবার শাসন চালায়। ছোটোরা কীভাবে বড়োদের সঙ্গে বা তাদের নিজেদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে— বড়োদের তৈরি করা বাধ্যতামূলক ছকটা ভেঙে ফেলতে পারে— তারই একটা প্রচেষ্টা থাকে এই থিয়েটারের গঠনে।

জার্মানির গ্রিপস থিয়েটার আন্দোলনের প্রবক্তা ও পরিচালক ফোলকার লুডভিগ-এর ব্যাখ্যান অনুসারে — ‘If a play achieves cathersis through Crying, with the tears fly away your emotions. On the other hand, if you laugh, your emotions stay with you. It makes you think.’[৯]

গ্রিপস থিয়েটার ফর্মে ছোটোদের ভূমিকায় অভিনয় করে বড়োরা। তাদের মুদ্রাদোষ, অভিব্যক্তি, সংলাপ সবকিছুই খুব স্বাভাবিকভাবে স্বচ্ছন্দে নাটকের মধ্যে উঠে আসে। অভিনেতাদের লক্ষ্য থাকে

এমনভাবে কথা বলা বা সংলাপ বলা যা ছোটোরা সহজে বুঝতে পারে। এই ধরনের নাটক কিন্তু যথার্থভাবে ইতিবাচক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারল। শুধু দর্শক নয় যাঁরা অভিনয় করলেন তাঁরাও একটা ভিন্ন স্বাদ পেলেন। গ্রিপস থিয়েটারের আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল যে নাটকের বিষয় যত কঠিনই হোক না কেন তার উপস্থাপনা হবে হাস্যরসাশ্রিত। অনেক মজা আর গানবাজনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে নাট্যগতিধারা।

জার্মান ভাষায় 'গ্রিপস্' শব্দটার অর্থ হল 'a quick graps of a situation' অথবা Coming to grips with a challenging situation'—অর্থাৎ পরিস্থিতিকে খুব শীঘ্র নিজ আয়ত্তের মধ্যে বেধে ফেলা। গত শতাব্দীর আশির দশকে ইউরোপীয় এই ধারাটিকে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন ভারতীয় থিয়েটারের অগ্রণী পুরুষ মোহন আগাসে। পুনাতে তিনি এই থিয়েটার ফর্ম নিয়ে একটি ওয়ার্কশপ করান যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন গ্রিপস থিয়েটার কর্মীরা।

গ্রিপস থিয়েটার ফর্মে জয়তী বসু প্রথম মঞ্চে নিয়ে এলেন ফোলকার লুডভিগ-এর রচনা 'Max and Minnie' অবলম্বনে 'Care করি না'। বাংলা ও ইংরেজি হরফের মিশ্রণে তৈরি নামকরণের সূচনা থেকেই তৈরি থাকে অভিনবত্বের বাতাবরণ। বিখ্যাত নাট্য পরিচালক উল্ফগ্যাঙ্গ কোলনেডর ভারতে এসে মারাঠী adaptation-এ এই 'Max and Minnie' নাটকটি করিয়েছিলেন। অঞ্জন দত্ত এই নাটকটি অবলম্বনে নির্মাণ করেছিলেন রক অপেরা 'কর্ড লাইন'। জয়তী বসু 'Care করি না' মূল নাটকটিকে অনুসরণ করলেও রক বা জ্যাজের প্রভাব মুক্ত রেখে জুড়ে দিলেন মজাদার ছন্দের কিছু গান। এ নাটকের কেন্দ্রে আছে দুটি মুখ্য চরিত্র— তাতা ও ওলি। দাদা ও বোন। এদের মা ছোটোবেলা থেকে তাদের একার দায়িত্বে মানুষ করেছেন বলেই বোধহয় আর সাধারণ পাঁচজন মায়েদের চেয়ে একটু বেশি মাত্রায় সচেতন। যেহেতু 'সিঙ্গল মাদার' তাই শাসনের মাত্রাটাও যেন বেশি। বোন ওলি টেলিভিশন দেখতে খুব ভালোবাসে কিন্তু সেক্ষেত্রে মায়ের নিষেধাজ্ঞার চাপ থাকে বেশি। বেশি টিভি দেখা— কিংবা বাইরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রেও তৈরি হয় নিয়ম নিষেধের বেড়াজাল। এরই মধ্যে শাসন সোহাগের চাপান উতোরে দিনাতিপাত করে সংসারের সদস্যরা— জয়তী বসু শাসনের দমবন্ধ পরিবেশে দুই ভাইবোনকে আটকে রাখেননি— দিয়েছেন তাদের প্রতিদিনের আনন্দ মজায় দিনযাপনের পরিসরও। তাই দু-ভাই বোনের থাকার জায়গাটাও ভারী সুন্দর—। তাতা ও ওলির ঘরে ব্যাঙ্ক খাট। এই দুই ভাই বোনের জগতে এসে পড়ে রবি। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এক মোটর মেকানিকের ছেলে রবির। অর্থাৎ তাতা ও ওলিদের শ্রেণির সঙ্গে ভিন্ন শ্রেণির একটি বাচ্চাকে মিশিয়ে দিয়ে বড়োদের আভিজাত্য, শাসন, বিধিনিষেধকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। বড়োরা যে শ্রেণিগত বৈষম্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় ছোটোদের অভিধানে তার কোনও জায়গা নেই। অনায়াসে

তাতা রবি ওলি খেলার জগতে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

গ্রিপস থিয়েটার ফর্মে ছোটোদের চরিত্রে অভিনয় করে বড়োরা। তাই বারো তেরো বছরের তাতার চরিত্রে স্বচ্ছন্দে অভিনয় করে প্রাপ্তবয়স্ক সুজন মুখোপাধ্যায় বা দশ-এগারো বছরের ওলির চরিত্রে স্নাতকোত্তরের ছাত্রী সাহানা। দুই ভাইবোনের ঝগড়াঝাটি, খুনসুটি, শব্দের খেলা, মজা, গান— বয়সের বাধা মানে না বরং অভিনয়ের অভিজ্ঞতায় আরও বেশি স্বচ্ছন্দ সাবলীল রাখে চরিত্র দুটিকে। দুই সন্তানের জননীর চরিত্রে জয়তী বসুর অভিনয়ও অত্যন্ত সাবলীল। ক্ষয়াটে বখাটে রবির চরিত্রে অনিন্দ্য ব্যানার্জীকে যেমন মানিয়েছে তেমনি এই ধরনের চরিত্র ওলিদের বাড়ির পরিবেশের মধ্যে একটা কনট্রাস্ট বা বৈপরীত্যের রঙ নিয়ে এসেছে।

একেবারেই একটা নতুন নাট্যাঙ্গিক নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে জয়তী বসুর ঝুঁকি ছিল যথেষ্ট। কিন্তু নির্দেশক হিসেবে তিনি কোথাও সমঝোতা করতে চাননি। তাঁর দক্ষতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর পরিশ্রমসাধ্যতাকে। অনেকগুলো মুহূর্ত সৃষ্টিতে তাঁর নাট্যনির্মাণের মুন্সিয়ানা প্রকাশ পায়। নাট্যসমালোচক পবিত্র সরকার লেখেন 'তাতার ব্যাংক বেডের একতলাকে আলিবাবার গুহা হিসেবে কল্পনা, ওলির স্কুল বাসের ছেলেমেয়েদের মতো তীক্ষ্ণ চিৎকারে স্বাভাবিক কথা বলা, তার ঠোঁট-ওল্টানো আর চোখ-পাকানো, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়, বিছানার চাদর ইত্যাদি চমৎকার তালগোল পাকিয়ে ভাঁজ করা ইত্যাদি নানারকম চমৎকার মঞ্চক্রিয়া দিয়ে জয়তী এই শিশুদের পৃথিবী নির্মাণ করে দিয়েছেন।'[১০] এই নাটকের মঞ্চসজ্জাতেও নির্দেশকের মুন্সিয়ানা ধরা পড়ে। ছোটোদের ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে বাংক বেডটির পরিকল্পনা নাটকটির সঙ্গো সুন্দরভাবে মিশে গেছে। বেডটি দুই ভাইবোন নানান ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে। কখনো পার্কের খেলবার বা ঝোলবার জাংগল জিম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। আলো মঞ্চ উপকরণ এবং অভিনয়— নাটকের সবকটি দিকেই ছিল নির্দেশকের তীক্ষ্ণ মনোযোগী পরিশ্রমসাধ্য দৃষ্টি এ ধরনের প্রযোজনা যথেষ্ট কঠিন কাজ ছিল। এছাড়া একেবারে নবীন অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে এরকম একটি জটিল ভাবনার স্তরকে সুন্দর সহজভাবে পরিবেশনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করা নিঃসন্দেহে জয়তী বসুর কাজের মাইলস্টোন হিসেবে পরিগণিত হবার যোগ্য। এ নাটকে গানের ব্যবহার ভিন্ন একটা জায়গা নিয়েছিল যেমন 'Care করি না' কিংবা 'টেলি পাগলি'। ভয়ের প্রসঙ্গে নির্মাণের ক্ষেত্রে জয়তী বসুর 'Care করি না' বাংলা নাট্যে একবারেই এক অভিনব সংযোজন। একেবারেই একটি নতুন ফর্মকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করানোটা যেমন কঠিন কাজ তেমনি কঠিনতর হল সেই প্রযোজনাটি জনপ্রিয় করে তোলা বা দর্শকের মনোগ্রাহ্য করে তোলা। ফলত জয়তী বসুকে একাধারে দুটি দায়িত্ব পালন করতে হল। জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গে বলা যায় যে 'Care করি না' নাটকটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা

অর্জন করেছিল এবং দুশো রজনীর মতো অভিনয় হয়েছিল।

'Care করি না'-র পরই সে প্রজেক্ টির সঙ্গে জয়তী বসু যুক্ত হলেন সেখানেও তিনি কাজ করলেন গ্রিপস্ থিয়েটার ফর্ম নিয়েই। ম্যাক্সমুলার ভবনের সহযোগিতায় উল্ফগ্যাঙ্গ কোলনেডর পরিচালনা করলেন ফোলকার লুডভিগ-এর 'Trummi in Pieces' নাটকের অনুবাদ 'রোবট কুপোকাৎ' (১৯৯৪)। জয়তী বসু এ নাটকে ছিলেন সহযোগী পরিচালক।

'রোবট কুপোকাৎ' নাটকটি মূলত চারজন কিশোর কিশোরীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে তিনজন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা আর একজন অত্যন্ত ধনশালী পরিবারের সন্তান ববি। যার বাবা খেলনা কোম্পানির মালিক। এরা চারজন সহপাঠী হলেও এদের মধ্যে শ্রেণিগত বৈষম্যের একটা আড়াল আছে নিজেদের অজান্তেই। এরা তিনজনে ববির সমকক্ষ হতে চায় না ঠিকই কিন্তু তার জীবনযাত্রার বিলাসবহুল দিনাতিপাতের প্রতি তাদের একটা বাড়তি আকর্ষণ আছে। তাই ববির সাইকেল চড়ার জন্য তার বইশুদ্ধ ভারী ব্যাগ বহন করতেও তারা রাজী। শ্রেণিগত উচ্চতা থেকে ববিও বিষয়টি উপভোগ করে। বাবার কোম্পানির তৈরি আধুনিক প্রযুক্তির তৈরি দামী দামী খেলনা দেখিয়ে সাধারণ পরিবারের এই ছেলেমেয়েদের প্রলোভিত করে। সহপাঠী হলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য এদের বন্ধুত্বের মধ্যে একটা আড়াল তুলে দেয়। নাটকের আসল সমস্যা তৈরি হয় যখন ববির বাবার খেলনা কোম্পানির তৈরি একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্মিত 'শ্যামস রোবট' নিয়ে ববি চমৎকৃত করে তার বন্ধুদের। রাহুল—যার মা ববির বাবার কারখানার কর্মচারী, সেই রাহুল তার টিফিনের বাঁচানো পয়সার বিনিময়ে ববির রোবটটি বাড়িতে নিয়ে আসে। নানান কারণে রাহুলের জন্য ববির রোবটটির 'Voice-box' খারাপ হয়ে যায়। চিন্তিত হয়ে পড়ে রাহুলের মা—কারণ রোবটটি যথাযথভাবে ফিরিয়ে দিতে না পারলে আটশো টাকা জরিমানা দিতে হবে। সে কারণেই রাহুলের মা কোম্পানি থেকে 'Voice-box' চুরি করে এনে রোবট সারিয়ে রাখেন— নানান দিকে সমস্যা ছড়িয়ে পড়ে। রাহুলের মায়ের চাকরি নিয়ে শুরু হয় টানাপোড়েন। নাটকের শেষে গল্প অন্যপথে বাঁক নেয়। অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরীদের চিন্তার কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায় তাদের বাবা-মায়ের সমস্যা। একটি সামান্য খেলনাকে কেন্দ্র করে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় জীবনের গভীরতম সমস্যার মর্মমূলে পৌঁছে যায় সেই সমস্যার অভিঘাত। বাবা-মায়ের শাসন তর্জন গর্জনেরও যে কারণ থাকে, তাদের মানসিক অস্থিরতা যে অযৌক্তিক নয়, বাবা-মায়েদের নিজেদের সম্পর্কেও থাকে নানান টানাপোড়েন— এ সবই ছোটোরা বুঝতে শেখে ধীরে ধীরে। তিনজন কিশোর-কিশোরী একসঙ্গে নেমে পড়ে রাহুলের মায়ের চাকরিটা ফিরে পাবার লড়াই-এ। সে চেষ্টা বিফল হলে আরও বড়ো একটা শিক্ষা তারা পেল তা হল নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিল,

তারা আর ববির সঙ্গে খেলবে না, ববির সঙ্গে বন্ধুত্বও রাখবে না। ববির প্রতি তাদের এই অনীহা ববিকেও শিক্ষা দিল। ববি তার বন্ধুদের সঙ্গ পেতে আকুল। আসলে শুধু দামী খেলনা, প্রযুক্তির উন্নতি, স্বাভাবিক কৈশোরের পথে বাধা হতে পারে না। জীবন্ত কৈশোর মানুষের সঙ্গ চায়, উষ্ণতা চায়, বন্ধুত্ব চায়। দেখা যায় অবশেষে ববির বাবা বাধ্য হন রাহুলের মায়ের চাকরিটা ফিরিয়ে দিতে।

অনেকগুলো দিক থেকে নাটকটি বিশ্লেষিত হতে পারে—

(১) কিশোর-কিশোরীরা বয়সে ছোটো হলেও বড়োদের সমস্যা বুঝতে ও সমাধান করতে পিছপা হয় না।

(২) প্রত্যেকটা শিশুরই খেলনার ওপর বাড়তি আকর্ষণ থাকে। তা যদি হয় আধুনিক প্রযুক্তির দামী মনোগ্রাহী চমকে দেওয়া খেলনা। কিন্তু তারাই আবার সেই প্রলোভনকে জয় করতে পারে যখন দেখে নিজেদের আত্মমর্যাদা, বাবা-মায়ের সম্মান ভূ-লুণ্ঠিত হয়।

(৩) ছোটোদের দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটি একরকম ভাবে ব্যাখ্যাত হয় আবার বাবা-মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়। যেমন দেখা যায় যে চরম সংকটকালেও রাহুলের মা একক মাতৃত্বের সাহসিকতায় ব্যক্তি-যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করে সন্তানকে আগলে রাখেন।

নির্দেশনার দিক থেকেও এই নাটকটির কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় চার জন কিশোর-কিশোরীর গল্পের ভেতর দিয়ে নাটককার-নির্দেশকের যৌথ প্রচেষ্টায় মজা গান হাসি হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত গভীর এক সমস্যাকে এবং সমস্যার সমাধানও তৈরি হয় সাবলীল পর্যায়ে। জয়তী বসুর নাটকে নানান কম্পোজিশনের মধ্য দিয়ে নানান ছবি তৈরি করেন। যেমন মঞ্চ জুড়ে রোবটের হাত-পা-ধড় খুলে ফেলে খেলতে থাকে— গান গাইতে থাকে। রাহুল নিশা তমালীরা সমবেত উল্লাসে গেয়ে ওঠে 'সবাই খেললে পরে দারুণ মজা সবচেয়ে মজা' কিংবা রাহুল ও রাহুলের মায়ের কম্পোজিশনে চমৎকার একটি গান 'তুমি কাজ করে যাও শুধু খেটে মরে যাও—' ঘরের মধ্যে তখন মায়াবী এক আলোয় তৈরি হতে থাকে মা-ছেলের সম্পর্কের ভালোবাসার এক দৃশ্যায়ন। নির্দেশক হিসেবে জয়তী বসুর ভাবনা-চিন্তার গতিপথ চিরাচরিত পথে হাঁটেনি। এ নাটকে জয়তী বসু সহযোগী নির্দেশক হলেও বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন— প্রথমত, তিনি কিশোর কিশোরীদের ভূমিকায় তাদের দিয়ে অভিনয় করালেন যারা বয়সের ক্ষেত্রে কৈশোরের সীমা অতিক্রম করে যৌবনের সীমানায় পৌঁছে গেছে। ফলত তাদের অভিনয়ের ধরন বা বাচনভঙ্গি কেমন হবে তা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য প্রতিনিয়ত একটা চর্চা বা নিরীক্ষা চলতে থাকে। দর্শক তাদের গ্রহণ করলে তবেই এই প্রভূত প্রচেষ্টার সাফল্য। দ্বিতীয়ত, এ নাটকে গানগুলি তিনি ব্যবহার করলেন তার কথা বা সুর আমাদের পরিচিত সুর বা কথার থেকে স্বতন্ত্র। এই ধরনের সুরে বিদেশি সুরের যে প্রভাব নাটকের

বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তা দর্শকের কতটা ভালো লাগবে বা লাগবে না সেটাও একটা চ্যালেঞ্জ বা পরীক্ষা।

'রোবট কুপোকাৎ'-এ জয়তী বসু দেবাংশু সেনগুপ্তকে নির্বাচন করেছিলেন গানের কথা ও সুর করবার জন্য। নাটকের বিষয়ের সঙ্গে গানগুলি সাযুজ্য রেখে নাট্যের গতিকে সচল রাখতে পেরেছিল এবং সুর ও কথার অভিনবত্বে দর্শককেও আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছিল। মঞ্চনির্মাণ ও আলোক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে প্রভাব থাকে নির্দেশকের কারণ তাঁরই ভাবনার প্রতিফলন ঘটান আলো বা মঞ্চ পরিকল্পক। 'Care করি না' বা 'রোবট কুপোকাৎ'— দুটি নাটকে গ্রিপস্ ফর্মকে ব্যবহার করে দর্শকচিত্ত জয় করতে পেরেছিলেন জয়তী বসু।

সাম্প্রতিককালে ক্রমবর্ধমান পণ্যসর্বস্বতা এবং ক্রমশ বেড়ে ওঠা আকাঙ্ক্ষার বীজ অনেক সময়েই সন্তান ও পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি করে। তবে একমাত্র শিশুরাই বোধহয় সক্ষম হয় অবহেলায় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে প্রলোভনের জগৎটা দূরে সরিয়ে রেখে এই সমাজটাকে বাঁচিয়ে তুলতে। দামী খেলনা রোবট যার মধ্যে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির নানা কৌশল তাকে সরিয়ে সামান্য কাঠের পাটাতন বা টুকরো নিয়ে খেলা করতেও তারা উৎসাহী। এভাবেই তারা শ্রেণিগত বৈষম্য ভেঙে উঁচুকে নিচুতে বা বলা ভালো সমস্তরে টেনে আনতে পারে। নিজেদের রায় বর্তাতে পারে অহঙ্কারী ঔদ্ধত্যের ওপর। স্বেচ্ছাচারী মালিককেও বাধ্য করার শক্তি রাখে। বিষয়গত দিক থেকে 'রোবট কুপোকাৎ' সমাজে একটা ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছে। সেইখানেই নাটকের সার্থকতা।

'Care করি না' এবং 'রোবট কুপোকাৎ'—নাটক দুটির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রিপস্ থিয়েটার সম্পর্কিত কয়েকটি জরুরি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখের প্রয়োজন আছে। গ্রিপস্ থিয়েটার ফর্মের অভিনয় পদ্ধতির প্রথম শর্তই হল দক্ষতা। অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক অভিনেতারা অভিনয় করেন ছোটোদের চরিত্রে। মূলত এই নাটকগুলি ছোটোদের আনন্দ দেবার জন্য তৈরি হলেও মূল বার্তার লক্ষ্য কিন্তু বড়োরা। ছোটোদের চোখ দিয়ে বিশ্লেষিত হচ্ছে বড়োদের জগৎ। একই সঙ্গে উঠে আসছে ছোটোদের সমস্যাগুলোও ছোটোরাই পুরো বিষয়টি ভেঙে চুরে দেখে সমাধানসূত্র খুঁজে বের করছে। এই রকম একটা অভিনব বিষয় ও আঙ্গিককে জয়তী বসু স্থাপনা করলেন বাংলা নাট্যের কাঠামোয়।

প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম এবং Workshop করার প্রয়োজন হয় এই গ্রিপস্ থিয়েটার ফর্ম-এর নাটক মঞ্চায়নে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক অভিনেত্রীকেও অনেক সময় ফ্রিল দেওয়া ড্রেস পরে বাচ্চাদের মতো করে

সংলাপ বলা অভ্যাস করতে হয়। তবে ছোটোদের ভাবটাকে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়— তাদের নকল করা নয়। এই নাট্যাঙ্গিকে অভিনেতার দায়িত্ব থাকে সম্পূর্ণ পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। 'রোবট কুপোকাৎ' ও 'Care করি না'-র নির্দেশক জয়তী বসুও এ নাটক দুটি অনুবাদ করেছেন নিজে অভিনয়ও করেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। তাঁর মতে যখন অভিনয় করা হয় তখন একটা সম্পূর্ণ পরিবেশ প্রতিবেশ মধ্যে ঢুকে পড়তে হয়। জয়তী বসুর অভিমত—'While acting, we try to get into the situation. We try to develop an attitude towards the problem at hand, from a childs point of view'.[১১] — দূর্বা দত্ত এই নাটকে যিনি তমালির চরিত্রে অভিনয় করেছেন– তাঁর মতে 'I don't identify with the character as such, but believe in the character—I'm acting out.'[১২]

গ্রিপস থিয়েটারের জন্য নির্দিষ্ট যে প্রেক্ষাগৃহ জার্মানিতে সেখানে দর্শকাসনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। গ্যালারি ওপর থেকে নীচে নেমে গেছে। মূল মঞ্চটা নীচে অবস্থিত। অর্থাৎ যে ছোটোদের জন্য গ্রিপস থিয়েটার— সেই ছোটোরা ওপর থেকে লক্ষ করে নীচে মূল মঞ্চে কি ঘটছে। অর্থাৎ ছোটোদের অবস্থানটা ওপরে আর বড়োরা যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁদের অবস্থান নীচে। পুনাতে গ্রিপস্ থিয়েটারের ২৫ বছর পূর্তি উৎসব (১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়)— যখন পুনার থিয়েটার আকাদেমিতে আয়োজিত হয় সেখানে দর্শক ও কুশীলবের মধ্যে এই অবস্থানগত একটা ফারাক তৈরি করা হয়েছিল।

১৯৯৪ সালেই জয়তী বসু ম্যাক্সমুলার ভবনের উদ্যোগে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন একজন Observer হিসেবে। সেটাই তাঁর জীবনে আশীর্বাদ হিসেবে এসেছিল। থিয়েটারের ক্ষেত্রে তাঁর যে অন্বেষণ তাঁর চলছিল নিরন্তর— তারই একটা হদিশ মিলল গ্রিপস থিয়েটার দেখার পর। তাঁর থিয়েটারের জগৎটা উন্মুক্ত হয়ে গেল— এবং আগামী কয়েকটা বছর তিনি কাজ করে যেমন আনন্দ পেলেন সেই আনন্দ ছড়িয়ে দিলেন বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যের দর্শকের কাছে। তাঁর নিজের কথায়—'কোলনেডর রিহার্শাল করাচ্ছেন। সেই দেখতেই যাওয়া। এইটে ছিল খুব interesting—আমি যেটা খুঁজছিলাম সেটা পেলাম। আমি যার জন্য ডিরেক্টর হতে চেয়েছি এইটা সেই থিয়েটার।'[১৩]

গ্রিপস্ থিয়েটার ফর্মে 'Care করি না' এবং 'রোবট কুপোকাৎ'-এর পর আরও নাটক তিনি পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে গ্রিপস ফর্ম কেন্দ্রিক 'No Future?? No Thank U!!' জয়তী বসুর রূপান্তরে ফোলকার লুডউইগ-এর 'Alles Plastik' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়— মূলত ক্রমশ ভেঙে পড়া জার্মান পরিবারগুলোর সমস্যা, বয়ঃসন্ধি পেরোনো ছেলেমেয়েদের আততি সংশয়— এই বিষয়গুলি উঠে এসেছে

নাটকে। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে পশ্চিম জার্মানির ১৩-১৯ বছর বয়সীদের যে সমস্যা তা কলকাতার সমাজে বা বাংলার সমাজভাবনায় কতখানি প্রযোজ্য? তবে ম্যাক্সমুলার ভবনের সহযোগিতায়, নির্দেশক জয়তী বসুর এই থিয়েটার ফর্ম নিয়ে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় জমে উঠেছিল ‘No Future?? No Thank U!!’।

## সীমা মুখোপাধ্যায় (১৯৫৯)

বাংলা রঙ্গমঞ্চের নারী নির্দেশকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে নাট্য পরিচালনার কাজ করে যাবার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন বা নজির সৃষ্টি করেছেন সীমা মুখোপাধ্যায়। নাটক লেখা, অভিনয় ও নাট্যনির্দেশনার মধ্য দিয়ে ক্রমশ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং একই সঙ্গে নাট্যদল চালনার দায়িত্ব পাশাপাশি বহন করে চলেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাটক নিয়ে স্নাতকোত্তর করেন এবং প্রথম বিভাগে প্রথম হন। মূলত ‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করেই তাঁর নাট্যজীবনের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। প্রথমে নাটকের নাট্যরূপ প্রদান, অভিনয় এবং ক্রমশ নাট্যনির্দেশনার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। একজন নাট্যপরিচালকের যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা বাঞ্ছনীয় সেই বৈশিষ্ট্যগুলি সীমা মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে লক্ষণীয়। নাটক নির্বাচন, অভিনয় শিক্ষা, বহুজনকে নিয়ে কাজ করবার প্রবণতা, দলগত নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাবার মানসিকতা, প্রভূত পরিশ্রম করার দৃঢ়তা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা—এসব বৈশিষ্ট্যই তাঁর মধ্যে লক্ষ করা গেছে। তিনি কখনোই নাটকের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাননি— দীর্ঘদিন ধরে নাট্য পরিচালনার কাজ তিনি নিয়ম মাফিক করে চলেছেন। প্রত্যেক বছরে তাঁর নির্দেশনায় এক বা একাধিক নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে—এই কৃতিত্ব বহু নারীনির্দেশক-ই অর্জন করতে সক্ষম হননি। তাঁদের নাট্যনির্দেশনা সংক্রান্ত কাজে ছেদ পড়েছে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই হোক।

সীমা মুখোপাধ্যায় ‘রঙরূপ’ গোষ্ঠীতে যুক্ত হবার সময় এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন সীমা মুখোপাধ্যায়ের শ্বশুরমশাই গৌতম মুখোপাধ্যায়। তিনিই ছিলেন ‘রঙরূপ’ গোষ্ঠীর কর্ণধার ও নাট্যনির্দেশক। ১৯৬৯ সালে ‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠীর সূচনা। গৌতম মুখোপাধ্যায় নির্দেশনা ও লেখা নাটকের মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে ‘রঙরূপ’ নাট্যগোষ্ঠী। তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলি হল— ‘একে একে শূন্য’ (১৯৬৯), ‘মিছিল’ (১৯৭২), ‘কণ্ঠস্বর’ (১৯৭৯) ইত্যাদি। এরপরই গৌতম মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় ‘কাদম্বরী’ (১৯৮২) মূল সংস্কৃত (বাণভট্ট) থেকে বাংলা রূপান্তর করেন কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী। যে শৃঙ্খলা ও কৌলিন্য রক্ষা করে ‘রঙরূপ’ গোষ্ঠীর জন্ম ও পথচলা সেই ঐতিহ্যকেই বহন করে নিয়ে চলেছেন সীমা মুখোপাধ্যায়। অভিনয় ছাড়া নাট্যনির্মাণ কর্মে ‘রঙরূপ’-এর পঞ্চম প্রযোজনা থেকে পাওয়া যায় সীমা মুখোপাধ্যায়কে। সুবোধ

ঘোষের গল্পের নাট্যরূপ দেন তিনি। 'অন্ধকারের রঙ' একাঙ্ক নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯৮৪ সালে গৌতম মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত নাট্যনির্মাণ ও নাট্যনির্দেশনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন 'রঙরূপ' নাট্যগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। পরবর্তী সময়ে অন্যত্র নাট্যপ্রশিক্ষণ ও নাট্যনির্দেশনার কাজেও যুক্ত হয়েছেন। 'রঙরূপ'-এর হয়ে শিশুনাট্য পরিচালনাও তাঁর নাট্যনির্মাণের আরও একটি দিক। 'রঙরূপ' গোষ্ঠীতে সীমা মুখোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতির একটি সারণী এইভাবে উপস্থাপিত করা যায় :

সীমা মুখোপাধ্যায় : নাটককার ও নাট্য নির্দেশক, প্রযোজনা : রঙরূপ গোষ্ঠী

| **প্রযোজনা** | **নাটককার** | **নির্দেশক** | **প্রথম অভিনয় কাল** |
|---|---|---|---|
| অন্ধকারের রঙ | কাহিনি : সুবোধ ঘোষ<br>নাট্যরূপ : সীমা মুখোপাধ্যায় | গৌতম মুখোপাধ্যায় | ১৯৮৪ |
| বিকল্প | সীমা মুখোপাধ্যায় | ,, | ১৯৮৯ |
| ভাঙা বনেদ | ,, | দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৯৯১ |
| বলি (একাঙ্ক) | তৃপ্তি মিত্র | সীমা মুখোপাধ্যায় | ১৯৯৩ |
| যে জন আছে মাঝখানে | সীমা মুখোপাধ্যায় | ,, | ১৯৯৪ |
| আলোর ফুলকি | অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর | সীমা মুখোপাধ্যায় ও<br>কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় | ১৯৯৬ |
| পানু শান্তি চেয়েছিল | কাহিনি : রমানাথ রায়<br>নাট্যরূপ সীমা মুখোপাধ্যায় | কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় | ১৯৯৮ |
| আবর্ত | সীমা মুখোপাধ্যায় | সীমা মুখোপাধ্যায় | ১৯৯৯ |
| শূন্যপট | ,, | ,, | ২০০০ |

গবেষণাপত্রের সময়পর্বের (২০০৩ পর্যন্ত) পরে তিনি প্রায় প্রত্যেক বছর একটি করে নাটক পরিচালনা করেছেন। তবে সেক্ষেত্রে তিনি নিজে নাটক রচনা না করে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনার নাট্যরূপ দিয়েছেন এবং প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেরই নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। এই নাটকগুলি হল 'শেষ রক্ষা' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), ২০০৪; 'হে মোর দেবতা' (কাহিনি দেবর্ষি সারোগী, নাট্যরূপ সীমা মুখোপাধ্যায়) ২০০৫; 'মুখোশ নৃত্য' (কাহিনি ভগীরথ মিশ্র, নাট্যরূপ সীমা মুখোপাধ্যায়) ২০০৬; 'জলছবি' ২০০৮; 'বুমেরাং' (কাহিনি ভগীরথ

মিশ্র, নাট্যরূপ সীমা মুখোপাধ্যায়) ২০০৯; ‘ব্রজবুড়োর সবুজ বাক্স’ (কাহিনি সত্যজিৎ রায়, নাট্যরূপ সীমা মুখোপাধ্যায়) ২০১০; ‘অধরা মাধুরী’, ‘নীল ঘোড়া’, ‘ছায়াপথ’, ‘অব্যক্ত’ ইত্যাদি।

এতদিন ধরে এতগুলি নাটক নির্দেশনা দেওয়ার ভিত প্রস্তুত হয়েছিল তাঁর নাটক রচনা ও নাট্যরূপ দেওয়ার মধ্য দিয়ে। তারপরই তিনি কাঁধে তুলে নেন নির্দেশনার দায়িত্ব। কখনো কখনো দেখা যায় গ্রুপ থিয়েটার-এ প্রথিতযশা নাট্যব্যক্তিত্বের পরবর্তী প্রজন্ম পিতা বা মাতার নাট্যচর্চার ধারাকে বহন করে চলে। সীমা মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও দৃষ্টি-আকর্ষণ করে যে, তিনি তাঁর শ্বশুরমহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলের নেতৃত্ব দিলেন তাঁর অবর্তমানে। সামাজিক ক্ষেত্রে এটিও দৃষ্টান্তস্বরূপ।

সীমা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবন শুরু হয় তাঁর শৈশবাবস্থায়। ক্লাস ফোর কিংবা ফাইভ-এর ছাত্রী তখন। বাবা অজিতকুমার ঘোষ ছিলেন ‘নাট্যায়ন’ সংস্থার একজন নাট্যকর্মী। তাঁরই যোগাযোগে প্রথম মঞ্চাবতরণ ঘটে গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা ‘শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য’ নাটকে ছোটো নিমাই-এর ভূমিকায়। বাবার স্বপ্ন ছিল যদি কন্যা সন্তান জন্মায় তাহলে মেয়ে হবে অভিনেত্রী। পিতার সেই স্বপ্নপূরণ করতে পেরেছেন সীমা মুখোপাধ্যায়। ‘শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য’ নাটকের পর, তিনি বিভিন্ন নাটকে শিশু চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ডাক পেতে থাকেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলিনাদেবীর সহায়তায় তাঁদের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ পান সীমা মুখোপাধ্যায়— যা তাঁর জীবনের এক পরম পাওয়া। এম. জি. এন্টারপ্রাইজ-এর হয়ে ছোটোবেলা থেকে তাঁর বিভিন্ন নাটকে অংশগ্রহণ তাঁর অভিনেত্রী সত্তাকে ক্রমশ দৃঢ়ভূমিতে দাঁড় করিয়েছে। এ সময় তিনি অভিনয় করেন ‘সাজাহান’ নাটকে সিপার, ‘রামকৃষ্ণ’ নাটকে সারদামণি, সাধক ব্যামাক্ষ্যাপায় ‘ভৈরবী’ ইত্যাদি চরিত্রে। প্রখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখতে দেখতে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর শৈশব কৈশোর। কখনো তিনদিক খোলা মঞ্চে, কখনো বা প্রসেনিয়াম থিয়েটারে। ঠাকুরদাস মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, মহেন্দ্র গুপ্ত-র মতো অভিনেতা অভিনেত্রীর সাহচর্য পেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগও পেয়েছেন। এঁদের শিক্ষা, নাট্যভাবনা পরবর্তী জীবনে তাঁকে যে বিশেষ সাহায্য করেছিল তা বলাই বাহুল্য। স্কুল পেরিয়ে কলেজ জীবনেও তাঁর সঙ্গী ছিল নাটক। বাসন্তীদেবী কলেজের দর্শন বিভাগের ছাত্রী সীমা মুখোপাধ্যায় নাটকের জন্যই কলেজে পড়তে পড়তে চাকরি পান জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায়। এই সময়েই কুন্তল মুখোপাধ্যায় তাঁকে আহ্বান জানান তাঁদের নাট্যদল ‘সংলাপ কোলকাতা’র হয়ে ‘ইস্পাত’ নাটকে ক্রিস্তিনা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। এই নাটকের অভিনয় দেখেই ‘রঙরূপ’ গোষ্ঠীতে শুভাশিস মুখোপাধ্যায় তাঁকে আহ্বান জানান অভিনয় করার জন্য। পরবর্তী সময়ে (১৯৮২-তে) তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং নাট্যজীবন ও দাম্পত্যজীবনের মধ্যে যোগসূত্র রচিত হয়।

'রঙরূপ' নাট্যগোষ্ঠীতে তখন 'কণ্ঠস্বর' (নাটক ও পরিচালনা গৌতম মুখোপাধ্যায়) নাটকে অভিনয়ের জন্য তিনি আসেন এবং সেই থেকে অর্থাৎ ১৯৭৯ থেকে ২০১৬ প্রায় সাঁইত্রিশ বছর ধরে এই নাট্যদলের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ। ১৯৮২-তে বিবাহের পর স্বামী ও শ্বশুরমশাই-এর অনুরোধে তিনি চাকরি ছেড়ে থিয়েটারের পূর্ণ সময়ের কর্মী হিসেবে যুক্ত হন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে নাটক নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন কিন্তু ১৯৮৩-১৯৮৫ এই দুটো বছর থিয়েটারের সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে মাতৃত্বের কারণে। কিন্তু এই সময়পর্বের পরে তিনি এম.এ.-তে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং আবারও পূর্ণমাত্রায় থিয়েটারের সঙ্গে সংযুক্ত হন।

সীমা মুখোপাধ্যায় এই সময়ে বহু নির্দেশকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন এবং সেই সুযোগ তিনি যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেক নির্দেশকের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা এবং নিজের অভিনিবেশ ও পর্যবেক্ষণ তাঁর নির্দেশক হবার পথকে সুগম করেছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় টেলিভিশনের অডিশন দিতে গিয়ে তাঁর অভিনয় দেখে বিভাস চক্রবর্তী ও অরুণ মুখোপাধ্যায় তাঁদের নিজস্ব দল যথাক্রমে 'অন্য থিয়েটার' ও 'চেতনা'য় অভিনয় করার জন্য সীমা মুখোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানান। বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় 'হচ্ছেটা কী' নাটকে মীরা চরিত্রে অভিনয় করতে করতে তাঁর যে শিক্ষা তা তাকে পরবর্তী জীবনে কতটা সাহায্য করেছে তা ব্যক্ত করেছেন সীমা মুখোপাধ্যায়। 'সবটাই মাপা ছক। কিন্তু অভিনয় যখন চলছে মঞ্চে তখন ওইসব মাপ-জোকের আউটলাইনটা মুছে দেওয়া যেত অনায়াসে। এত এনজয় করে অভিনয় করতাম এই নাটকটাতে। এরপর এই নাটকের সবকটি অভিনয়ই করেছি আমি, আর প্রতিদিন কিছু না কিছু অবিষ্কার করেছি, শিখেছি যা পরবর্তী থিয়েটার জীবনে আমার পুঁজি হয়েছে।'[১৪] বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির প্রযোজনা 'বলিদান'-এ অভিনয় করতে গিয়ে খুব কাছ থেকে দেখেছেন— পাঠ থেকে মঞ্চায়নের যাত্রাপথ। উৎপল দত্তের পরিচালনায় 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন'-এ অভিনয় করার অভিজ্ঞতাও সীমা মুখোপাধ্যায়কে প্রভাবিত করেছিল বিশেষভাবে। 'Reading Rehearsal থেকে প্রথম Show-এই যাত্রাপথে ওই নাটকে অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক উৎপল দত্তকে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করা— এ অভিজ্ঞতা তো গোটা জীবনের সঞ্চয়, সুদে আসলে এক এলাহি ব্যাপার। ... উৎপল দত্ত'র পরিচালনায় এই প্রযোজনাটিতে অভিনয়ের সুবাদে নিজের ব্যক্তিজীবন এবং অভিনয়জীবনে এমন শিক্ষা পেয়েছি যা এখনও আমায় চলতে সাহায্য করছে।'[১৫] অসিত মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'গান্ধার' প্রযোজিত 'ভাস্মা' নাটকে অভিনয়ের জন্য সীমা মুখোপাধ্যায়কে, অসিত মুখোপাধ্যায় নিজে এসে প্রস্তাব দেন। সেক্ষেত্রেও নির্দেশনা সম্পর্কিত বিষয়ে সীমা মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা পরবর্তী

জীবনের পাথেয় হয়ে থাকে। মহলা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানাচ্ছেন— 'এরপর শুরু হল মহলা। আমার থিয়েটার জীবনের এক ভিন্ন পদচারণা। আমি এই প্রথম জানলাম অভিনয়টা কখনও করা যায় না ওটা একটা হওয়া, হয়ে ওঠা, অনেক দিন ধরে একটু একটু করে একটা চরিত্রকে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করার খেলা। এই প্রথম জানলাম, একটা নাটকের লিখিত সংলাপের আড়ালে না-লেখা সংলাপের অন্বেষণ কেমন করে করতে হয়। কাকে বলে Under the text .... এই নাটকের কোন মহলায় আমি অনুপস্থিত থাকিনি। কারণ রিহার্সাল দেখে যেভাবে শেখা যায় অন্য আর কোনভাবে তা হয় না— এটা তখন বুঝে গেছি। আর এ-নাটকে অন্যদের অভিনয় দেখাটা একটা বিশেষ পাওনা আমার ভষ্যিতের।'[১৬] শাঁওলী মিত্রের কাছে শিখেছেন কী করে দম নিতে হয়, উচ্চারণ শুদ্ধ করতে হয়, হারমোনিয়াম ধরে কি করে রেওয়াজ করতে হয়। দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংস্তব' নাট্যদলে অভিনয় করেছেন 'ধূনিস্তম্ভ' নাটকে, তড়িৎ চৌধুরী পরিচালিত 'সাঁকো'-তে। সমস্ত কিছুর সমন্বয় ঘটেছে সীমা মুখোপাধ্যায়ের নাট্যনির্দেশনার ক্ষেত্রে। নাট্যপরিচালনার কাজে মঞ্চ, আলো, অভিনয়, সংগীতপ্রয়োগ দৃশ্যায়ন বা ডিজাইন সমস্ত বিষয়গুলিই জরুরি। কিন্তু একেকজন পরিচালক বিশেষ একটি দিকের ওপর গুরুত্ব দিতে চান। সীমা মুখোপাধ্যায় নাট্যপ্রযোজনার প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যে সমগ্রতার সন্ধান করেন। তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলির আলোচনার মধ্য দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষিত হবে।

সীমা মুখোপাধ্যায় নাট্য নির্দেশনায় আসার আগে অবশ্য নাটককার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর লেখা যে নাটকগুলি 'রঙরূপ' মঞ্চস্থ করেছে তার মধ্যে রয়েছে 'অন্ধকারের রঙ' (নাট্যরূপ) 'বিকল্প', 'ভাঙা বনেদ', 'যে জন আছে মাঝখানে', 'পানু শান্তি চেয়েছিল' (নাট্যরূপ), 'আবর্ত' ও 'শূন্যপাট'। এক্ষেত্রে তিনি যেখানে শুধুমাত্র নাটককার সেই নাটক সম্পর্কিত আলোচনার পরে বিশ্লেষিত হবে তাঁর রচিত ও নির্দেশিত নাটকগুলির প্রসঙ্গ।

'অন্ধকারের রঙ' সুবোধ ঘোষের কাহিনির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয় ১৯৮৪ সালে গৌতম মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়। একাঙ্ক এই নাটকটি বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। দুটি পুরুষ ও একটি নারী কেন্দ্রিক ত্রিভুজ প্রেমের এই নাটকটি অত্যন্ত সাধারণ মানের। নাটকে এই তত্ত্ব-ই প্রকাশ পেয়েছে যে চোখ অন্ধকার থাকলেও একজনের মন হতে পারে আলোকোজ্জ্বল আবার অন্যদিকে খোলা চোখেও মানুষ আলোর সন্ধান পায় না। নাটকের কাহিনি যদি নির্বাচন করে থাকেন তাহলে অবশ্যই নাট্যরূপকারকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। যেমন গণশক্তি লেখে— '১৯৮৫ সালের প্রযোজনা হলেও গ্রুপের ওই বয়সে শুধুমাত্র প্রেমনির্ভর এই কাহিনি তারা কেন বাছলেন কে জানে? নাটকের শরীরও তেমন সুগ্রথিত নয়। তাই সব মিলিয়ে এটা

দাগ কাটলো না মনে, অন্তত এই বয়সী এক দলের কাছে যা আশা করাই গিয়েছিল।'[১৭] নাটকে অন্ধ হিরন্ময়ের ভূমিকায় মল্লিনাথ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট আন্তরিক এবং তার স্ত্রী অপরাজিতার চরিত্রে সীমা মুখোপাধ্যায়ের গভীর অভিব্যক্তিময় চরিত্রায়ন নাটকটির সম্পদ। স্বামীর কাছে অপরাজিতা যেন শুধুমাত্র নার্স। তার জীবনে যখন আসে কিংশুক (মহান সেনগুপ্ত) তখন নাটকে একটা রঙ আসে ঠিকই কিন্তু অপরাজিতার সংসার ভাঙে না। আবার সে ফিরে পায় তার ভালোবাসা। অত্যন্ত সরল মানবিক সম্পর্কের কাহিনিকে একাঙ্কে বেঁধেছেন নাট্যরূপকার এবং মঞ্চ পরিকল্পনা ও আলোর মাধ্যমে কিছু কিছু মুহূর্ত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন পরিচালক গৌতম মুখোপাধ্যায়। 'অন্ধকারের রঙ' 'রঙরূপ' গোষ্ঠীর তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও প্রযোজনা নয় তবে এ নাটকেই সীমা মুখোপাধ্যায় অভিনয় ছাড়া নাট্যনির্মাণের কাজে অংশ নিলেন সেটাই উল্লেখ্য।

পরবর্তী নাটক রচনায় অনেক বেশি সচেতন এবং বিষয়ের নির্বাচনের পরিণততর হয়ে উঠলেন সীমা মুখোপাধ্যায়। 'বিকল্প' মৌলিক নাটক— আধুনিক সমাজ ও বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনার প্রকাশ ঘটল এ নাটকে। একটি পরিবারের নিঃসন্তান দম্পতি তৃষা ও নবারুণের জীবনে হঠাৎই আশার আলোর সম্ভাবনা দেখা যায় যখন ডঃ শাস্ত্রীর উদ্ভাবনায় গর্ভধারণে অক্ষম তৃষার মাতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা যায়। সন্তান কামনায় অস্থির দম্পত্তির ভ্রূণ গর্ভে ধারণ করতে রাজি হয় শিবতোষের স্ত্রী শ্যামলী। অর্থের বিনিময়ে সে গর্ভে ধারণ করবে তাদের সন্তান এবং সুস্থ সন্তান জন্মাবার পরই তাকে তুলে দিতে হবে এই সন্তান তৃষা ও নবারুণের কাছে। স্বামী শিবতোষের ইচ্ছায় শ্যামলী সেই শর্তে রাজী হয়। এ এক কঠিন পরীক্ষা প্রত্যেকটি মানুষের কাছে। বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার সারোগেট মাদার বা বিকল্প মাতৃত্বের ধারণা পরিবার সমাজ ও বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রেই কীভাবে প্রভাব ফেলছে তারই একটা ছবি এ নাটকে তুলে ধরেন সীমা মুখোপাধ্যায়। তিনি যেমন মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি বিজ্ঞান ভাবনার সঙ্গে মানবমনের সম্পর্কের যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার দুটো দিক আছে। ভালোর দিক এবং মন্দের দিক। মানুষ এই উদ্ভাবনাকে গ্রহণ করবে অক্ষমতার পরিপূরক হিসেবে। নিঃসন্তান মাতৃত্বের স্খালন হবে আবার অপর দিকে যে মা দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করবে সন্তানকে তার মধ্যে মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে থাকবে অথচ অর্থের জন্যই তাকে মেনে নিতে হয়েছে এই সিদ্ধান্ত। সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে এইভাবে মানবিক সম্পর্কের মধ্যে ফেলে বিশ্লেষণের যে ভঙ্গি সীমা মুখোপাধ্যায় গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। নির্দেশনা ও সম্পাদনায় গৌতম মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বও কিছু কম নয়। সীমা মুখোপাধ্যায়ের নাট্য কাঠামোর ভেতর থেকে তিনি বের করে এনেছেন চিকিৎসক ডাক্তার শাস্ত্রীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তৃষার মাতৃত্বের আকৃতি ও নবারুণের উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষা, জঠর ভাড়া দেওয়া শ্যামলীর মাতৃহৃদয়ের আকুলতা, শিবতোষের

অর্থলোভ, পিতার বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রতি মূল্যবোধহীনতার প্রতি শ্লেষ— এতগুলো বিষয়কে একটি ঘটনাকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। নাট্যকার যেহেতু একজন নারী স্বাভাবিকভাবেই তিনি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করবেন এমনটাই স্বাভাবিক কিন্তু নাট্যকার স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন মাতৃত্ব শুধু নারীর সমস্যা নয়, মাতৃত্বকে কেন্দ্র কবে বিকল্প নাটকটির কাহিনির মধ্যে যে মোচড়গুলি সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার তা প্রশংসনীয়। তৃষা ও নবারুণ নিঃসন্তান। বহু চেষ্টা করেও কোনো ফল পায়নি তারা। এই ব্যবস্থায় আবিষ্কৃত হয় বিজ্ঞানের এক অভিনব ভাবনা। সারোগেট মাদার— সেখানে অর্থাৎ বিকল্প মা। যে মা সন্তানকে নিজ গর্ভে ধারণ করবে ভিন্ন দম্পত্তির ভ্রূণ দশমাস দশদিন জঠরে আশ্রয় দিয়ে সন্তানের জন্ম দেবে। কিন্তু সন্তানের জন্মের পর সেই সন্তানের ওপর ধাত্রী মায়ের কোনো অধিকার থাকবে না। সে ফিরে যাবে তার আসল বাবা-মা-র কাছে। ফিরে যাবে তার সেই মায়ের কাছে যার অক্ষমতার কারণে সে ধারণ করতে পারেনি সন্তান। তাহলে এই সন্তানের মা কে? এই প্রশ্ন বিরাট এক সামাজিক ও মানবিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় মানুষকে। এ নাটকে তৃষা ও নবারুণ সন্তানের বীজ, বেকার বস্তিবাসী শিবতোষের ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে স্ত্রী শ্যামলীকে রাজি করায় তাঁর জঠর ভাড়া দেবার জন্য। শ্যামলী বিকল্প মায়ের ভূমিকা পালন করতে রাজি হয় কিন্তু তার ভেতরেও একটা ঝড় ওঠে। বদলে যেতে থাকে তার সমাজ, একটা পরিবার ও তার পারিপার্শ্বিক। নবারুণের বাবা সুধাংশুশেখর পুরোনো পন্থী মানুষ তাঁর কাছে ডঃ শাস্ত্রীর বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারের পন্থাকে সমর্থন করতে পারেন না। ডঃ শাস্ত্রী বিজ্ঞানের নতুন আলোতে বদলে যাওয়া সমাজ ও মানবের সম্পর্কগুলিকে মেনে নেন স্বাভাবিকভাবেই। তবে নাটকের শেষে এই প্রশ্নের জটিলতা থেকেই যায় যে কে আসল মা? জন্মদাত্রী না পালনকর্ত্রী?

একটি পরিবারের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে সমাজবৃত্তে নাটকটি ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এইখানেই নাটককার একটা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটককে পৌঁছে দেন দর্শনে। 'বিকল্প' রচনার পর সীমা মুখোপাধ্যায়ও নাটককার হিসেবে স্বীকৃতি পান। বাংলা রঙ্গমঞ্চে মহিলা নির্দেশক যাঁরা আছেন তাঁরা মূলত পরিচালনার কাজেই নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন। কিন্তু সীমা মুখোপাধ্যায়ের ব্যতিক্রম এইখানেই যে তিনি নিজে নাটক লিখে নাটকের নির্দেশনা দেন এবং এই কাজের একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেন। এটি তাঁর নিজের নির্দেশনার ক্ষেত্রে এবং দলের ক্ষেত্রেও সুবিধাজনক। একটি দলে যদি নাটককার ও নির্দেশক একই ব্যক্তি হন তাহলে সেই দলের কাছে বিষয়টি অসম্ভব ভালো। সেই হিসেবে সীমা মুখোপাধ্যায়ের একটা স্বতন্ত্র জায়গা চিহ্নিত হয়েছে।

'বিকল্প' নাটকটি প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নবান ছিলেন পরিচালক গৌতম মুখোপাধ্যায়। মানবিক

মূল্যবোধের জায়গা থেকে তিনি চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রের যে টানাপোড়েন তাকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল ভাল অভিনয়ের। অভিনয়ের ক্ষেত্রে কুশীলবদের যেমন দায়িত্ব থাকে তেমনি পরিচালককেও অনেকখানি দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে তিনজনের নাম উল্লেখ্য তাঁরা হলেন শিবতোষের ভূমিকায় অশেষ সেনগুপ্ত, তৃষা (সীমা মুখোপাধ্যায়) এবং ডঃ শাস্ত্রী (দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়)। শিবতোষের অর্থ চাহিদা থেকে নিজের স্ত্রীকে জোর করে এমন একটি দায়িত্ব নিতে বাধ্য করানোর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অকপট। নানান সমস্যার টানাপোড়েনে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত মাতৃহৃদয়ের আর্তি ব্যাকুলতায় সীমা মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রায়ন ছিল কঠিন সে কাজটি তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছেন বিশেষ দক্ষতায়। স্বাভাবিক অভিনয়ে শিবতোষের রূপায়ণ যেমন চমকে দেবার মতো তেমনি মঞ্চ পরিকল্পনায় মনু দত্ত ছিলেন বিশেষ সচেতন। মঞ্চের ডানদিকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর ছবি এবং এই চিত্রের ওপর আলোক সম্পাত মঞ্চের ব্যঞ্জনাকে মূর্ত করতে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। আলোর ক্ষেত্রে জয় সেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে সার্থক, বিশেষ করে অপারেশন থিয়েটারের আলো। আবহের ক্ষেত্রে দেবাশিস দাশগুপ্ত যেভাবে শিশুকণ্ঠের ব্যবহার করেছেন তা এই নাটকের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত এবং নাটকের শেষে প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি। আবহ, মঞ্চ, আলো এই সমস্ত কিছু সংগ্রহিত করে নাট্য প্রযোজনা, উপস্থাপনা যেমন নির্দেশকের কৃতিত্ব তেমনি নির্দেশককে নির্ভর করতে হয় নাটকের মূল কাঠামোর ওপর। সেই কাঠামো নির্মাণে নাটক রচনার সূচনাপর্বেই সীমা মুখোপাধ্যায় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মাতৃত্ব বনাম বিকল্প মাতৃত্বের টানাপোড়েনে তাঁর কলমের সমর্থন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই মা—যে মা সন্তানকে সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতার থেকে আড়াল করে সন্তানের জন্মের আলোটি জ্বালিয়ে দেয়। একজন নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষিত বলে এমনই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। একজন পুরুষের কলমে কী প্রাধান্য পেত এই বিষয় এবং বিষয়ের বিশ্লেষণ? নাটকটির জন্য সীমা মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রশংসাও হয়েছিল। 'যুগান্তর' পত্রিকায় লেখা হয় 'সেদিক থেকে রঙরূপ প্রযোজনা 'বিকল্প' অবশ্যই বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। মৌলিক নাট্যরচনার জন্যই শুধু নয়, বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যের সুবাদেও সীমা শুভেচ্ছা ও সম্মান পাবেন।'[১৮]

বিকল্প নাটকটি রচনার দুবছর পর সীমা মুখোপাধ্যায় রচনা করলেন 'ভাঙা বনেদ'। এ নাটকের নির্দেশক ছিলেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজ্ঞান মনস্কতা থেকে সমাজ মনস্কতার পথে হাঁটলেন নাটককার। তুলে নিলেন একটি বিষয় যা প্রতিনিয়ত মানুষকে উদ্বেগ আর আশঙ্কার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। ছোটো ছোটো ফ্ল্যাটের কামরায় বন্দি শৈশব যৌবন, যারা শিকার হয় ইঁদুরদৌড়ের ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতায়। সাফল্য অর্থ আর উচ্চাশা তাদের জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। এমনই তা জ্বলন্ত দৈনন্দিনকে নাটকে বাঁধলেন সীমা মুখোপাধ্যায়

তাঁর ‘ভাঙা বনেদ’ নাটকে। নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ উৎসাহ পেয়েছিলেন অভিনেত্রী শাঁওলি মিত্রের কাছ থেকে। তিনিই সীমা মুখোপাধ্যায়কে উৎসাহিত করেছিলেন। ‘‘ভাঙা বনেদ’ নাটকটা খুব পছন্দ আমার। খুবই পছন্দ। এর মধ্যে এমন কতগুলো মানবিক সম্পর্কের কথা, মানবিক সমস্যার কথা আছে যা মনকে ছোঁয়। ... এতে তো অনেক কথা বলা হয়েছে যা খুব জরুরী, যা একই সঙ্গে বোধ এবং বুদ্ধিকে তৃপ্ত করে।’[১৯]

‘ভাঙা বনেদ’ নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ছবি। কংক্রিটের শহরে ছোটো হতে হতে পরিবারগুলোর সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়ে মাত্র তিন বা চার জনে। স্বামী স্ত্রী আর তাদের দুটি বা একটি সন্তান। বাবা মায়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা উচ্চাশা স্বপ্ন সফলতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে একটি সন্তানকে ঘিরে। সবাই চায় যে কোনো উপায়ে সাফল্যময় জীবন। তারই জন্য ইঁদুরদৌড়। মানবতার মূল্য তাহলে কোথায়? মানুষ যদি বর্হিজগতের টানাপোড়েনে নিজেকে জয় করে ক্রমশ তাহলে তার অন্তরের ভাণ্ডারে কি থাকে? এমনই এক গভীর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নাটককার।

নাটকে মূলত দুটি পরিবারকে দেখা যায়, একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের একমাত্র কন্যা রিয়া। অন্য অ্যাপার্টমেন্টটিতে থাকে স্বামী স্ত্রী ও তাদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলে। সঙ্গে থাকেন স্বামীর মা ও ভাই। আরেকজন মানুষও এ নাটকের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি থাকেন যে অ্যাপার্টমেন্টটিতে তাকে চিলেকোঠা বলাই যুক্তিযুক্ত। অধ্যাপকের শিক্ষা সম্পর্কে ভাবনা, জীবন সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রিয়াকে যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে পরিবারের গৃহকর্তা কর্ত্রীদের। কী করে তাঁকে তাড়ানো যায় তারই পরিকল্পনা চলতে থাকে। কেননা তিনি সাফল্যের উচ্চতায় বিশ্বাস করেন না— করেন মানবিকতায়। যা প্রভাবিত করে রিয়ার মতো মেয়েদের অন্য শিশুদের। তারা তাদের স্বেচ্ছাধীন জীবন বাহিত করতে চায়। ‘ভাঙা বনেদ’ আবার সেই শিশুদেরও গল্প যাদের স্কুল পাঠানোর মুহূর্তে রীতিমতো নাটক চলে বাড়িতে, সেই শিশুরা যারা ইংরেজিয়ানার কপটভূমিতে বড়ো হতে থাকে, শিকড়ের সন্ধান পায় না। সীমা মুখোপাধ্যায় এই চেনা দুনিয়ার চৌহদ্দীর মধ্যে খুঁজে নিয়েছেন তাঁর নাটকের রসদ। দেখিয়েছেন কোন চোরাবালিতে মুখ লুকিয়ে যাপন চলছে একশ্রেণির মধ্যবিত্তের। সামাজিক অবক্ষয়ের নির্মমতায় ক্রুদ্ধ নাটককার তারই মধ্যে মরুদ্বীপের মতো সৃষ্টি করেছেন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যথার্থ শিক্ষা কি পারবে দুর্বিনীত সমাজে শিরদাঁড়া টান করে দাঁড়াতে। এই জায়গাটাকেই নাড়িয়ে দিতে কলম ধরেছেন নাটককার। সেখানে নাটক আর বিনোদনমাত্র নয়— নাটককারের আদর্শ ও দর্শনের মিশেলে তৈরি হয়েছে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন।

‘ভাঙা বনেদ’-এর নির্দেশক দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও এ নাটক নির্মাণের ক্ষেত্রে সীমা মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাও লক্ষণীয়। মঞ্চ নির্দেশক তড়িৎ চৌধুরীকে নিজস্ব ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন সেভাবেই নির্মিত হয়েছিল মঞ্চ। ‘‘ভাঙা বনেদ’-এর সময় সীমা বলল মঞ্চটা আমাকে দিয়ে করাবে আমি বললাম, ‘ভাল, কিরকম মঞ্চ চাও?’ ও বলল একটা Set-এর মধ্যেই অনেকগুলো ভাগে ব্যাপারটা ঘটবে। যাতে কোন ছেদ না পড়ে, কোন বাধা না পড়ে নাটকটার গতির। আমি তখন একটা transparent মঞ্চ করার idea ওকে দিলাম। চারদিক থেকে সবই দেখা যাবে অথচ আলোর খেলার মাঝখান দিয়ে, এটা ওটা সেটার মধ্যে দিয়ে Zone গুলো পাল্টে পাল্টে যাবে। সেইভাবে নাটকের গতিটাও বাড়ল, stylised দিকটাও হল—”[২০] কালো কাঠের রেলিং দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টের আদল আনা হয়েছিল অনেকটা খাঁচার ধরনে। শুধু মঞ্চ নয় এ নাটকে চরিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নাটককারের পছন্দ গুরুত্ব পেয়েছিল। স্বপন রায় অভিনয় করেছিলেন এ নাটকে সীমা মুখোপাধ্যায়েরই অনুরোধে। ‘দু-একজনকে বাতিল করার পর সীমা আমাকে বলল— একটা চরিত্র করতেই হবে। সেটা খুবই ছোট চরিত্র। সীমা যখন নাটকটা পড়ে শোনাল, দেখলাম, ছোটো তো নয়, একটা অত্যন্ত ভালো চরিত্র।’[২১] নাটক লেখা ছাড়াও মঞ্চভাবনা চরিত্র নির্বাচন এমনকি নির্দেশক দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও নির্বাচন করেছিলেন সীমা মুখোপাধ্যায়। এই দায়িত্বগুলো পালন করতে হয়েছিল তাঁকে। এই অভিজ্ঞতাগুলিই ক্রমশ সীমা মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশক হবার পথ প্রস্তুত করল। ‘ভাঙা বনেদ’ নাটকটি অনেকদিন চলেছিল এবং বিশেষ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। এই সমস্ত কাজগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এমনটাই বলা যায় যে সীমা মুখোপাধ্যায় শুরুর সময় থেকেই বিশেষ সচেতন ছিলেন নাট্যক্ষেত্রে। এ নাটকে আলোর পরিকল্পনা করেছিলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ। তিনি অধ্যাপকের ঘরটি দেখবার জন্য আলোর সাহায্যে দূরত্ব কমিয়ে একটা অভিনব দৃষ্টিগ্রাহ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়, সব্যসাচী দাশগুপ্ত, সীমা মুখোপাধ্যায়, বিদীপ্তা চক্রবর্তী প্রমুখ।

‘ভাঙা বনেদ’ নাটকটি রচনা প্রসঙ্গে নিজের মনোভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন নাটককার। অভিনয়পত্রীতে ‘ভাঙা বনেদ’—কেন এই শিরোনামে সীমা মুখোপাধ্যায় লিখলেন ‘... দু’তিন বছর থেকেই শিক্ষার আরাধনা হয় যে দেশে সে দেশের তো উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হবার কথা। সেখানে এতো কলুষ কেন? চারদিকে এতো অনিশ্চয়তা কেন?

মানুষ এতো নিরাপত্তাহীন কেন? মূল্যবোধের এতো অভাব কেন? সে সোজা হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না কেন? ... এই অবস্থার শুরুর বিন্দুটা কোথায়? এর বীজ কি আমরাই বপন করে দিচ্ছি একেবারে গোড়ায়— শিশু অবস্থাতেই? এক সর্বনাশা জাঁতাকলে নিজেরাই পেষাই হচ্ছি আর পরের প্রজন্মকে

জেনে বুঝে ঠেলে দিচ্ছি তাতেই? আর জোর করে যখন একটি কুঁড়িকে ফোটানো হয়— তার স্বাভাবিক বিকাশকে বন্ধ করে দিয়ে, সেই ফুলটির চেহারাটা যেমন হয়— আমাদের বর্তমান সমাজের চেহারাটাও বোধহয় তেমনি বিবর্ণ।

আরো অন্বেষণ আরো খোঁজা এই 'ভাঙা বনেদ' নাটকে খুঁজতে চেয়েছি ঐ শক্ত ভিতটাকে যাতে দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি আমি, আমরা, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।'[২২]

আধুনিক সভ্য শহুরে মানুষজনদের নিয়ে লেখা 'ভাঙা বনেদ' যেমন সমাজের সমস্যার গভীরে ধাক্কা দেয় তেমনি তাঁর লেখা পরবর্তী নাটক যা মঞ্চস্থ হয়েছিল তাঁর-ই নির্দেশনায় ১৯৯৪ সালে সেই নাটকটি হল 'যে জন আছে মাঝখানে'। তবে সীমা মুখোপাধ্যায়ের প্রথম নির্দেশনা ১৯৯৩ সালে তৃপ্তি মিত্র রচিত 'বলি' (একাঙ্ক)। এখানেও নাটককার ও নির্দেশক দুজনেই মহিলা। 'বলি' নাটক এর আগে তৃপ্তি মিত্রের তত্ত্বধানে অরিজিৎ গুহ-র নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করেছিল 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থা ১৯৭৭ সালে। 'বহুরূপী'-র সংকটকালে এই নাটক তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। 'রঙরূপ'-এর প্রযোজনাটি সম্পর্কেও তেমন আলোচনা হয়নি। এই নাটকটি পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমা মুখোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে ছিলেন সমকালীন শিল্পীদলের পরিচালক অম্বর রায়। তাঁর অনুরোধেই 'রঙরূপ'-এর পক্ষ থেকে পরিচালক হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন সীমা মুখোপাধ্যায় 'সমকালীন শিল্পী দল'-এর উৎসবে 'বলি' নাটকটির মঞ্চায়নে। তবে 'বলি' নাটকটির প্রযোজনা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে এই নাটকটি থেকেই সীমা মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনার পথ চলা শুরু। এর পর থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে নাট্যনির্দেশনার কাজ করে গেছেন প্রায় তেইশ বছর ধরে। তবে নির্দেশনায় তাঁর আসা খানিকটা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই। 'রঙরূপ'-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্দেশক গৌতম মুখোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়লে সীমা মুখোপাধ্যায়ের ওপর দায়িত্ব এসে পড়ে। অভিনেত্রী, নাটককারের বয়ানে, 'প্রথমে ঠিক হল বাইরে থেকে কোনো নির্দেশককে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সেই মতো *ভাঙা বনেদ*-এ দ্বিজেনদাকে পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল। কিন্তু তারপর নানান কারণে হঠাৎ একদিন মাঠে নেমে পড়লুম। শুধুমাত্র এতদিন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গুণী মানুষদের কাজ করতে দেখার অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে। *'যে জন আছে মাঝখানে'* লেখা হল এবং বেশ একটা সাহসী সাহসী ভাব নিয়ে নতুন আর এক পর্বে ঢুকে পড়া গেল।'[২৩]

এই পর্বে অর্থাৎ নির্দেশনার পর্বে ঢুকে পড়ার পর ২০০০ সাল পর্যন্ত সীমা মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় পরপর মঞ্চস্থ হল 'যে জন আছে মাঝখানে', 'আবর্ত' ও 'শূন্যপট'। ১৯৯৪ সালের প্রযোজনা 'যে জন

আছে মাঝখানে' (নাটক সীমা মুখোপাধ্যায়) তিন প্রজন্মের কাহিনি। আবারও তাঁর কলমে উঠে এল সমাজভাবনার গভীরতর এক সংকট। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি কিভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মানুষের জীবনপ্রবাহকে প্রভাবিত করছে তারই এক ছবি তুলে ধরেছেন নাটককার। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্বেতা ও সমীরের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণেই। উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান সমীর আর নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে শ্বেতা। যে বিবাহিত জীবনে ভালোবাসার অভাব, সেই বিবাহিত জীবন ভিতহীন। তাই তাদের বিয়েটা ভেঙে যায়। কিন্তু শ্বেতার মা পূর্ববর্তী প্রজন্মের মানুষ; রক্ষণশীলতা তাকে মেনে নিতে দেয় না— এই বিবাহ বিচ্ছেদ। অথচ তিনিও একটা সময় স্বামী পরিত্যক্ত। যমুনার স্বামী পঙ্কজ তাঁকে ছেড়ে চলে যায় অন্য নারীর প্রতি আসক্তির বশে। আবার সে ফিরেও আসে। চরম অসুস্থতার সময় তাকে সেবা করে যমুনা-তার স্ত্রী-ই। যমুনা পারেননি নতুন করে সংসার পাততে। কিন্তু শ্বেতা সেই কাজটি করতে পেরেছে আবার সে সংসার পেতেছে অশেষের সঙ্গে কিন্তু তার মধ্যেও আছে রক্ষণশীলতা কেননা তার ও সমীরের সন্তান আভাসের যখন মুসলিম মেয়ে আরমার সম্পর্ক তৈরি হয় তখন শ্বেতার রক্ষণশীল মন পরবর্তী প্রজন্মের উদারনৈতিকতাকে মেনে নিতে পারে না। শ্বেতার রক্ষণশীলতাকে মেনে নিতে পারে না আভাষ। যে বিদ্রোহ করে। যদিও অশেষ এই সম্পর্ককে মেনে নেয়। যুগ থেকে যুগে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এইভাবে ঘটে চলে সামাজিক জীবনের পরিবর্তনশীলতা। সীমা মুখোপাধ্যায়ের সমাজমনস্ক বিশ্লেষণ এইভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে মানব মনের অলিগলি। তবে নাটক সম্পর্কে কতগুলি সমালোচনা উঠে আসে তা হল শ্বেতার ভাই শান্তর চরিত্র সৃষ্টি যা এ নাটকে অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হয়— সে রিক্সা চালিয়ে পরিবারকে যে সাহায্য করতে চায় এই ঘটনাও অত্যন্ত আবেগসর্বস্ব। পথ দুর্ঘটনায় তার আকস্মিক মৃত্যু নাটকে কোনও মাত্রা যোগ করে না। এছাড়াও এই নাটকটির সম্পাদনা ছিল বিশেষ জরুরি। নাট্যদৃশ্যগুলিও আরও সংহত হলে নাট্যগতিও রক্ষিত হত।

নির্দেশক হিসেবে সীমা মুখোপাধ্যায়ের কাজও আরও পরিণত এ নাটকে। আলো মঞ্চ ও আবহ এবং অভিনয়— চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগকে এক সূত্রে বেঁধেছেন নির্দেশক। আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেভাবে মানব চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করেছে নাটককার— তার মঞ্চায়ন খুব সহজ ছিল না। এ নাটকে আলোক প্রক্ষেপণ মানবমনের অন্তর্লোকের জটিলতা প্রকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। বিশেষ করে শেষ দৃশ্য পরিকল্পনায় পরিচালক আলো ও ছায়াকে ব্যবহার করে সমস্ত চরিত্রগুলি যেন এক কল্পলোকের মানব হয়ে সহাবস্থান করে সংঘাত দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসানে। আলোর সঙ্গে সঙ্গে আবহের একটা সম্পর্ক তৈরি হয় ভালো প্রযোজনার ক্ষেত্রে। এ নাটকের আবহ নির্মাণ করেছেন গৌতম ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের গানকে ব্যবহার করে

এ নাটকের চমৎকার কিছু মুহূর্ত তৈরি হয়েছে। যেমন ‘মোহ আবরণ’ অথবা ‘খাঁচার পাখি ছিল’— পুত্র ও সৎপিতার মধ্যে কোথাও যেন যোগসূত্র রচনা করে দেয়। ‘বধূ কোন আলো লাগল চোখে’ গানটি ভালোবাসার সম্পর্কগুলো উন্মোচন করায়। বিদীপ্তা চক্রবর্তী অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ছিলেন সমালোচক ধরণী ঘোষ। বিদীপ্তা চক্রবর্তী সম্পর্কে লেখেন—‘A marvellous Singer, Bideepta Chakraborty should not waste her talent or time in this short of plays.’[২৪] শুধু কাব্যিক মুহূর্ত সৃষ্টি করা নয়— অত্যন্ত কঠিন কঠোর বাস্তবের তীব্রতা প্রকাশ পায়, যখন শ্বেতার বাবা বিছানায় অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে বাটিতে চামচ বাজিয়ে স্ত্রীকে ডাকে। প্রথম স্বামীকে ত্যাগ করে তখনই শ্বেতা ঢোকে তার বাপের বাড়িতে। এই ধরনের তীব্র আওয়াজ অত্যন্ত সংকেতময়। আশঙ্কাজনক কিছু ঘটবে, তারই পূর্বাভাষ যেন।

মঞ্চ পরিকল্পনায় উঠে এসেছিল দুটি বিপরীতধর্মী পরিবেশ। শ্বেতার মায়ের বাড়ির দারিদ্র্যমলিন পারিবারিক ছবি অন্যদিকে দ্বিতীয় বিবাহের পর শ্বেতার সাজানো গোছানো পরিচ্ছন্ন সাজানো ফ্ল্যাট— এই বৈপরীত্যের দৃশ্যসজ্জা নাট্যগতিকে সফল রেখেছে। খালেদ চৌধুরীর শৈল্পিক সত্তা বিশেষ প্রভাবিত করেছেন তাঁর যে ধরন অর্থাৎ যমুনার ঘরে তিনি দরজা জানলায় ফ্রেম দিয়ে দেখিয়েছিলেন। খুবই সাধারণ আসবাবপত্র টুল বেতের মোড়া, আলনা দিয়ে দারিদ্র্যের একটা ছাপ কিন্তু তার মধ্যেও রয়েছে পরিচ্ছন্নতা। শ্বেতার ফ্ল্যাটটি ছোটো টেবিল, কিছু বুক, পর্দা ঢাকনার শৌখিনতা, ফুল আঁকা কাপড়ের ঢাকা—সবটা মিলিয়ে একটা বৈপরীত্য তৈরি হয় যমুনার সাধারণ ঘরের দৃশ্যমানতার সঙ্গে। নির্দেশক মঞ্চ আবহ ও আলোকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন ফলত একটা সামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে নাট্যের ক্ষেত্রে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে চিত্রা সেনের যমুনা, সীমা মুখোপাধ্যায়ের শ্বেতা, বিদীপ্তা চক্রবর্তীর আরমা-র চরিত্রায়ণ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় এ নাটকে যমুনার স্বামী ও অশেষের ভূমিকায়, আভাসের চরিত্রে কৌশিক মুখোপাধ্যায় অভিনয় করেন।

সীমা মুখোপাধ্যায় নাট্যকার হিসেবে বারবারই এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে গেছেন। মূল কাঠামোর ক্ষেত্রে কিন্তু নাটকের অন্তরে সব সময়ই তিনি ধরতে চেয়েছেন সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের স্রোতকে, সমস্যাকে। পোখরানে ভারতের পারমানবিক নিরীক্ষাগত বিস্ফোরণ এবং তার জবাবে পাকিস্তানের বিক্ষোভ দুই দেশের অর্থনীতির ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। এই আন্তর্জাতিক বিষয়টিকে মাথায় রেখে তার ওপর গাঁথা হয় একটি সাধারণ পারিবারিক নাটক— ‘পানু শান্তি চেয়েছিল’। মূল গল্প রমানাথ রায়, তারই নাট্যরূপায়ণ সীমা মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর হাতে তৈরি হয়েছে সংলাপ ও নাটকটি। একেবারেই সাধারণ একটি গল্প— কর্তার মৃত্যুর পর সমস্ত সংসারে যেমন হয়, সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, শাশুড়ী

বৌ-এর বিবাদ অশান্তি আর এরই মাঝখানে পড়ে যায় শান্তশিষ্ট গোবেচারা পানু। এরই মধ্যে সীমা মুখোপাধ্যায় নাটকে বুনে দিতে থাকেন দুটি দেশের সম্পর্কের কথা, খুব স্পষ্টভাবে না হলে অননুমেয় নয়। নাটকের শেষ অবশ্যই হয় মিলনান্তক সুরে, যেখানে সবার মধ্যে মিলমিশ হয়ে যায়— কারণ পুরো ঘটনাটাই ঘটে বাস্তবে নয় স্বপ্নে। পানুর ঘুম ভাঙলে নাটকের ফ্যান্টাসির অবসান ঘটে। নাটকের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সীমা মুখোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি লক্ষণীয় যে ক্রমশ নির্দেশক হিসাবে পরপর কাজ করতে করতে নাটককার হিসেবেও পরিণত হয়েছেন। নিজের রাজনৈতিক আর্থ সামাজিক সচেতনতাকে অপ্রকটভাবে নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার কৌশল তিনি রপ্ত করে নিচ্ছেন। নির্দেশক হিসেবেও তার পরিচিতি তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে একজন মহিলা নির্দেশক বর্তমান নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে প্রায় অধিকাংশ পুরুষ নির্দেশকদের সঙ্গে কাজ করার সাহস অর্জন করেছেন। সাংগঠনিক জায়গা তৈরি করছেন কেননা ভালো উপকরণ ছাড়া ভালো নাটক মঞ্চায়ন সম্ভব নয়। সীমা মুখোপাধ্যায় নাটকটি তাঁর মতো করে সাজিয়েছেন। একটা বৈশিষ্ট তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায় যে তিনি সহজ সরল করে বাস্তবকে উপস্থাপিত করেন সেখানে আতিশয্য ও চমক দেখাবার চেষ্টা করেন না। তাঁর মঞ্চ পরিকল্পনাও তাই সবসময়েই বিশাল বিপুল নয় তা বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমস্ত নাটকের মধ্যেই একটা অন্তর্লীন কৌতুকের আবহ থাকে অত্যন্ত গুরুতর বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হলেও। নাট্যকার এবং নির্দেশক হিসেবে সীমা মুখোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য এটাই। সহজ সরল কাহিনির মধ্য দিয়ে, নিরলঙ্কার মঞ্চসজ্জায় গভীর সমস্যাকে তিনি ব্যক্ত করেন।

'পানু শান্তি চেয়েছিল' নাটকটির নির্দেশক কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়। 'আবর্ত' ও 'শূন্যপট' সীমা মুখোপাধ্যায় লিখিত ও নির্দেশিত এই গবেষণার পরের সময়পর্বের শেষ দুটি নাটক। এই নাটক দুটিতে তিনি নিজেকে আরও পরিণত প্রমাণ করলেন। 'আবর্ত' নাটকের মূল সমস্যা কেন্দ্রীভূত হয়েছে নীল চরিত্রটিকে ঘিরে। নীলের বাবা পেশায় ডাক্তার—দেবাঞ্জন সেন তার বাঙালি স্ত্রী ও সন্তানকে দেশে ফেলে রেখে বিদেশে চলে যান এবং সেখানেও একটি সংসার পাতেন। মাতৃহারা বাবার স্নেহরঞ্জিত নীল, মানুষ হয় পিসি—সোনামার কাছে যিনি সবসময়ের একজন রাজনৈতিক কর্মী। নীলের বাবা জিনতত্ত্বের গবেষক, আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার খবরে মানসিকভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নীল। সাইকোসিসে আক্রান্ত হয় সে। সমস্যা আরও গভীরে পৌঁছে যায় যখন সোনামার পালিত পুত্র ডাঃ দেবাঞ্জন সেনের বস্তি উচ্ছেদ করে হাসপাতাল, ওষুধের কারখানা তৈরির প্রচেষ্টায় প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সোনামা প্রথম দিকে ভাই-এর পক্ষে থাকলেও পরে বুঝতে পারে তার ভাইদার অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য। নাটকের শেষ দৃশ্যে অবশ্য নাটককার ডাঃ সেনের বোধোদয় ঘটিয়েছেন। নীল তার বাবাকে অনুরোধ করেছে মানুষকে ভালোবাসার জিন আবিষ্কার

করতে। নবীন প্রজন্মের হতাশা, প্রতিবাদ, আত্মবোধের নাটক 'আবর্ত'। বাবার অন্যায় অবিচারে ক্ষুব্ধ নীল, জুলুম করে বস্তি উচ্ছেদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসে যারা, তারা সবাই যুবক—নবীন প্রজন্ম। তাদের প্রতিবাদের সঙ্গে নিজেকে সামিল করে সোনামা। সীমা মুখোপাধ্যায় নাটকে আবেগের একটা বড়ো জায়গা তৈরি করেন, তার ওপর তৈরি হয় সামাজিক সমস্যার কাঠামো। মানবিক বোধের জাগরণ ঘটানো এবং সামাজিক সংস্কার নাটককারের মূল লক্ষ্য— এই নাটকেও সেই পথ অবলম্বন করেছেন তিনি। তাঁর নাটকে কখনোই বিনোদনসর্বস্বতা প্রাধান্য পায়নি। নাটকের মূল উদ্দেশ্য যে মানবিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো। নির্দেশনার ক্ষেত্রেও তাই নাটককে তিনি বাঁধতে পারেন নিজের মতো করে। সেখানে তীব্র নাটকীয় দ্বন্দ্বে শুরু করেন নাটক। নাটকের মঞ্চ নির্মাণে সঞ্চয়ন ঘোষ, বাদল দাসের আলোতে এবং গৌতম ঘোষের সংগীত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নাট্যভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

'শূন্যপট' বড়ো মর্মান্তিক অথচ বাস্তব কঠিন সমস্যাকেন্দ্রিক নাটক শৈশব থেকে হারিয়ে যাওয়া দাদু-ঠাকুমা-দিদিমাদের আবাস বর্তমান সমাজে শুধু বৃদ্ধাবাস। বার্ধক্য ক্রমশ আলাদা করে দেয় এই বয়স্ক মানুষদের, সংসার বিচ্ছিন্ন, উত্তাপ বিচ্ছিন্ন এই মানুষগুলোর দিন কাটে মৃতুর পথ চেয়ে নিঃসঙ্গ, কঠিন শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে। নাটক রচনার মধ্যে যেমন সাংবাদিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে নির্দেশকের নাট্যগঠনেও এসেছে নিরাবেগ সমাজ বিশ্লেষণের পন্থা। একটানা কাহিনি না বলে গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে দুই যুবক যুবতী যারা পেশায় সাংবাদিক সন্ধান আর দিঠি— যেন ক্যামেরা বন্দি করে তুলে ধরে এই সমস্ত 'শূন্য' মানুষগুলোর জীবনচরিত তাদের অনুসন্ধিৎসার মধ্য দিয়ে।

এই প্রযোজনার মধ্য দিয়ে সীমা মুখোপাধ্যায় তাঁর নির্দেশনার ক্ষেত্রে এতদিনের পথচলার ধরনটাকে ভেঙেছেন। তিনি সবসময়ই বাস্তবনিষ্ঠ সমাজবিশ্লেষক নাটককার ও নির্দেশক। পরিচালনার ক্ষেত্রেও এখানে তাঁর ভিন্ন ধরন প্রকাশ পেয়েছে। আনন্দবাজার  পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে লেখা হল—'পরিচালক নাট্যকার সীমা মুখোপাধ্যায় একটি সামাজিক মানবিক সমস্যা নিয়ে ফিচার লেখার মতো নাট্যমাধ্যমকে ব্যবহার করেছেন।'[২৫]—এই ফিচারধর্মিতাই এই নাট্য উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য। এখানে সংবাদ, তথ্য, বক্তব্য, বার্তা সব কিছু মিলে মিশে তৈরি করেছে নাট্যআবহ। পরিচালক হিসেবে সীমা মুখোপাধ্যায়ের আরও একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এই নাটকে ২২ জন কুশীলব নির্বাচন করেছেন যাঁরা বাস্তব জীবন থেকে নির্বাচিত। তাঁরা প্রবীণ এবং জীবনে এটাই তাঁদের প্রথম মঞ্চ অভিজ্ঞতা। এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করলেন পরিচালক। প্রায় আনকোরা ২২ জন কুশীলবকে দিয়ে অভিনয় করানো বাংলা মঞ্চের ক্ষেত্রেও এক অভিনব ভাবনার প্রকাশ।

সমাজের প্রান্তিক মানুষজনদের পক্ষে নিয়ে এ ধরনের নাটক রচনা ও নির্দেশনা দেওয়ার কৃতিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য। তিনি চিরাচরিত পথ অবলম্বন করেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছেন। বৃদ্ধাবাস ও বার্ধক্যের ক্ষেত্রেও শ্রেণিগত যে বৈষম্য, তা তুলে ধরতে পারার মধ্যে চিন্তার প্রসারতা লক্ষ করা যায়। যারা অর্থবান আর যারা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে দিনাতিপাত করেন তাঁদের জীবনযাপনের মধ্যে বিস্তর ফারাক। যদিও তাঁরা সকলেই বার্ধক্যের শিকার। 'শূন্যপট' এমনই সব নিঃসঙ্গ বার্ধক্যের গল্প। নির্মম সত্যের ছবি তৈরি করেছেন নির্দেশক। গর্ভজাত সন্তান সন্ততির অবহেলার শিকার এই বৃদ্ধের দল। তাদের মধ্যে অনেকেই রোজগারের জন্য ঠোঙা বানায়। দর্শক চিত্তে এসব দৃশ্য ঘটনা এক অদ্ভুত অভিঘাত তৈরি করে। এ নাটকে খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ পরিকল্পনায় গৌতম ঘোষের আবহে এবং সঞ্চয়ন ঘোষের মঞ্চ নির্মাণে তৈরি হয়েছিল 'শূন্যপট' নাটকের পটভূমি। সীমা মুখোপাধ্যায় ক্রমশ নিজেকে পরিণত করে তুলেছেন এবং বাংলার মঞ্চে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে মহিলা নাট্যনির্দেশকদের মধ্যে নিজের স্থান অধিকার করেছেন।

## ডলি বসু (১৯৫৬)

বাংলা নাট্যমঞ্চে যে নারী নির্দেশকরা এগিয়ে এসেছিলেন স্বেচ্ছায় অথবা পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করেছিল নির্দেশনার কাজে যুক্ত হতে তাঁদের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ্য ডলি বসুর নাম। বাংলাভাষী না হয়েও বাংলা নাটকের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগ, যে নিবিড় সম্পর্ক, নাট্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান তা আমাদের বিস্মিত করে। শুধু বাংলা নাটকে বাংলার মঞ্চে অভিনয় নয়, নিজে নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করে সেই দলের সম্পাদিকা হিসেবে দল চালনা করা, নাটকের নির্দেশনা দেওয়া, নাটকের মাধ্যমে শিশুদের থেরাপি ও প্রশিক্ষণ দেওয়া সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর দায়বদ্ধতা, অভিনিবেশ, উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষণীয়। ১৯৯৫ সালের ১৯ জুন প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁদের নিজস্ব নাট্যদল 'চুপকথা'। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব অসিত মুখোপাধ্যায় ছিলেন ডলি বসুর নাট্যজীবনের পথপ্রদর্শক। থিয়েটার যে একটা শক্তিশালী মাধ্যম, থিয়েটারের মধ্যে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনার দিক এই বোধ তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল অসিত মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে। তাঁর নিজের কথায় 'সত্যি বলতে কি 'চুপকথায়' আসার আগে, অসিতদা (অসিত মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে কাজ করার আগেও আমি থিয়েটার করেছি। থিয়েটারের যে কি শক্তি ও সম্ভাবনা তখন আমি বুঝতে পারিনি।'[২৬]

ডলি বসু ছোটোবেলা থেকেই নাটকের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। বাবা-মা দিল্লির মানুষ হলেও তাঁদের বিবাহের পর তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন এবং ডলি বসুর জন্ম হয় কলকাতাতেই। তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা, তাঁর সাংস্কৃতিক মানসিকতা গড়ে উঠেছিল পশ্চিমবাংলার মাটিতে, বাংলার জলহাওয়ায়। হিন্দি মাধ্যম স্কুল

‘অভিনব ভারতী’তে মন্টেসরী, এরপর ভর্তি হন বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন স্কুলে। এখানে পড়াশুনার সঙ্গে চলছিল নাচ, গান, নাটকে অভিনয়। হিন্দি মাধ্যম স্কুল হলেও বাংলা ছিল আবশ্যিক— তাই বাংলাতেও নাটক করেছেন। যে পাড়ায় তাঁর শৈশব কৈশোর অতিবাহিত হয় সেই ডোভার লেনের পরিবেশ প্রতিবেশীদের আত্মীয়তা, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বতঃস্ফূর্ত, বাংলা সংস্কৃতি চর্চা তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ছোটোবেলাতেই ‘অনামিকা’ সংস্থায় নাটক বিভাগে শিশুশিক্ষা হিসেবে কাজ করেছেন। কলেজে পড়ার সময়ও নাটকের আগ্রহ তাঁর কমেনি। কিন্তু কলেজ জীবন শেষ করেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়— এবং নাট্য জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে প্রায় আট বছর। নিজের জীবনের এই পর্যায়কে তিনি বলেছেন ‘অন্ধকার সময়’ বা ‘ডার্ক এজ’ (Dark Age)। সেসময় কোনও নাটকের অনুষ্ঠানে নিজে যুক্ত হতেন না এমনকি দেখতেও যেতেন না। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পুত্রবধূ হিসেবে তাঁর নিজস্ব ও পারিবারিক কিছু বিধিনিষেধ এ সময় তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু একজন শিল্পীর অন্তর্গত যে তীব্রতা, ক্ষুধা এই সময় সেই যন্ত্রণা তিনি ভেতরে ভেতরে অনুভব করতেন। থিয়েটারের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কতটা তীব্র যখন তিনি আট বছর থিয়েটার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন তখন এই বিষয়টা বেশি করে বুঝতে পেরেছিলেন। আবার যখন তিনি ফিরে এলেন, রিহার্সাল শুরু করলেন তিনি বুঝতে পারলেন থিয়েটার তাঁর জীবনকে কতখানি অধিকার করে আছে।

‘Yet when I got back to rehearsals, I realised how much I had been missing something I really, really loved.’[২৭] থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর আবার যোগাযোগ ঘটে ছোটোবেলার ‘অনামিকা’য় নাটক করার সময়কার বন্ধু প্রদীপ অরোরার মাধ্যমে। তিনি যোগাযোগ করিয়ে দেন সোহাগ সেনের সঙ্গে। সোহাগ সেন তাঁর নাটকের জন্য এইরকমই একজন অভিনেত্রীর খোঁজ করছিলেন। ডলি বসুর নাট্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল। সেই সময় তাঁর জীবনে ফিরে এসেছিল তার কলেজ জীবনের নাটক করার দিনগুলোর আনন্দ। ‘রিহার্শাল দিচ্ছি, আড্ডা মারছি, ভাঁড়ে চা-মানে গোয়িং ব্যাক টু মাই লুজ সারকিট্।’[২৮]

নাট্যজীবনের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে ডলি বসু কয়েকটি নাটকে অভিনয় করলেন— শিবকুমার ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে ইংরেজিতে ‘ডলস হাউস’-এ, ‘অনামিকা কলাসঙ্গম’ প্রযোজিত মারাঠী নাটক মহেশ এলকুঞ্চয়ার রচিত ‘ওয়াড়া চিরেবন্দী’—নাটকের হিন্দি রূপান্তর ‘উত্তরাধিকার’-এ ছোটো বৌ-এর চরিত্রে, বাদল সরকারের ‘যদি আর একবার’-র হিন্দি অনুবাদ ‘একবার ফির সে’, সোহাগ সেনের ‘পার্টি’তে তাঁর অভিনয় তাঁকে নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা দেয়। ঊষা গাঙ্গুলির ‘রুদালী’ নাটকেও মাঝে মাঝেই কারোর বদলে অভিনয় করেছেন। ঊষা গাঙ্গুলী পরিচালিত ‘খোঁজ’ নাটকে ডলি বসুকে একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ের

জন্য নির্বাচন করা হয়। এ নাটকে অসিত মুখোপাধ্যায়ও আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে থিয়েটার সম্পর্কিত ভাবধারার একটা পরিবর্তন ঘটে ডলি বসুর জীবনে। এর আগে তিনি অসিত মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখেছেন, 'গান্ধার' প্রযোজিত 'নীলাম নীলাম', 'তখন বিকেল' ইত্যাদি নাটকে, একসঙ্গে ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবিতেও কাজ করেছেন। কিন্তু 'খোঁজ' নাটকে কাজ করার সময় অত্যন্ত কাছ থেকে তাঁকে দেখা, তাঁর নিয়মানুবর্তিতা, থিয়েটারের প্রতি প্যাশন, অভিনয় শিক্ষা সমস্ত কিছু তাঁকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে— তাঁর সামনে থিয়েটারের একটা ভিন্ন জগৎ উন্মোচিত হয় এবং তিনি অসিত মুখোপাধ্যায়কে তাঁর নাট্যজীবনের গুরু বলে স্বীকার করে নেন। অসিত মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তিনি জানান—'তাঁর অনেস্টি টু থিয়েটার, থিয়েটারের প্রতি সততা—আমাকে নাড়িয়ে দিল। ... আসলে আমি একজন গুরুর খোঁজ করছিলাম। অসিতদার মধ্যে সেই গুরুকে খুঁজে পেলাম আমি।'[২৯] অসিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ডলি বসুর নাট্যসম্পর্কিত ভাবনা মিলে যাওয়ার ফলেই তাঁকে গুরু বলে মেনে নেওয়া এবং এক নতুন নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা করা। তাঁদের নতুন নাট্যদল 'চুপকথা'-র জন্ম ১৯৯৫ সালের ১৯ জুন। ডলি বসু হিন্দি নাটক করবেন আর অসিত মুখোপাধ্যায় বাংলায় এই দুটো ইচ্ছে পরিপূরক হ'য়ে জন্ম হল 'চুপকথা'র। প্রথম থেকেই এই নাট্যদলের সম্পাদিকা ডলি বসু। দলের যাবতীয় কাজ— লোগো তৈরি বা রবার স্ট্যাপ তৈরি থেকে দল পরিচালনা করা, নাটকের পোশাক, সেট ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য করা সর্বোপরি অর্থনৈতিক দায়ভার সামলানো— সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন ডলি বসু। তবে নির্দেশনার কাজটি প্রথমাবধি করেছেন অসিত মুখোপাধ্যায় নিজে। এতরকম থিয়েটার সম্পর্কিত কাজ এবং অভিনয় একই সঙ্গে পালন করেছেন ডলি বসু। 'চুপকথা'র জন্ম থেকে তাঁর নাট্যজীবনের তৃতীয় পর্যায়ের এবং বলা যেতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সূচনা। এই পর্বে তাঁর অভিনেত্রী সত্তা ক্রমশ বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন নাটকে জটিল গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের রূপায়ণে এবং এইপর্বেই তিনি নির্দেশনার কাজে যুক্ত হন।

ডলি বসু নিজে কখনো নির্দেশক হবার কথা ভাবেননি। তবে 'চুপকথা' তৈরি হবার পর অভিনয় ছাড়াও নির্দেশনা বা প্রযোজনায় সহযোগিতা করা, পোশাক পরিকল্পনা করা, সেট ও লাইট সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা—এই কাজগুলো করে গেছেন। তাই অসিত মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর ডলি বসুর পক্ষে নির্দেশনার দায়িত্ব তুলে নিতে কার্যত অসুবিধা হয়নি কারণ তিনি মনে করতেন তাঁদের বেঁচে থাকতে হবে কাজের মধ্য দিয়ে।

'চুপকথা'র প্রথম নাটক 'আকরিক'। যদিও এই নাটকটি 'গান্ধার'-এর প্রযোজনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয়

আর অসিত মুখোপাধ্যায় ‘গান্ধার’ ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর ‘চুপকথা’র প্রযোজনা আকরিক মঞ্চস্থ হতে থাকে। এ নাটকের পোশাক পরিকল্পক এবং সহ নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছিলেন ডলি বসু। শুধু তাই নয় নাটকটির ষোলোতম অভিনয় থেকে ঊর্মিমালা বসুর পরিবর্তে মাত্র আঠাশ দিনের মধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে তিনি মঞ্চে অভিনয় করেন। ‘তখন বিকেল’ নাটকেও শিপ্রা লাহিড়ীর চলে যাবার পর মুখ্য চরিত্রে ডলি বসুকেই অভিনয় করতে হয়। দলের সংকটকালে এভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন ডলি বসু। দলের প্রতি তার এই সাহসী ও সদর্থক ভূমিকা পরবর্তী সময়ে নির্দেশনা কর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করেছে নিঃসন্দেহে। প্রথমাবধি ‘চুপকথা’ নাট্যগোষ্ঠীর সম্পাদিকা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। একটি নতুন দল তৈরি করা এবং দলের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো তৈরি করা— অত্যন্ত জরুরি বিষয়। সেই ক্ষেত্রটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন ডলি বসু। ‘চুপকথা’ তৈরি হবার পর তিনিই বলেছিলেন ‘ফিন্যানশিয়াল ব্যাপারটা আমিই সামলালাম’ কিংবা অন্যত্র, শ্যাম ভী থী ধুঁয়া ধুঁয়া প্রসঙ্গে বলেছেন ‘ইনভেস্টমেন্ট অনেকটাই আমার ছিল।’ শুধু অর্থনৈতিক সংকটমোচন বা দল পরিচালনার ক্ষেত্রে নয় দলের সর্বোচ্চ শক্তির অবর্তমানে পারিপার্শ্বের পরিস্থিতির মোকাবিলা করে দলকে সচল রাখতে চেয়েছেন—‘We needed to immerse ourselves in work, after the setback.’[৩০]

তাঁরা পুরোনো প্রযোজনা ‘আকরিক’, ‘জন্মদিন’ সচল রাখলেন নতুন প্রযোজনার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। বিভিন্ন নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে তাঁর অভিনয় যেমন ক্রমশ তাঁর অভিনেত্রীসত্তাকে বিকশিত করেছে তেমনি অসিত মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁকে তুলে নিতে হয়েছে দলকে সঠিকভাবে চালনার দায়িত্ব এবং নাট্যনির্দেশনার কাজ একই সঙ্গে। তিনি তাঁর নিজস্ব সত্তার বিকাশ চেয়েছিলেন— ‘They would invariably refer to me as the chief minister’s dauther-in-law. But I would like to have an identity of my own.’[৩১] পরিচালনা বা নাট্যনির্দেশনা বলতে তিনি মনে করেন শুধু কোথায় দাঁড়াব বা কীভাবে কথা বলব, কীভাবে ডায়ালগ বলব তা নয়— আরও গভীরতম দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব হল যে কথাগুলি তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে বিশ্বাস করেন তার-ই প্রকাশ। ফলত এই বিশ্বাস বা জেদ তাঁকে অসিত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর এতগুলো বছর পরেও দলকে চালিয়ে নিয়ে যাবার সাহস জুগিয়েছে। এই নেতৃত্বদানের ক্ষমতার জন্যই ডলি বসু বাংলা নাট্যসমাজে সম্মাননীয় নাট্যব্যক্তিত্ব। গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়সীমায় তাঁর তিনটি নাট্য প্রযোজনার প্রসঙ্গই আলোচিত ও বিশ্লেষিত হবে। এই নাটকগুলি হল— (১) সুন্দর (হিন্দি), (২) দুই তরঙ্গ, (৩) মিসেস সোরিয়ানো।

‘চুপকথা’র মূলভাবনাই ছিল ভালো বাংলা প্রযোজনাগুলি হিন্দি ভাষায় রূপায়িত করা যাতে বাংলা

প্রযোজনাগুলি আরো অনেক দর্শকের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। ‘সুন্দর’ নাটকটি হিন্দিতেই প্রথম মঞ্চায়ন ঘটায় ‘চুপকথা’। যদিও মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত এ নাটক রচিত হবার অনতিবিলম্বে কলকাতা দূরদর্শন নাটকটি টেলিভিশন উপযোগী করে সম্প্রচার করে এবং বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। ‘সংস্তব’ নাট্যগোষ্ঠীও দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বাংলায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এরপর প্রায় দশ বছর পর ‘চুপকথা’র প্রযোজনায় ডলি বসুর নির্দেশনায় ‘সুন্দর’ হিন্দিতে উপস্থাপিত হয়। হিন্দিতে অনুবাদ করেন রফিকী আনজুম; শুধু জনপ্রিয়তা নয় নাটকটি লাভ করে ‘লাইলায়নস্’ কলাকার পুরস্কার (‘Lions’ Kalakar Award)-ও।

নাটকের বিষয়বস্তুতে নাট্যকার এক অভিনব ভাবনার রসদ লুকিয়ে রেখেছেন। সৌন্দর্য সম্পর্কে গভীরতর এক ভাবনার উন্মোচন এই নাটকে। এ নাটক প্রকারান্তরে মানুষকে শেখায় যে মানুষের অন্তরে কোথায় লুকিয়ে আছে সৌন্দর্য। অন্তরের সৌন্দর্য-ই আসল, বাকি সব সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। এ নাটকের মূল চরিত্র মল্লিকা— একটা চাকরির জন্য সে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি অফিসে ইন্টারভিউ দিতে এসে তার সঙ্গে দেখা হয় এক যুবকের। সেই যুবক সৌরভই মল্লিকাকে শিখিয়ে দেয় জীবনে আনন্দে থাকবার ও অন্যকে আনন্দে রাখবার এক অমোঘ মন্ত্র। তা হল অপরের মধ্যে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করা ও বলা — ‘তুম সুন্দর হো’। সৌরভ তার ছোট্ট গণ্ডীতেই আবিষ্কার করে সেই চিরন্তন সত্যকে— সে সত্য মানুষকে দেখতে শেখায় চারপাশের জগতে কোথায় ছড়িয়ে আছে আনন্দ। এই রকম একটি বিষয় নিয়ে নাট্যকারের ভাবনাকে মঞ্চে রূপায়িত করলেন নির্দেশক ডলি বসু।

এ নাটকে মুখ্য চরিত্রে দোয়েল বসু নিজেকে প্রমাণ করছেন তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা ও অভিনয় প্রতিভা দিয়ে। তার অভিব্যক্তিময় মুখচ্ছবি নাটকের মূল চলনকে ধরে রাখে— কেননা এক জন মানুষ একেক রকম ভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়— তাদের প্রত্যেকের মনোজগতের আকার বিচিত্রধর্মী, বিচিত্রবর্ণী। এই রকম গভীর এক দার্শনিক বিষয়কে হাস্যোচ্ছলে, কৌতুকের মোড়কে পরিবেশন করা ও দর্শকের সমর্থন আদায় করে নেওয়ার কৃতিত্ব নির্দেশকেরই প্রাপ্য।

নাটকের কুশীলব প্রায় সবাই বাঙালি সেক্ষেত্রে ডলি বসু বা নির্দেশকের একটা অতিরক্ত দায়িত্ব থাকে। কারণ মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় অভিনয় করা যথেষ্ট কঠিন। ডলি বসুকে একই সঙ্গে হিন্দি ভাষায় সংলাপ বলানো রপ্ত করানো ও অভিনয় শিক্ষা দুটি দিকেই নজর দিতে হয়েছে। ‘সুন্দর’ ছোটো নাটক এবং ডলি বসুর প্রথম নির্দেশনার কাজ হলেও দর্শকচিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছিল গল্পের অভিনবত্ব এবং নির্দেশকের পরিমিতিবোধের কারণে। অসিত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর যে তিনটি নাটক তিনি নির্দেশনা দিলেন—

'সুন্দর', 'দুই তরঙ্গ' ও 'মিসেস সোরিয়ানো'— তিনটি প্রযোজনাই ছিল তাঁর কাছে সমান প্রিয়, প্রায় সন্তানসম। কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটাকে গ্রহণ করতে তিনি নারাজ। All the three plays are very dear to me. Every line I have uttered in each play in what I have believed in.[৩২]

ডলি বসুর দ্বিতীয় নির্দেশনা দুই তরঙ্গ— দুটি ছোটো ছোটো নাটকের ভিন্ন ভিন্ন উপস্থাপনা হলেও এদের মূলসুরের মধ্যে কোথাও একটা সূক্ষ্ম যোগাযোগ লক্ষ করা যায়। 'দুই তরঙ্গ' নির্মিত হয়েছে দুটি ভিন্ন ভিন্ন গল্পের ভিত্তিতে। প্রথম গল্পটিতে এক নিদারুণ নিঃসঙ্গতার কথা বলা হয়েছে। যে নিঃসঙ্গতা সবসময়ে উষ্ণতা খোঁজে জীবনের উত্তাপ চায়। দ্বিতীয় গল্প বা নাটকটিতে নবনীতা যে সব সূক্ষ্ম পরিহাস প্রিয়তার মধ্য দিয়ে গভীর এক বিষয়ের অনুসন্ধান করা হয়েছে—তা হল ভালোবাসা। সত্যিকারের ভালোবাসার খোঁজ পাওয়া বাস্তবিকই দুষ্কর—সেই কথাগুলিই খুব হাল্কাভাবে মজা ও হাসির মধ্য দিয়ে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন লেখিকা তা দশর্ককে যেমন কৌতুকের আবহের মধ্যে রাখে তেমনি ভাবনার উদ্রেক করে। প্রথম নাটকটির অবলম্বন 'ধূপ কা এক টুকরা'— বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক নির্মল ভার্মার লেখা। দ্বিতীয়টি নবনীতা দেবসেনের একটি রম্য রচনা 'ভালোবাসা কারে কয়'-এর নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। দুটি বিষয়কে একজায়গায় মেলাতে চেয়েছেন নির্দেশক—'There's a Common Strain in both, despite the apparent polarity in structure and content.'[৩৩] দুটি একাঙ্কতেই এক নারীর যাত্রার কথা বলা হয়েছে। প্রথম গল্পটিতে মূল সুর বিষাদের আর দ্বিতীয়টিতে হাস্যরস। জীবনের গতিপথ তো এভাবেই কান্নাহাসির পৌষ-ফাগুনের পালার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছে।

প্রথম একাঙ্ক 'এক টুকরো রোদ'-এ দেখা যায় একটি নির্জন পার্কের দৃশ্যসজ্জা। সেখানে বেঞ্চিতে বসে আছেন এক বৃদ্ধ— নিশ্চুপ, স্থবির, নির্বাক। এই সময়ে পার্কে আসে একটি মেয়ে বিবাহবিচ্ছিন্না এই মেয়েটির জীবনে যে অপূর্ণতা নিঃসঙ্গতা তা যেন শৈত্যপ্রবাহের মতো, সে উষ্ণতা চায়। যে নিঃসঙ্গতা কুড়ে কুড়ে নিঃস্ব করে তাকে সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে এক রৌদ্রপিয়াসী নারীর আত্মকথনে প্রকাশ পায় তীব্র হাহাকার। কোনো খেদ নেই তার, আছে জীবনের উত্তাপের জন্য অন্বেষণ। এই একাঙ্ক নাটকের মূল চরিত্র— লেখিকা দীপাবলী দস্তিদারের কাছে কাগজের অফিসের সম্পাদকের আর্জি যে তাকে প্রেম সম্পর্কে একটি লেখা লিখতে হবে। কিন্ত লেখিকার কোনও ধারণা নেই এ যুগের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে। তিনি তখন মেয়ের বন্ধুবান্ধবদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রেম সম্পর্কে একটা ধারণা গড়তে চান। কিন্তু নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কোনও মাথাব্যথা নেই এ বিষয়ে। দুরন্ত গতির জীবনে থিতু হবার, ভালবাসার সময় নেই তাদের। তারা নিজেদের স্বার্থের গণ্ডিতেই নিজেদের আটকে রাখে। প্রেমহীন আকাঙ্ক্ষাময় জীবন তাদের।

অবশ্য লেখিকা শেষকালে এসে খুঁজে পায় প্রেমের সংজ্ঞা। নিজের মধ্যেই সেই ভালোবাসার খনি। জীবনের ইতিবাচক দিকটা খুঁজে পেলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। নবীনতা দেবসেনের নিজের জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে যেন এই গল্পে। দ্বিতীয় একাঙ্কটিতে দেখানো হয়েছে জীবনের এক বড়ো প্রগতির দিক হল ভালোবাসার অন্বেষণ। এখানে এক লেখিকাকে ভালোবাসা বিষয়ক লেখা লিখতে দেবার 'deadline' দিয়ে দেওয়া হয়েছে। লেখিকার মনে নানান প্রশ্ন উঠতে থাকে ভালোবাসা বস্তুটি সম্পর্কে। সেই সূত্রে তার সামনে হাজির হয় নানান জিজ্ঞাসা, নানান চরিত্র। মজার সংলাপের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে লেখিকা পৌঁছে যান নিজস্ব সিদ্ধান্তে। দুটি একাঙ্কে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্রে রূপদান করেন ডলি বসু।

অনেকেই সমালোচনা করেছিলেন যে প্রথম কাহিনিতে বিষয়ের গভীরতা থাকলেও নাট্যবুননে কিছু খামতি ছিল। হয়তো কাহিনির সাহিত্যগুণ থাকলেও নাট্যগুণ ততধিক ছিল না। তুলনামূলকভাবে নবনীতা দেবসেনের কাহিনিতে হাস্যরসের উপাদান অনেক বেশি। ফলে সহজেই তা দর্শকের কাছে পৌঁছে যায়। হয়তো অচেতনভাবেই নির্দেশক দুটি ভিন্নধর্মী ভিন্নস্বাদের গল্প বেছে ছিলেন বৈচিত্র্যের কারণে, নিজের অভিনয়ের সীমানার ব্যাপ্তির প্রমাণ রাখতে। এক অভিনেত্রীর এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকতেই পারে। সে দিক থেকে ডলি বসু নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পত্রপত্রিকায় তাঁর অভিনয় ও নির্দেশনা প্রশংসিত হয়েছিল। 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায় লেখা হয় 'একটি পূর্ণ সময়ের নাটককে একা টেনে নিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই সহজ নয়, ডলি তা পেরেছেন অনায়াসে।'[৩৪] অভিনয় ছাড়াও মঞ্চ, সংগীত ও আলোর ক্ষেত্রে সে তিনজন স্থপতি তাপস সেন (আলো), খালেদ চৌধুরি (মঞ্চ), মুরারি রায় চৌধুরী (সংগীত) এ নাটকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদের দক্ষতা ও কর্মকুশলতা এ নাটকের সম্পদ।

নিজেও ডলি বসু অভিনেত্রী ও নির্দেশক হিসেবে স্বচ্ছন্দ ছিলেন এ নাটকে। 'দুই তরঙ্গ' নাটক সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত— 'আমার নতুন নাটক 'দুই তরঙ্গ' দুটো একাঙ্ক। দুটো নাটকেই প্রধান চরিত্র একটি মেয়ে। দুটো মেয়েই একা সংলাপ বলে। প্রথম নাটকে একটি মেয়ে সংসার, ভালোবাসা সব হারিয়ে একটি পার্কে এক চিলতে রোদ্দুরের সন্ধানে আসে। সামনের চার্চে নববিবাহিত যুবক যুবতীরা আসে। মেয়েটি সেই দৃশ্য দেখে স্মৃতির পথ ধরে হেঁটে যায় তার অতীতের ভালবাসার দিনগুলিতে। সে কাউকে দোষারোপ করে না, কাউকে অভিশাপ দেয় না। দ্বিতীয় নাটক নবনীতা দেবসেনের 'ভালবাসা কারে কয়' গল্প অলম্বনে। হাল্কা মেজাজের মধ্যে দিয়ে একটি নারী অনুসন্ধান করতে থাকে প্রেমের সংজ্ঞা।'[৩৫]

'দুই তরঙ্গ' নাটকে অভিনয়ের জন্য ডলি বসু পঃ বঃ সরকার প্রদত্ত নাট্য আকাডেমির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর

পুরস্কার পান। তিনি নিজেকে এই নাটকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। অসিত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ পরবর্তী জীবনে নিজেকে এবং দলকে নিয়ে তাঁর সামনে বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। নির্দেশনার ক্ষেত্রে সেই সময় তিনি একেবারে অনভিজ্ঞ। কিন্তু নিজের মধ্যে তিনি সেই সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন এবং নিরন্তর একটা জেদ আগুনের মতো জ্বলেছে। 'দুই তরঙ্গ' নাটকে প্রথম গল্পে একটিই নারী আর একজন বৃদ্ধ তাদের কোনও নাম নেই। আর দ্বিতীয় গল্পে একটি নারী চরিত্র অনেকগুলি নাম— এই বিচিত্র নামধারী চরিত্রগুলিকে আলাদা আলাদা করে রূপ দেন ডলি বসু। তাঁর কাছে প্রত্যেকটা চরিত্রই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটা চরিত্রের ভিতরে ঢুকে গিয়ে চরিত্রের রক্ত-মাংসের চেহারাটাকে বের করে আনা, চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলা— যা প্রত্যেক অভিনেতারই কাম্য। নির্দেশক হিসেবেও তিনি চেয়েছিলেন যে প্রথমে শারীরিক বা আঙ্গিক বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তারপর ধীরে ধীরে চরিত্রের ভেতরে ঢুকে যাওয়া।

'দুই তরঙ্গ' নাটকটি এমনভাবে তৈরি করেছিলেন ডলি বসু যাতে যেখানে খুশি এ নাটকের অভিনয় করা সম্ভব। এ কারণেই মঞ্চভাবনা ছিল অতিশয্যহীন। একটা পার্কের বেঞ্চে নির্জন পরিবেশে এক বৃদ্ধ, বই পড়ছেন। মহিলার হাতে একটা ব্যাগ আর দ্বিতীয় নাটকে চেয়ার টেবিল ও একটা টেলিফোন। তাই দেখা যায় অল্পসংখ্যক সহযোগীদের নিয়ে ডলি বসু একক অভিনয় করছেন শুধুমাত্র চিরাচরিত অডিটোরিয়ামগুলিতে নয়, ছোটো কোনও হল, কোনও বিপণী, কখনো বা স্যাটার ডে ক্লাবের ছোটো হলে, কখনো অনধিক একশ জন মহিলা দর্শকের সামনে হুগলির হেস্টিংস কোর্টে মহিলা স্টাডি গ্রুপের পরিচালনায়। সেই দিক থেকে বিচার করলে 'দুই তরঙ্গ' সমসময়ের নাটকগুলির মধ্যে ছিল অনায়াসগম্য নাটক। এই ভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে দুটি নাটককে বাঁধা এবং যেখানে খুশি উপস্থাপনার কৌশল আবিষ্কার ডলি বসুর নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ। যেহেতু এ নাটকের তিনি নির্দেশক তাই নির্দেশনার কতগুলো 'মুন্সিয়ানা তিনি দেখাতে পেরেছেন। সমালোচকেরাও তাঁর শুরুর দিককার কাছে যথেষ্ট সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছিল 'আশা করি এ দুটি সংক্ষিপ্ত তরঙ্গে অবগাহন করে শ্রীমতী বসু অভিনেত্রী ও নির্দেশিকা হিসেবে তাঁর নাট্যদল নিয়ে খুব শিগগরিই শক্ত জমিতে এসে দাঁড়াবেন— আমাদের থিয়েটার পাবে আর একজন সমর্থ মহিলা নির্দেশক।'[৩৬]

যে সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে লক্ষ করেছিলেন দর্শক ও সমালোচকেরা তাঁর নির্দেশনার সেই সম্ভাবনা পরিণততর হয়ে উঠল পরবর্তী প্রযোজনা পূর্ণাঙ্গ নাটক 'মিসেস সোরিয়ানো'র ক্ষেত্রে। নাটক নির্বাচন থেকে চরিত্রগুলির যথাযথ রূপায়ণ, মঞ্চ-সঙ্গীত-আলোর ক্ষেত্রে অধিক সচেতনতা তাঁর পরিণততর ভাবনারই প্রকাশ ঘটালো। একজন নির্দেশক হয়ে ওঠার জন্য অনেকগুলো বিষয়ে ব্যুৎপত্তি থাকাটা জরুরি। ডলি বসু

তাঁর অভিনয় জীবনের তৃতীয় পর্বে এসে থিয়েটারের নানান বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং নিষ্ঠা সহকারে সে-সমস্ত কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। 'চুপকথা'-র প্রযোজনা 'আকরিক' মঞ্চস্থ হবার সময়ে তিনি প্রপ্‌স্‌, সেট নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেন। 'জন্মদিন'-এর সময় থেকে তাঁর সচেতনতা আরও গভীর হয় যখন তিনি খালেদ চৌধুরি তাপস সেন-র সঙ্গে থেকে কাজের ক্ষেত্রগুলোকে আরও বুঝতে থাকলেন, অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকলেন। মঞ্চভাবনা কেমন হবে? এই রকম আলো হবে কেন বা আলোর রঙ কি হবে ইত্যাদি প্রশ্নগুলো তাঁকে আরও বেশি নাটকের সঙ্গে নির্দেশনা সংক্রান্ত আগ্রহ তৈরি হচ্ছিল। যেহেতু অসিত মুখোপাধ্যায় অনেক বেশি নির্ভর করতেন দুই বিশিষ্ট শিল্পীর উপর (খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন) ডলি বসুও তাঁদের ওপরই নির্ভর করলেন যখন তিনি নিজে নির্দেশক হিসেবে কাজ শুরু করলেন। তাঁর নির্দেশনা পর্বে এঁরা হয়ে উঠলেন ডলি বসুর অভিভাবক। 'মিসেস সোরিয়ানো' নাটকে নির্দেশক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা ও নাট্যশিক্ষাকে যথাযথভাবে কাজে লাগালেন।

নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন নির্দেশকের বিশেষ ভূমিকা থাকে। ডলি বসুর পরবর্তী নির্দেশনা মিসেস সোরিয়ানোর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় এ নাটকে নারীর অধিকারের লড়াইকে প্রাধান্য দিয়েছেন নির্দেশক। ইতালীয় নাট্যকার Eduardo de Filipo রচিত Filumena Marturano মূল নাটকটির অনুবাদ করেন নাট্য অভিনেতা নির্দেশক অরুণ মুখোপাধ্যায় এবং পরিমার্জনা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নাটকটির নাম বদল করে 'মিসেস সোরিয়ানো' নামকরণ হয় তার কারণ মূল নামকরণের মধ্যে দিয়ে ফিলুমেনা— এ নাটকের মূল নারী চরিত্রের আত্মসম্মানের লড়াইটাকেই গুরুত্ব দেওয়া হল।

ফিলোমেনা মারতুরানো চেয়েছিল মিসেস সোরিয়ানো হয়ে আইনী স্বীকৃতি লাভ করতে। পুরুষশাসিত সমাজে ধনবান দাম্ভিক ক্ষমতালোভী পুরুষের নারীকে ব্যবহার করার যে প্রবণতা খানিকটা কৌতুকের বা কমেডির মোড়কে তাকেই বিদ্ধ করা হয়েছে এ নাটকে। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে একটি মেয়ে তার জীবনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেখানে পৌঁছল সেই পথটাকেই। কোথাও সোচ্চারভাবে প্রচারিত হয়নি নারীর স্বাধিকার রক্ষার প্রতিবাদ কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় এবং ফিলুমেনার জেদ আত্মসম্মান অর্জনের সংগ্রামে, তার বুদ্ধিমত্তায় পরাজিত হয় জেমেনিকো সোরিয়ানোর দৌরাত্ম্য অহঙ্কার ও ব্যভিচার। এ নাটক সমাজের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ।

জেমিনিকো সোরিয়ানো সম্ভ্রান্ত উচ্চবিত্তশীল সমাজের এক প্রতিষ্ঠিত পুরুষ। পঁচিশ বছর অগে যুবক সোরিয়ানো কোনও এক বেশ্যালয় থেকে বাড়িতে নিয়ে আসে পতিতা ফিলোমেনাকে। এতগুলো বছর

ধরে সোরিয়ানোর বাড়ির দেখাশুনা করছে ফিলোমেনা, তাকে ভালোবেসেছে। তার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে, তার ব্যবসার কাজে সাহায্য করেছে, গৃহস্থালির সমস্ত রকম কাজকর্ম করেছে এই আশায় যে একদিন সে যোগ্য সম্মান পাবে, সোরিয়ানো তাকে স্ত্রী হিসেবে আইনি স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু পরিবর্তে ফিলোমেনা বঞ্চনার শিকার হয়। জেমিনিকো সোরিয়ানো আগের সেই যৌবনের উদ্দমী পুরুষ না হলেও আকর্ষিত হয় অল্পবয়সী ডায়ানার প্রতি এবং তাকে বিবাহ করবার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠে। চিন্তিত ফিলোমেনা কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া উপায় থাকে না। সে অসুস্থতার ভান করে, মৃত্যুপথযাত্রী হিসেবে সোরিয়ানোকে জোর করে তাকে বিবাহ করবার জন্য সোরিয়ানো রাজিও হয়। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ফিলোমেনার মৃত্যু হলে সে আবার ডায়ানাকে বিবাহ করতে পারবে এই আশায় বিবাহকার্য সম্পন্ন করে। কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হবার পরই চাতুরী ছেড়ে ফিলোমেনা শয্যা থেকে লাফিয়ে ওঠে। সোরিয়ানো সমস্ত বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে চিৎকার করতে থাকে। তাতে অবশ্য ফিলোমেনার কিছু আসে যায় না কারণ সে ততক্ষণে মিসেস সোরিয়ানোতে পরিণত। তার আইনি স্বীকৃতি লাভ করা হয়ে গেছে। নিশ্চিন্তে সে সোয়েটার বুনতে থাকে। নানান ধরনের কৌতুককর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তীব্র জটিল মানবিক সম্পর্কগুলি উন্মোচিত হতে থাকে ডলি বসুর পরিচালনার মুন্সিয়ানায়। নাটকের শুরু যেভাবে করেন সেখান থেকেই বোঝা যায় নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি ক্রমশ কতটা পরিণত হয়ে উঠছেন। পর্দা খুললেই দেখা যায় নাটকের চরিত্ররা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরে সেই স্তব্ধতাকে ভেঙে জেমিনিকো সোরিয়ানোর সেই চিৎকার। এখান থেকেই দর্শক ঢুকে পড়ে নাটকের অন্দরে। বিবাহের পর জেমিনিকো যখন জানতে পারল ফিলোমেনার পরিকল্পনা তখনই সে চিৎকার করতে শুরু করল। এই মধ্যপথ থেকে নাটক শুরু করে কাহিনি অতীতকে ছুঁয়ে পরিণতির পথে এগিয়েছে ঘটনা পরম্পরায়।

আরও একটি ক্ষেত্রে ফিলোমেনা জটিল মানবমনের দ্বন্দ্বকে সুকৌশলে উপস্থাপিত করেছে। গোপনে ফিলোমেনা তার তিনটি পুত্রকে মানুষ করেছে সোরিয়ানোর অর্থেই। এই তিন পুত্রের মধ্যে একজন জেমিনিকো সোরিয়ানোর নিজের সন্তান। কিন্তু সোরিয়ানোর নিজের পুত্র কোনটি তা রহস্যে ঢেকে রয়েছে ফিলোমেনা— কিছুতেই প্রকাশ করতে চায়নি। তা প্রকাশ পেলে একটি সন্তানের প্রতি পিতার পক্ষপাত থাকবে— বাকি দুজনার প্রতি ঘটবে স্নেহের অভাব। তিনজনের সম্পর্কের মধ্যেও তৈরি হবে ব্যবধান। অবশ্য শেষকালে গিয়ে সোরিয়ানো নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছে যথার্থ প্রেমিক, স্বামী ও পিতা হিসেবে। সুখী পরিবারের আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশে সমাপ্তি ঘটেছে নাটকের।

এ নাটকের চলনটাই ছিল হাল্কা কৌতুকের মোড়কে কঠিন বাস্তবকে তুলে ধরা। নাটকের কুশীলবরা

যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে নিজস্ব চরিত্রের প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন। মুখ্য ভূমিকায় ডলি বসুর সংযত অভিনয় ও পরিমিতিবোধ যেমন দর্শককে আকৃষ্ট করেছে তেমনি এ নাটকের মধ্যমণি হয়ে উঠেছেন তিনিই। শেষ দৃশ্যে তার চোখের জল, অনুভূতি, নাচের মুহূর্ত অভিভূত করে রাখে দর্শককে। জেমিনিকো সোরিয়ানোর ভূমিকায় জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। আলফ্রেড আমোরোসো-র ভূমিকায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রভুর দীর্ঘদিনের সঙ্গী, কৌতুককর অঙ্গভঙ্গি ও বাচনে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছেন। ডায়ানার চরিত্রে দোয়েল বসুর অভিব্যক্তিময় উপস্থিতি স্বল্প পরিসরেও দাগ রেখে যায়। তিনটি পুত্রের ভূমিকায় ছিলেন তড়িৎ আঢ্য, সায়ক রায়চৌধুরী ও চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী।

সংগীত, মঞ্চ ও আলো— নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি বিষয়ে ডলি বসু ছিলেন বিশেষভাবে সচেতন। তিনি নিজেই সংগীতের দায়িত্বগ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের fairly music সংগ্রহ করে তার বিভিন্ন অংশ নিয়ে Juxtapsoing একটা টোন আনবার চেষ্টা করেছেন এবং নাটকের বিভিন্ন মুডের সঙ্গে মানানসই করে তাকে প্রয়োগ করেছেন। কখনো ইতালীয় লোকসংগীতের ব্যবহারে কখনো ট্যারানটুলার ব্যবহার করে আনন্দঘন মুহূর্ত সৃজনের চেষ্টা দেখা গেছে তাঁর মধ্যে। একদিকে বিদেশি সংগীতের ব্যবহারে একটা আবহ যেমন সৃষ্টি হয়েছে তেমনি আবার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনুবাদের রকমফের ঘটিয়ে ভারতীয় পরিবেশের চেহারা আনবার চেষ্টা করেছেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পরিমার্জনার পরেও নির্দেশকের আরও দায়িত্ব থেকে গেছে কেননা কীভাবে তিনি নাটকটি উপস্থাপন করবেন তা সম্পূর্ণত তাঁর ওপরেই নির্ভর করছে। মঞ্চের ক্ষেত্রে খালেদ চৌধুরী ও আলোয় তাপস সেনের প্রতি যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পূর্ববর্তী সময় থেকে প্রবাহিত এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। দীর্ঘ সময় ধরে এই দুই ব্যক্তির সান্নিধ্য ও কর্মকুশলতা ‘চুপকথা’র নাট্যপ্রযোজনাকে সমৃদ্ধ করেছে। ‘মিসেস সোরিয়ানো’তে সামান্য উপকরণ ব্যবহার করেছে খালেদ চৌধুরী মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে। কোনও বাড়তি চমক সৃষ্টির প্রবণতা তাঁর মধ্যে থাকে না— এখানেও নেই। আতিশয্যহীন অথচ শিল্পসম্মত মঞ্চসজ্জা এবং সুনিপুণ আলোক পরিকল্পনা এ নাটকের গতিকে অব্যাহত রেখেছে।

নির্দেশক হিসেবে ডলি বসু মূলত অসিত মুখোপাধ্যায়ের ঘরানাকেই অনুসরণ করেছেন। অসিত মুখোপাধ্যায়ের ঘরানা অনেকটাই বহুরূপী এবং শম্ভু মিত্রের ধারা প্রভাবিত, যেখানে বাচিক অভিনয়ের গুরুত্ব বেশি এবং উচ্চারিত শব্দগুলিকে নিংড়ে অভিনয়ের উন্মোচনের ওপর জোর দেওয়া হয়। আবার অপরদিকে সবিতাব্রত দত্ত ছিলেন নির্দেশনার ক্ষেত্রে অসিত মুখোপাধ্যায়ের টেকনিকের গুরু। শম্ভু মিত্রের ইনটেলেক্ট এবং সবিতাব্রত দত্তর টেকনিক এই দুটি বিষয়কে অসিত মুখোপাধ্যায় মেলাবার চেষ্টা করেছেন।

ডলি বসু সেই ঘরানাকেই 'চুপকথা'র কাজের মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোথাও কোথাও তাঁর নিজস্ব ভাবনারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তিনি যা বিশ্বাস করেন সেইটেই দেখাতে চান দর্শককে। কোনও কিছু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া নয়। তাঁর মতে নাটক ভিস্যুয়াল আর্ট, কানে শোনাটা থাকবে কিন্তু চোখে দেখাটা বাদ যায় কেন? চোখে দেখা ও কানে শোনার মধ্যে ব্যালান্স রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন তিনি। মিসেস সোরিয়ানো নাটকটির ক্ষেত্রে যেমন করেছেন তা হল নাটকে অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের সুযোগ ছিল কিন্তু নির্দেশক প্রবল পরিশ্রম করেছেন কি করে জায়গাগুলো আরও সহজ করা যায়। অথবা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার বা অশ্লীলতা দেখানোর পক্ষপাতী তিনি নন।

থিয়েটার ডলি বসুর কাছে একটা সেতু বা ব্রিজ। থিয়েটার তাঁকে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছে। কত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক  তৈরি হয়েছে, বন্ধন তৈরি হয়েছে এই থিয়েটারের মাধ্যমেই। দীর্ঘ আট বছর থিয়েটারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকবার পর আবার যখন তিনি থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল তারপর থেকে দীর্ঘ তেইশ-চবিশ বছর ধরে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন ওতপ্রোতভাবে। অভিনয় এবং নির্দেশনার কাজে ব্যাপৃত রেখেছেন নিজেকে। সামাজিক ও মানসিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা শিশুদের নিয়ে পরিচালনা করেছেন মাচেন্ট অফ ভেনিস, 'চুপকথা'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রযোজনায় ছোটোদের নিয়ে করেছেন তলস্তয়ের তিনটি ছোটোগল্প অবলম্বনে 'ছোটোদের টলস্তয়', হিন্দিতে পরিচালনা করেছেন স্বাধীনতা পরবর্তী পাকিস্তানের ছোটোগল্প কেন্দ্র করে সমাজে নারীর স্বাধিকারের সম্মান প্রতিষ্ঠার ও সংগ্রামের নাটক— চারটি গল্পের নাট্য কোলাজ। শিশুদের নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষা, প্রশিক্ষণ থিয়েটার থেরাপির কাজ তাঁর জীবনের প্রধান আশ্রয়স্থল। 'অন্তর হতে উদাসী' (ভাবনা, রচনা, নাট্য পরিকল্পনা ও নির্দেশনা ডলি বসু), সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'আত্মীয়স্বজন'। থিয়েটারের কাজে ফাঁক পড়েনি কখনো। 'থিয়েটার থেরাপি' তাঁর উদ্ভাবনামূলক এক পদ্ধতি যা থিয়েটারের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের, সামাজিক মানসিক ক্ষেত্রে লড়াই করা শিশুদের মুক্তির দরজা হিসেবে থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যসম্পর্কিত কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখে আনন্দ পেয়েছেন। ডলি বসু থিয়েটারের শক্তিতে আস্থা রাখেন। মনে করেন থিয়েটারের ক্ষমতা আছে সমাজ বদল করার। যদি ১০০ জন দর্শকের মধ্যে ১০ জনকেও থিয়েটারের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়, থিয়েটার মনস্ক করা যায় তাহলে তাই-ই প্রাপ্তি।

## তথ্যসূত্র


১. জয়তী বসুর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, ২০১৫

২. তদেব

৩. তদেব

৪. তদেব

৫. রবিশংকর বল, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৪.০১.১৯৯১

৬. Samik Bandyopadhyay, Introduction, Mahesh Elkunchwar, *Reflection*, p. X;

৭. Dharani Ghosh, 'Mirror up to the nature', *The Statesman*, 27.04.91

৮. জয়তী বসুর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, ২০১৫

৯. Rahul Chandawarkar, 'Coming ot Grips', *Business Standard*, Saturday, 07.12.1996

১০. পবিত্র সরকার, 'কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয়', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৫.১১.৯৫

১১. Chitralekha Basu, 'Slapstick and sound sense', *Sunday*, 31.12.1994

১২. তদেব

১৩. জয়তী বসুর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, ২০১৫

১৪. সীমা মুখোপাধ্যায়, 'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল...', *স্যাস নাট্যপত্র*, সংখ্যা ২৭, পৃ. ২৮৪

১৫. তদেব, পৃ. ২৮৪-২৮৫

১৬. তদেব, পৃ. ২৮৫

১৭. তাপস চক্রবর্তী, 'অন্ধকারের রঙ', *গণশক্তি*, ২৭.০৪.৮৮

১৮. 'বিষয়ে বক্তব্যে বিন্যাসে বিশ্বস্ত 'বিকল্প', *যুগান্তর*, ২৩.০৯.৯০;

১৯. শাঁওলী মিত্র, আকাঙ্ক্ষা, 'ভাঙা বনেদ' নাটকের *স্মরণিকা*;

২০. তড়িৎ চৌধুরী, রঙরূপ নাট্যগোষ্ঠীর চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা, পৃ. ২২

২১. স্বপন রায়, তদেব, পৃ. ২৬;

২২. সীমা মুখোপাধ্যায়, 'ভাঙা বনেদ— কেন?' 'ভাঙা বনেদ' নাটকের *অভিনয়পত্রী*

২৩. সীমা মুখোপাধ্যায়, 'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল', *স্যাস নাট্যপত্র*, সংখ্যা ২৭, পৃ. ২৮৭

২৪. Dharani Ghosh, 'Marriage Guidance', *The Statesman*, Calcutta, Tuesday, 10 Jan 1995;

২৫. মনসিজ মজুমদার, 'বুড়ো মানুষের কষ্টের কথা', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮.০৬.২০১২;

২৬. ডলি বসু-র সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, *স্যাস নাট্যপত্র*, সংখ্যা ২১, ২০০৪, পৃ. ৭১;

২৭. Shoma A Chatterji, 'The Second Coming', *The Sunday, Statesman Magazine,* Kolkata, Aug 15, 2004

২৮. ডলি বসুর সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, *স্যাস নাট্যপত্র*, সংখ্যা ২১, ২০০৪, পৃ. ৭৩

২৯. ডলি বসু, 'গুরু পেয়েছিলাম, হারিয়েছি, তাঁর নাটক বন্ধ হবে না', ডলি বসুর মুখোমুখি অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃতি, *আজকাল*, ৮.০৩.২০০০;

৩০. Sudip Ghosh, 'Director Dolly', *The Times of India,* Calcutta, Times News Network, 05.04.2000;

৩১. Mousumi Biswas, 'Dolly Basu has a Point to Prove', *The Asian Age,* Calcutta, 26.04.1997

৩২. Shoma A Chatterji, 'The Second Coming', *The Sunday, Statesman Magazine,* Kolkata, Aug 15, 2004

৩৩. Sudip Ghosh, *The Times of India,* Calcutta, Times News Network, 5.04.2002

৩৪. দিব্যেন্দু পালিত, 'দুই তরঙ্গ দেখতে হয় ডলি বসুর চমৎকার অভিনয়ের গুণে', *সংবাদ প্রতিদিন*, কলকাতা, ১৯.০৭.২০০২

৩৫. *আজকের মেগাসিটি*, সল্টলেক, ৪ শ্রাবণ ১৪০৯, ২১ জুলাই, রবিবার, ২০০২, পৃ. ৯;

৩৬. শেখর সমাদ্দার, 'দুটি স্বতন্ত্র তরঙ্গ এবং তারপর', *দেশ*, ৭০ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, কলকাতা, ২০০৩;

### সপ্তম অধ্যায়

# থিয়েটারের উত্তরাধিকার

(ঈশিতা মুখোপাধ্যায়, সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, শাশ্বতী বিশ্বাস, অর্পিতা ঘোষ)

সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন ষাটের দশকে জন্ম নেওয়া চারজন অভিনেত্রী-নাট্যনির্দেশক। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ঈশিতা মুখোপাধ্যায় (১৯৬৩), সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত (১৯৬৩), শাশ্বতী বিশ্বাস (১৯৬৭) এবং অর্পিতা ঘোষ (১৯৬৭)। একই দশকে কাছাকাছি সময়ে এঁদের জন্ম হলেও নাটকের সঙ্গে সংযোগ বিভিন্ন সময়ে। অবশ্য কর্মসূত্রে তাঁকে চলে যেতে হয় ভারতের বাইরে সুদূর আমেরিকায়। সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'থিয়েট্রন' নাট্যগোষ্ঠীর যে ধারা তিনি বহন করে নিয়ে চলছিলেন, যত দিন থিয়েটার করেছেন সেই ধারার প্রতি অনুগত থেকেছেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর কর্পোরেট কর্মক্ষেত্রে থিয়েটারের শিক্ষা যে কতখানি কাজে লেগেছে তা তিনি অস্বীকার করেননি কখনও। বাকি তিনজন-ই ধারাবাহিকভাবে নাট্যনির্দেশনার কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন। ঈশিতা মুখোপাধ্যায় এঁদের মধ্যে সবার আগে নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও মধ্যবর্তী সময়ে বেশ কয়েক বছর নাটক সম্পর্কিত কাজ থেকে অব্যাহতি নেন, যদিও নাট্যসমালোচনার কাজটি করে গেছেন তিন বছর ধরে। আবারও তিনি পূর্ণোদ্যমে সর্বসময়ের নাট্যকর্মী ও নাট্যনির্দেশক হিসেবে উত্তরাধিকারকে বহন করে নিয়ে চলেছেন সক্রিয়ভাবে। সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত ও অর্পিতা ঘোষের সূচনা এই গবেষণাপত্রের সমাপ্তি পর্বে হলেও এবং তাঁদের মাত্র একটি করে প্রযোজনা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হলেও পরবর্তী সময়ে নাট্যনির্দেশক হিসেবে কাজের ধারাকে প্রবাহিত রেখেছেন একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত। এঁরা সকলেই নাট্য সম্ভাবনার উত্তরাধিকারকে বহন করে নিয়ে এসেছেন। যৌবনের শুরুতেই কাঁধে তুলে নিয়েছেন নির্দেশনার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

## ঈশিতা মুখোপাধ্যায় (১৯৬৩)

এই অধ্যায়ের নারী নির্দেশকদের মধ্যে ঈশিতা মুখোপাধ্যায়-ই সবচেয়ে কম বয়সে নাট্যনির্দেশনায় আসেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ঈশিতা মুখোপাধ্যায়ের নাট্যজীবন শুরু হয় কলেজ জীবনেই। বিভিন্ন আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান তাঁকে অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে যে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল, সেখান থেকেই নিজস্ব নাট্যদল গড়ে তোলার প্রেরণা পান। সমমনস্ক ও সমবয়সি বন্ধুদের সঙ্গে মিলে তৈরি হয় নাট্যদল

উষ্ণীক। প্রথমে তিনি নির্দেশনা দেননি। তাঁর প্রথম পরিচালনার কাজ মাত্র কুড়ি বছর বয়সে— জাঁ পল সার্ত্রের ‘দ্য রুম’ অবলম্বনে ‘ঘর’ (১৯৮৪)। উষ্ণীক ছাড়াও তিনি অন্যত্র নাট্যনির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন। শুধু নির্দেশনা নয়, নিজস্ব নাট্যদলের জন্য নাটক লেখা ও সাংগঠনিক কাজে তিনি প্রথমাবধি ছিলেন অত্যন্ত দায়িত্বশীল কর্মী।

ঈশিতা মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত ও উষ্ণীক প্রযোজিত নাটকগুলি ছিল—

| নাটক | নাটককার | অনুবাদ/রূপান্তর | অভিনয়কাল | প্রযোজনা |
|---|---|---|---|---|
| ঘর | জাঁ পল সার্ত্রে | মূল নাটক: দ্য ‘রুম’ রূপান্তর ঈশিতা মুখোপাধ্যায় | ১৯৮৪ | উষ্ণীক |
| বনলতার প্রেমিকারা | ডুরেন মার্ট | মূল নাটক : দ্য ম্যারেজ অব মিঃ মিসিপিসি | ১৯৯১ | উষ্ণীক প্রয়োগ—ম্যাক্সমুলার ভবন |
| তখনো ছিল অন্ধকার | ঈশিতা মুখোপাধ্যায় | মৌলিক নাটক | ১৯৯২ | উষ্ণীক |
| কমল কামিনী | ” | ” | ১৯৯৩ | উষ্ণীক |
| দুর্গেশনন্দন | ” | ” | ১৯৯৮ | উষ্ণীক |
| গওহরজান | ” | ” | ২০০২ | উষ্ণীক |

গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়সীমা (২০০৩)-র পর থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত তিনি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। মাঝে মধ্যেই পেশাগত কারণে নিয়মিত মঞ্চায়ন ঘটেনি তাঁর নির্দেশিত নাটকের, কিন্তু পুনরায় যখনই তিনি পূর্ণোদ্যমে শুরু করেছেন তখন তাঁর মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা পূর্ণমাত্রায় কাজ করেছে। তাঁর এই পর্বের নাটকগুলি ছিল কৃষ্ণ-১, কৃষ্ণ-২ (২০১০), খেলা ভাঙার খেলা (২০১২), কাল্লুমামা (২০১৩), ভূতের প্রেমে (শ্রুতি নাটক ২০১৪), শ্রাদ্ধ শতবার্ষিকী (একাঙ্ক, ভগীরথ মিত্রের গল্প অবলম্বনে, ঈশিতা মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ) ইত্যাদি।

**‘ঘর’**— ঈশিতা মুখোপাধ্যায় তখন ঈশিতা মিত্র, যৌবনের প্রাণশক্তিতে এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী বাঁধা পথের বাইরে হাঁটতে চেয়েছিলেন। ঈশিতা-র নেতৃত্বে তাঁরাই উপহার দিলেন বিষয়বস্তুর দিক থেকে একেবারেই অভিনব এক নাটক ‘ঘর’। ঈশিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ-ই ছিল এই নাটকের মূল কাঠামো। আপাত সহজ সরল নাটকের সংলাপ ভেদ করে এ নাটকের অন্তর্গূঢ় জটিল মানসিকতার রেখাচিত্র ধরা পড়ে মাত্র চল্লিশ মিনিটের এই নাটকে। স্বল্প সময়ের মধ্যে বাঁধা হয়েছে বলেই নাটকীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন নাট্যকার, নইলে অবান্তর বিষয় সংযোজনায় নাটকের গতি শ্লথ হয়ে যাওয়ার

একটা সম্ভাবনা ছিল। আরও একটা বিষয়, বিদেশি নাটকের অনুবাদের ক্ষেত্রে যে আড়ষ্টতা শব্দচয়ন ও বাক্যগঠনে অবশ্যম্ভাবী, কুড়ি বছরের তরুণীর কলমে ও প্রথম নির্দেশনার সে ত্রুটি লক্ষ করা যায়নি। বরং নাটকটি ছোট বলে পূর্বে কাব্যনাটক পাঠের আসরটির সংযোজন দুর্বলতার-ই প্রকাশ। সার্ত্রের নাটকের আগে রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' পাঠ অনুষ্ঠানের মূল সুরকে ব্যাহত করে।

'ঘর' নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যেই আছে প্রেমের সম্পর্কের জটিলতা। মূল গল্পে স্ত্রী ইভ, স্বামী পিয়েরকে ছেড়ে চলে যেতে চায় না। রূপান্তরিত নাটকে এই গল্প-ই অনুসরণ করা হয়েছে। 'নারী মনের অতলান্তে ডুব দিয়েছিলেন সার্ত্র। তারই ফসল 'দি রুম'— অকৃপণ প্রেমের এক আশ্চর্য ছবি। ঈশিতা রূপান্তকরণে এই মূল ছবিটি অটুট থেকেছে, যা কোনো নবীন নাট্যকারের কাছে অপ্রত্যাশিত।'[১] আসলে একজন বিকারগ্রস্ত মানসিক ভারসাম্যহীন বিপর্যস্ত স্বামীকে ছেড়ে যে যেতে চায় না তার স্ত্রী, তার পেছনে নারীর মনের জটিল রসায়নের ছবিটি তুলে ধরেছেন। সার্ত্রের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল মেয়েদের মনের চেতন অবচেতন স্তরের মনস্তাত্ত্বিক জটিল সংশ্লেষ। স্ত্রী নন্দিনী অর্থাৎ ইভ বা খুকু— যে খুব আন্তরিকতার কারণে সংসারে বাধা পড়ে আছে তাই নয়। তার মধ্যে আর একটা উদ্দেশ্য খেলা করে চলেছে। প্রেমের বা দাম্পত্যের সম্পর্কের কত যে বিচিত্র অনুভূতি! অত্যন্ত অল্পবয়সি এক নাট্যকারের কাজে যে পরিণততর মানসিক দ্বন্দ্বের নাটক রূপ পেয়েছে তা বিস্ময়কর। তবে সার্ত্রের নিজস্ব ধরনে যে নির্মম বাস্তবতা প্রকাশ পায় তা বাংলা নাটকে দুর্লভ এবং তারই অনেকটাই ঈশিতা তাঁর নাটকে ধরতে চেয়েছেন। দাম্পত্য প্রেমের সংজ্ঞা-ই বদলে গেছে। বিকারগ্রস্ত উন্মাদপ্রায় স্বামী আনন্দকে সে ছেড়ে যেতে চায় না, কিন্তু স্বামীকে সে হত্যাও করবে। এই জটিলতা নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে ধরে দিয়েছেন বলেই নির্দেশকের দায়িত্ব বেড়ে গেছে অভিনয়াংশকে আরও পরিণত করে তোলার ক্ষেত্রে।

আনন্দের ভূমিকায় শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় একটা ভিন্ন ভঙ্গি গ্রহণ করে। অর্ধস্ফুট কথা, শরীরী সঞ্চালনার নানা ভঙ্গিতে তার যন্ত্রণা, কাতরতা, আবেগ, ভয় প্রকাশিত হয়েছে অকৃত্রিমভাবে। তার চোখের অভিব্যক্তি, সংলাপ উচ্চারণে যেন কুণ্ঠিত শীতার্ত এক ব্যক্তিত্ব শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে জীবন্ত বাস্তব হয়ে ওঠে। স্ত্রী নন্দিতার ভূমিকায় সমান তালে অভিনয় করেছেন ঈশিতা মিত্র। নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গে এত জটিল চরিত্রের রূপায়ণ সহজ ছিল না। তার প্রেম যেন সর্বংসহা গভীর প্রেম, অথচ তারই মধ্যে হননের আকাঙ্ক্ষা লুকোনো থাকে। নির্দেশকের ভাবনায় যুগপৎ আতঙ্ক ও করুণার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বিষয়টি বাংলার পরিবেশে দর্শক গ্রহণ করবে কি না তা নিয়ে

বিতর্ক থাকলেও নাট্যরূপায়ণের কৌশলে সেই আশঙ্কার সম্ভাবনা দূর করা গেছিল। তরুণ নির্দেশকের ভাবনার অভিনবত্ব দর্শককে প্রভাবিত করেছিল। অতি নাটকীয়তাকে কোথাও প্রশ্রয় দেননি নির্দেশক। এ নাটকে বাবা ও মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন চন্দন দে ও সন্ধ্যা চক্রবর্তী, যাঁরা আবার বাস্তব জীবনে ছিলেন ছেলে ও মা।

নির্দেশনার ক্ষেত্রে এসে বাঙালি দর্শকের সঙ্গে যেভাবে সার্ত্রের যোগাযোগ ঘটালেন ঈশিতা মিত্র, তা প্রশংসনীয়। নাটক নির্বাচন, নাট্য উপস্থাপনার যাবতীয় কলাকৌশল, অভিনয়-দক্ষতা সবগুলি তাঁকে আরও পরিণত করে তুলল নির্দেশক হিসাবে। পরবর্তী প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তিনি তাই আবারও নির্বাচন করলেন এক অভিনব বিষয়কেন্দ্রিক নাটক 'বনলতার প্রেমিকেরা'।

**'বনলতার প্রেমিকেরা'**– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুই জার্মান নাট্যকার ম্যাক্স ফ্রিস্‌চ্ (Max Frisch) এবং ফ্রেডরিক দুরেনমার্ট (Friedrich Durrenmatt) যাঁদের জন্ম সুইজারল্যান্ডে। বাংলার দর্শকের কাছে স্বল্প পরিচিত নাট্যকার ডুরেনমার্টকে নিয়ে ঈশিতা মুখোপাধ্যায় কাজ করার আগেই উত্তরবঙ্গের একটি নাট্যদল এই নাট্যকারের লেখা দুটি নাটক নিয়ে কাজ করেছেন। তারই একটি নাটক ম্যাক্সমুলার ভবনের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হল উষ্ণীক-এর নিবেদনে। সুইস চুক্তিবদ্ধ বা মৈত্রীবদ্ধ হওয়ার ৭০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ম্যাক্সমুলার ভবন দুরেনমার্টের নাটক উপস্থাপনার পরিকল্পনা করে। ১৯৫২ সালে লেখা নাট্যকারের 'দ্য ম্যারেজ অফ মিস্টার মিসিসিপি' অবলম্বনে ঈশিতা মুখোপাধ্যায় রূপান্তরিত করেন 'বনলতার প্রেমিকেরা'। অনুবাদ না করে রূপান্তরিত করলেন বা বলা ভাল যে, রূপান্তরে নাটকটি প্রায় মৌলিক নাটকের চেহারা নিয়েছে। সংলাপ রচনাও অনুবাদের আড়ষ্টতা কাটিয়ে একেবারে স্বচ্ছন্দ রূপ নিতে পেরেছে। তবে দুটি বিষয় বাংলা নাটকটির কাছ থেকে পাওয়া যায় না– (১) মূল নাটকের যে দ্বন্দ্ব কমিউনিজম ও স্বাধীনতা সম্পর্কে, দুই আদর্শবাদী সেন্ট ক্লোদ ও মিঃ মিসিসিপির যে অভিমত তর্ক মতামত, রূপান্তরিত নাটকে সেই পরিবেশটা রক্ষিত হয়নি। ডুরেনমার্ট নাট্যকার হিসেবে যে তীব্রতা সৃষ্টি করেন নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, ঠাট্টা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে—বাংলায় রূপান্তরিত নাটকটিতে সেই পরিবেশ তৈরি হয়নি। তুলনায় ঈশিতা মুখোপাধ্যায় অপেরাধর্মী পরিবেশ রচনা করেছেন নাচ, গান, নাটক মিলিয়ে মিশিয়ে। এ নাটকের মুখ্য দুই পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা আদায় করে নিয়েছিলেন রজতাভ দত্ত (কৃপাসিন্ধু) ও আশুতোষ (ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী)। তুলনামূলকভাবে আশুতোষ যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ হলেও কৃপাসিন্ধুর মধ্যে কিছুটা অতিনাটকীয়তা লক্ষ করা যায়। তা তাঁর শারীরিক অভিনয়ের কারণেই। এই দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বনলতার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন ঈশিতা মুখোপাধ্যায়— বারবার যে নারী ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন

সময়ে বিভিন্ন মানুষের দ্বারা। এই চরিত্রের পরতে পরতে বিচিত্র মানসিকতার আরোহন অবরোহন। ফলত কঠিন ছিল সেই আত্মপ্রকাশ। সম্পূর্ণ না হলেও নির্দেশকের মেধা দিয়ে সেই চরিত্রায়নকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন ঈশিতা মুখোপাধ্যায়। '...but Durrenmatt purposely constructed jarring scenes to symbolise the disintegration of morality and society. Mukhopadhyay's own pofaced acting as Banalata reveals little of the inner psychology of Durrenmatt's utterly selfish, mendacious heroine.'[২]

ঈশিতা মুখোপাধ্যায় এমন-ই একজন নাট্যনির্দেশক যিনি পর পর দুটি স্বতন্ত্র ধারার বিদেশি নাটকের অনুবাদ মঞ্চায়নের পরই ফিরে গেছেন নিজস্ব রচনার দিকে। এর পর থেকে তিনি নিজের লেখা মৌলিক নাটকের মঞ্চায়ন ঘটিয়েছেন ধারাবাহিকভাবে। ১৯৯৩ সালে তাঁর লেখা 'কমল কামিনী'র নির্দেশনা দেন। একক অভিনয় করেন কেতকী দত্ত। নাট্যকার ও নির্দেশকের বয়স তখন ত্রিশ। যে সময়ে তিনি নির্দেশনার কাজ শুরু করেছিলেন সেই সদ্য যৌবনের পথ পেরিয়ে তাঁর মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে প্রাত্যহিক জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতা এবং পঠন-পাঠন সংক্রান্ত দার্শনিক প্রজ্ঞা। এই দুটি বিষয়কে তিনি মিলিয়ে দিলেন নাট্যনির্দেশনার ক্ষেত্রে।

তৃপ্তি মিত্রের 'অপরাজিতা' (১৯৭১), শাঁওলী মিত্রের 'নাথবতী অনাথবৎ' (১৯৮৩)-এর পর একক অভিনয়ে কেতকী দত্ত ফিরিয়ে আনলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যশিক্ষণ প্রাপ্ত কমল কামিনীর চরিত্রকে। নাট্যাচার্যের সঙ্গে সর্বক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন কমল কামিনী তা তাঁর আজীবনের সঞ্চয়। নাটকে দেখা যায় পুরোনো দিনের এক বিখ্যাত অভিনেত্রীকে টেলিভিশন সিরিয়ালে অভিনয় করবার জন্য নিয়ে আসা হয়। তিনি সাজগোজ সম্পূর্ণ করে অপেক্ষা করতে থাকেন সাজঘরে কখন তার ডাক আসবে তার-ই জন্য। তাঁকে বসিয়ে রেখে নতুন নায়িকাকে নিয়ে চলতে থাকে অতিরঞ্জিত আপ্যায়ন। এই বিষয়টি মঞ্চের বাইরে ঘটে। আর মঞ্চের ওপর কমল কামিনীর স্মৃতিচারণের মধ্যে অভিনীত হতে থাকে পুরোনো নাটকের দৃশ্যগুলি। পূর্বকথার স্মরণে আবেগ ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে থাকে হিউমার আয়রনি-র মণিমাণিক্য উপরন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয় কেতকী দত্তের কণ্ঠের অতুলনীয় গান। একেবারেই একটা নতুন ফর্ম ব্যবহার করলেন নির্দেশক এখানে। স্মৃতিচারণা— পুরোনো নাটকের অভিনয়— স্বতঃস্ফূর্ত গান— এই ত্রিধারার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে 'কমল কামিনী'। 'এই কমলকামিনী চরিত্র করার জন্য আমাকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে। পড়তে হয়েছে। চরিত্র নিয়ে ভাবতে হয়েছে।'[৩] ভাবনার দিক থেকে যেমন অভিনব তেমনই এর মঞ্চায়ন কৌশলও ছিল প্রথানুগ নাট্য উপস্থাপনার থেকে স্বতন্ত্র। কমল কামিনী তাঁর স্মৃতিচারণায় পূর্ব ইতিহাস-ই ব্যক্ত করেন। কিন্তু

এখানে স্মৃতি আর ইতিহাস মিলেমিশে তৈরি করে নাটক, সেই পদ্ধতি ও প্রকরণ-ই নাটকটিকে বাংলা মঞ্চে একটা আলাদা জায়গা করে দেয়। অবশ্যই নির্দেশক হিসেবে ঈশিতা মুখোপাধ্যায়ের জায়গাটাও আরও সুদৃঢ় হয়।

কেতকী দত্তকে দীর্ঘদিন পরে মঞ্চে ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় ও পরিকল্পনা যেমন ঈশিতা মুখোপাধ্যায়কে সাহস জুগিয়েছিল, তেমনিই আরও সাহসী করে তুলল 'গওহরজান'-এর মঞ্চায়ন। এর জন্য তিনি অনেকটা সময় নিয়েছেন, গবেষণা করেছেন চার বছর ধরে। কিন্তু উনিশ ও বিশ শতকের ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে জন্মসূত্রে আর্মেনিয়ান গওহরজানের জীবনকে একবিংশ শতাব্দীতে এসে পুনর্বিন্যাস করার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করেছিলেন নির্দেশক। গওহরজানের জীবন এক বিচিত্রমুখী, নানা রঙের মিশেলে তৈরি। বাবা ছিলেন আর্মেনিয়ান রবার্ট উইলিয়াম আর মা বাইজি মালকাজান। মায়ের কাছেই তার গানের শিক্ষানবিশী। গওহরজানের ১৩০তম জন্মদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে উষ্ণীক তাদের প্রথম প্রযোজনাটির প্রথম মঞ্চায়ন ঘটায় ছাতুবাবু লাটুবাবুর নাটমন্দিরে— এই স্থানটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় জায়গা, এখানে মুজরো বসাতে পছন্দ করতেন গওহরজান। মালকাজানেরও মুজরো বসত এখানে। ফলত এই জায়গাটিকে ইতিহাসের সাক্ষ্যে ব্যবহার করলেন নির্দেশক। দীর্ঘদিন ধরে গওহরজানের জীবন, সমকাল, গান-গায়কী নিয়ে গবেষণা করেছেন নাট্যকার। শুধু নাটক রচনা নয়, পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্বও ছিল তাঁরই। যেহেতু পিরিয়ড পিস অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নাটক, তাই কল্পনার জায়গা উন্মুক্ত থাকলেও ঐতিহাসিক সত্যতাকে মান্যতা দিতে হয়েছে নাট্যকার-নির্দেশককে।

নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে ঈশিতা মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন যে— 'I owe a lot to Rantideb Moitra, Uma Basu and Karuna Mukhopadhyay. I had to read over 60 books at the National Library before writing the script.'[৪] নাটকটি বাঁধা হয়েছে স্মৃতিকথা, তথ্য কল্পনা এবং নাটকীয় নান্দনিকতার বাঁধনে। প্রথমে মালকাজান তাঁর বাইজি জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তাঁর কথিত কাহিনির মধ্যে উঠে এসেছে অভিনয় অংশ। মালকাজান ও গওহরজানের স্মৃতিচারণার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোরী গওহর। নির্দেশক এখানে এদের পরস্পরের সম্পর্কের নানান ছবি তুলে ধরেছেন। বাবলু সরকারের আলোর কারিগরিতে, নাচ-গান-কথার মিশ্রণে তৈরি হয়ে উঠেছে এমন কিছু কিছু মুহূর্ত যা নাটকীয় ও আবেগমথিত। যেমন গওহরজানের বড় হয়ে ওঠার দৃশ্যটি; কিশোরী গওহর কথা বলতে বলতে মঞ্চের এক দিকে চলে যায়, অন্ধকার হয়ে যায় মঞ্চের এক দিক। আরেক দিকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পূর্ণযুবতী গওহরজান। এই সূত্রটি ধরিয়ে দিয়ে যায় কিশোরী

গওহর-ই ওই রূপান্তরিত নারী। এখান থেকে শুরু হয় যুবতী গওহরের জীবন, তাঁর গানের জীবনের পথ পরিক্রমণ। ১৯০২ সালে প্রথম তাঁর গানের রেকর্ড বেরোয়, জার্মানি থেকে তৈরি হয়ে এসেছিল সেই রেকর্ড যা নাকি ভারতে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম মুক্তি পাওয়া গানের রেকর্ড। প্রত্যেকটি গানের শেষে তাঁকে বলতে হত 'মাই নেম ইজ গওহরজান'। উনিশ ও বিশ শতকের সমাজ জীবনে নারীর অবস্থান বিশেষ করে বাইজি সমাজের অপমান বঞ্চনা তুলে ধরেছেন নাট্যকার। পাশাপাশি মালকাজান ও গওহরজানের প্রতিভার যে বিচ্ছুরণ, ঔজ্জ্বল্য তা-ও ব্যক্ত হয়েছে।

উনিশ শতকে গওহরজানের মুজরো ছিল অভিজাত পরিবারের সংগীত রসিকদের কাছে 'স্ট্যাটাস সিম্বল'। তাঁর রূপ, কণ্ঠ, শরীরী অভিব্যক্তি চলন-বলন সব কিছুর মধ্য দিয়ে একটা শৈলী বা আভিজাত্য তৈরি করেছিলেন গওহরজান। তাঁর জীবনটাই ছিল যেন এক চিত্রনাট্য। সেই গওহরজানের জীবনকে জীবন্ত করে তুললেন গানে ও অভিনয়ে স্বাগতা মুখোপাধ্যায়। ছোট গওহরজানের ভূমিকায় রুথলিন সাহা এবং মা মালকাজান— ছন্দা চট্টোপাধ্যায়। নাটকের আবহ নির্মাণ করেছিলেন দীপক চৌধুরী। বীণা, তবলা, সারেঙ্গী, তানপুরা ইত্যাদি দেশীয় যন্ত্রের ব্যবহারে উপযুক্ত সংগীত সৃষ্টির কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন তিনি। অজিত পাণ্ডেকে দিয়ে গাওয়ানো হয়েছিল মুকুন্দদাসের বিখ্যাত 'ফেলে দাও রেশমী চুড়ি' গানটি। এছাড়াও নির্দেশক ব্যবহার করেছিলেন গওহরজানের নিজস্ব কণ্ঠের কিছু গান। নির্দেশক এই নাটকে রন্তিদেব মৈত্র-র ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নিয়ে এসে গওহরজানের পুরোনো রেকর্ডের গানকে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যবহার করেছিলেন। ওয়াজেদ আলি মাঝে মাঝেই মুজরো বসাতেন তাঁর মেটিয়াবুরুজের বাড়িতে মালকজানকে দিয়ে। নাটকে ওয়াজেদ আলির নিজের গানটি গেয়েছেন নেপথ্যে ওস্তাদ মুশকুর আলি খান— 'ফুলবালে কাল মুঝকো মেকো।' শ্রীলেখা মিত্রের নৃত্যভাবনা আলাদা এক পরিবেশ তৈরি করেছিল নাটকে।

'গওহরজান' নাটকে নারীর অপমান বঞ্চনার জায়গাটা খুব স্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করেছেন নাট্যকার। একজন নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে কখনওই তা অযৌক্তিক বা একপেশে হয়ে ওঠেনি। বিষয়বক্তব্যে ইতিহাস প্রবণতা ও সামাজিক বিশ্লেষণ যেমন নাটকটিকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনই গওহরজান ও মালকাজানের নিখুঁত চরিত্রায়ণ এবং উনিশ ও বিশ শতকের পরিবেশ সৃষ্টিতে নির্দেশকের পরিশ্রম ও সততা ঈশিতা মুখোপাধ্যায়কে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে। আরও দুটি একাঙ্ক নাটকের নির্দেশনা দিয়েছিলেন ঈশিতা মুখোপাধ্যায়। একটি 'তখনো ছিল অন্ধকার...' যে নাটকের কুশীলব মাত্র দুজন ঈশিতা মুখোপাধ্যায় ও রজতাভ দত্ত। আবহ ও শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাজীব ঘোষাল, আলো পরিকল্পনা বাদল দাস। প্রস্তুতি সহায়তায় ছিলেন হিমাদ্রী মুখোপাধ্যায়, তপন দাস, অলোক ঘোষ ও

সোমেশ ভট্টাচার্য। মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। দেখা যাচ্ছে শুরুর সময়ে তিনি স্বল্পসংখ্যক চরিত্র নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু 'বনলতার প্রেমিকেরা'-র চরিত্রলিপি ছিল দীর্ঘ। 'দুর্গেশনন্দন' নাটকটির অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৌনক সান্যাল। নাটকটির রচনা ও নির্দেশনা ঈশিতা মুখোপাধ্যায়েরই। এ নাটকের মঞ্চ পরিকল্পক হিরণ মিত্র আর মঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন বিলু দত্ত। আলো দীপক মুখোপাধ্যায় আর আবহ গৌতম ঘোষ। রূপসজ্জা আলোক দেবনাথের। বিজ্ঞাপনে 'উল্লেখ করা হয়েছিল ''রাজস্থানের হলুদ বালি আর পাথুরে কেল্লায় দুটি মানুষের গল্প 'দুর্গেশনন্দন'।

নাট্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে ঈশিতা মুখোপাধ্যায়ের যে স্বাতন্ত্র্য সেখানে দেখা যায় বিষয় নির্বাচনে তিনি বিচিত্রমুখী। বার বার তিনি নতুন বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। কখনওই একই ধরনের ঘটনা বা বিষয়কে নাটকে উপস্থাপিত করেননি। যে কোনও নির্দেশকই মুখ্য চরিত্রে নিজেরাই অভিনয় করা পছন্দ করেন। প্রথম দিকের দু'তিনটি নাটকে অভিনয় করার পর নির্বাচন করেছেন চরিত্রানুযায়ী অভিনেত্রীদের। সার্ত্র দিয়ে পথ চলা শুরু করে 'কমল কামিনী'র জীবন বা গওহরজানের জীবনকথার গবেষণাভিত্তিক উপস্থাপনায় তাঁর আগ্রহ। নিটোল গল্পকথা নয়, তথ্য, ইতিহাস, স্মৃতিকথায় তিনি নাটককে গঠিত করতে চান। ফলত নাটক রচনা ও নির্দেশনার জন্য অনেকটা সময় প্রয়োজন হয়। নাটক রচনা ও নির্দেশনার পাশাপাশি সংগঠনের দায়দায়িত্ব বহুলাংশে তাঁর-ই ওপর ন্যস্ত। সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন ও দলের নেতৃত্ব দান আশির দশক থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত। অভিনেত্রী, নির্দেশক এবং সংগঠক ঈশিতা মুখোপাধ্যায় বাংলা মঞ্চে সক্রিয় সচেতন উপস্থিতিতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছেন।

## সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত (১৯৬৩)

বাংলা থিয়েটারের বিশিষ্ট অভিনেত্রী সুরঞ্জনা দাশগুপ্তর জীবন পরিক্রমায় নাট্য অভিনয় যদি কেন্দ্রবিন্দু হয়, তবে বৃত্তের সম্পূর্ণতা ঘটেছে নাট্যসম্পর্কিত নানান কাজের খণ্ডাংশ জুড়ে জুড়ে। গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়কালের শেষ বছরে অর্থাৎ ২০০৩ সালে তিনি তাঁর প্রথম নাট্যনির্দেশনার কাজটি সম্পন্ন করেন। এই সময় থেকেই সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত তিনি ধারাবাহিকভাবে নাট্যনির্দেশনার কাজটিই করে গেছেন মূলত। বর্তমানে বাংলা রঙ্গমঞ্চের মহিলা নির্দেশকদের মধ্যে সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত একটি বিশিষ্ট নাম।

অভিনয় দিয়েই শুরু হয় নাটকের সঙ্গে যোগাযোগ। প্রথমে ‘ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার’ পরে ‘থিয়েটার ওয়ার্কশপ’, ‘অন্য থিয়েটার’, ‘সংলাপ কোলকাতা’, ‘রঙ্গকর্মী’, ‘আরশি’, ‘ইল্যুশন’, ‘নির্বাক অভিনয় আকাডেমি’— বিভিন্ন নাট্যদলে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেন। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমির প্রযোজনাতেও তিনি অভিনয় করেছেন। অভিনয় জীবনের শুরু থেকেই বাংলা থিয়েটারের বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের নাট্যনির্দেশনার ক্ষেত্রকে অজান্তেই প্রস্তুত করেছিল বলেই অনুমান করা যায়। এই নাট্যনির্দেশকদের মধ্যে আছেন বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, অশেষ সেনগুপ্ত, ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়, কুন্তল মুখোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা। উৎপল দত্তের পরিচালনায় ‘চৈতালি রাতের স্বপ্ন’ নাটকের পনেরোটি মহড়া দেন যদিও সেই নাটকের মঞ্চায়নের সময় তিনি ছিলেন না। পেশাদারি মঞ্চেও (কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ) তাঁর অভিনয় সাড়া ফেলেছিল। রমাপ্রসাদ বণিকের নির্দেশনায় ‘ভালো খারাপ মেয়ে’ নাটকে অপর্ণা সেন, দীপঙ্কর দে-এর মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁর অভিনয় যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

শুধু অভিনয় নয় তার সঙ্গে নাট্যনির্মাণের নানা দিকে নিজেকে বিস্তৃত করেছিলেন সুরঞ্জনা। নির্দেশনা দেওয়ার বহু পূর্বেই বহু নাটকে পোশাক পরিকল্পনা, মঞ্চ ভাবনায় তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। ছোটোবেলায় বাড়ির পরিবেশেই ছিল নাট্যসংস্কৃতির আবহাওয়া। বাবা সুবোধ দাশগুপ্তর সঙ্গে নাট্যজগতের মানুষদের যোগাযোগ। বিভিন্ন নাট্যদলের প্রযোজিত নাটকের লেটারিং তৈরি বা অন্যান্য শৈল্পিক কাজকর্মের কারণে সুরঞ্জনার মধ্যেও তৈরি হতে থাকে নাটক সম্পর্কে আগ্রহ। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়বার সময় নান্দীকার গোষ্ঠীর দেখা ‘তিন পয়সার পালা’, আরও একটু বড়ো হয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিভাস চক্রবর্তী নির্দেশিত ‘মহাকালীর বাচ্চা’ আর তারও দু’বছর পর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পাপপুণ্য’ ও আরও একটি নাটক তৃপ্তি মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত ‘থানা থেকে আসছি’— ইত্যাদি নাটক তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

নাটকে অভিনয়ের সূচনা ১৯৭৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর। কাজল চৌধুরীর অনুরোধে ‘ক্যালকাটা গ্রুপ থিয়েটার’-এ অনল মিত্রের নির্দেশনায় অভিনয় করেন ‘সেন্ট জোয়ানের বিচার’ নাটকে এক বারবণিতা ও ঘোষক এবং ‘ওয়র অ্যান্ড পীস’— নাটকে নাতাশার ভূমিকায়। কলেজে পড়ার সময় বিভাস চক্রবর্তীর অনুরোধে থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এ ‘বিসর্জন’ নাটকে অপর্ণার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাট্যদলেরই প্রযোজনা ‘বেলা অবেলার গল্প’ থেকে শুধু অভিনয় নয় প্রযোজনার নানাবিধ কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়া। অশোক মুখোপাধ্যায়ও নির্দেশক হিসেবে অল্পবয়সী

মেয়েটির প্রতি নির্ভর করেছিলেন মূলত তার আগ্রহ এবং আত্মনির্ভরতা দেখে। 'বেলা অবেলার গল্প' নাটকের পোশাক পরিকল্পনার ভার দিয়েছিলেন সুরঞ্জনাকে। 'অভিনয় ছাড়া অন্যান্য কাজে যে যুক্ত হওয়া সেটা 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' থেকে শুরু। অশোকদারও একটা অবদান ছিল।... বলেছিলেন কস্টিউমে কারিগরি দেখাবার জায়গা নেই তুমি রঙ ঠিক করবে, সেট্-এর কালারটা বলে দেব। ছোট্ট বই তৈরি করেছিলাম। প্রত্যেকটা চরিত্রসহ পরপর এঁকে জমা দিয়েছিলাম। খুব খুশি হয়েছিলেন অশোক মুখোপাধ্যায়।'[৫] অনেকগুলি নাট্যদলের আহ্বানে তিনি এই কাজটি করতে থাকেন দায়িত্ব সহকারে। কেন-না নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রে এই বিভাগটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

যে নাটকগুলিতে সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত পোশাক পরিকল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে—

| **নাটক** | **অভিনয়কাল** | **নাট্যদল** | **পরিচালক** |
|---|---|---|---|
| বেলা অবেলার গল্প | ১৯৮৬ | থিয়েটার ওয়ার্কশপ | অশোক মুখোপাধ্যায় |
| মাধব মালঞ্চী কইন্যা | ১৯৮৮ | অন্য থিয়েটার | বিভাস চক্রবর্তী |
| ঘরে ফেরা | ১৯৯৪ | সংলাপ কোলকাতা | কুন্তল মুখোপাধ্যায় |
| শূদ্রায়ন | ১৯৯৬ | সংলাপ কোলকাতা | কুন্তল মুখোপাধ্যায় |
| স্বপ্ন নিয়ে | ১৯৯৮ | সংলাপ কোলকাতা | কুন্তল মুখোপাধ্যায় |
| চতুরঙ্গ | ২০০৩ | পূর্বপশ্চিম | ব্রাত্য বসু |
| মানদা সুন্দরী | ২০০৩ | আরশি | সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত |

২০০৩-এর পর থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত প্রায় দশটি নাটকে দীর্ঘ সময় ধরে পোশাক পরিকল্পনার কাজটি করে গেছেন। পাশাপাশি করে চলেছেন মঞ্চ পরিকল্পনার কাজও। এই নাটকগুলি হল 'ল্যাবরেটরী' (২০০৬, লোককৃষ্টি, নির্দেশনা ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, পোশাক), 'কানন পিসির জপমালা' (২০০৫, ইলিউশন/নির্বাক অভিনয় আকাদেমি, নির্দেশনা সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, মঞ্চ ও পোশাক), 'যোগাযোগ' (২০১০, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, অশোক মুখোপাধ্যায়, পোশাক), 'তিন গুছির বিনুনি' (২০১০, নির্বাক অভিনয় একাদেমি, নির্দেশনা সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, মঞ্চ ও পোশাক), 'পারুল বনে রবি' (২০১২, নির্বাক অভিনয় একাদেমি, নির্দেশনা সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, মঞ্চ ও পোশাক), 'ধূসর গোধূলি' (২০১৩, নির্বাক অভিনয় একাদেমি, অঞ্জন দেব, মঞ্চ ও পোশাক), 'আহুতি মাড়োয়ারি বণিক পুর কী' (২০১৩, পরিবার মিলন, নির্দেশনা সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, মঞ্চ ও পোশাক), 'সীতা থেকে শুরু' (২০১৪, নির্বাক অভিনয় একাদেমি, নির্দেশনা সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, মঞ্চ ও পোশাক), 'রাত মোহনা' (২০১৬, নির্বাক অভিনয় একাদেমি, নির্দেশনা কথাকলি দেব, মঞ্চ ও পোশাক), 'মনসামঙ্গল' (ব্লাইন্ড

অপেরা, নির্দেশনা শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, পোশাক)। শুধুমাত্র কয়েকটি নাটকে তিনি সাময়িকভাবে পোশাক পরিকল্পনার কাজ করেননি। দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে কাজের দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। বিশেষত যে নাটকগুলি তিনি নিজে পরিচালনা করেছেন সেখানে মঞ্চ এবং পোশাক দুটি বিভাগেরই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

নির্দেশনায় আসার আগে দুটি নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি। ১) শূদ্রায়ন ২) স্বপ্ন নিয়ে। দুটি নাটকেরই প্রযোজক ছিল 'সংলাপ কোলকাতা' এবং পরিচালনা করেছিলেন কুন্তল মুখোপাধ্যায়। 'শূদ্রায়ন' এর তাঁর প্রথম করা মঞ্চ। কোনো প্রথাগত শিক্ষা নয় দেখতে দেখতে কাজ করতে করতে শেখা। এই নাটকে শূর্পনখার চরিত্রে অভিনয় করতেন বলেই পুরো নাটকটা সম্পর্কে তাঁর একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাছাড়া ছবি আঁকার আশঙ্কাটা ভেতরে ছিল, বাবাকে দেখেছেন ছবি আঁকতে। এছাড়াও যখন তিনি এই মঞ্চ পরিকল্পনা করছেন তখন তাঁর কুড়ি বছর থিয়েটার করা হয়ে গেছে। সুরঞ্জনার কথায়' হয়তো কাগজে লেখাটেখা হয়নি কিন্তু যাঁরা দেখেছেন তাঁরা খুবই প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল নাটকের সঙ্গে যদি মঞ্চ পরিকল্পনাটা যায় তাহলে ওটা অনেক বেশি ইনটারেস্টিং হয়। মহাকাব্য এবং রামায়ণের ঘটনা বলেই একটা নিরাভরণ মঞ্চের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 'পুরো মঞ্চে যে রস্টামগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলো হাফরাউন্ড। রাউন্ডের ওপর আবার একটা ছোটো রাউন্ড। মঞ্চের মধ্যে, ডানদিকে ও বাঁদিকে। জঙ্গল বোঝাবার জন্য অর্থাৎ অবস্থানগত পরিবর্তন দেখাবার জন্য বাঁশ কেটে কেটে গাছ তৈরি করে মঞ্চে ঢোকানো হয়। আবার যখন অঙ্গিরার আশ্রম দেখানো হচ্ছে ওই গাছগুলো সরে যাচ্ছে আর কিছু বাড়ির আউট-লাইন আসছে। লাঠির সঙ্গে বর্শা দিয়ে খরদূষণের জায়গাটা তৈরি হল। দণ্ডকারণ্য অযোধ্যার প্রচুর মানুষ দিয়ে দিয়ে 'শূদ্রায়ন'-এর মূল ডিজাইনটা করা হয়েছিল।'[৬] 'স্বপ্ন নিয়ে' নাটকে অবশ্য 'কমপ্লিট সেট' তৈরি করা হয়েছিল। পাঁচমিশালি একটা বাড়ির উঠোন। ভাঙাচোরা বাড়ির আদল দেখাবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন একটা অর্ধেক ভাঙা সিঁড়ি। অনেক প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন অর্ধেক। কিন্তু মঞ্চ নির্মাতার মনে হয়েছিল ভাঙা বাড়ির আদল দেখাবার জন্য এটা অনাবশ্যক নয়। মঞ্চ পরিকল্পক সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত মনে করেন এমনভাবে মঞ্চের পরিকল্পনা করতে হবে যেখানে নাটক ও মঞ্চ মিলে মিশে যাবে।

নাটক রচনা ও নাট্যরূপায়ণের ক্ষেত্রেও সুরঞ্জনা দাশগুপ্তর বিশেষ দক্ষতা প্রমাণিত হয় এবং তিনি অনেকগুলি মৌলিক নাটক ও বিশিষ্ট লেখকদের রচনার নাট্যরূপ দর্শককে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে আছে 'মানদা সুন্দরী' (মূল রচনা মানদা সুন্দরী), 'কানন পিসির জপমালা' (মৌলিক), 'দুলালি' (ইবসেন-এর ওয়াইল্ড ডাক অবলম্বনে), 'তুলকালাম দুর্গানাম'

(মৌলিক), ‘ভূশণ্ডীর মাঠে’ (পরশুরাম), ‘গাছপাখালির দুঃখগাথা’ (মৌলিক), ‘অনাথবাবুর ভয়’ (সত্যজিৎ রায়), ‘সীতা থেকে শুরু’ (নবনীতা দেবসেন), ‘মণিকাহিনী’ (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), ‘নীরব কথা’ (অনুবাদ আসীফ করিমভয় থেকে), ‘ধূসর গোধূলি’ (মৌলিক) ইত্যাদি। নিজের লেখা নাটকগুলির মধ্য দিয়ে একটা সহজ সাধারণ জীবনযাত্রাকে ধরবার প্রবণতা যেমন লক্ষ করা যায় আবার যখন নাট্যরূপ দিচ্ছেন তখন কিন্তু বিশিষ্ট সাহিত্যিক যেমন পরশুরাম, সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে নবনীতা দেবসেন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকদের নির্বাচন করেছেন।

২০০৩ সালে তিনি প্রথম নির্দেশনার কাজটি শুরু করেন। ঊষা গাঙ্গুলির নির্দেশনায় ‘মুক্তি’ নাটকের অভিনয় করার সময় সহঅভিনেত্রী সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি এই নির্দেশনা সংক্রান্ত কাজ করার প্রেরণা পান। সেঁজুতি মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ‘আরশি’ নাট্যদলে নাটক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সুরঞ্জনা দাশগুপ্তকে অনুরোধ জানানো হয়। একেবারেই সদ্য প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলে, প্রায় ২৫ জন নতুন আসা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নির্দেশনার কাজ শুরু করেন। প্রথম নাটকের ক্ষেত্রেও কিন্তু কোনও চিরাচরিত বাধাগতের নাটক বেছে নেননি। তুলনামূলকভাবে বিতর্কিত একটি রচনাকে নাটকের টেকস্ট্ হিসেবে নির্বাচন করলেন এবং নাট্যরূপ দিলেন নিজেই। গ্রন্থটি মানদাসুন্দরীর লেখা। ‘শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত’ অবলম্বনে তাঁর নির্মিত নাটকটি হল ‘মানদাসুন্দরী’। যদিও গ্রন্থটির লেখক সম্পর্কে কিছুটা সংশয় আছে। অভিনয়পত্রীতে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ‘Doubts have been expressed about the authenticity of the text’.[৭] গ্রন্থটি সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও উনিশ শতকে আলোড়ন তুলেছিল এই আত্মচরিত। রচনাকাল বাংলা ১৩৩৬ অর্থাৎ ১৯২৯। মানদাসুন্দরীর জন্ম কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯০০ সালে। পড়াশুনাও করেছিলেন বেথুন স্কুলে। কিন্তু বাল্যপ্রেমের বিপাকে তাঁকে ঘর ছাড়তে হয়, সারাজীবন বহন করতে হয় প্রতারণার দায়। তাঁর ঠিকানা হয় পতিতাপল্লীতে। মানদাসুন্দরীর দৃষ্টিতে শুধু পতিতা সমাজের চিত্রই নয় একই সঙ্গে উঠে এসেছে সমাজ-রাজনীতি-পরিবার এবং স্বদেশী আন্দোলনের পরিস্থিতি। এক পতিতার দৃষ্টিতে ব্যাখ্যাত হয়েছিল বলেই এত আলোচনার ঝড় উঠেছিল সেই সময় এবং পরবর্তী সময়েও। যুক্তিপূর্ণ সাহসী মানসিকতার পরিচায়ক মানদাসুন্দরীর আত্মচরিতে এক নারীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে— ‘আমি সমাজের ঘৃণিতা, অস্পৃশ্যা— সমাজে আমার স্থান নাই, স্থান থাকাও উচিত নহে, কিন্তু যে সকল সাধু-বেশী লম্পট আমাদের সংস্পর্শে থাকিয়াও সমাজের উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন, আমার জীবনীতে তাঁহাদেরও কতিপয় চিত্র দেখিয়া সমাজটাকে চিনিয়া রাখিতে পারিবেন।’[৮]

‘শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত’-এর বিপক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদ এবং একদল মানুষ

বইটি বাজেয়াপ্তও করতে চেয়েছিল। আবার সপক্ষেও বিশিষ্টজন সহমত হয়েছিলেন। গ্রন্থটির অনেকগুলি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। হিন্দি ও ইংরেজি ভাষাতেও প্রচারিত হয়েছিল। কত বিশিষ্ট মানুষদের কথা সরাসরি উঠে এসেছে এই আত্মজীবনীতে। শিবনাথ শাস্ত্রী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, দীনবন্ধু মিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্টজনের প্রসঙ্গ এক নারীর লেখনীতে উঠে আসা যেমন সাহসিকতার পরিচায়ক, তেমনি নির্দেশক তিনিও আধুনিক যুগের এক নারীর দৃষ্টি থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার যে সাহস রেখেছেন তাও উল্লেখ্য। কেন তিনি এই নাটকটি নির্বাচন করলেন সে বিষয়ে নির্দেশকের নিজস্ব অভিমত হল— '...পোক্ত নির্দেশকের খুঁটিতে আমি বাঁধা ছিলাম না। জলে নেমে হয়তো খুবই অপেশাদার স্টাইলে সাঁতরেছি। কিন্তু মানদাসুন্দরীকে জানবো--- এই ছিল বাসনা। একান্ত বাসনা ঠিক-ভুল, কাঁচা-পাকা যাই হোক না কেন ঐ আত্মজীবনীটাতে আছে এক অন্য ইতিহাস। অন্য লড়াইয়ের গল্প। খালি চোখে যে ভুল বা লড়াইগুলোকে আমরা প্রায় দেখতেই পাই না। সেই সত্যটাকে বলার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই কাজটা করেছি।'[৯]

১৯৮০-২০০৩ এই তেইশ বছরে খানিকটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে ছিলেন সুরঞ্জনা। তাঁর মনে হয়েছিল তিনি যেন লোকের বলা সংলাপ বলছেন। তাই 'মুক্তি' নাটক করতে গিয়ে সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথাবার্তা, ভাবনাচিন্তা আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে যখন সেঁজুতি তাঁর নিজের দলে কিছু কাজ করবার জন্য সুরঞ্জনাকে প্রস্তাব দেন— তিনি সাগ্রহে রাজি হন।

শুধু একক মানদাসুন্দরী নয়, অনেক মানদাসুন্দরীর দুঃখ, বঞ্চনা, ব্যথা, প্রতারণার কাহিনিকে এ নাটকের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন সুরঞ্জনা। ''শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত'— এই বইটি বাবা এনে দিয়েছিলেন। বইটা আমাকে নাড়া দিয়েছিল— আমার খুব ইনটারেস্টিং লেগেছিল। যাদের পতিতা বলা হচ্ছে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের টাকা তুলে দিতে যাচ্ছে কিন্তু তাদের রিফিউস করা হচ্ছে। তথাকথিত অর্থে সভ্য লোকেরা যে এদের ইমোশনকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তারা কিন্তু ভাবছে তারা দেশপ্রেমের অংশীদার। পতিতাদের ভোটাধিকারও ছিল না এক সময়ে। এই প্রান্তিক মানুষেরা, এদের প্রান্তিক করে রাখা মূলত এটাই বলতে চেয়েছি।''[১০]

'আরশি'র প্রযোজনায় এই কাজটি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করেছিলেন সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়ের উদ্যমে ও উৎসাহে কাজটি করতে কোথাও কোনও বাধা পাননি। নতুন দলের প্রায় ১৫/২০ জন একেবারেই নতুন ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক বছর ধরে

ওয়ার্কশপভিত্তিক কাজ করে তৈরি করেছিলেন 'মানদাসুন্দরী'। প্রথমদিকে মূল টেক্সট নিয়ে সরাসরি মহলা চলত। কিন্তু দেখা গেল এভাবে করলে অনেক সময় লাগবে। তখন সুরঞ্জনাই নাটকটি লিখলেন। তথাকথিত গল্প তার নিজস্ব গতিপথ ধরে এগোবে। কোনও নাট্যরূপ তৈরি হল না। মানদাসুন্দরীর জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা জুড়ে জুড়ে তৈরি হল নাটক। উপস্থাপনার ভঙ্গিটি ছিল যেন একটা থিয়েটারের দল, মানদাসুন্দরীর জীবন নিয়ে কাজ করছে। নাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তৈরি হয়েছিল যেখানে একটা 'সাইকোলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন (Psychological transformation)' দেখানো হয়েছিল। সেখানে অভিনেত্রী মানদাসুন্দরী আসল মানদাসুন্দরী হয়ে ওঠে। ঘটনাটি ঘটানো হয় এইভাবে যে সংবাদমাধ্যম থেকে সাক্ষাৎকার নিতে আসা সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী তখন আর তার নিজের কথা বলে না। মানদাসুন্দরীর কথাগুলো তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। সে তখন নিজেই হয়ে ওঠে মানদাসুন্দরী।

'মানদাসুন্দরী' নাটকের সংগীত ভাবনা ও মঞ্চপরিকল্পনাও ছিল সুরঞ্জনা দাশগুপ্তর নিজের। মঞ্চভাবনার ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন নির্দেশক। 'একবার বাঁকুড়ায় গিয়েছিলাম অঞ্জনের (সুরঞ্জনা দাশগুপ্তর স্বামী অঞ্জন দেব) সঙ্গে একটা নাটকের ওয়ার্কশপ করতে। সেখানে তারা রামায়ণের কাহিনি নিয়ে কাজ করছিল। আমাকে বলা হল আপনি সেট্-টা ভাবুন না দিদি। যেখানে কাজটা হচ্ছিল সেখানে অনেক ব্লক পড়ে ছিল নানান ধরনের— চৌকোনা, তিন কোনা, কোনোটা গোল। আমি ওগুলো দিয়ে কখনো ব্লক উলটে, কখনো উলটোদিকটা ব্যবহার করে। কখনো তিনটে চারটে ব্লক সাজিয়ে দেওয়াল থাম ইত্যাদি নানারকমের ফরমেশন করিয়ে ছিলাম। ওরা খুব খুশি হয়েছিল। ওটা হয়তো আমার ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে ছিল। ... মানদাসুন্দরীতেও ওইরকম ব্লক ব্যবহার করে সেট তৈরি হয়েছিল। টপ্‌টা ব্যবহার করতে পারিনি সে শক্তি তখন ধরিনি। হরাইজেনটা ধরেছিলাম।'[১১] এই মঞ্চ পরিকল্পনার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন তাপস সেন। তিনি এই নাটকের আলোক পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর মতো বর্ষীয়ান প্রতিথযশা শিল্পীকে 'আরশি'র প্রথম প্রযোজনায় এবং নির্দেশক তাঁর প্রথম পরিচালনার কাজে পেয়েছিলেন— এটা ছিল তাঁদের কাছে বড়ো প্রাপ্তি। 'মানদাসুন্দরী'র দৃশ্যবিন্যাস করেছিলেন অঞ্জন দেব। ছোটো মানদার ভূমিকায় কথাকলি দেব এবং বড়ো মানদাসুন্দরীর চরিত্রে সেঁজুতি মুখোপাধ্যায় অভিনয় করেছিলেন। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ২০০৩ সালের ২৮ জুলাই। নাটকের নানান বিভাগের সঙ্গে তাঁর সংযোগ এবং দীর্ঘদিন অভিনয় করার সূত্রে প্রযোজনা সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বিশিষ্ট জনের সাহায্য ও মতামত গ্রহণ করেছিলেন সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। শুধু তাঁর প্রথম নির্দেশনার কাজ বলে নয় তাঁর নাট্যনির্মাণের একটা বৈশিষ্ট্য-ই হল

পরামর্শগ্রহণ করা এবং সেই অভিমতগুলি প্রয়োজন মতো নাটকে প্রয়োগ করা। 'মানদাসুন্দরী'র আলোক কল্পনায় তিনি যেমন তাপস সেনকে পেয়েছেন তেমনি নাটক লেখার পর মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তীর মতো ব্যক্তিত্বরা দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব মতামত দিয়েছেন। প্রযোজনাটি সম্পর্কে সমালোচকেরাও ছিলেন আশাবাদী। 'কলকাতার থিয়েটার ইতিপূর্বে মহিলা পরিচালক ঊষা গাঙ্গুলি, সোহাগ সেন, শাঁওলি মিত্র, সীমা মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ নাট্যকর্ম দেখেছে। স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত নান্দীকার-এ পরিচালকের কাজ করেছেন। এখন সীমার দলে 'খুঁজে নাও'-এর পরিচালক স্বাতীলেখা। চমৎকার পরিচালনা। এঁদের অনেক অনেক আগে তৃপ্তি মিত্র বহুরূপী পতাকাতলে করেছিলেন 'ঘরে বাইরে', 'অপরাজিতা', আরব্ধর প্রযোজনায় 'রক্তকরবী'। অসিত মুখোপাধ্যায় চলে যাওয়ার পর ডলি বসু তুলে নিয়েছেন 'চুপকথা'র দায়িত্ব। এই তালিকায় নতুন উজ্জ্বল সংযোজনে সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। অকপটে বলি, নাট্যকর্মটি দেখার সময় একবারের জন্য মনে হয়নি, এটি কোনও পরিচালকের প্রথম পরিচালনা বা কোনও দলের প্রথম প্রযোজনা। তরতাজা যুবকদের নিয়ে সম্ভাবনাময় কাজ করেছেন সুরঞ্জনা। একমাত্র ও নিজে এবং সেঁজুতি মুখোপাধ্যায় ছাড়া সব নতুন আমাদের থিয়েটারে।'[১২] 'নাট্যপঞ্জিকা'য় লেখেন কমল সাহা– 'একটা দৃশ্যে পতিতাদের আচরণ এতোই বাস্তব হয়েছে যে মাথা নীচু হয়েছে লজ্জায়। রুদালীর থেকেও নিষ্ঠুর। ইতিপূর্বে তৃপ্তি মিত্র, ঊষা গাঙ্গুলি, সোহাগ সেন বাংলা মঞ্চে ঝড় তুলেছেন। এবার সুরঞ্জনার পালা।'[১৩]

২০০৩-র পর থেকে শুধুমাত্র অভিনেত্রী সত্তায় সন্তুষ্ট থাকেননি সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। কলকাতার থিয়েটারে মহিলা পরিচালকের তালিকায় যেমন অন্তর্ভুক্ত হল তাঁর নাম– তারপরে নির্দেশক হিসেবে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে গেছেন, একটির পর একটি প্রযোজনার মধ্য দিয়ে ক্রমশ নিজের জায়গাটাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'আরশি'-র পর 'ইলিউশন' দল গঠন করে 'কাননপিসির জপমালা' প্রযোজনা থেকে 'নির্বাক অভিনয় একাডেমি'র সঙ্গে কাজ করা শুরু এবং ধারাবাহিকভাবে এখানেই নাট্যনির্দেশনার কাজ করেছেন। ফলত দল পরিচালনার দায়িত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে। নাট্যনির্দেশনা বা দলপরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব একটা দর্শন আছে, একটা বিশেষ নীতিতে তিনি বিশ্বাস রাখেন। নির্দেশক হিসেবে তিনি কোনও দিনই খুব রাগত হয়ে কাজ করাবার পদ্ধতি বিশ্বাস করেন না। যদি আনন্দ করে কাজ করা যায় তার মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে। যারা থিয়েটার করতে আসছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই প্রথম থিয়েটারে আসছে কাজেই প্রথমেই একটা ধ্বংসাত্মক আচরণ করে থিয়েটারের প্রতি তাঁদের নিরুৎসাহ করে থিয়েটারের বাইরে সরিয়ে দেওয়ার সম্পূর্ণ বিপক্ষে সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। তাঁর নিজস্ব অভিমত– 'আমি একেবারেই কঠিন নই, চরিত্রগত দিক থেকে

খুব ডমিনেট করতে পারি না। এতদিন থিয়েটারের কাজ করে আমি যা পেয়েছি যা স্মৃতিতে আছে তার সবটাই আনন্দের। খারাপ ব্যবহার, বকাঝকা, মেরেধরে বের করে দেওয়া এটা আমি পছন্দ করি না। এটা খুব পুরোনো পদ্ধতি। সারাদিন বাইরে পরিশ্রম করে, যাবতীয় স্ট্রেসটা রিলিজ করতে ছেলেমেয়েরা থিয়েটারে আসে। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় ওদের কমফোর্ট জোনটা থিয়েটারে থাকা উচিত। এর ফলও আমি পেয়েছি। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে হয়তো পোশাক সেলাই করে ফেলল, রিকুইজিশন সাজিয়ে ফেলল, ব্যাক স্টেজের বিভিন্ন কাজ নিজেরাই সামলে নিল। আসলে থিয়েটারে ভুল বলে কিছু হয় না। থিয়েটারের কাজ এই নয় যে আমার ভাবনাটাই শুধু accomodate হবে। বিভিন্ন রকম ভাবনাকে accomodate করাই থিয়েটারের কাজ। থিয়েটার এখন শুধু নির্দেশকের মাধ্যম নয়। শুধু সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত নয়। একটা Co-oparetive-এর মতো হয়ে গেছে।'[১৪] এইভাবেই নতুন প্রজন্মের নির্দেশকদের মধ্য থেকে নতুন নতুন ভাবনার জন্ম হচ্ছে, থিয়েটারের ক্ষেত্র বদলাচ্ছে নির্দেশকের নির্দেশ-ও ভিন্ন মাত্রা পাচ্ছে। অনেক মেয়েরাই অভিনেত্রী থেকে নির্দেশক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বদলে দিচ্ছেন থিয়েটারের মানচিত্র।

## শাশ্বতী বিশ্বাস (১৯৬৭)

বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীদের মধ্যে কালক্রমে নির্দেশক হওয়ার প্রবণতাই বিশেষ লক্ষ করা যায়। তৃপ্তি মিত্রের পর মূলত সেই পথেই হেঁটেছেন পরবর্তী সময়ের অভিনেত্রীরা। অভিনয়- অভিজ্ঞতাই তাঁদের প্রচালিত করেছে নির্দেশক হওয়ার পথে।— শাশ্বতী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তার অন্যথা ঘটেনি। মূলত থিয়েট্রন নাট্যগোষ্ঠীর হয়ে তিনি নির্দেশনার কাজ করেছেন। থিয়েট্রন নাট্যগোষ্ঠীর সূচনা হয় ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। পরবর্তী সময়ে শাশ্বতী বিশ্বাস থিয়েট্রন নাট্যগোষ্ঠীতে যোগ দেন এবং কয়েকটি নাটকে অভিনয়ের পর পরই তুলে নেন নির্দেশনার দায়িত্ব। বলা যেতে পারে এই সময় তিনি একাধারে অভিনয় ও নির্দেশনার কাজ চালিয়ে গেছেন। যে থিয়েটার গোষ্ঠীর হয়ে তিনি মূলত নির্দেশনার কাজ করেছেন সেই থিয়েট্রন নাট্যগোষ্ঠীর একটা নিজস্ব পথ ছিল। শাশ্বতী বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভে তাই থিয়েট্রন নাট্যগোষ্ঠীর সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত জরুরি।

থিয়েট্রন নাট্যগোষ্ঠীর কর্ণধার সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় থিয়েট্রন-এর যাত্রা শুরু করেছিলেন— 'প্রথম পার্থ' এবং 'সংক্রান্তি'— বুদ্ধদেব বসুর দুটি কাব্যনাটক দিয়ে। যাঁরা বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক দিয়ে প্রথম যাত্রা শুরুর কথা ভাবেন তাঁদের গতিপথ যে অন্যান্য নাট্য দলের অনুসরণে হবে না, তা অনুমেয়।

বুদ্ধদেব বসুর নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যে ভাবনাটা কাজ করেছে তা হল তাঁর নাটক একধারে ভারতীয় ধ্রুপদী ভাবনার অনুসরণ করে আবার তা অসম্ভব আধুনিক! মানুষের প্রাত্যহিকতার মাপের চেয়ে বড় এই বড়কে ছুঁতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নাটক নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সময়ে বাংলা থিয়েটারের অবস্থাটা কেমন ছিল? শম্ভু মিত্র বহুরূপী থেকে চলে গেছেন— তবে ক্যালকাটা রেপার্টরি বা নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীর হয়ে তিনি অভিনয় করছেন। উৎপল দত্ত পূর্ণোদ্যমে অভিনয় করে চলেছেন তখন। ১৯৭০ সালে কেয়া চক্রবর্তীর মৃত্যু এবং এর কিছু দিন পর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নান্দীকার ছেড়ে চলে আসায় নান্দীকার-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। সেই সময় জন্ম নিল থিয়েট্রন। প্রথম থেকেই নাটক মঞ্চায়নের চেষ্টা না করে তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করেছিলেন কঠিন পরিশ্রম এবং নাটকের ট্রেনিং-এর মাধ্যমে নাটক মঞ্চায়নের। সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করতেন 'একটা নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করা মানে একটা সমাজের মধ্যে সমাজ তৈরি করা।'[১৫] মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রভাবও ছিল, তাঁর ওপর। নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাঁর একটা লক্ষ্য ছিল তা হল যা আমাদের ক্ষমতার চেয়ে বড়— তাকে ধরতে চাওয়া। থিয়েট্রন-এ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত কাজ করেছেন নিরন্তর। তার নির্দেশিত নাটকগুলি ছিল—

| **নাটক** | **নাট্যকার** | **সময়কাল** |
|---|---|---|
| প্রথম পার্থ ও সংক্রান্তি | বুদ্ধদেব বসু | ১৯৭৮ |
| তুঘলক | গিরিশ কারনাড | ১৯৭৯-৮০ |
| তপস্বী ও তরঙ্গিনী | বুদ্ধদেব বসু | ১৯৮৯ এবং ১৯৯৮ |
| মেদেয়া | ইউরিপিদেস | ১৯৮৩ |
| রাজা লিয়র | শেকসপিয়র | ১৯৮৬ |
| সাদা ঘোড়া | ইবসেন (মূল নাটক : Rosmersholm) | ১৯৯৮ |
| বিসর্জন | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৯৯০ |
| খেলাঘর | জে.বি. প্রিস্টলে (মূল নাটক : The Time and The Conways) | ১৯৯২ |
| অসঙ্গত | সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৯৯৫ |
| কালবেলা | রবার্ট বোল্ট অনুবাদ : সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় | ২০০০-২০০১ |

থিয়েট্রন নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যতালিকা লক্ষ করলে দেখা যায়— তাঁরা এমন ধরনের নাটক নির্বাচন করেছেন যা সাধারণত মানুষের তাৎক্ষণিক বাহবা কুড়োনো বা শুধুমাত্র জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য নয়। প্রত্যেকটি নাটকের মধ্য দিয়ে একটা গভীর তাৎপর্যবাহী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করল থিয়েট্রন।

'প্রথম পার্থ' বা 'সংক্রান্তি'— বুদ্ধদেব বসুর লেখা দুটি নাটকই বিষয় ও ভাবনার দিক থেকে যথেষ্ট কঠিন এবং এর মঞ্চায়নের ভাবনাও চিরাচরিত নাট্যভাবনা থেকে আলাদা। একটি নাট্য দলের মূল কাঠামো তৈরি হয় সেই দলের নাটক নির্বাচনের ওপর— এখান থেকেই অনুমিত হয় তাদের মানসিকতা, কর্মক্ষমতা এবং নাট্যভাবনা। তাই থিয়েট্রন যখন বুদ্ধদেব বসু দিয়ে যাত্রা শুরু করে, নির্বাচন করে তাদের প্রথম মঞ্চ উপস্থাপনায় দুটি কাব্য নাটক 'প্রথম পার্থ' ও 'সংক্রান্তি'— তখন সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন এবং দর্শকও মুখ ফিরিয়েছিল থিয়েট্রন-এর কাজের প্রতি। থিয়েট্রন একটা নিজস্ব ঘরানার দর্শক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই ধারাটা বহন করে নিয়ে চলেছেন সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর শাশ্বতী বিশ্বাসও।

আরও দুজন পরিচালক অভিজিৎ সেন ও দেবাশিস রায়চৌধুরী একটি করে নাটক পরিচালনা করলেও সম্পূর্ণভাবে সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনায় প্রভাবিত হয়ে পরিচালনায় এলেন শাশ্বতী বিশ্বাস। এ ছাড়া সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত বহু নাটকে পোশাক ও মিউজিকের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন শাশ্বতী। থিয়েট্রন-এর অভিনেত্রী হিসেবে তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠ। স্বভাবতই মনে হতে পারে যে সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর কেন শাশ্বতী বিশ্বাসের ওপর এই দায়িত্ব বর্তাল? একজন সফল অভিনেত্রী অবশ্যই নির্দেশক হতে পারেন কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয় আরও কতকগুলো যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্য। শাশ্বতী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সেই যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্যগুলো কী ছিল তা আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, তিনি ছিলেন অভিনেত্রী— দ্বিতীয়ত, সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নাটকে তিনি শুধু অভিনয় নয়, নাটক-অনুবাদ, সংগীত ভাবনা, পোশাক পরিকল্পনা ইত্যাদি নাটকের প্রায় সব ক'টি বিভাগ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। তৃতীয়ত, তাঁর মধ্যে নেতৃত্ব দানের একটা ক্ষমতা ছিল। যাদের নিয়ে কাজ করছেন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যেমন ছিল তেমনই শাসনেরও একটা জায়গা তৈরি করে নিয়েছিলেন। চতুর্থত, অভিনয় ছাড়াও নাট্য প্রযোজনার অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে তিনি হাতে কলমে কাজ করেছেন। এই সময়েই সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় থিয়েটারের কাজ থেকে বিশ্রাম নিতে

চাইছিলেন— তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি আর উৎসাহ পাচ্ছেন না— শাশ্বতী বিশ্বাস দায়িত্ব নেওয়াতে তাঁর উপকারই হল— তিনি বেঁচে গেলেন এবং নিশ্চিন্তও হলেন যে থিয়েট্রন দলটা সচল থাকল বলে। পঞ্চমত, পরিশ্রম করতে পারতেন প্রচুর। এই রকম নানাবিধ কারণেই শাশ্বতী বিশ্বাস থিয়েট্রন-এর নির্দেশকের জায়গাটা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ছাড়া নির্দেশনার দায়িত্ব নিতে তাঁর মতো আগ্রহ আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষা ও সাহচর্য তাঁকে যেমন নির্দেশক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল, তেমনই তাঁর ব্যক্তিগত পড়াশোনা, আগ্রহ, থিয়েটারের সামগ্রিক ভাবনাচিন্তার পরিমণ্ডলে তাঁর ব্যাপ্তি— নির্দেশক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে তাঁর সহায়ক ছিল।

শাশ্বতী বিশ্বাস পড়াশুনা করেছেন সাউথ পয়েন্ট স্কুল-এ। তার পর অর্থনীতি নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে স্নাতক। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক স্তরে ইকনমিক্স্-এ প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ। তার পর চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ করে একটি বহুজাতিক সংস্থায় কর্মজীবন শুরু করেন। ফ্যাক্টরি ও বোর্ড মিটিং-এ ব্যস্ততার জীবনেও নাটকের জন্য তত দিনে তৈরি হয়ে গেছে— আলাদা জগৎ। ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হিসেবে কাজ করার সময় তাঁর হাতে অনেকটাই ফাঁকা সময় থাকত— সেই সময়টা তিনি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং মঞ্চের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগটা তৈরি হয় পরবর্তী সময়ে কলকাতা শহরে থাকার সময় পর্যন্ত সেই বন্ধনটা ছিন্ন হয়নি। বরং অভিনেত্রী থেকে নির্দেশক হওয়ার পর থিয়েটারের জন্য তাঁকে অনেক বেশি সময় এবং শ্রম দিতে হয়েছে।

নাট্যজীবন শুরু হয় শাশ্বতীর গান্ধার নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে। অসিত মুখোপাধ্যায় ছিলেন গান্ধার-এর কর্ণধার।— এই সময়টা শাশ্বতীর জীবনে 'অবজারভেশন'-এর সময়।— বসে বসে খালি পর্যবেক্ষণ করতেন নাটকের ক্রিয়াকর্ম। গান্ধার-এ তিনি একটি নাটকে (পুলিশে মানুষে) একটি মাত্র অভিনয় করেন ছোট্ট একটি চরিত্রে। এর কিছু দিন পরেই শাশ্বতী যোগ দেন থিয়েট্রন-এ। গান্ধার এবং থিয়েট্রন-এর দুই কর্ণধার যথাক্রমে অসিত মুখোপাধ্যায় ও সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়— দুজনের মধ্যে একটা সখ্য ছিল এবং তাঁদের মধ্যে নাট্য সম্পর্কিত ভাব-ধারণার আদান-প্রদান চলত। ফলত, শাশ্বতীর নাট্যজীবনের গঠনে এই দুই নাট্যব্যক্তিত্বের সাহচর্য তাঁকে গঠনমূলক কাজে প্রভাবিত করেছে। পরবর্তী সময়ে তাঁর অভিনেত্রী-সত্তা ও নির্দেশক-সত্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় থিয়েট্রন নাট্যগোষ্ঠীতে শাশ্বতী বিশ্বাসের অভিনেত্রী জীবন শুরু হয়েছিল 'অসঙ্গত' নাটকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্য দিয়ে। থিয়েট্রন-এর প্রযোজনায় নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়— ৪ এপ্রিল ১৯৯৫, আকাদেমি মঞ্চে। অভিনয় করেছিলেন বিভিন্ন চরিত্রে রেশমী

দত্ত— শাশ্বতী বিশ্বাস, ড. চঞ্চল সরকার— সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃগেন— দেবাশিস রায়চৌধুরী, নার্স— অনীতা চট্টোপাধ্যায়, সোমেন দত্ত— জয় সেনগুপ্ত, মীনাক্ষী দত্ত— মণিকা দে, পার্থ— অভিজিৎ চৌধুরী, দাদু— চুণী দত্ত, ঠাম্মা— সবিতা রাহা, মঞ্চ—বিকাশ রায়। রঙ্গবস্তু— অনীতা চট্টোপাধ্যায় ও অভিজিৎ চৌধুরী। আলো— বাদল দাস, রূপসজ্জা— মুনীর হোসেন, আবহ— সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, আবহ নিয়ন্ত্রণ— সুব্রত ভাবক। প্রযোজনা সহায়ক— অশেষ চৌধুরী, নাটক ও নির্দেশনা— সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'অসঙ্গত' নাটকটির কাহিনির মধ্যে রয়েছে তিনটি পরিবার ও চারটি দম্পতির কথা। একটি পরিবার— যারা এই নাটকের কেন্দ্রে তারা একটি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। সোমেন দত্ত ও তার স্ত্রী মীনাক্ষী ও তাদের একমাত্র সন্তান রেশমী। বয়ঃসন্ধির এই কিশোরীর মানসিক গঠনে কোথাও একটা অস্থিরতা আছে। সে এক রাতে তার ঘুমন্ত পিতামাতাকে বৈদ্যুতিক তার জড়িয়ে মেরে ফেলতে যায়। ব্যর্থ হয় সে। তার-ই চিকিৎসার জন্য আসেন সাইক্রিয়াটিস্ট ডা. চঞ্চল সরকার। কিন্তু চিকিৎসকেরও নিজের চিকিৎসার প্রয়োজন। তিনি ধীরে ধীরে উন্মোচন করেন কিশোরী রেশমীর মনোবিকলনের কারণ। আর সেই পথেই কিশোরী রেশমীর সঙ্গে চিকিৎসকের মধ্যে গড়ে ওঠে এক 'transference of relationship'। রেশমীর বাবা সোমেন দত্ত, তার হাতে সময় বড় কম, সাফল্যের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে তার সময় ফুরিয়ে যায়— সন্তানের ভাগ্যে জোটে না বাবার সাহচর্য। মা মীনাক্ষী উচ্চাকাঙ্ক্ষী, স্বপ্নের জগতে তার বিচরণ। তারা দুজনেই তাদের রেশমীকে ভালোবাসেন। রেশমীও মা-বাবা অন্ত প্রাণ। কিন্তু একরাতে রেশমী বাবা-মাকে বৈদ্যুতিক তার জড়িয়ে খুন করতে যায়। উন্মাদ হয়ে ওঠা এই কিশোরীর গল্প নতুন নয়। বর্তমান সময়ে যে কিশোর-কিশোরীদের আত্মঘাতী হয়ে ওঠার নানান ঘটনা সমাজের এক জ্বলন্ত সমস্যা, সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে আনলেন এ নাটকে। রেশমীর মধ্যে দিয়ে অসুখী সমাজ-সংসারের প্রতি বিরক্ত কিশোর-কিশোরীদের ছবি শুধু তুলে আনলেন না। নিউক্লিয়ার পরিবারের মেয়েটির মানসিক অসুস্থতার নিদান মিলল তারই বন্ধু পার্থর যৌথ পারিবারিক কাঠামোয় থাকা ঠাম্মা-দাদুর কাছে। ঠাম্মার মুখে গল্প শুনে রেশমী কেঁদে ওঠে। নাট্যকার এখানেই আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় পরিবারে কেবল চিকিৎসক চঞ্চল সরকারকেই দেখতে পাই আমরা— তাঁর স্ত্রী স্বাতী এখানে পরোক্ষভাবে উপস্থিত। দ্বিতীয় পরিবারেও রেশমীর বন্ধু পার্থর বাবা-মা পরোক্ষভাবে উপস্থিত। ঠাম্মা-দাদুর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি এবং নাটকে চারটে দম্পতি ও তিনটি পরিবারের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি মধ্য দিয়ে নাট্যকার বর্তমান সময়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় 'অসঙ্গত' নাটকে উপস্থিত করেছেন। আর এই রকম একটি মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের চরিত্রে রূপদান করেছেন শাশ্বতী বিশ্বাস।

থিয়েট্রন-এ শাশ্বতীর প্রথম মঞ্চাবতরণ 'অসঙ্গত' নাটকে একটি মানসিক অস্থির ১৬ বছরের

কিশোরীর চরিত্রে। তাঁর বয়স তখন তো ১৬ নয়, ফলে এ রকম একটা চরিত্রায়ণ ছিল নিঃসন্দেহে কঠিন। সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় এই রেশমীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রীর অনুসন্ধান করছিলেন– তখন তিনি পেলেন শাশ্বতীকে। নাটকের চরিত্রটির চেয়ে বয়সে বড় একজন অভিনেত্রীরই খোঁজ করছিলেন নির্দেশক– কারণ বয়সে বড় না হলে ওই জটিল মানসিক দ্বন্দ্বময়তায় চরিত্রটিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শাশ্বতীর পরিণত মানসিকতা এবং চেহারার দিক থেকেও কিশোরীর আদল– দুটো দিক মিলে যাওয়াতে– রেশমী দত্ত-র ভূমিকায় তিনিই ছিলেন উপযুক্ত। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিলেন শাশ্বতী। তাঁর অভিনয় সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত– 'অভিনয়ে রেশমীর চরিত্রে শাশ্বতী বিশ্বাস ভারি মানানসই। এক কথায় নতুন এই অভিনেত্রীর অভিনয় দু'ঘণ্টা তুড়ি মেরে সাফ করে দেয়।'[১৬]

ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া অর্থনীতির ছাত্রী– যার সামনে অপেক্ষা করছিল বৃহত্তর পেশাদারি কর্মজগৎ, তিনি কিন্তু নাট্যমঞ্চে প্রথম অভিনয়েই নজর কেড়েছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেমন লেখা হয়েছিল তেমনি ব্যক্তিগতভাবে শাশ্বতী বিশ্বাসের অভিনয়ের স্মৃতি ধরা আছে রুশতী সেন-এর কলমে– '১৯৯৫ সালে 'থিয়েট্রন'-এর অসংগত নাটকে (নাটক ও নির্দেশনা : সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়) এক নতুন অভিনেত্রী চমকে দিয়েছিলেন। এক কিশোরীর চরিত্রে অভিনয় করতেন শাশ্বতী বিশ্বাস। সেই কিশোরী এবং এক অর্থে সেই কিশোরীর প্রজন্ম যে মানসিক বিষাদে ভারাক্রান্ত, সেই গ্লানির কার্যকারণ বিন্যাসেই ছিল নাটকটির চলন। ঘটনাক্রমের কিছু সরলীকরণ সত্ত্বেও সে নাটক নতুন প্রজন্মের তত্ত্বই বিষণ্ণতার সংগতি খুঁজত সামাজিক-সাংসারিক নিয়ম-বেনিয়মের জটিল আবর্তে। সেই খোঁজের ভিতর দিয়েই নাটকটির 'অসঙ্গত' নামকরণ সত্যি হয়ে উঠত। সংগতির সেই নির্মাণে শাশ্বতীর অভিনয় ছিল মনে রাখবার মতো। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে ভ্রূণ যে ভঙ্গিতে মাতৃগর্ভে অবস্থান করে, তেমন এক মুদ্রায় কিশোরীটিকে মঞ্চে প্রথম দেখা যায়। ওই ভঙ্গিমাই তার অনিশ্চিতির, তার বিষাদের, তার অসংলগ্নতার লক্ষ্মণ, আর তার সঙ্গে তার অনন্ত নীরবতা।'[১৭] অর্থাৎ নিজের বয়সের বাইরে বেরিয়ে এসে, নিজের চরিত্রের চেয়ে ভিন্নতর এক চরিত্রায়ণের পথটা তৈরি হয়ে গেল 'অসঙ্গত' নাটকে শাশ্বতীর অভিনয়ে। অভিনয়-অভিজ্ঞতা তাঁকে ক্রমশ পরিণত করে তুলল। তবে অভিনেত্রী থেকে নির্দেশক হয়ে ওঠার সময়কালটা খুব বেশি নয় শাশ্বতীর ক্ষেত্রে। কীভাবে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য? একজন অভিনেতার তো সব ধরনের চরিত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে না। যা সে দেখে তারই আলোকে চরিত্রকে নির্মাণ করতে যায়। শাশ্বতীর নিজের কথায়– 'It is not possible for any actor to be familiar with different characters he/she might be required to play in the course of his/her career. It is therefore imperative that the artistic take off from the

nearest point of identification.'[১৮] শাশ্বতী চার বছর ধরে এই ১৬ বছরের কিশোরীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কিন্তু তাকে কি ক্লান্ত করেছে বারবার এই চরিত্রে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা? শাশ্বতী মনে করেন না। নাটক তো টেলিভিশন নয়, এখানে প্রতিদিন চরিত্রটিকে খনন চলে, আবিষ্কার করতে করতে যাওয়া যায়। যখন একটা চরিত্রের সঙ্গে বসবাস করা হয়, তখন শুরু হয় চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করা। সময় সাহায্য করে একটা চরিত্রের গভীরে অবগাহনের চেষ্টাকে। ক্রমশ চরিত্রটি বুঝতে আরও ভাল লাগে, আরও গভীরে যাওয়া যায়। এই বিষয়টাই একজন অভিনেতার পারফরমেন্সকে সাজিয়ে তোলে— আর এ কারণেই দুটো অভিনয় কখনও এক রকম হয় না।

অভিনেত্রীর জীবনের পথ চলাটাই নির্দেশকের গন্তব্যে পৌঁছেছিল অন্তত শাশ্বতীর ক্ষেত্রে। তাই যে নাটক দিয়ে সূচনা হয়েছিল থিয়েট্রন-এর 'সেই তপস্বী ও তরঙ্গিনী'— তৃতীয় পর্যায়ে আবারও মঞ্চস্থ হল ১৯৯৮-তে এবং শান্তার চরিত্রে অভিনয় করলেন শাশ্বতী বিশ্বাস। রাজা ঋষ্যশৃঙ্গের জীবন কাহিনি ও নাটকীয়ত্ব এবং এই নাটকটির তাৎপর্য পরিচালক সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার প্রাণিত করেছে। তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এ নাটকের মধ্যে নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বের যে পটভূমিকা তৈরি হয় সেই ভাবনায়। সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনার একটা নিজস্ব ঘরানা ছিল। 'The director added that with a few exceptions, he has always tried to produce plays written by the masters, because only their work reflects a world view, a meaningful philosophy of life and a greatness. No matter what, his productions will reflect at least a little of this greatness. Since ... Theatron has always been sincere in their effort to produce plays relevant to the contemporary social and political background, this play assumes greater significance.'[১৯]

তৃতীয় পর্যায়ে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-র শান্তা চরিত্রে শাশ্বতী বিশ্বাসের অভিনয় বিশেষ প্রশংসিত হয়— 'রাজকুমারী শান্তার চরিত্রে শাশ্বতী বিশ্বাসের অভিনয়ের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে নাটকেরও চরিত্রের শিল্পগত নির্যাসকে নিংড়ে প্রকাশ করেছেন থিয়েটার ও নবনির্মাণের মূল্যায়ন।' এর আগে মঞ্চস্থ হওয়া নাটক আবারও মঞ্চস্থ করলেন যখন সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন তিনি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ভিন্ন ধরনকে আহ্বান জানালেন। সেই নাট্যভাষা অনুযায়ী তৈরি করে নিলেন অভিনেতাদের। ফলত 'অসঙ্গত'-র পর একেবারে ভিন্নমুখী এক চরিত্রে অভিনয় করে অভিনয় সম্পর্কিত বিষয়টি আরও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করলেন শাশ্বতী। এই পর্যায়ে তাঁর শিক্ষাগ্রহণ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়কেই অনুসরণ করল। এবং থিয়েট্রন-এর ঘরানাকে অধিগত করার প্রয়াস চালালেন।

শাশ্বতী বিশ্বাস-এর নির্দেশক হয়ে ওঠার আগে শাশ্বতী বিশ্বাস আরও একটি নাটকে অভিনয় করেন। দেবাশিস রায়চৌধুরীর নির্দেশনায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লম্বকর্ণপালা'। এই নাটকে শাশ্বতী চাকরের ভূমিকায় (ঘুন্টে) অভিনয় করেন এবং তিনি আনন্দের সঙ্গেই কাজটি করেছিলেন। কমেডি নাটকে অভিনয় করা যে যথেষ্ট পরিশ্রমের এবং 'অসঙ্গত'-র মতো এই 'লম্বকর্ণপালা'তেও তাঁকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে কাজটা করতে হয়েছিল। 'অসঙ্গত' নাটকে রেশমী দত্ত-র মতো একটি ষোলো বছরের মানসিকভাবে অস্থির কিশোরীর ভূমিকায়, 'লম্বকর্ণপালা'য় চাকর ঘুণ্টে এবং 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-তে মহাভারতীয় প্রেক্ষাপটে শান্তার চরিত্র রূপায়ণ— শাশ্বতী বিশ্বাসকে অভিনয়ের ক্ষেত্রে যেমন প্রতিষ্ঠা দিল, সেই সঙ্গে ক্রমশ নিজেকে থিয়েট্রন ঘরানার সঙ্গে নিবিষ্ট করে তুললেন। তাঁর সমসময়ের অভিনেতা এবং 'লম্বকর্ণপালা'র নির্দেশক দেবাশিস রায়চৌধুরী শাশ্বতী বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে লক্ষ করেছিলেন তাঁর মধ্যে রয়েছে থিয়েটার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানবার এবং সবকিছু শিখে নেওয়ার একটা আগ্রহ— 'শাশ্বতী ছিল বাণিজ্যের ছাত্রী— শাশ্বতী যখন থিয়েটারকে ভালোবেসে এল তখন অদ্ভুত একটা involvement দেখেছিলাম ওর মধ্যে— মানে সব কাজেই যেন ওর একটা জানার আগ্রহ ছিল ভীষণ— সবদিক থেকে। যেহেতু ভালো ছাত্রী ছিল— সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল।'[২০]

এই যে অভিনয় করতে করতে নাটকের অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে জানবার আগ্রহ বা শিখে নেওয়ার চেষ্টা, এটা সবার মধ্যে থাকে না। সে ক্ষেত্রে শাশ্বতী বিশ্বাস থিয়েট্রন-এ যুক্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় নাটকের ক্ষেত্রেই নিজের একটা পথ তৈরি করেছেন। সেই সময়ে অর্থাৎ যে সময়ে সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করতে চাইছেন না, তিনি দলের অন্যতম সিনিয়র মেম্বার ও অভিনেতা দেবাশিস রায়চৌধুরীর ওপর দায়িত্ব দিলেন। এত দিন যে ধরনের নাটক থিয়েট্রন করে এসেছে 'লম্বকর্ণপালা' ছিল তার মধ্যে অন্য রকম। থিয়েট্রন সবসময়ই সিরিয়াস বিষয় নিয়ে নাটক করতে পছন্দ করেছে। তাদের প্রযোজনা তালিকা সেই পরিচয়-ই দেয়। এই প্রযোজনাতেও শাশ্বতী উইগ পরে ছেলেদের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। গানেও গলা দিয়েছিলেন। তা ছাড়া 'এখানেও শাশ্বতীর involvement ভীষণ ছিল। রিকুইজিসনের দায়িত্ব, কস্টিউম, পোশাক ইত্যাদি দেখা, ধীরে ধীরে ও অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে চলছিল এবং ওর যে শেখার আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে সলিলদার একটা সান্নিধ্য পাওয়া— কাজের ক্ষেত্রে এটা শাশ্বতী ভীষণভাবে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিল। কাজ করতে করতেই কিন্তু শাশ্বতী একসময় থিয়েট্রন থেকে নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করল।'[২১] যে সময়টায় শাশ্বতী থিয়েট্রন-এ নির্দেশনার দায়িত্ব পেয়ে গেল, তখন কিন্তু দেবাশিস রায়চৌধুরী থিয়েট্রন-এ নেই। অরুন্ধতী

বন্দ্যোপাধ্যায়ও নেই। ফলত শাশ্বতী বিশ্বাসের কাজের আগ্রহ, পরিশ্রম করার প্রবণতা, সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষা ও সাহচর্যে ক্রমশ নিজেকে উন্নত করে তোলা— এই সমস্ত বিষয়গুলি তাঁকে নির্দেশক হয়ে ওঠার পেছনে অনেকটাই সাহায্য করেছে। এমনটাই অভিমত দেবাশিস রায়চৌধুরীর। এ ছাড়া সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ও থিয়েট্রন-এর পঁচিশ বছর পূর্তিতে জানালেন— 'থিয়েট্রন এবারে পঁচিশে পা রাখলো। ব্যাপারটা ঘোষণীয় কিংবা পালনীয়— কোনোটাই নয়। তবু সময় হয়ে আসছে বুঝতে পারছি বলে এবারে জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত নবীনদের। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অথচ যৌবনের স্পর্দ্ধা নিয়ে তারাই তো করবে থিয়েটার। আমি না থাকি থিয়েট্রন হয়তো থাকবে, থিয়েট্রন না থাকলেও থিয়েটার থাকবেই। সেই প্রাণবন্ত অর্থবহ থিয়েটারের জয় হোক!'[২২] শাশ্বতী বিশ্বাসের ওপর সেই সময় থিয়েট্রন এবং থিয়েট্রন-এর কর্ণধার নির্ভর করেছিলেন— তাই পর পর অনেকগুলি নাটক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি।

**'থিয়েট্রন'-এর প্রযোজনায়**

**শাশ্বতী বিশ্বাসের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ নাটক**

| নাটক | মূল নাটক | নাটককার | প্রথম অভিনয় |
|---|---|---|---|
| তোমার আঁধার তোমার আলো | দ্য গিফ্‌ট অফ দ্য গরগন; | পিটার স্যাফর | ১৯৯৯ |
| তোমারই মাটির কন্যা | The Trojan Women | ইউরিপিদেস | ২০০২ |

**তোমার আঁধার তোমার আলো:** ১৯৯৯ সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়— থিয়েট্রন-এর কর্ণধার যখন মনে করলেন সময় এসেছে নবীন প্রজন্মের হাতে প্রযোজনার দায়িত্ব তুলে দেওয়ার, তখন শাশ্বতী বিশ্বাসও সেই দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্য হয়ে উঠলেন। তাঁর প্রথম কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন— পিটার শ্যাফর-এর মতো নাট্যকারকে। কেন এই নাটক বেছে নেওয়া হল সে সম্পর্কে সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযোজন— 'এই নাটক কেন করতে চাইছে থিয়েট্রন সে কথা নবীন নির্দেশক শাশ্বতী লিখেছেন। এটা তাঁর প্রথম কাজ। প্রথম কাজ করতে গিয়ে তিনি যে ক্ষমতার মাপে একটি অকিঞ্চিৎকর নাটক বেছে না নিয়ে Peter Shaffer-এর জীবনের শেষ ফসল এই অত্যন্ত জটিল কঠিন এবং প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক নাটকটি নিয়ে ঝাঁপ দিলেন এতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা যেমন অনুভব করছি তেমনই, (নিতান্ত বিফল এই নাট্যকর্মীরও) এক ধরনের সার্থকতার অনুভব হচ্ছে।'[২৩]

একজন সিনিয়র এবং নাট্য-অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব যখন একথা বলেন তখন সেই কাজটি বাড়তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শাশ্বতী বিশ্বাস পিটার শ্যাফর রচিত 'The Gift of the Gorgon' নাটকটির অনুবাদ

মঞ্চস্থ করতে আগ্রহী হন, তার কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে এমন একটা সময়ের মুখোমুখি তাঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন যে তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতেই হবে— কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। যতই মুখ ফিরিয়ে থাকা হোক না কেন আর ভান দেখানো হোক যে হিংসা বা জিঘাংসা আমার দরজায় আঘাত করছে না, কিংবা হিংসার বিরুদ্ধে আরও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে আগামী প্রজন্মকে ভালো, উপযুক্ত রাখার জন্য তৈরি করা হচ্ছে— তা আরও মারাত্মক। যাদের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা কী চুপ করে থাকবে! এ নাটকে যে লড়াইটা দেখানো হয়েছে তা রূপকধর্মী— শুধু বাইরের নয় প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরে যে দ্বন্দ্ব চলে তা হল ভাল আর মন্দের লড়াই।

এ নাটকে এই নতুন তথ্য আবিষ্কার করে যে, আমাদের সমাজে কী ধরনের হিংসা-প্রতিহিংসা চলছে। তখন মানুষকে বেছে নিতেই হয় যে কোনও একটা পথ।

পিটার শ্যাফরের শেষ পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক 'The Gift of the Gorgon' (১৯৯২) তাঁর নাট্য গঠনের একটা ধরন আছে যেখানে থিয়েটার শুধু থিয়েটার থাকে না— একটা শিক্ষার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেয়। কলকাতা শহরে বা বাংলা থিয়েটারে তাঁর আগে কেউ পিটার শ্যাফরের নাটকের মঞ্চায়ন ঘটিয়েছেন কি না সন্দেহ আছে। এই সমসাময়িক বিদেশি নাট্যকারকে বাংলার দর্শকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে শাশ্বতী বিশ্বাসের কতকগুলি বিষয় উঠে আসে—

১) বিদেশি আধুনিক নাটক সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।
২) আধুনিক জীবনের সমস্যাগুলো যেভাবে শাশ্বতী বিশ্বাসকে নাড়া দিয়েছে তারই উত্তর সন্ধানে তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন বিদেশি নাট্যকারের কাছে এবং একটা সেতু তৈরি করতে পেরেছেন।
৩) থিয়েট্রন এযাবৎ যে ধরনের নাটক মঞ্চায়নের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছে শাশ্বতী সেই পথটাই অনুসরণ করলেন। থিয়েট্রন-এর ঘরানাকে ভেঙে ফেলার প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল না।
৪) প্রচলিত ঘরানার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মৌলিক চিন্তাভাবনার মেলবন্ধন ঘটালেন।
৫) অনুবাদের দায়িত্ব নিজে বহন করার মধ্যে অনুবাদকের দর্শন কোথাও প্রতিফলিত হয়— নাট্যকারের নাটকের বাঁচার মধ্য থেকেও গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে নিজস্ব দর্শনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। সেই কাজটিই করেছেন শাশ্বতী।
৬) 'তোমার আঁধার তোমার আলো'র নামকরণও তাঁর অভিনব ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে।

পিটার শ্যাফর জীবনের সঙ্গে নাটককে সম্পৃক্ত করে তুলতে পেরেছিলেন কি না তা অবশ্যই বিচার্য, কিন্তু তাঁর সৃষ্ট 'The Gift of Gorgon'-এর চরিত্র নাট্যকার এডওয়ার্ড ড্যামসনকে পিটার শ্যাফর

এমনভাবে গড়তে চেয়েছেন যিনি তাঁর রচিত নাটকের মধ্য দিয়ে জীবনকে স্পর্শ করতে চান। পিটার শ্যাফর-এর 'The Gift of the Gorgon' যেন একটি খনি— কত যে সম্ভাবনার সম্ভার সেখানে। গঠনগত এবং ভাবনাগত দিক থেকে এই নাটকটি শুরু হয়— প্রখ্যাত নাটককার এডওয়ার্ড ড্যামসনের মৃত্যু-সংবাদের রেডিও ঘোষণা দিয়ে। এডওয়ার্ড-এর অবৈধ পুত্র ফিলিপেরও প্রিয় বিষয় নাটক। তার বাবার লেখা নাটক সে ক্লাসে পড়ায়। মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ফিলিপ চলে আসে— দেখা করে এডওয়ার্ড-এর স্ত্রী হেলেনের সঙ্গে। তার কাছ থেকে ফিলিপ শুনতে চায় এডওয়ার্ড-এর জীবনের কথা। কেন না তার লক্ষ্য পিতার জীবনী রচনা করা। হেলেনের আপত্তি টেঁকে না ফিলিপের তীব্র ইচ্ছার কাছে— নিমরাজি হয়েও এবং বলে চলেন এই এডওয়ার্ডের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হওয়া থেকে নাট্যকারের জীবনের শেষ পর্যন্ত। বাবার কাহিনির জন্ম? উদ্‌ঘাটিত হয় প্রতিভাধর এডওয়ার্ডের মনের জগৎ। তাঁর ভাবনাচিন্তার জটিলতার জগৎ। আসলে এই নাটকের মধ্য দিয়ে পিটার শ্যাফর মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন প্রকৃতি বনাম শৃঙ্খলার দ্বন্দ্বের প্রশ্ন। এ সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়া কী? আমরা কেউ কেউ একে গ্রাহ্যই করি না— চোখ বন্ধ করে রাখি। অনেকেই আবার বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে না— কেউ কেউ আবার ভেতরে ভেতরে— প্রতিবাদী হয়ে ওঠে— ন্যায়হীন পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের অবহেলার প্রতিকারের জন্য প্রতিহিংসাকে আশ্রয় করে। কিন্তু প্রশ্ন হল এইখানেই যে, হিংসার উত্তর কি প্রতিহিংসা দিয়ে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারে না এককভাবে কোনও রাষ্ট্র সমাজ— এর জন্য প্রত্যেক মানুষকে সচেতন হতে হয়— পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ যদি সচেতন হয়, নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা রাখে— তবেই হয়তো একটা নিশ্চিন্ত সমাধানের উত্তর পাওয়া যেতে পারে। ব্যক্তি সত্তার রূপান্তরে রূপান্তরিত হতে পারে সমাজ— রাষ্ট্র। এই ধরনের নাটক নির্বাচন করে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিলেন শাশ্বতী বিশ্বাস।

পিটার শ্যাফর-এর নাটকের একটা বৈশিষ্ট্য হল তিনি থিয়েটারের মধ্যে ফ্ল্যাশব্যাক রাখতে পছন্দ করেন। মেটা থিয়েটারের (Meta theatre) জটিল আবর্তে আমরা এই নাটকে দেখতে পাই এখানে পুত্র সাক্ষাৎ নিচ্ছে তার পিতার স্ত্রীর— যিনি তার নিজের মা নন। কথা প্রসঙ্গে মায়ের স্মৃতিচারণে উঠে আসছে পুরোনো দিনের ছবি। নাট্যকার এই রকম গভীরতম সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করতে ভালবাসেন। সে ক্ষেত্রে শাশ্বতী সমাজ-সচেতক হিসেবে এই ধরনের সামাজিক সমস্যানির্ভর নাটকের প্রতি আগ্রহী হলেন— বিনোদন বিষয়টি প্রাথমিক শর্ত ছিল না। শাশ্বতী ফিরে এলেন নাটকের এমন একটা বিষয়ে যা নতুন প্রজন্ম বা যৌবনের কথা বলে— বাঙালি দর্শক যাঁরা সাম্প্রতিক বিদেশি নাটক সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করালেন সাম্প্রতিক বিদেশি কাজকে। শুধু মূল নাটকের পাঠ নিয়ে নয়, তাঁর চিন্তাভাবনাকে প্রসারিত করে দিলেন নাটকের প্রযোজনাতেও। প্রযোজনার ক্ষেত্রে

তিনি যথেষ্ট পরিণত নির্দেশক হিসেবেই কাজ করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় (৩০.০৯.২০০০) লেখা হয়— ''বেশ পরিণত লাগে তাঁর নির্দেশনার কাজও। ভারি রঙের আধিপত্যে এবং আলোর সুমিত ব্যবহারে আগাগোড়া একটা দমচাপা পরিবেশ তৈরি হয়ে থাকে মঞ্চে। এ ব্যাপারে তাঁকে যোগ্য সহায়তা দিয়েছে গৌতম ঘোষের আলো আর মুন দত্তের মঞ্চ ও পোশাক পরিকল্পনা। স্টেজের প্রতিটি অংশকে ব্যবহার, অনায়াসে বেশ কিছু মঞ্চ ছবি তৈরি করায় নাট্যের ব্যাকরণে শাশ্বতীর অধিকার প্রবেশ পায়।''

এ নাটকে শাশ্বতী মূল চরিত্রে অভিনয় করেন (হেলেনা — নাট্যকারের স্ত্রী)। শাশ্বতীর অভিনয় বিশ্লেষণে পরতে পরতে খুলে যায়— হেলেনা চরিত্রের জটিলতাময় বহুমুখিতা। কাতিনার ভূমিকায় চৈতি চৌধুরীও বিশেষ নজর কাড়েন। তাঁর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকদের মধ্যে একটা ভয় আতঙ্ক তিনি সঞ্চারিত করে দিতে পারেন। অশেষ চৌধুরী (জার্ভিস), আশিস গুপ্ত (ক্রমওয়েল), শঙ্কর ঘোষ (ডামসিনস্কি)— এর পরিণত অভিনয় নাটকটির সম্পদ। কিন্তু— এডওয়ার্ড ড্যামসনের ভূমিকায় গৌতম এবং ফিলিপের চরিত্রে প্রদীপ বিশ্বাস— তাঁদের ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী অভিনয় প্রার্থিত ছিল। এ নাটকে আলোর দায়িত্ব ছিল গৌতম ঘোষ-এর, মঞ্চ ও পোশাক মনু দত্ত।

এ নাটকের মূল কথাই ছিল 'একমাত্র ব্যক্তিসত্তার রূপান্তরই নিশ্চিত করতে পারে আমাদের এই পৃথিবীটার রূপান্তর।'

**তোমারই মাটির কন্যা (২০০২):** 'দ্য ট্রোজান উইমেন'— ইউরিপিদেস-এর নাটকটির অনুবাদ করলেন সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৯ সালে শাশ্বতীর প্রথম নির্দেশনার কাজ 'তোমার আঁধার তোমার আলো'। একেবারে সাম্প্রতিক এক ব্রিটিশ নাট্যকারের নাটককে বঙ্গভূষণে উপস্থাপনার কৃতিত্ব পুঁজি করে তিন বছর পর আরও একটি সাহসী প্রযোজনায় হাত দিলেন তিনি। ট্রয় যুদ্ধ এই নাটকের কেন্দ্র। যুদ্ধে জিতেছে গ্রিকরা কিন্তু তাদের জয়ের পশ্চাতে ছিল হীন চাতুরী। দশ বছর ধরে তারা অবরোধ করে রেখেছিল ট্রয় নগরী। কাঠের ঘোড়া নগরের প্রাচীরের বাইরে ফেলে রেখেছিল চাতুরী করে। ট্রয়বাসীরা ভেবেছিল গ্রিকরা পরাজিত। বিজয় উৎসব সেরে যখন তারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে— তখনই চরম আঘাত হেনেছিল গ্রিকরা। হত্যা করেছিল ট্রয়ের সশস্ত্র পুরুষদের— এক রাতেই হত্যা করেছিল শত শত যোদ্ধাকে। বেঁচে ছিল শুধু ট্রয়ের নারীরা। স্বামীহারা সন্তানহারা ভাইহারা নারীরা। নিদারুণ নির্মম এক সমাজ কাঠামো। শুধু ট্রয়ের সাধারণ মানুষ নয়— ট্রয়ের রাজপরিবারেও একই অবস্থা। বেঁচে আছে প্যারিসের মা রানি হেকাবে। বেঁচে আছে রাজকন্যা পলুকসেনা আর তার দিদি

দেবতা আপোল্লোনের পূজারিণী কুমারী কাসান্দ্রা। হেকটরের বিধবা স্ত্রী আন্দ্রেমাখ আর শিশুপুত্র আসটিয়ানাসে। যে কিনা ট্রয়ের একমাত্র বংশধর— রাজপুত্র প্যারিস, স্পার্টার রাজা মেনেলাওসের অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী হেলেনকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল ট্রয়-এ। আর সেই কারণেই মেনেলাওসের ভাই রাজা আগামেমননের নেতৃত্বে দশ বছর আগে গ্রিকরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ট্রয়ের ওপর। গ্রিকরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ট্রয়ের মেয়েদের ওপর চালিয়েছিল নৃশংস অত্যাচার। ক্রীতদাসী শয্যাসঙ্গিনী করে সেই নারীদের গ্রিসে নিয়ে যাওয়ার সময় মাঝসমুদ্রে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় তুলে জাহাজ ডুবিয়ে গ্রিকদের পরাস্ত করেছিলেন দেবতা পসেইদোন আর দেবী আথিনে।

আপাতদৃষ্টিতে এ নাটক ট্রয়ের নারীদের ওপর গ্রিকদের অত্যাচারের নাটক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ নাটক নারীদের ওপর যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের নাটকই শুধু নয়, বরং যুদ্ধের কারণে মানুষের সার্বিক সংকটের নাটক। থিয়েট্রন— তাদের অভিনয়পত্রীতে লেখে যে— ‘কোনো একটি দেশের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার কাহিনি নয় এই নাটক। এই নাটক সভ্যতার অপমৃত্যুর নাটক এবং যা কিছু শুভ আর পবিত্র তাতে আস্থা হারাবার আশঙ্কা ও বেদনার নাটক!’[২৪]

এমন একটি নাটক কেন বেছে নিলেন শাশ্বতী বিশ্বাস? তিনি তো শুধু গ্রিক ট্রয়ের যুদ্ধ কাহিনি উপস্থাপনার জন্য এ নাটক নির্বাচন করেননি। নারীসমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হয়েছে যেমন পুরো বিষয়টি তেমনই উপস্থাপনার ভঙ্গিতে উঠে এসেছে শুধু নারী নয়— সমস্ত সমাজ কীভাবে যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারই চিত্র। আজকের অত্যাধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির পৃথিবীতে ইউরোপীয় ইতিহাস আজও কতটা বাস্তব ও জ্যান্ত ‘তোমারই মাটির কন্যা’— তা আবারও প্রমাণ করল। কীভাবে ট্রোজান নারীরা (ট্রয়ের অসহায় নারীরা) এই যন্ত্রণার পথ অতিক্রম করবে?— এই নিষ্পাপ নারীরা যারা শান্তিপূর্ণ— সংসার জীবনে সুখী থাকতে চেয়েছিল, যুদ্ধের সঙ্গে তাদের তো কোনও সম্পর্ক ছিল না অথচ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল যুদ্ধের পরিণামে। তারা তো সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল তাদের স্বামী সন্তান পরিবার, ঘর সংসার আত্মীয় পরিজনকে, অথচ তারাই যেন মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হল। যুদ্ধের পুরো ঝড়টাই তাদের জীবনপ্রবাহকে ওলট-পালট করে দিল। যুদ্ধের পুরো প্রকোপের শিকার হল এই নারীরাই। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন শাশ্বতী এ রকমই একটি নাটক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের অসহায়তাকেই প্রকাশ করে এই নাটক।

ইউরিপিদিস ‘দ্য ট্রোজান উইমেন’ লিখেছিলেন ৪১৫ খ্রি.পূ.-তে, যার উপস্থাপনা হল ২৪১৭ বছর পর। বাংলায় রূপান্তরিত নাটকটির নাম হল ‘তোমারই মাটির কন্যা’— রবীন্দ্রনাথের গানের

পঙ্‌ক্তিতে। ২০০২ সালে ১৭ জুন আকাদেমি মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হয় এ নাটক ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের পরিসরে। শাশ্বতী যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন গ্রিস দেশে, সেই সময় তাঁর মাথায় আসে এ নাটকের ভাবনা— 'Due to travel to Greece last year, I re-read the famous Greek plays for a better acquaintance with the cultural fabric. Never did I think of re-working Euripedes masterly creation.'[২৫] গ্রিসদেশ ভ্রমণকালে সেই দেশের সংস্কৃতি সাহিত্য যেভাবে তাঁকে জারিত করেছিল তারই ফলশ্রুতি ট্রোজান নারী কেন্দ্রিক নাটক 'তোমারই মাটির কন্যা'। নাটক নির্বাচন ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে শাশ্বতী বিশ্বাস এক পথে না হাঁটার-ই পক্ষপাতী, তাই তিনি পিটার শ্যাফারের মতো সমসাময়িক আধুনিক লেখকের পরপরই নির্বাচন করেন আড়াই হাজার বছর আগেকার কোনও নাট্য-উপাদান। তাঁর মতে যে নাটকের মধ্যে থাকবে সাম্প্রতিক সময়কে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বা সমকালকে ধরবার প্রবণতা, তিনি তেমনই নাটকের দ্বারস্থ হন। তাঁর মতে 'Theatre must reflect its contemporary society. Otherwise it has little relevance.'[২৬] স্বভাবতই পিরিয়ড ড্রামা করলে তার অনেক দায়িত্ব থাকে— সেই সময়কে ধরা, সেই দেশের আদবকায়দা, চালচলন, পোশাক, সেট, সংগীত—সব কিছুতেই সেই সময়ের একটা ছাপ থাকা প্রয়োজন। 'The director will retain the Grecian look replete with classical costumes and set design'[২৭] এই নাটকটির অনুবাদ করেছিলেন সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় আর মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন খালেদ চৌধুরী। আলোর পরিকল্পনা ছিল বাদল দাসের। নৃত্য পরিকল্পনা— ডান্সার্স গিল্ডের প্রার্থনা পুরকায়স্থ-র।

এ নাটকে হেলেনের অংশের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে নারী চরিত্রগুলি। মেয়েদের কোরাসের একটা বড় ভূমিকা ছিল এ নাটকে। পাঁচজন মহিলার একসঙ্গে সংলাপ। হেলেনের এপিসোড কম রাখার কারণে। 'Helen is among the most complex characters in world literature. Delving into her psyche required time and we did not want to do in justice by squeezing her within our time constrain.'[২৮] অবাক হওয়ার মতো বিষয় যে ইউরিপিদেসের আড়াই হাজার বছর আগের লেখা নাটক আজকের সময়েও প্রাসঙ্গিক। একজন মহিলা নির্দেশক হয়েও তিনি কিন্তু কোনও নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটি বিশ্লেষণ করলেন না— সভ্যতা ও মানবিকতাকে কীভাবে ধ্বংস করছে যুদ্ধ তাকেই প্রত্যক্ষ করালেন নির্দেশক। যখন এ নাটক মঞ্চায়নের কথা ভাবছেন নির্দেশক, তখন ভারত ও পাকিস্তান সীমান্ত রক্ষার জন্য পারস্পরিক হানাহানিতে মত্ত।

এ নাটকটি যে শাশ্বতী নিজে নির্দেশনা দেবেন এমনটা ভাবেননি। তিনি ভেবেছিলেন নাটকটি সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা করবেন। কিন্তু অবশেষে তাঁকেই এ নাটকটির নির্দেশনা দিতে হল—

এবং তিনি এ কাজটি বেশ যত্ন সহকারেই করলেন। অভিনয়ও করেছেন এ নাটকে এবং সংগীত ভাবনাও ছিল তাঁর। সংগীতের ক্ষেত্রে যে কাজটি তিনি করেছিলেন, তিনি নিজে কোনও মিউজিক তৈরি করেননি। বিভিন্ন গ্রিক নাটক থেকে মিউজিক সংগ্রহ করে সংগীতাংশের আয়োজন করেছেন। এগুলি তিনি গ্রিসে ভ্রমণরত অবস্থায় সংগ্রহ করেছিলেন।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি বহু অ্যামেচার শিল্পীকে নিয়ে কাজ করলেও তাঁদের নির্বাচন ও যথোপযুক্তভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর মুনশিয়ানা ছিল উল্লেখযোগ্য। এ নাটকের মুখ্য চরিত্রেরা ছিল অভিনেত্রী। তাদের সঙ্গে কাজ করাটাও ছিল তাঁর কাছে এক অভিজ্ঞতা— 'It was a revelation to work with an almost all female cast. I may be biased, but women do seem to be more dedicated than man.'[২৯] এ নাটকের কুশীলবরা ছিলেন— প্রোসেইডন-অসীম সেন, আথেনা-জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায় ও গার্ড হেকাবে-অলকানন্দা ভট্টাচার্য, কাসান্দ্রা-তানিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, আনদ্রোমাশে-সেঁজুতি রায় মুখোপাধ্যায়, তালথি বিয়াস (Talthibius)- ধ্রুবজ্যোতি দাস, কোরাস-জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপ্রিয়া বসাক, সোমা কর, অরুন্ধতী চক্রবর্তী ও শাশ্বতী বিশ্বাস।

'থিয়েট্রন'-এর কুশীলবরাই এ নাটকে অভিনয় করেছিলেন, তবে আনদ্রো মাশে চরিত্রের জন্য সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়কে আনা হয়েছিল। শাশ্বতী বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত আনন্দের। একজন অভিনেত্রীর দৃষ্টি থেকে নির্দেশককে দেখেছেন সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়।

শাশ্বতী বিশ্বাসের নির্দেশনায় এর পর মঞ্চস্থ হয় আরও কয়েকটি নাটক। তার মধ্যে রয়েছে 'মৃত্যুমুখর' ১ ও ২, 'সে', 'বারনাডা আলবার বাড়ি'। আলোচ্য গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়সীমার (২০০৩) পরে এই নাটকগুলির মঞ্চায়ন ঘটেছে বলে তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা হল না এই প্রসঙ্গে। 'তোমার আঁধার তোমার আলো' এবং 'তোমারই মাটির কন্যা' দুটি নাটকেই নিজেকে একটা বিশেষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন শাশ্বতী বিশ্বাস। তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে তিনি প্রত্যেকবারই এক নতুন পথের সন্ধান করতে চেয়েছেন। পিটার শ্যাফরের বাস্তবতার জগৎ, হিংসা ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের অন্বেষণের পর তিনি ফিরে গেছেন আড়াই হাজার বছর আগের ইউরোপীয় ইতিহাসের আখ্যানে। নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি সব সময়ই খুব সহজ সরল টেক্সটের দিকে ঝোঁকেননি। গভীর জটিল সিরিয়স বিষয়ের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। সস্তা জনপ্রিয়তাকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর পরবর্তী প্রযোজনাগুলির ক্ষেত্রেও তিনি একই ভাবনায় চালিত হয়েছেন। 'মৃত্যুমুখর ১ ও ২' দুটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মৃত্যুর অনুষঙ্গ। জীবন হল জন্ম আর মৃত্যুর মাঝে একটা সময় একটা নিরন্তর মুহূর্ত। এই জীবনই আমাদের উপহার দেয় অভিজ্ঞতা আর অনুভবের তোড়া। এই জীবনই

বহু রহস্যময়তার সামনে এনে আমাদের দাঁড় করায়, পরতে পরতে খুলতে থাকে রহস্যময়তার জাল। লুইগি পিরানদেল্লো ও কৃষ্ণা সোবতির মূল রচনা থেকে শাশ্বতী বিশ্বাস ও সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে জীবন ও মৃত্যুর ভূমিকাকে মা ও মেয়ে দুটি মাত্র নারী চরিত্র অবলম্বন করে উপস্থাপিত করেছিলেন নির্দেশক। বাংলা মঞ্চে এই রকম একটি বিষয় নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা শাশ্বতী বিশ্বাসকে নির্দেশক হিসেবে আরও একধাপ এগিয়ে দিল। সুজান হিল-এর উপন্যাসের স্টিফেন ম্যালাট্র্যাট কৃত নাট্যরূপের মঞ্চায়ন ঘটালেন 'সে' নাটকে। সাসপেন্স থ্রিলারের প্রতি তাঁর বরাবরই একটা আকর্ষণ ছিল। স্টিফেন ম্যালাট্র্যাটের মঞ্চভাষ্য থেকে সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় যে নাট্যরূপ তৈরি করেছিলেন তাকে অবলম্বন করে আলো এবং শব্দ প্রক্ষেপণের কারিগরিতে নির্দেশক রহস্যময় পরিবেশ ও সাসপেন্সটি তৈরি করতে পেরেছিলেন। ভৌতিক গল্পটি পুরোপুরি থ্রিলারের মতো রহস্যে মোড়া। নির্দেশক হিসেবে নানান ধরনের কাজে যখন নিজেকে প্রমাণিত করছেন তখনই নাটকের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটল। শাশ্বতী বিশ্বাসের শেষ নির্দেশনার কাজ ফেদরিকো গার্সিয়া লোরকার শেষ রচনা 'বারনাডা আলবার বাড়ি'। নারী জীবনের তীব্র সংকট, মনস্তত্ত্ব, টানাপোড়েন উঠে এসেছে বিতর্কিত কবির নাটককে ঘিরে। এ নাটকের সমস্ত চরিত্রই মহিলা। যে নিশ্ছিদ্র দমবন্ধ পরিবেশ তৈরি করে রাখে বারনাডা তার বাড়িতে, তারই যথাযথ রূপায়ণ ঘটান নির্দেশক এ নাটকে। কিন্তু চাকরির সূত্রে এবং খানিকটা থিয়েটারের প্রতি অনীহা ও অভিমানে শাশ্বতী বিশ্বাস বিদেশে পাড়ি দিলে বাংলার মঞ্চ একজন বলিষ্ঠ নারী নির্দেশকের প্রযোজনা থেকে বঞ্চিত হয়। ঘটনাটি বাংলা থিয়েটারের কাছে দুর্ভাগ্যজনক নিঃসন্দেহে; কিন্তু শাশ্বতী বিশ্বাসের কাজের যে বলিষ্ঠতা এবং সাহসিকতা, তা নারী নির্দেশকদের মধ্যে তাঁকে একটা স্বতন্ত্র জায়গা করে দেয়।

শাশ্বতী বিশ্বাসের প্রযোজনাগুলির মধ্য থেকে তাঁর নির্দেশনা সংক্রান্ত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়— প্রথমত, বিষয় নির্বাচন বা নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি বিদেশি নাটকের অনুবাদের প্রতিই আগ্রহী ছিলেন বেশি। তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলির তালিকার দিকে লক্ষ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, থিয়েট্রন-র একটি ধারাই ছিল বিদেশি নাটকের অনুবাদের সরাসরি মঞ্চায়ন। ছায়ানুবাদ বা বঙ্গীকরণের চেয়ে এটাই ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য। সেই ধারাকে শাশ্বতী বিশ্বাসও বজায় রাখলেন। তৃতীয়ত, বিরাট সংখ্যক কুশীলব কেন্দ্রিক নাট্যপ্রযোজনা নয় বা বৃহদাকারে বিশাল পটভূমিকায় নাটকের উপস্থাপন নয়। স্বল্প সংখ্যক চরিত্রকে নিয়ে ঘনবদ্ধ নাটক নির্মাণের পক্ষপাতী শাশ্বতী বিশ্বাস মূলত নির্দেশকের ভূমিকায়। চতুর্থত, বেশির ভাগ নাটকের ক্ষেত্রেই পোশাক, আবহ ও সংগীতের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। এবং এই কাজটি করবার জন্য তিনি কোনও সমঝোতা বা লোকভুলানো পন্থায় বিশ্বাস করেন না। সেক্ষেত্রে হয়তো নাট্যপ্রযোজনাগুলি ব্যয়বহুল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

পঞ্চমত, এই খরচসাপেক্ষ প্রযোজনার ব্যয়ভার গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব অনেক সময়ই নিজ কাঁধে তুলে নেওয়ার একটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। ষষ্ঠত, যেহেতু নির্দেশক হিসেবে তিনি কঠোর ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার পক্ষে, তাই তাঁর সহযোগীদের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করবার দায়িত্ব বর্তায়। সর্বোপরি কঠোরতায়, মাধুর্যে, ভালবাসা ও বন্ধুত্বে কাজ করবার পদ্ধতিতেই বিশ্বাস রাখেন শাশ্বতী বিশ্বাস। এ কারণেই অল্প সময়ের জন্য এসেও, মাত্র পাঁচ-ছয়টি প্রযোজনার মধ্য দিয়েও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন এবং নির্দেশক হিসেবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই তিনি নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চে।

## অর্পিতা ঘোষ (১৯৬৭)

সাম্প্রতিক বাংলা থিয়েটারের মহিলা নির্দেশকদের মধ্যে অর্পিতা ঘোষ একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি তাঁর ধারাবাহিক কাজের মধ্য দিয়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর পরিচয় তিনি শুধু একজন নাট্য অভিনেত্রী নন, তিনি নাটক অনুবাদক, রূপান্তরকারী এবং নাট্য নির্দেশক। নাটকের অন্য বিভাগগুলির মধ্যে আলো ও সংগীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও আগ্রহ বিশেষ লক্ষণীয়। ২০০৩ সালে শুরু হয় তাঁর নির্দেশনার পাঠ। প্রায় ১৩ বছর ধরে একটানা নির্দেশনা, নাটক-অনুবাদ-সংগঠন পরিচালনার কাজ করে চলেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। যদিও থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর সংযোগ যথেষ্ট পরিণত বয়সে। ১৯৯৮ সালে ফোর্থ ওয়াল নাট্যদলে যুক্ত হন। এক বছর এই নাট্যদলে থেকে দুটি নাটকে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করার পর ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে 'পঞ্চম বেদ চর্যাশ্রম'-এ যুক্ত হন অভিনয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে। এক বছর শিক্ষাক্রম শেষ করে পঞ্চম বৈদিক নাট্যসংস্থায় যোগ দেওয়ার পর সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এই সংস্থার সর্ববিধ কাজের জন্য নিজেকে নিয়োগ করেন। পঞ্চম বৈদিক নাট্যসংস্থায় শাঁওলী মিত্রের তত্ত্বাবধানেই তাঁর অভিনয় শিক্ষা, নির্দেশনা সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করা, সাংগঠনিক নানাবিধ কাজে যুক্ত হয়ে পড়া। পরবর্তী সময়ে শাঁওলী মিত্র নিজেই অর্পিতা ঘোষের হাতে তুলে দেন পঞ্চম বৈদিক-এর নাটক নির্দেশনার এবং দল পরিচালনার দায়িত্ব।

কলকাতা শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে বজবজের নিকটবর্তী বিড়লাপুর-এর মেয়ে অর্পিতা ঘোষের বড়ো হওয়া মফস্‌সল শহরেই। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সময় স্কটিশচার্চ কলেজে পড়বার সময়ে যোগাযোগ ঘটে কলকাতার সঙ্গে। কবিতা পাঠ বা বই পড়ার পাশাপাশি খেলাধুলো ছিল অর্পিতা ঘোষের জীবনের একটা বড় অঙ্গ। ক্রিকেট খেলা ছিল তার সবচেয়ে ভাল

লাগার জায়গা। এ ছাড়াও তিনি ফুটবল, বাস্কেটবল, ভলিবল, টেবিল টেনিস সব ধরনের খেলায় ছিলেন পারঙ্গম। ছোটোবেলা থেকেই খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠা অর্পিতা ঘোষের মানসিক গঠনে ক্রীড়াজগতের লড়াই, দৃঢ়তা বিশেষ প্রভাব রেখেছিল। একজন নাট্য নির্দেশকের যে কষ্টসহিষ্ণু সংগ্রাম, সব ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সাহস প্রয়োজন, তা যেন তাঁর খেলোয়াড়ি মনোভঙ্গির কারণেই দৃঢ়তর হয়েছে। ওড়িশার হয়ে স্টেট লেভেল-এও ক্রিকেট খেলেছেন। কোনও দিন ভাবেননি থিয়েটার করবেন। যাত্রা দেখতে ভালবাসতেন আর রেডিও-র নাটক শুনতে। থিয়েটারের পূর্বসূত্র বলতে এইটুকুই। তবে কবিতা শোনাতেন, গান গাইতেন। স্কটিশচার্চ কলেজে পড়বার সময় বাম-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। পেশাগত জীবনে বারবার দিকবদল হয়েছে তাঁর। কলেজে পড়তে পড়তে গ্র্যাজুয়েশনের আগেই চাকরি, সেই সূত্রে ওড়িশায় কাটান কয়েক বছর। তিন বছর চাকরি করার পর কলকাতায় ফিরে অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানিতে আবার শুরু হয় কর্মজীবন। এরই সঙ্গে প্রিন্টিং-এর ব্যবসা চলতে থাকে। ১৯৯০-এর কাছাকাছি সময় থেকে কলকাতার থিয়েটার দেখতে আরম্ভ করেন। প্রথম দেখা নাটক শাঁওলী মিত্রের 'নাথবতী অনাথবৎ'— যা তাঁর জীবনের গতিধারাকেই বদলে দেয়। কৌশিক সেন, মনীশ মিত্র, সুমন মুখোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু নির্দেশিত নাটক দেখলেও মনের মধ্যে তোলপাড় করে দিয়েছিল পঞ্চম বৈদিক-এর প্রযোজনা 'নাথবতী অনাথবৎ'। বহুবার তিনি এ নাটক দেখেছেন। এরই মধ্যে তাঁর সঙ্গে বাদশা মিত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটে ফোর্থ ওয়াল নাট্যদলের সঙ্গে। এখানেই শুরু হল তাঁর অভিনয় জীবনের। কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত দুটি নাটকে অভিনয় করলেন অর্পিতা ঘোষ। একটি 'রঙের নাম দুঃসাহস' এবং আর একটি 'দাদা সরে বসুন'। দ্বিতীয় নাটকটি ছিল পথনাটকের আধারে তৈরি— যেখানে অর্পিতা ঘোষ একই সঙ্গে অনেকগুলো চরিত্রে অভিনয় করতেন। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষার জন্য ভর্তি হন পঞ্চম বৈদিক পরিচালিত এক বছরের নাট্যশিক্ষার কোর্সে। ফোর্থ ওয়াল নাট্যদলটির ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে অর্পিতা ঘোষ পঞ্চম চর্যাশ্রম সমাপ্ত করে পঞ্চম বৈদিকে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই সময় থেকেই প্রধানত শুরু হয় তাঁর নাট্যজীবনের মূল পর্ব। অর্পিতা ঘোষের মতে— 'থিয়েটার-ভাবনা আমার পঞ্চম বৈদিক-এ এসে শুরু হয়। থিয়েটারটা কী, জীবনে তার গুরুত্ব কী, কোন প্রায়োরিটি সিকোয়েন্সে এটাকে রাখা দরকার, এই সবটা শাঁওলীদি ভেতরে একেবারে ইনজেক্ট করে দিয়েছিলেন।... আমি যা কিছু শিখেছি সব শাঁওলীদির কাছ থেকে। এই যে তিনি আমার ভিতরে থিয়েটারের বীজটা বপন করে দিলেন, সেইটা কোথাও এমনভাবে এসে গেল যে আমার মনে হল এটাই আমার কাজ।'[৩০]

নাটকের সঙ্গে অর্পিতা ঘোষের এইভাবে সংযোগ গড়ে ওঠে এবং সেই সময় থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পঞ্চম বৈদিক নাট্যসংস্থার সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে কাজ করে চলেছেন। অভিনয় থেকে নির্দেশনা

দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত। নির্দেশনার ক্ষেত্রে ২০০৩-২০১৬ এই দীর্ঘ সময় জুড়ে তিনি পরিণততর হয়ে উঠেছেন। ২০০৩ সালে একেবারেই ছোটদের নিয়ে সুকুমার রায়ের ‘হযবরল’-র নাট্যরূপের যে মঞ্চায়ন ঘটিয়েছিলেন---- তারপর ২০১৬ সালে যখন জীবনানন্দ দাশ-এর ‘কারুবাসনা’র মঞ্চায়ন ঘটান, তখন তাঁর নির্দেশক সত্তা পরিণততর হয় ঠিকই কিন্তু জীবনাচরণ, নিয়ম-শৃঙ্খলার মানদণ্ড, আচরণবিধির কোনও পরিবর্তন হয় না। যে দায়িত্বভার শাঁওলী মিত্র তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন, যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তিনি সেই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

পঞ্চম বৈদিক-এর হয়ে তিনি অনেকগুলি নাটকের নির্দেশনা দেন। তবে গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নাটকগুলি হল ‘হযবরল’ এবং ‘অন্তর্গত আগুন’। দুটি নাটকই ২০০৩ সালের প্রযোজনা। এর পরে ২০০৬ থেকে তিনি একটির পর একটি নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন— ‘পশুখামার’ (২০০৬) থেকে ‘কারুবাসনা’ (২০১৫) পর্যন্ত।

পঞ্চম বৈদিক-এ অর্পিতা ঘোষ নির্দেশিত নাটক

| **নাটক** | **মূলরচনা** | **অভিনয়কাল** | **নাটককার/নাট্যরূপ** |
|---|---|---|---|
| হযবরল | সুকুমার রায় | ২০০৩ | অর্পিতা ঘোষ |
| অন্তর্গত আগুন | — | ২০০৩ | তীর্থঙ্কর চন্দ |
| লঙ্কাদহন পালা | — | ২০০৫ | লীলা মজুমদার |
| ঘাটের কথা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২০০৫ | অর্পিতা ঘোষ |
| পশুখামার | জর্জ অরওয়েল-এর উপন্যাস-অ্যানিম্যাল ফার্ম | ২০০৬ | অর্পিতা ঘোষ |
| টোকোলশ | রোনাল্ড সেগাল | ২০০৭ | অর্পিতা ঘোষ |
| নারকীয় | — | ২০০৮ | অর্পিতা ঘোষ |
| অ-পরাজিত | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি ছোটগল্প অবলম্বনে | ২০০৯ | অর্পিতা ঘোষ |
| ঘরে বাইরে | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২০১০ | অর্পিতা ঘোষ |
| এবং দেবযানী | মহাভারত অবলম্বনে | ২০১১ | অর্পিতা ঘোষ |
| অচলায়তন | ররীন্দ্রনাথ ঠাকুর | — | অর্পিতা ঘোষ |
| অস্তমিত মধ্যাহ্ন | আর্থার কোয়েশলার-এর ‘ডার্কনেস অ্যাট নুন’ | ২০১৩ | অর্পিতা ঘোষ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | উপন্যাস অবলম্বন | | |
| স্ত্রীর পত্র | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে | — | — |
| কারুবাসনা | জীবনানন্দ দাশ | ২০১৫ | অর্পিতা ঘোষ |
| খড়ির তীর | অলক বিশ্বাস | | নৈহাটি সময় ১৪০৪ |
| হয়বদন | গিরিশ কারনাড | | উত্তর দিনাজপুর রেপার্টরি থিয়েটার (দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালনা করেন।) |

শুরু থেকেই নির্দেশনা সংক্রান্ত কাজে বিশেষ আগ্রহ ছিল অর্পিতা ঘোষের। যখন তিনি দলে আসেন, তখন শাঁওলী মিত্রের নির্দেশনায় ‘সুজন ব্রতীর সীমান্ত’ নাটকটি তৈরি হচ্ছে। সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়ের লেখা। সেই সময় বিকেল চারটে থেকে বসে থাকতেন অর্পিতা, একমাত্র তিনিই উপস্থিত থাকতেন এবং যা যা ভাবনা তাঁর মনে আসত তা জানাতেন। এই সময় থেকে তাঁর মধ্যে পরিচালনা সম্পর্কে যেমন আগ্রহ বাড়তে থাকল, তেমনই তা প্রকাশ করার একটা সুযোগ ঘটল ২০০২ সালে শাঁওলী মিত্র পরিচালিত ‘পুতুলখেলা’ নাটকে নির্দেশনা সহায়ক হিসেবে কাজ করার। সম্পূর্ণভাবে নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে এটাই ছিল নাট্যনির্দেশনার প্রথম পদক্ষেপ। ‘পুতুলখেলা’র মহলায় যেদিন শাঁওলী মিত্র আসতেন, তাঁর অভিনয়টা অর্পিতা করতেন, যাতে নির্দেশক তাঁর কাজটা করতে পারেন। অভিনয় ও নির্দেশনা একই সঙ্গে চললে নির্দেশনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলির প্রতি ততটা নজর দেওয়া সম্ভব হয় না বলেই। এই পদ্ধতিতে অন্য সময় অর্পিতা ঘোষ সহায়ক হিসেবে নোট রাখতেন, অন্যান্য কাজে সাহায্য করতেন নির্দেশককে।

‘পুতুলখেলা’ প্রযোজনার পর ‘পঞ্চম বৈদিক’-এর সামনে সংকটকাল উপস্থিত হয়। বিশেষ করে রানিকুঠির প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে দেওয়ার পর কোথায় অভিনয় করা হবে সেই জায়গার সংকটটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। নাট্যদল বন্ধ করে দেওয়ার মতো অবস্থা। সেই সংকটকাল থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য অর্পিতা ঘোষ ছোটদের নিয়ে একটি নাট্যপ্রযোজনার প্রস্তাব দেন। দীর্ঘদিন ধরেই নির্দেশনা সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ ছিল এবং কাজ করার একটা উদ্যম ছিলই। সেই উদ্যম থেকেই তৈরি হয় ‘হযবরল’। এরও আগে শাঁওলী মিত্রের একটি লেখা থেকে নাট্যরূপ দিয়ে ‘অপারগতা’ নামে একটি নাটক প্রস্তুত করেছিলেন অর্পিতা, যদিও তা মঞ্চস্থ হয়নি। সেই অর্থে ‘হযবরল’-ই তাঁর নির্দেশিত প্রথম নাটক।

শুরুর সময় থেকেই, অর্থাৎ, পঞ্চম বৈদিক-এর চর্যাশ্রমে যুক্ত হওয়ার সময় থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন অর্পিতা ঘোষ। ২০০০ সালে ছাত্রী হিসেবে চর্যাশ্রমে যোগ দেওয়ার সময়-ই অর্পিতা ঘোষ-সহ অনেকেই মনে করেছিলেন তাঁরা থিয়েটারটা করবেন। কিন্তু ২০০২ সালে 'পুতুলখেলা' মঞ্চস্থ হওয়ার পর-পরই শাঁওলী মিত্রদের ছেড়ে দিতে হল রানিকুঠির শ্রীঅরবিন্দ কালচারাল ইনস্টিটিউট-এর 'অন্তরঙ্গ নাট্যমঞ্চ'। যে স্বপ্ন নিয়ে ক্রমশ গড়ে উঠেছিল থিয়েটারের নিরীক্ষা, শিক্ষা, যে মঞ্চকে ঘিরে একটা আশা জাগছিল তা প্রতিহত হল। '২০০৪-এ পুরোপুরি উৎপাটিত হলাম আমরা। স্বপ্ন ভেঙে খান-খান। তখন নতুন নাটক 'রাজনৈতিক হত্যা'-র প্রস্তুতি সবে শুরু হয়েছে। আবারও কাজকর্ম বন্ধ হওয়ার মুখে। কিন্তু কোনো এক ফেরে আবার একজন জেদি জন্ম নিল পঞ্চম বৈদিককে বাঁচানোর জন্যে। তিনি হলেন অর্পিতা ঘোষ। কী যে তাঁর এবং তাঁর সাথীদের দায় পড়েছিল জানি না। তাঁরা শুরু করল বাচ্চাদের নিয়ে কাজ।'[৩১] সেটা অবশ্য কিছু আগেই শুরু হয়েছিল। সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' মঞ্চস্থ হয়েছিল ওই নাট্যমঞ্চেই। তীর্থঙ্কর চন্দের একটি নাটিকাও সেখানে নিরীক্ষামূলকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল অর্পিতারই নির্দেশনায়— 'অন্তর্গত আগুন'। এছাড়াও ছোটো ছোটো বেশকিছু প্রযোজনা তিনি করে চলেছিলেন। এমনি করে নিজের আগ্রহে অর্পিতা থিয়েটারের সবরকম কাজ শিখে নিচ্ছিলেন। 'আলো', 'শব্দ', 'নাট্যলিপি-প্রস্তুতি', 'সম্পাদনা'— সবরকম কাজ। এইরকম এটা সংকটসময়ে অর্পিতা ঘোষ এগিয়ে এসে দায়িত্ব বহন করেছিলেন নির্দেশনার এবং শাঁওলী মিত্রের-পর ধারাবাহিকভাবে এতগুলো নাটকে নির্দেশনা সংক্রান্ত কাজে একমাত্র অর্পিতা ঘোষের নাম-ই উল্লেখ্য। 'অর্পিতা কাজটি হাতে তুলে নিয়েছে বলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশি। কারণ আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি নতুন প্রজন্ম যদি উৎসাহিত হয়ে হাল ধরার কাজে এগিয়ে না আসে, তাহলে কোনো কাজেরই শেষ পর্যন্ত কোনো অর্থ থাকে না। ও, বা ওঁর পরেও যদি কেউ মশাল হাতে এগিয়ে চলতে চায়, তার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ ভালোবাসা জড়িয়ে থাকবে।'[৩২]

এভাবেই 'পঞ্চম বৈদিক'-এর নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন অর্পিতা ঘোষ। নিজস্ব উদ্যম ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে। 'হ য ব র ল'-র নাট্যরূপায়ণ শাঁওলী মিত্রের সম্মতি লাভ করলে অর্পিতা ঘোষ নাটক মঞ্চায়নের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। পরিচিত মহল থেকে প্রায় ২২/২৪ জন ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে শুরু হয় মহড়া। ছোটদের নাট্যনির্দেশনার পদ্ধতি ছিল একেবারেই ভিন্ন। এই কাজটা অর্পিতা ঘোষ নির্দেশক হিসেবেও অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করেছিলেন। 'বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করাটা আমেজিং (amazing) অভিজ্ঞতা। যেহেতু আমি ৩-১২ এই এজ গ্রুপটায় কাজ করেছিলাম

যার ফলে ওদের সঙ্গে খেলাটাই মূল। খেলতে খেলতেই থিয়েটার করতে হবে।’[৩৩] ছোটরাও এই পদ্ধতিটাই পছন্দ করত এবং তারা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। একই সঙ্গে নাটকের দায়দায়িত্ব গ্রহণেরও একটা অভ্যাস তৈরি হচ্ছিল। এই নাটকের এক কুশীলব তিস্তা লাহিড়ী যার বয়স তখন সাড়ে চার বছর, পরবর্তী সময়ে তার ছোটবেলার স্মৃতি থেকে উঠে এসেছে অনেকগুলো বিষয় যা এই আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পার্ক সার্কাসের মহলা কক্ষে প্রথম দিনে উপস্থিত ছিল প্রায় ত্রিশজন বাচ্চা। ক্রমশ তাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং শাঁওলী মিত্র ও অর্পিতা ঘোষের নিরন্তর সহযোগে শুধু একটি মাত্র প্রযোজনা নয়, পরবর্তী সময়ে তাদের জীবন গঠনেও সহায়ক হয়ে উঠেছিল। থিয়েটার তাদের এক অন্য ভুবনের সন্ধান দিয়েছিল যেমন, তেমনই নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, নাটক সম্পর্কে সচেতনতাও জাগিয়ে তুলেছিল। অবশ্যই যার প্রাথমিক ভিত্তি ছিল খেলাধুলো। ‘হৈ হুল্লোড় খেলাধুলোর ফাঁকে ফাঁকেই শুরু হয়ে যায় একটু একটু করে শেখাও। কীভাবে স্টেজে দাঁড়াতে হয়, বসতে হয়, লাইট নিতে হয়, কোন কথাটা কতটা জোরে বলতে হয়, কোথায় তাকাতে হয়..., এমনই আরো কত কী! পাশাপাশি প্রতি মহলার পরে বসত গান আর কবিতার আসর। উজান তো স্পষ্ট করে কথা বলতে শিখে গেল রিহার্সাল দিতে দিতেই।... আমাদের প্রথম শো হয়েছিল আমাদের ইস্কুলে, অন্তরঙ্গ নাট্যমঞ্চে। সেবার ‘হ য ব র ল’-এর মেক-আপ, অর্পিতাদিদি নিজে করেছিল। সে রীতিটা অবশ্য ‘হ য ব র ল’-এর সব শো-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। ‘হ য ব র ল’-এর সব গান গাওয়া হয়েছিল স্টেজের সামনে মাদুর পেতে বসে, আমাদের একটা বিশাল গর্ব ছিল যে, আমাদের ‘হ য ব র ল’-এর জুড়ির দলে স্বয়ং মাসিমণি গান গেয়েছিল।’[৩৪] মাসিমণি অর্থাৎ শাঁওলী মিত্র। তিস্তা লাহিড়ীর লেখা থেকে কতকগুলি জিনিস স্পষ্ট হয়ে যায়— ১) অর্পিতা ঘোষ নির্দেশনার পদ্ধতিতে একটা হালকা, আনন্দের মেজাজ বজায় রাখতে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন নিরন্তর। তিনি অন্তর থেকেই এই বিষয়টি সমর্থন করতেন। ২) ছোটদের সঙ্গে খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে থিয়েটারের কাজটুকু বের করে নিতেন। ৩) ছোটদের মেক-আপ নিজে হাতে করিয়ে দিতেন প্রায় সবক’টি অভিনয়েই। ৪) ইতিমধ্যে তিনি আলো-মঞ্চ ও সংগীত বিষয়ে নিজেকে অনেকটাই প্রস্তুত করে তুলেছেন। ৫) কোনও বাচ্চা আলো নিতে পারছে না দেখলে উইংসের ধার থেকে তাঁর ইশারায় ছোটরা ভুলটা শুধরে নিতে শিখেছিল— এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নির্দেশক হিসেবে তাঁরও যেমন পাঠ শুরু হয়েছিল পঞ্চম বৈদিক-এর, তেমনই তাঁরই শিক্ষায় তৈরি হয়ে উঠেছিল এক ঝাঁক শিশুর দল যারা পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ পঞ্চম বৈদিক-এ থেকেও গেছে অভিনয়ের জন্য। এক বছর ধরে বাচ্চাদের ট্রেনিং করানোর পর নাটকটি করা হয়েছিল। এই ট্রেনিং-এর ফলে ছোটরা এমনভাবে তৈরি হয়ে

উঠেছিল যে, পরের বছর তাদের দিয়ে যখন 'লঙ্কাদহন পালা' করানো হয় তখন একটুও অসুবিধা হয়নি। ছোটদের মধ্যেও একটা দলগত বন্ধন তৈরি হয়ে উঠেছিল।

'এক সঙ্গে এক বছর মহলা দিতে দিতে বেশ দলের মতো একটা দল হয়ে উঠেছিলাম আমরা, রিহার্সালের শেষে কে অর্পিতাদিদির দলে ক্রিকেট খেলবে তা নিয়ে যত ঝগড়াঝাটিই করি না কেন। একটা দলের প্রতি দায়িত্ববোধও কী করে যেন তৈরি হয়েছিল।... নাটকটা যে আমাদের সকলের বড্ড শখের আর বড্ড পরিশ্রমের ধন, সে কথাটা আমাদের হাড়ে মজ্জায় ঢুকে গেছিল।'[৩৫]

কেন নির্বাচন করা হয়েছিল সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল'? মূলত আনন্দের জগৎ যে বুদ্ধিমত্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় সুকুমার রায়ের রচনা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পঞ্চম বৈদিক মনে করেছিল 'বাংলা সাহিত্যে এ এক অদ্বিতীয় রচনা। শিশুপাঠ্য কাহিনির মোড়কে ভদ্রলোকি কালচারের কৃত্রিম মূল্যবোধের ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়। হিজিবিজবিজ, ন্যাড়া, উধোবুধো, কাকেশ্বর কুচকুচে, বিচারপতি সব্বাই মিলে এক উদ্ভট আশ্চর্য কিন্তু অতিবাস্তব জগৎ তৈরি করে। এ নাটক তারই মঞ্চায়ন।'[৩৬] মূলত ছোটদের জন্য লিখিত হলেও নাট্যনির্দেশক এরই মধ্যে সন্ধান করেছেন সমাজবাস্তবতাকে। মূল কাহিনি সুকুমার রায়, তত্ত্বাবধানে শাঁওলী মিত্র, নাট্যরূপ ও নির্দেশনা অর্পিতা ঘোষ। আলোক পরিকল্পনা সুদীপ সান্যাল, রূপসজ্জা পঞ্চানন দে। অভিনয় করেছিল— অর্যমা, শিবাঞ্জনা, রোণক, ঋদ্ধি, গোগোল, উজান, তিস্তা, বিট্টু, বিহান (বড়), মৌলি, টিয়া, বহ্নিতা, বিহান (ছোট), আত্রেয়ী, কৌস্তভ, আরুণা, প্রেরণা, মাতুন এবং আরও অনেক শিশুশিল্পী। পোশাক, মঞ্চ, আলো এবং একঝাঁক শিশুর সম্মিলিত প্রয়াসে ও অর্পিতা ঘোষের প্রথম নাট্য নির্দেশনায় সফলতা পেয়েছিল 'হ য ব র ল'।'

২০০৩ সালে আরও একটি নাটকের নির্দেশনা দেন অর্পিতা ঘোষ— তীর্থঙ্কর চন্দ রচিত 'অন্তর্গত আগুন'। এই নাটকটি প্রযোজনার একটি বিশেষ কারণ আছে। ২০০৩-এ অর্পিতা অনুবাদ করছিলেন জঁ পল সার্ত্র-এর ক্রাইম প্যাশানেল নাটকটি। 'রাজনৈতিক হত্যা'-র প্রযোজনার কথা যখন ভাবনায় আসে তখন বিদেশি ফরম্যাটেই করার চিন্তা আসে। ফলত এই ধরনের নাটকে যে ধরনের বাচিক শারীরিক অভিনয় প্রয়োজন, বিশেষ করে হাঁটাচলা— তার অনুশীলনের জন্যই নির্বাচন করা হয় ''অন্তর্গত আগুন'। এটি 'রাজনৈতিক হত্যা' নাটকের পূর্বপ্রস্তুতি বলা যেতে পারে। মধ্যবিত্ত বাঙালির হাঁটাচলাগুলোর সঙ্গে এই ধরনের নাটকের চরিত্রদের শারীরিক চলনের যে স্মার্টনেস তার সঙ্গে কোথাও একটা ফারাক থেকে যায়। এই কারণেই 'অন্তর্গত আগুন' বড়দের জন্য করা হল 'হ য ব র ল'-র

পাশাপাশি। দুটো কাজ একসঙ্গে চলতে থাকে। 'হ য ব র ল' এক বছর ধরে ট্রেনিং হয়েছিল বলেই ছোটদের পরবর্তী প্রযোজনা 'লঙ্কাদহন পালা' বা 'ঘাটের কথা'য় বেশি সময় লাগেনি। ঠিক তেমনই 'অন্তর্গত আগুন' ছ'মাস ধরে রিহার্সাল করা হয়েছিল। 'ফলে 'রাজনৈতিক হত্যা' আমরা অনেক স্মার্টলি নামাতে পেরেছিলাম। হাঁটাচলার জন্য শাঁওলীদিকে আর আলাদা করে সময় দিতে হয়নি। ওই প্র্যাকটিসটা আমি অলরেডি করিয়ে রেখেছি। শাঁওলীদি শো-টা দেখেও ছিলেন। এটা করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল আমরা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক হত্যাটা করব তার একটা প্রস্তুতি বলা যেতে পারে। সেটা কিন্তু বেশ সবাই মিলে একটা প্রযোজনা হয়েছিল। সেই আমার প্রথম হাতেখড়ি।"[৩৭]

এর পর থেকে একটানা কাজ করে গেছেন অর্পিতা ঘোষ। বিশেষ করে ২০০৫ সালে শাঁওলী মিত্র 'চণ্ডালী' পরিচালনার পর আর কোনও নাটক পরিচালনা করেননি। ২০০৬-এ 'পশুখামার' থেকে অর্পিতা ঘোষের হাতে তুলে দিয়েছেন নির্দেশনার দায়িত্ব। 'হ য ব র ল' থেকে অবশ্যই শাঁওলী মিত্রের তত্ত্বাবধানে পথ চলেছেন অর্পিতা। নাটক দেখানো, পরামর্শ নেওয়া ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই তাঁর অভিভাবকত্বে কাজ করেছেন। বিশেষ করে নির্দেশনা সংক্রান্ত কাজে। বর্তমানে সেই অভিভাবকত্বে তিনি পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নির্দেশনার কাজে উৎসাহী করছেন। পঞ্চম বৈদিক-এর এটা একটা পরম্পরা বলা যেতে পারে।

শুধু নির্দেশনা নয়, নাটকের অন্য বিভাগগুলিতেও নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন অর্পিতা ঘোষ। প্রথমত— সংগীত প্রয়োগ। পঞ্চম বৈদিক-এ এসেই শিখেছিলেন সংগীত প্রক্ষেপণের কাজ। ২০০০ সালে 'সুজনব্রতীর সীমান্ত' নাটকে এই কাজটা নিজের দায়িত্বে করতেন। দ্বিতীয়ত, ২০০১ সাল থেকে 'নাথবতী অনাথবৎ' ইত্যাদি যে যে নাটক রানীকুঠির অন্তরঙ্গ নাট্যমঞ্চে হত, তার আলোক প্রক্ষেপণ করতেন অর্পিতা। 'প্রথম থেকে আমার খুব ইচ্ছে ছিল এগুলো শিখে নিতে। কারণ না হলে একজন অ্যাক্টরেরও যেমন অসুবিধা হয় একজন ডিরেক্টরেরও অসুবিধা হয়। কারণ আমি যদি আমার পজিশন অফ লাইট বুঝে যাই অ্যাক্টর হিসেবে তাহলে খুব সুবিধা হয়। ... মিউজিক অপারেশনটার সঙ্গে লাইট অপারেশনটার খুব যোগ আছে কারণ এ দুটো মিলে মিশে চলে। আমার বরাবরই ইচ্ছে ছিল কাজটা শেখার।'[৩৮] তৃতীয়ত, নির্দেশনার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নাটক সম্পাদনা ও রূপায়ণ। যে কাজটি অর্পিতা ঘোষ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শিখেছিলেন শাঁওলী মিত্রের কাছ থেকে। নির্দেশক কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাটকটি দেখছেন সেই জায়গা থেকে নাটকের স্ক্রিপ্ট তৈরি করাটা

জরুরি এ শিক্ষাও তিনি  পেয়েছেন শাঁওলী মিত্র-র কাছ থেকে। চতুর্থত, মঞ্চ তৈরি করার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত আগ্রহী। এই কাজটাও তিনি হাতেকলমে করেন এবং করতে ভালবাসেন। ‘পুতুলখেলা’র মঞ্চবিভাগে তিনি কাজ করেছেন। এই সমস্ত কাজ জানা থাকলে একজন নির্দেশকের সুবিধা হয়। বাইরে থেকে এসে একজন মঞ্চ করে দিলেন, একজন আলো করে দিলেন, একজন মিউজিক করে দিলেন— কাজটা হয় ঠিকই, কিন্তু যদি নির্দেশকের এই সমস্ত বিষয়গুলোর সম্পর্কে একটা জ্ঞান থাকে তাহলে total কাজটা করতে কোনও অসুবিধা বা সমস্যা হয় না।

শাঁওলী মিত্রের মতো একজন নাট্যব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পেরেছেন বলেই তাঁর সুবিধা হয়েছে বলে মনে করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই সাহায্য তিনি নিয়েছেন এবং পেয়েছেন। তার পর শাঁওলী মিত্র-ই খুবই ধীরে ধীরে দায়িত্বটা দিয়ে নিজে সরে গেছেন। অর্পিতা ঘোষও সেইভাবেই দায়িত্ব অর্পণ করতে চান। কিন্তু কী কী গুণ থাকলে একজন নির্দেশক হয়ে উঠতে পারে? অর্পিতা ঘোষ মনে করেন—প্রথমত, তার মধ্যে নাটক সম্পর্কে নির্দেশনা সম্পর্কে আগ্রহ থাকতে হবে। বেশির ভাগ মানুষই শুধু অভিনয় করতে চায়। সব দিকে যাদের আগ্রহ থাকে তাদের তিনি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করেন। বর্তমানে পঞ্চম বৈদিক-এর নবীন প্রজন্মের মধ্য থেকে ছোট ছোট ৭/৮ টি প্রযোজনা করিয়ে তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট প্রযোজনা তৈরি করার মধ্য দিয়ে নির্দেশক হওয়ার একটা শিক্ষা-পদ্ধতি তৈরি করেছেন। হয়তো আজ-ই সে নির্দেশক হবে না। তবে ৬/৭ বছর বাদে সে নির্দেশক হিসেবে হাত পাকাবে। অর্থাৎ নির্দেশক হওয়ারও একটা পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। যাতে করে তাদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে শাঁওলী মিত্র সরে গেছেন। এই সরে যাওয়াটা একদিনে নয়। ‘পশুখামার’-এর সময় অনেকটা সাহায্য করেছেন, তারপর টোকোলশ একটু কম— এর পর আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিতে নিতে ‘ঘরে বাইরে’ (২০১০) থেকে একেবারেই সম্পূর্ণভাবে অর্পিতা ঘোষের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। নির্দেশনার সেই পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন যিনি, সেই অর্পিতা ঘোষও পরবর্তী প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে নিজে সরে যেতে চান। তবেই ভবিষ্যতের নির্দেশক তৈরি হবে।

অর্পিতা ঘোষ শুরু করেছিলেন ছোটদের নাটক দিয়ে তাঁর নির্দেশনার কাজ। পাশাপাশি বড়দের একটি নাটক করলেও তা ছিল আগামী একটি প্রযোজনার পূর্ব-প্রস্তুতি। কিন্তু ২০০৬ সালে তাঁর প্রথম বড় কাজ ‘পশুখামার’— যেখানে প্রায় চল্লিশ জন অভিনেতা অভিনেত্রী। সেই কাজ থেকে ক্রমশ নিজেকে যেভাবে পরিণত করে তুলেছেন, তার পশ্চাতে কাজ করেছিল তাঁর নির্দেশনা সংক্রান্ত দর্শন।

তিনি মনে করেন— 'আমার নিজের মনে হয়েছে ডিরেক্টোরিয়াল কাজ করতে গেলে সামগ্রিক টেকনিক্যাল পার্টটা সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার, script is very important, how to edit। একটা স্ক্রিপ্ট বাছবে কী করে, কী ভেবে বাছছো এবং কীভাবে এডিট করবে, তুমি কী লাইনে নিয়ে যেতে চাও, handling of people, যারা কাজ করছে তাদের কীভাবে হ্যান্ডল করা হবে, তাদের কীভাবে আমি কাজে লাগাতে পারি, কে কাজটা পারে তার ভিতর থেকে সেইটা বার করা, মোটিভেট করা লোকজনকে এবং তার সঙ্গে সবচেয়ে বড়ো যেটা ডিরেক্টরের কাজ বলে আমার মনে হয় সামগ্রিকভাবে একটা নাটকে দেখতে পাওয়া চাই। যেটা কেউ দেখতে পায় না আগে, কেউ আগে বুঝতে পারে না। ডিরেক্টরের মাথায় সেটা আস্তে আস্তে কনসিভ করে, বাকি সবাই খণ্ডে খণ্ডে আসে। এই সামগ্রিকতাটা একজন ডিরেক্টরের দরকার হয় বলে আমি মনে করি।'[৩৯]

অর্পিতা ঘোষের নির্দেশক সত্তার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি নিজেই তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলির নাট্যরূপ তৈরি করেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা ক্লাসিকধর্মী। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে তিনটি ভাগে বিভাজিত করারই পক্ষপাতী। ১) যখন নাট্যরূপ দিচ্ছেন ২) নির্দেশক ৩) অভিনেত্রী। নির্দেশক হিসেবে তিনি নাটক সম্পাদনার ক্ষেত্রে নির্মম। আবার তাঁর নির্দেশক সত্তা অভিনেত্রী সত্তাকে প্রভাবিত করে না। নিজের ভাবনায় নির্মাণ করেন চরিত্রকে। গবেষণাপত্রের নির্দিষ্ট সময়কালে তাঁর অনেকগুলি নাটকের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা না গেলেও— সামগ্রিকভাবে তাঁর নির্দেশক সত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যক্ষ করা গেল। নাটকের অন্যান্য বিভাগে তাঁর পারদর্শিতা এবং প্রয়োগ কৌশল লক্ষণীয়। সর্বোপরি তাঁর মধ্যে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের যে বৈশিষ্ট্য, তা দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চম বৈদিক-এর সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলার সহায়ক। তাঁর কুড়ি বছর বয়স যখন, তখন তিনি ম্যানেজার হিসাবেই কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হন। 'আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লোক। আমার বরাবরই এই কাজে একটা অ্যাসপিরেশন ছিল। সেটা আমার করতে ভালো লাগে। আর আমি কোনো দায়িত্ব নিয়ে সেই কাজটা কমপ্লিট না করা পর্যন্ত শান্তি পাই না।'[৪০]

অভিনয়, নাটক রূপায়ণ, নাটক সম্পাদনা, মেক-আপ, মঞ্চ, আলো, সংগীত প্রয়োগ— অর্থাৎ, নাটকের প্রায় সবক'টি বিভাগে কাজ ধরার আগ্রহ, বাস্তবে কাজ করার অভিজ্ঞতা, দৃঢ় মানসিকতা, সাংগঠনিক কাজে পারদর্শিতার জোরে দক্ষ নির্দেশক হিসাবে অর্পিতা ঘোষ বাংলা রঙ্গমঞ্চে স্থায়ী আসনটি দখল করে নিয়েছেন।

## তথ্যসূত্র


১. ‘উষ্ণীক এর ঘর’, *কলেজ স্ট্রিট*, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

২. Ananda Lal, ‘Courageous attempt’, *The Telegraph,* Calcutta, 21.8.1991.

৩. কেতকী দত্ত, *কেতকী দত্ত: নিজের কথায় টুকরো লেখায়,* শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থিত, থীমা, ডিসেম্বর, ২০১২ কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৬, পৃ ৮১

৪. Priyanka Dasgupta, ‘Gawaharjaan recreated’, Calcutta Times, *The Times of India,* Calcutta, Tuesday 25 June, 2002.

৫. সুরঞ্জনা দাশগুপ্তর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, ২০১৫

৬. তদেব

৭. ‘আরশি’ প্রযোজিত মানদাসুন্দরী নাটকের অভিনয়পত্রী

৮. মানদাদেবী, ‘আমার কৈফিয়ৎ’, *শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত,* দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১০, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম চিরায়ত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪

৯. সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, ‘নির্দেশকের কথা’, ‘আরশি’ প্রযোজিত মানদাসুন্দরী নাটকের অভিনয়পত্রী

১০. সুরঞ্জনা দাশগুপ্তর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, ২০১৫

১১. তদেব

১২. পাঁচু রায়, ‘কলকাতার মঞ্চে আর এক মহিলা পরিচালক’, *আজকাল,* কলকাতা, ২২.০৯.২০০৩

১৩. কমল সাহা, ‘সম্মাননীয়া বারবধূর কথা’, নাট্যপঞ্জিকা, সেপ্টেম্বর ২০০৩

১৪. সুরঞ্জনা দাশগুপ্তর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, ২০১৫

১৫. সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, ২০১৫

১৬. সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘থিয়েট্রনের ‘অসঙ্গত’ দেখিয়ে দিল’, *প্রতিদিন,* শুক্রবার, ১৯ এপ্রিল ১৯৯৬

১৭. রুশতী সেন, ‘এলোমেলো স্মৃতির নৈর্ব্যক্তিক-ব্যক্তিক’, *ফালতু লেখায় ফালতু কথা’,* সূত্রধর, জানুয়ারি ২০১১, পৃ ৬৯

১৮. Saswati Biswas, Young Achievers, Theatre Personality, reprinted in Theatron Booklet

১৯. Soma Dattagupta, ‘Poetic drama re-enacted after 25 years’, *The Asian Age,* 1st July 1998, Page, 20

২০. দেবাশিস রায়চৌধুরীর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, ২০১৫

২১. তদেব।

২২. সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, থিয়েট্রন নাট্যগোষ্ঠীর পঁচিশ বছর পূর্তিতে প্রকাশিত অভিনয়পত্রী

২৩. তদেব

২৪. থিয়েট্রন প্রযোজিত 'তোমারই মাটির কন্যা' নাটকের অভিনয়পত্রী

২৫. Ram Kamal Mukherjee, 'Bengali to script Greek Play', *The Asian Age,* 14 June, 2002

২৬. তদেব

২৭. তদেব

২৮. তদেব

২৯. 'War and Women, An Ageless Tale', *HT City,* Monday, 17 June 2002.

৩০. অর্পিতা ঘোষ 'আমার মধ্যে সময়টা কাজ করে', সাক্ষাৎকার, গ্রাহক শেখর সমাদ্দার, শেখর সমাদ্দার (সম্পা.) *সময় নাট্যভাষ নারী বিশ্ব ও থিয়েটার,* বিশেষ সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্চ, ২০১৫, পৃ. ১১০

৩১. শাঁওলী মিত্র, কতটা পথ পেরোলে তবে 'পথিক' বলা যায়?', *পঞ্চম বৈদিক ৩০,* পঞ্চম বৈদিক নাট্যগোষ্ঠীর ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা, আগস্ট, ২০১৩, পৃ ২৫-২৬

৩২. তদেব, পৃ ২৭

৩৩. অর্পিতা ঘোষের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক ২০১৬

৩৪. তিস্তা লাহিড়ী, 'নাটুকে ছেলেবেলা', *পঞ্চম বৈদিক ৩০,* পূর্বে উল্লিখিত, পৃ ২১৪.

৩৫. তদেব, পৃ ২১৫

৩৬. পঞ্চম বৈদিক প্রযোজিত হ য ব র ল নাটকের অভিনয়পত্রী, পঞ্চম বৈদিক ৩০ থেকে উদ্ধৃত,

৩৭. অর্পিতা ঘোষের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক ২০১৬

৩৮. অর্পিতা ঘোষের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক ২০১৬

৩৯. অর্পিতা ঘোষের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক ২০১৬

৪০. অর্পিতা ঘোষ 'আমার মধ্যে সময়টা কাজ করে', সাক্ষাৎকার, গ্রাহক শেখর সমাদ্দার, শেখর সমাদ্দার (সম্পা.) *সময় নাট্যভাষ নারী বিশ্ব ও থিয়েটার,* বিশেষ সংখ্যা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্চ, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১২৫

## অষ্টম অধ্যায়

# নাট্যনির্মাণে শহরতলির মেয়েরা

গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত নাট্যনির্দেশনা ও নাট্যনির্মাণে নারীদের অবদান নিয়ে যে আলোচনা স্থান পেয়েছে সেই ক্ষেত্রমধ্যস্থ নারীরা প্রত্যেকেই মূলত কলকাতা শহরকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত। পত্রপত্রিকা, মঞ্চ, টেলিভিশনে তাঁরাই আলোচনার কেন্দ্রে। কিন্তু শহরের নাট্যচর্চার সমান্তরালে একটা শক্তিশালী নাট্যধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই নাট্যধারায় মেয়েদের নাট্যচর্চা ও নির্মাণ-ভাবনা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে বলেই গবেষণাপত্রে তাঁদের নাট্যকৃতির আলোচনা জরুরি হয়ে ওঠে। সামাজিক ক্ষেত্রে নিরন্তর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যেখানে মানুষকে চলতে হয়, সেখানে তুলনামূলকভাবে পুরুষদের থেকে মেয়েদের লড়াইটা আরও কঠিন। যাঁদের কথা এই অধ্যায়ের আলোচনার মুখ্যবস্তু তাঁরা লড়াই চালিয়েছেন দুটি স্তরে— ১) তাঁরা নাটক করতে চেয়েছেন ২) তাঁরা কলকাতা শহর থেকে দূরে দাঁড়িয়েও কাজটা করে চলেছেন। তাই শহরতলির মেয়েদের নাট্যচর্চার বাস্তবভূমিতে যতটা স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততটাই থাকে প্রতিবন্ধকতাকে ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম। এমনই কয়েকজন শহরতলির নাট্যকর্মীর নাট্যচর্চার নিরিখে আলোচিত হবে সামগ্রিকভাবে শহরতলির মেয়েদের নাট্যনির্মাণের ইতিবৃত্ত।

বাংলার রঙ্গমঞ্চে নাট্যনির্মাণ ও নির্দেশনায় মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনার শুরু হয়েছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'র অভিনেত্রীদের প্রসঙ্গ অবতারণায়। তেমনই পশ্চিমবঙ্গের জেলা-নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে দেখা যায়, গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখার মাধ্যমে স্বাধীনতা-পরবর্তী পঞ্চাশের দশকের নাট্যচর্চায় একটা পরিবর্তন সূচিত হয়। 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'র সাংগঠনিক প্রতিবেদন থেকে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে সেখানে জানানো হচ্ছে, '১৯৫২-১৯৫৪ সালের মধ্যে কলকাতা ছাড়া ২৮টি জেলার মধ্যে ১৪টি জেলায় ১০৩টি শাখা সংগঠন কাজ করে চলেছে।'[১] দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই কলকাতা শহরের বাইরে বিস্তৃত হচ্ছে নাট্যচর্চার ধারা।

অভিনয় করাটাই যেখানে শহরতলির মেয়েদের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে নির্দেশনা বা থিয়েটারের অন্যান্য কাজে যেমন মঞ্চনির্মাণ, আলোক প্রক্ষেপণ, সংগীত প্রয়োগ, রূপসজ্জা ইত্যাদি— নিজেদের প্রমাণ করতে তাঁদের সময় লেগেছে নিঃসন্দেহে। এঁদের মধ্যে যাঁরা নির্দেশনা, নাট্যনির্মাণ বা থিয়েটারের নেপথ্যকর্মী হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে পেরেছেন, বিভিন্ন জেলার সেই সব অভিনেত্রীর মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকজনের সাক্ষাৎকার অথবা সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রবন্ধের নিরিখে তাঁদের নাট্যকর্মের

মূল্যায়ন করা হল। নানা দিকের প্রতিবন্ধকতা ও প্রলোভন সামলে কীভাবে তাঁরা সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন, পরিবারের মতো লালন করেছেন নিজের দলকে, গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শকে ধরে রাখতে আগ্রহী হয়েছেন, তাঁদের নাট্যচর্চা ও জীবনভাবনার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে।

হাওড়া-র 'নটধা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪-এ আর রবীন্দ্রভারতীর ছাত্রী **সাধনা মুখোপাধ্যায় (১৯৫৪)** এই নাট্যদলে যোগ দেন ১৯৭৭-এ। ১৯৭৭ থেকেই তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হয়। 'নটধা'-কে কেন্দ্র করেই তাঁর অভিনয়-জীবন প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে আছে 'ঐশ্বরিক' (১৯৭৭), 'পোষ মানা ওরা', 'সেই জ্যান্ত স্মৃতি' (১৯৭৮), বণিক ও মানুষ (১৯৮৩), 'এক্কা দৌড়', 'রক্তকরবী' (১৯৭৮ ও ১৯৮৪), 'নষ্ট কেন মা' (১৯৮৫), 'বলি' (১৯৮৭) ও আরও বহু নাটক। এই নাট্য-অভিজ্ঞতা এবং শিব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনা-পদ্ধতি তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। দলের সদস্যদের উৎসাহে ও স্বামী শিব মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় প্রথম নির্দেশনা দেন ১৯৮৭ সালে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'র নাট্যরূপায়ণে। মূলত নটধা-র অপেক্ষাকৃত ছোটদের নিয়েই কাজটি করেন। প্রায় ১৩ বছর পর আবারও একটি ছোট নাটক শিব মুখোপাধ্যায় রচিত 'ঘনিষ্ঠতা' তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। আরও ১২ বছর পর নির্দেশনা দেন 'এখন যেরকম' নাটকের। রবীন্দ্রভারতীতে পড়ার সময় তাঁর বিশেষ পত্র ছিল নির্দেশনা। সেখানে শিক্ষক কুমার রায় এবং 'নটধা'য় পরিচালক শিব মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা তাঁর নির্দেশনা ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। তবে তিনি যে এত দীর্ঘসময়ের বিরতিতে নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন তার অন্যতম মূল কারণ নির্দেশককে যে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়, দলের যাবতীয় দায়দায়িত্ব সামলে সেই ভার নেওয়াটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে সংগঠনের দায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হয়েছে নিরন্তর। তিনি মনে করেন 'মহিলারা যেভাবে সংসারটা সামলায়, বাড়ির গিন্নিকে যেমন সব দিকে খেয়াল রাখতে হয় সেভাবেই দলকে রক্ষা করেছি। ভালবাসা দিয়ে আগলে রেখেছি।'[২] এই কারণেই সাধনা মুখোপাধ্যায়রা পরবর্তী প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে গড়ে তুলেছেন সাংগঠনিক ক্ষেত্রে সমতার আবহাওয়া। 'দলের ছোটরাই আর আমাদের কাজ করতে দেয় না। সব কাজ ওরাই করে— চা করা থেকে শুরু করে ইস্ত্রি করা এবং নাটকের সব কাজ অবশ্যই। সব থেকে আশ্চর্য হই যে ছোট বাচ্চারা 'নটধা'য় যারা নাট্যশিক্ষার জন্য আসে তাদের ভাবনা চিন্তার প্রকাশ দেখে।'[৩]

দীর্ঘদিনের নাট্যকর্মী সাধনা মুখোপাধ্যায়ের জীবনের সঙ্গে নাটক এবং নিজের দল একাকার হয়ে আছে। তাই দীর্ঘ চল্লিশটা বছর তিনি নাটকের ঘরকন্না করেছেন অম্লান আনন্দে।

উত্তর ২৪ পরগনার 'স্ববাক' নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক **নীলিমা চক্রবর্তী (১৯৫৬)** দীর্ঘদিন

ধরে নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত। স্কুলজীবন থেকেই শুরু হয় অভিনয়। পেশা হিসেবে নাটককে গ্রহণ করেন যখন, তাঁর বয়স তখন চব্বিশ। আসানসোলের চিত্তরঞ্জন অঞ্চলে 'নাট্যরূপা' গোষ্ঠীর হয়ে গিরিজাশঙ্কর দত্তের পরিচালনাধীনে বহু নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। বাড়ির খানিকটা বাধা থাকলেও অভিনয় ছাড়তে পারেননি। 'বাটানগর থিয়েটার ইউনিট'-এ অমল মজুমদারের নির্দেশনায় কাজ করা এবং অফিস ক্লাবের হয়ে প্রচুর নাটক করতে করতেই তিনি তাঁর অভিনয় সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। 'লোকরঞ্জন' শাখায় যখন অভিনয় করতেন পরিচালকদের বিভিন্ন ধরনের কর্মপদ্ধতি তাঁকে মুগ্ধ করত এবং তিনি সব কিছুর নোট রাখতেন। সেই থেকে তাঁর মধ্যে শুধু অভিনয় নয়, নির্দেশনার প্রতি একটা আগ্রহও তৈরি হয়। এত দিনের অভিনয়-অভিজ্ঞতাকে তিনি নির্দেশনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার একটা পথ খুঁজে পান। স্বামী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও সমর্থনে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নিজের নাট্যদল 'স্ববাক'— যেখানে তিনি নাটক পরিচালনা ছাড়াও সমস্ত রকম দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দলের কোষাধ্যক্ষ-ও তিনি। যত দিন স্বামী বেঁচে ছিলেন–– ২০০৮ পর্যন্ত, আয়োজন করেছেন বড় বড় নাট্যোৎসবের। নীলিমা চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটকগুলির মধ্যে আছে 'শাস্তি', 'বিসর্জন', 'বন্ধনহীন গ্রন্থি', 'তিন পয়সার পালা', 'সূর্যগ্রাস', 'আড়াল', 'নষ্টনির্মাণ', 'অণুবীক্ষণ' ইত্যাদি নানা মঞ্চসফল প্রয়াস। বৃহৎ সংখ্যক শিল্পী কলাকুশলীর রঙ্গভূমি নয়, বরং তিনি স্বল্পায়োজনসাধ্য ছোট ছোট নাটক বাছেন। পরিবহণের সুবিধার্থে অনধিক দশজনের টিম নিয়ে অভিনয় করে আসেন মেদিনীপুর, গড়বেতা, বর্ধমান, আসানসোল, বজবজ, কাকদ্বীপ ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে। নাটক নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা ছিল তাঁর কাছে অনেকটা প্রাপ্তির। নিউ দিল্লির কালীবাড়ির উদ্যোগে আয়োজিত National Theatre Competetion-এ অংশগ্রহণ করে ছিনিয়ে এনেছেন পুরস্কার, নিজে পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর শিরোপা। 'দিশারী' পুরস্কারও পেয়েছেন ১৯৮৫ সালে। নাট্যনির্দেশক, অভিনেত্রী নীলিমা চক্রবর্তী নিজেকে জেলার নাট্যকর্মী হিসেবে পরিচয় দিতে অহংকার বোধ করেন। দলের ছেলেমেয়েদের প্রতি তিনি নিজে যেমন উৎসাহী তারাও তাঁকে মান্য করেন। তবে নির্দেশক বলেই তিনি সমস্ত সিদ্ধান্ত একা নিতে রাজি নন। নাটক নির্বাচনের পর সকলে মিলে নাটক নিয়ে আলোচনা হয়। সকলের অভিমত-ই নেওয়া হয় এবং নাট্যকারের সঙ্গে আলোচনা করে পরিবর্তনগুলি করা হয়। নীলিমা চক্রবর্তী মনে করেন 'মেয়েরা এগিয়ে আসুক, মেয়েরা ডিরেকশন দিক। ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়, সীমা মুখোপাধ্যায়রা যেমন দৃঢ়তার সঙ্গে নির্দেশনার কাজ করে যাচ্ছেন, সেই ধারাটা যেন আরও জোরালো হয়।'[৪]

কলকাতা শহরের অনতিদূরে উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা অঞ্চলের নাট্যচর্চা নিষ্ঠা ও স্থায়িত্বে নিজস্ব একটা জায়গা করে নিয়েছে। মেয়েরাও নাট্যনির্মাণের কাজে অত্যন্ত সজাগ। 'গোবরডাঙা শিল্পায়ন'-এর

দীর্ঘদিনের অভিনেত্রী **দীপা ব্রহ্ম** বহুকাল ধরে নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত থেকে যেভাবে কাজ করে চলেছেন–– সেখানে বাণিজ্যিক মনোভাব বা অর্থকরী প্রতিষ্ঠার প্রতি ততটা মনোযোগ নেই, যতটা রয়েছে সচেতন নিজস্ব নাট্যদলের পরিকাঠামো সুগঠিত করবার ক্ষেত্রে। তাঁর মানসিকতাই হল তাপস সেন, খালেদ চৌধুরী, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা। পেশাগত দিক থেকে তিনি একজন শিক্ষিকা। সর্বক্ষণের নাট্যকর্মী না হলেও তাঁর ভাবনায় থিয়েটারকে জাগিয়ে রাখেন অহর্নিশ। 'গোবরডাঙা শিল্পায়ন'-এ ১৯৮৬ সালে দীপা ব্রহ্ম যুক্ত হন। অভিনয় ছাড়াও নাট্যের নানান ক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণ করেছেন বার বার। তাঁর নাট্যচর্চার সূচনা কলকাতা শহরে। কিন্তু শিল্পায়ন-এর সঙ্গেই অতিবাহিত হয়েছে দীর্ঘ সময়। স্বামী আশিস চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত বিভিন্ন নাটকের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন দীপা ব্রহ্ম। 'মালাডাক' নাটকে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ অভিনেত্রী হিসেবে। কিন্তু অভিনেত্রী হিসেবেই নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ রাখতে চাননি। দলের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্কের জায়গা আন্তরিক থাকাটাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন তিনি। 'দলে কোনো ছেলে বা মেয়ে প্রায় অসুস্থ থাকলে সে দিকেও খোঁজ নিই–– কেন সে বারবার অসুস্থ হচ্ছে। আমরা সরস্বতী পুজো করি। প্রত্যেক সদস্যের জন্মদিন আমাদের ডায়েরিতে লেখা আছে। প্রত্যেকের জন্মদিন আমরা কেক কেটে পালন করি।'[৫] অর্থাৎ 'দল' বা 'সংগঠন'কে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে না দেখে, সকল সদস্যের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়ে পারিবারিক আবহ তৈরি করার চেষ্টা করে গেছেন দীপা ব্রহ্ম-র মতো নাট্যকর্মীরা। তাই এঁদের জীবনে পরিবার ও থিয়েটার একীভূত হয়ে গেছে। থিয়েটারের জন্য স্বার্থত্যাগের যে উদাহরণ সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন এঁদের পূর্বসূরিরা, সেই আদর্শকে তাঁরাও ধরে রাখতে চেয়েছেন। তাই সাহস করে থিয়েটারটা যেমন করে চলেছেন, তেমনই নানান প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়েও যাচ্ছেন। তবে এটাও বিশ্বাস করেন যে— 'যে কোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থপর হয়েও ভালোবেসে লড়াই করলে জয়লাভ সম্ভব। আমি নিজের সোনার আংটি বিক্রি করেও নাটক করেছি। ট্রেনে ঘুরে ঘুরেও নাটক করেছি।'[৬]

'রাধানগর দর্পণ'-এর **গার্গী দত্ত**-র থিয়েটারচর্চার মূলে কিন্তু নিজেকে অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে নিজের দলকে সঠিকভাবে চালনার অভীপ্সা। 'রাধানগর দর্পণ'-এর সম্পাদক গার্গী দত্ত ও পরিচালক কিশোর মিত্র-র উদ্যোগেই দলটি প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৯৯ সালে। প্রথম থেকেই দলের সমস্ত রকম কাজকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন গার্গী। মঞ্চভাবনা থেকে শুরু করে পোশাক, রূপসজ্জা, সংগীত প্রয়োগ, পরিচালককে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। ভাবনা-চিন্তার আদান-প্রদান ঘটানো। সাংগঠনিক দিক সামলানো–– এক কথায়, সর্বস্তরীয় দায়িত্বই নিজের ইচ্ছেয় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি। স্বামী অসীম দত্ত এই নাট্যদলের সভাপতি এবং নিজেদের বাসগৃহেই তৈরি হয়ে উঠেছে দলের কর্মক্ষেত্র। সূচনা

পর্বে যদিও তিনি সম্পাদক ছিলেন না, কিছু দিন পরই এই দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে। গার্গী মনে করেন— 'শুধু অভিনয় করে চলে গেলে আমার ভালবাসাটা আসবে না। টোটাল টিমের প্রতি বা টোটাল প্রোডাকশনের প্রতি আমার ভালবাসা আসবে না।'[৭] তাই দলের নিয়মানুসারে সবাইকেই কাজটা ভাগ করে করতে হয়। পোশাক, মঞ্চ বা সংগীতের কাজটা দলের সদস্যরাই করে নেন, শুধু আলোর ক্ষেত্রে বাইরের কাউকে নিয়ে আসতে হয়। তবে আলোক প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রেও গার্গীর যথেষ্ট আগ্রহ। শুধু অভিনয় করতে করতে এই কাজটা করা অসুবিধাজনক বলেই তাঁকে বিরত থাকতে হয়েছে এ কাজে। তবে সংগীত প্রয়োগের কাজটা তিনি দক্ষতার সঙ্গে করে থাকেন। যে দৃশ্যে অভিনয় থাকে না, সেই দৃশ্যে বাইরে বেরিয়ে মিউজিক অপারেট করতে অভ্যস্ত তিনি। এই কাজটা টেকনিক্যাল দিক থেকে যতটা কঠিন, মনঃসংযোগের ক্ষেত্রেও স্থৈর্যের প্রয়োজন। দুটো দিককে মেলাতে সক্ষম হয়েছেন গার্গী দত্ত। পোশাক নির্বাচন করা এবং বানানো দুটো কাজই করে থাকেন তিনি। তিনি নিজে কাটিং করে সেলাই করেন দলের প্রযোজিত নাটকগুলির পোশাক। তিনটি কারণে এই কাজটি তিনি করেন— ১) বাইরের কাউকে দিয়ে করালে মনোমত হয় না ২) আসা-যাওয়া করতে অনেকটাই সময় ব্যয়িত হয় ৩) নিজে হাতে পোশাক তৈরি করে নিতে পারলে অর্থকরী দিক থেকেও দলের অনেকটা সাহায্য হয়।

মঞ্চ নির্মাণের ক্ষেত্রেও গার্গী দত্ত সব সময়ই তাঁর চিন্তাভাবনা দিয়ে সাহায্য করেন। পরিচালক কিশোর মৈত্র-র সহযোগী হয়ে প্রযোজনা-পরিচালনার বিষয়ে নিজেকে ক্রমশ তৈরি করে চলেছেন তিনি। দলগত শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে একটা কঠোরতার ভূমিকা তাঁকে নিতে হয়, নতুবা সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখতেই বিশ্বাসী তিনি এবং তাঁর সংস্থা 'রাধানগর দর্পণ'।

যে দায়বদ্ধতা নিয়ে— যে আদর্শ নিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের পথচলা শুরু হয়েছিল এবং গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকর্মী হিসেবে একটি নির্দিষ্ট দলের মধ্যে থেকে কাজ করার লক্ষ্যে স্থির ছিলেন— সাম্প্রতিককালে কলকাতা কেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় দলগুলি সেই আদর্শ সব সময় ধরে রাখতে আগ্রহী নন। শহরতলির নাট্যচর্চায় কিন্তু এখনও একটি দলে থেকে, সেই দলের অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রবণতাই বেশি। তাই দেখা যায়, দীপা ব্রহ্ম যিনি ১৯৯৯ সালে 'গোবরডাঙা' শিল্পায়ন'-এর সঙ্গে যুক্ত হন, দীর্ঘ ১৬-১৭ বছর সেই দলের সঙ্গেই কাজ করে চলেছেন একটানা। 'রাধানগর দর্পণ'-এর গার্গী দত্ত ১৬ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কলকাতার দু'একটি দলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন নিজের দলের স্বার্থে। তবে পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে একটি দলের সমস্যা সমাধানের জন্য একবার মাত্র দলের বাইরে বেরিয়ে অভিনয় করেন।

নাট্য সম্পর্কিত বিবিধ কাজের প্রতি আগ্রহ থেকেই গার্গী দত্ত নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সৌমিত্র বসুর নাটক 'টুনটুনি লো'-র প্রযোজনার সময় পরিচালক কিশোর মিত্রকে নানা মতামত দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। যেমন এ নাটকে ছোট বড় সবাই একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। ছোটদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই সেখানে বড় রানি যদি গার্গী অভিনয় করেন তবে রাজার চরিত্রে অভিনয় করে ন'বছরের কিশোর। ছোট রানির বয়স ছ'বছর। টুনটুনির ভূমিকায় যদি পাঁচ বছরের শিশু অভিনয় করে, তবে মন্ত্রীর ভূমিকায় ছিলেন পরিচালক কিশোর মিত্র। গার্গী দত্ত প্রথম একক নির্দেশনার কাজ করেন 'অহল্যা' নাটকে। মূল ভাবনা ছিল তাঁরই। দীর্ঘ সাত বছর ধরে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করে সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় নাটকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। এ নাটকের পোশাক পরিকল্পনা তাঁরই। অহল্যার ভূমিকায় অভিনয় করেন গার্গী নিজে। যখন তিনি নির্দেশক, তখন সবাই তাঁর কথা মানতে বাধ্য-- এই শক্তিটা নিয়েই নির্দেশনার কাজটা করেন। যেহেতু দুটি নাটকই ২০০৩-এর পর প্রযোজিত তাই নাটক দুটির বিস্তারিত আলোচনা এ ক্ষেত্রে স্থগিত রইল। সাংগঠনিক কাঠামোয় একটা পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখতে চান গার্গী দত্ত— যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজের যেন প্রাপ্য সম্মান পায়— 'আমি ১৬ বছর থিয়েটার করছি। কিশোরদার সঙ্গে কাজ করছি। কিশোরদা যখন ডিরেকশনটা দিচ্ছেন আমি তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানটা দেব। আমিও আশা করব তিনিও আমাকে আমার প্রাপ্য সম্মানটা দেবেন। সবার মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যাপার না হলে কাজ করা যায় না। মালিক আর শ্রমিক তো কেউ হতে পারে না, যে আমি ডিরেক্টর বা গ্রুপ চালাচ্ছি বলে আমি মালিক— এটা নয়। আমি যখন ডিরেক্টর নই, ব্যাকস্টেজের কাজ করছি-- তখন পরিচালক কিশোরদাও যদি কোনও ভুল করেন বা মিউজিকটা ঠিকমতো হয়তো বাজানো হল না, তখন আমি রিঅ্যাক্ট করি। কাজের সময় কোনও কম্প্রমাইজ নয়। তবে অন্য সময় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয় পরস্পরের মধ্যে, কিন্তু একটা জায়গায় সবাই সহমত হলে তবেই প্রোডাকশনটা হয়। দলের মধ্যে এই বাঁধনটা আছে বলেই দলটা আছে।'[৮] ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়, সোহাগ সেন, অর্পিতা ঘোষ প্রমুখ মহিলা নির্দেশকদের প্রযোজনা গার্গী দত্তকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এঁদের মধ্যে অর্পিতা ঘোষকে দেখেছেন আলোক নিয়ন্ত্রণ করছেন, ব্যাকস্টেজে পোশাক রূপসজ্জা নিয়ে তাঁর সম্পৃক্তি গার্গীকে নির্দেশক হিসেবে নাট্যকর্মী হিসেবে বিশেষ প্রেরণা দিয়েছে। পরিবারের কাছ থেকে তিনি যে সহযোগিতা পেয়েছেন হয়তো অন্য মহিলা নাট্যকর্মীর ক্ষেত্রে তা পাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাঁর স্বামী, দলের সভাপতি মনে করেন— 'গার্গীর অনুরাগ থিয়েটারে। ও যদি ওর ভাল জিনিসটা সমাজকে দিতে পারে তা হলে সমাজেরই ভাল হবে।'[৯] এই অনুরাগ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে রাধানগর দর্পণ'-এ থেকে নাটকের কাজ ও নির্দেশনায় মনোনিবেশ করেন পূর্ণ সময়ের নাট্যকর্মী গার্গী দত্ত।

**শিপ্রা সেন (১৯৭৫)** দীর্ঘদিনের নাট্যকর্মী যাঁর নাট্যজীবনের সূচনা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রভূমি বহরমপুরের নাট্যসংস্থা 'ঋত্বিক'। স্বামী সুগত সেন এই নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কোনও একটা সময়ে দলে অভিনেত্রীর অভাবে পরিচালক গৌতম রায়চৌধুরীর অনুরোধে শিপ্রা সেন ১৯৯৮ সালে ঋত্বিক নাট্যসংস্থায় যোগ দেন। পারিবারিক কোনও প্রতিবন্ধকতা নয়, শ্বশুরবাড়ির উৎসাহে ও পূর্ণ সমর্থনে তিনি নাট্যচর্চার কাজ করে যেতে পেরেছেন। আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পথনাটক 'সাগরপারের রাজকন্যা' (১৯৯৮) দিয়ে তাঁর অভিনয় জীবনের শুরু। 'ঋত্বিক' প্রযোজিত গৌতম রায়চৌধুরী নির্দেশিত বহু নাটকে মুখ্য নারী চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। 'ঋত্বিক' প্রযোজিত তাঁর অভিনীত নাটকগুলি হল 'আত্মবিশ্ব' (২০০১), 'ব্যাস' (২০০৩), 'মেঘবতী' (২০০৩), 'ভারত পুরাণ' (২০০৫), 'দেশদ্রোহী' (ইবসেনের অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল অবলম্বনে, ২০০৬), 'চতুরঙ্গ' (২০০৭), 'দিবারাত্রির কাব্য' (২০০৯), 'শেষরক্ষা' (২০১১), 'আদি রাজা' (২০১৩-২০১৪), 'আঁধারে সূর্য' (২০১৫) ইত্যাদি। পাশাপাশি পথনাটকেও তিনি অভিনয় করেছেন যেমন '৩০শে জানুয়ারি' (১৯৯৮) 'হরিপদ মিস্ত্রি' (২০০০), 'জতুগৃহ' (২০০২), 'শাহারজাদির গল্প' (২০০৩) ইত্যাদি। জে. এন. আকাদেমি স্কুলের বাচ্চাদের সঙ্গে বহু কর্মশালা পরিচালনা করা, ঋত্বিক-এর ছোট বাচ্চাদের শনি-রবিবারে নাটকের ক্লাস নেওয়া, কর্মশালা পরিচালনা করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিপ্রা সেন যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেছেন, সেই শিক্ষাই তাঁকে নির্দেশক হওয়ার সাহস জুগিয়েছে। স্কুল ছাত্রদের নিয়ে নির্মাণ করেন 'হ্যামলিনের 'বাঁশিওয়ালা' (২০১০)। 'নান্দীপট' আয়োজিত মহিলা পরিচালিত নাট্যোৎসবের জন্য তাঁর নির্দেশনায় প্রস্তুত ও প্রদর্শিত হয় 'কঙ্কাল' (২০১৪)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ছোটগল্পের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন কৌশিক রায়চৌধুরী। 'ঋত্বিক' নাট্যগোষ্ঠীতে তিনিই প্রথম মহিলা নাট্যপরিচালক।

একজন নবীন অভিনেত্রী থেকে নির্দেশক হওয়ার পথটা সহজ ছিল না। পরিশ্রম, নিষ্ঠা যেমন ছিল তেমনই তাঁকে সাহায্য করেছে সাংগঠনিক পরিকাঠামো। দলের প্রত্যেকের সঙ্গে সুসম্পর্ক শিপ্রা সেনকে কাজ করার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে 'দলে একটা পারিবারিক সম্পর্ক, বিপদ হলে সবাই সবার পাশে দাঁড়াবে। আমরা এখানে সবাই সবাইকে শ্রদ্ধা ভালবাসার চোখে দেখি। আমার মনে পড়ে না— খুব সত্যি কথা–– কারও সঙ্গে কারও বিবাদ হয়েছে। আমরা ওখানে (দলে) গিয়ে ফ্রেশ অক্সিজেন পাই। সারাদিন কাজকর্ম করে সন্ধেবেলা গ্রুপে গেলে ফিরে আসি ফ্রেশ অক্সিজেন নিয়ে।'[১০] 'ঋত্বিক' নাট্যগোষ্ঠী শুধু নাটক অভিনয় ও মঞ্চায়নের মধ্যে নিজেদের সীমায়িত করে রাখেনি। তাদের বৃহৎ কর্মকাণ্ডের শরিক হয়ে শিপ্রা সেনের নাট্যজগতের পরিধিও বিস্তৃততর হয়েছে। 'ঋত্বিক' আয়োজিত বাৎসরিক

নাট্যমেলায় দেশ-বিদেশের নাট্যদলগুলি যোগদান করে–– যা শুধু আঞ্চলিক মানুষের, নাট্যমোদী দর্শকের কাছে নয়, সমগ্র নাট্যজগতের কাছেই গর্বের বিষয়। এ ছাড়াও নিয়মিত কাজের মধ্যে নিজেদের সব সময় সচল রাখেন তাঁরা। প্রত্যেক মাসে তাঁদের নিজেদের অভিনয় থাকে। কখনও কখনও সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে আসে অন্যান্য জেলার দলগুলিও। ছ'মাসের যে নাট্যকর্মশালার আয়োজন করে 'ঋত্বিক' সেই কর্মশালার মাধ্যমে দলে নিযুক্ত হয় নতুন নতুন ছেলেমেয়ে। প্রত্যেকটা দিন কিছু না কিছু কাজ হয় দলে। অভিনয় ছাড়াও যে কাজগুলো থাকে, দলের ছেলেমেয়েরাই সে কাজগুলো করে। এই সমস্ত কর্মভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত থাকেন শিপ্রা সেন। 'ঋত্বিক' নাট্যগোষ্ঠীর এই রকম সাংগঠনিক পরিকাঠামো ও কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিপ্রা সেনের নাট্য-অভিজ্ঞতা অর্জন ও নির্দেশক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। শিপ্রা সেনের নাট্যচিন্তায় এখনও দলগত ঐক্যের প্রতিই পূর্ণ বিশ্বাস–– তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রিত শিল্পী হয়ে থিয়েটার করতে আগ্রহী নন তিনি।

শিপ্রা সেনের মতো দীর্ঘদিন ধরে একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে থেকে নাট্যচর্চা করে যাওয়ার দৃষ্টান্ত **সঙ্গীতা চৌধুরীর**-ও। 'ইছাপুর আলেয়া'র সঙ্গে যুক্ত হন তিনি ১৯৯৯ সালে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের পারিবারিক আদলে গড়ে ওঠা সাংগঠনিক কাঠামোয় অভিনয় ছাড়াও নাটকের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মে অত্যুৎসাহী সঙ্গীতা নাট্যনির্দেশনায় আসেন ২০১৪ সালে। মৈনাক সেনগুপ্তর লেখা 'আপন ঘরের পরের আমি' তাঁর নির্দেশিত প্রথম নাটক। কিন্তু নির্দেশক হওয়ার কোনও বাসনা তাঁর ছিল না। ছোটবেলা থেকে ছিল অভিনয়ের নেশা। ব্যারাকপুরের 'উত্তরণ সাংস্কৃতিক চক্র' সংস্থায় যুক্ত ছিলেন। তখন বুঝতেন নাটক মানেই অভিনয়। কিন্তু ব্যারাকপুর ছেড়ে বিয়ের পর যখন ইছাপুরে এসে যোগ দিলেন 'ইছাপুর আলেয়া'র সঙ্গে, তখন বুঝলেন থিয়েটার মানে শুধু অভিনয় নয়— আরও অনেক কিছু। তাঁর কথায় 'বুঝলাম থিয়েটার মানে একটা সামগ্রিক কাজ। থিয়েটার মানে সংগঠন। একটা সংগঠন না গড়লে থিয়েটার করা যায় না।'[১১]— এই ধারণাটা তাঁর মধ্যে গেঁথে দিয়েছিলেন 'ইছাপুর আলেয়া'র কর্ণধার, পরিচালক শুভেন্দু মজুমদার। শুরুর দিন থেকে তাঁর কাছ থেকেই সঙ্গীতা চৌধুরী শিখেছেন গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শ। নিজেদের প্রয়োজনার কাজ তাঁরা নিজেরা করতেই অভ্যস্ত। আলো, সংগীত, মঞ্চ, রূপসজ্জা সব কিছু। শুধু মেক আপ করেই অভিনয় করতে নেমে গেলাম–– সেটা এই দলের ক্ষেত্রে হয় না। এভাবেই গড়ে উঠছে দল আর এইভাবেই দলের মধ্যে থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন সঙ্গীতা। থিয়েটারকে তিনি যে মানসিকতা থেকে দেখেন সেখানে পাঁচজনের সমবেত চেষ্টায় গড়ে ওঠে থিয়েটার। কারণ সেটে যে মানুষটি পেরেক পুঁতছে সেই কাজটা যদি সে ঠিকভাবে না করে, তা হলে যে অভিনয় করবে তার হাত পা কেটে যেতে পারে। অনেক দিন ধরে এই শিক্ষার মধ্য

দিয়ে বড় হয়ে উঠেছেন সঙ্গীতা, থিয়েটার হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যম।

অভিনয়ের পাশাপাশি নাটক লেখার শিক্ষাও তাঁর শুভেন্দু মজুমদারের কাছে। তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি নাটক 'ইছাপুর আলেয়া' ও অন্য দলের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে 'অবিচ্ছেদ্য' (প্রযোজনা: 'ইছাপুর আলেয়া', পরিচালনা শুভেন্দু মজুমদার, পোশাক : সুমিতা মজুমদার), 'e-মানবিক' (মঞ্চ ও নির্দেশনা শুভেন্দু মজুমদার) 'আসা যাওয়া' (অন্য একটি দলের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়)। সঙ্গীতা চৌধুরীর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় 'আপন ঘরে পরের আমি' (পরিচালনা : সঙ্গীতা চৌধুরী, পোশাক : সুমিতা মজুমদার) ইত্যাদি। 'ইছাপুর আলেয়া'র বৈশিষ্ট্য হল ৩৬৫ দিন ২৪ ঘণ্টা দল সচল থাকে। নিয়মিত সদস্য প্রায় ২৫ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে অন্তত ১৫ জন প্রতিদিন উপস্থিত থাকে এবং কোনও না কোনও কাজ করে। কখনও রাজা ভট্টাচার্যের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়েছে 'ক্ষীরের পুতুল', কখনও দেবশঙ্কর হালদার লিখিত 'ইন্ডিয়ান আইডল'।

প্রতি রবিবার ৬-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে শিশু-কিশোর নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির। উল্লেখ্য যে 'ইছাপুর আলেয়া'র আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে মহিলা পরিচালিত নাট্যোৎসব। সেখানে কলকাতার একটি এবং শহরতলির প্রায় পাঁচটি নাট্যদলের নাটক অভিনীত হয়েছে। ২৭-৩০ জুলাই, ২০১৬ শ্যামনগর, রবীন্দ্রভবনে এই 'মঞ্চকন্যা উৎসব' পালিত হয়। সেখানে কলকাতার 'মুখোমুখি' নাট্যদলের পৌলমী বসুর পরিচালিত নাটক ছাড়া নীলিমা চক্রবর্তী, কাবেরী মুখোপাধ্যায়; দীপান্বিতা বণিক দাস, বেবি সেনগুপ্ত, সঙ্গীতা চৌধুরীর নাটক নির্বাচিত হয়। যে নাট্যদল এই রকম একটি নাট্যোৎসবের পরিকল্পনা করে সেই নাট্যদলের কর্মী হিসেবে সঙ্গীতা চৌধুরীর স্বতন্ত্র মানসিকতা লক্ষণীয়। সর্বক্ষণের নাট্যকর্মী সঙ্গীতার কাছে জীবনধারণের একটা পথ-ই হল থিয়েটার। '... থিয়েটার তো শুধু বিনোদন নয়, আদর্শ। আমাদের একটা আদর্শ আছে। আমরা একটা গল্প বা গল্পের মোড়কে একটা মেসেজ দিতে চাই। আমরা বলি না যে এটা করা উচিত বা উচিত নয়। কিন্তু মানুষ বুঝে যায় আমাদের থিয়েটার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যে, এটা করলে এটা হতে পারে। আমরা এটা বিশ্বাস করি।'[১২]

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার 'গোবরডাঙা নক্‌শা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে আর কয়েক বছর পরই ১৯৯০ সালে **দীপান্বিতা দাস বণিক** এই নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং প্রায় ছাব্বিশ বছর ধরে এই নাট্যদলেরই তিনি একজন সক্রিয় কর্মী। আশিস দাস মূলত 'গোবরডাঙা নক্‌শা'র পরিচালক, কিন্তু দীপান্বিতা দাস বণিক-ও নিজের ইচ্ছায় এগিয়ে আসেন এবং নির্দেশনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। থিয়েটারে নিজের

একটা জায়গা করে নেওয়াটা সুগম ছিল না দীপান্বিতার ক্ষেত্রে। ছোটবেলা থেকে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। বাবা থিয়েটার করা অপছন্দ করতেন। এমনকী দীপান্বিতা এ-বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার পর কথা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই সংগ্রাম আরও তীব্র হল যখন শ্বশুর বাড়িতে নাটক করার ওপর নিষেধাজ্ঞা এল। বিয়ের মাত্র পনেরো দিনের মাথায় শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী দীর্ঘদিনের নাট্যকর্মী দীপান্বিতা মনে করেন '...নাটক নিয়ে পড়াশোনা করার সুবাদে নাট্যকর্মী হতে পেরেছি। আর এই নাট্যকর্মী হতে পারার জন্য সমাজের কাছে কিছু বক্তব্য কিছু আবেদন রাখতে পারছি। যে আবেদন বা বক্তব্য সমাজের পক্ষে সামগ্রিক ইতিবাচক। ... সেই কারণে আমি মনে করি যে, নাট্যকর্মীদের তো সমাজ-সচেতন করার ব্যাপারে দায়িত্ব আছে আর যেহেতু আমি মহিলা সেই কারণে এই দায়িত্বটা একটু বেশিই থেকে যায় মহিলাদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে।'[১৩]

শহরতলির নাট্যচর্চায় মেয়েদের ভূমিকাটা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠেছে। তার কারণ যাঁরা অভিনেত্রী, শুধু অভিনয়ের জন্যই দলে যুক্ত হয়েছিলেন— তাঁরাই অভিনয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে পোশাক পরিকল্পনা, সংগীত, কর্মশালা পরিচালনা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজে নিজে ব্যাপৃত থাকতে থাকতে নির্দেশনার কাজেও আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। 'শান্তিপুর সাংস্কৃতিক'-এর রাত্রি চট্টোপাধ্যায় (১৯৭০) এবং শান্তিপুরেরই 'রঙ্গপীঠ'-এর নীলিমা বিশ্বাস একটানা একই দলে থেকে যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। রাত্রি চট্টোপাধ্যায় দলে 'গুরু'র পদ অর্জন করেছেন। তাঁর অভিনয় জীবনের দীর্ঘপথ তিনি অতিক্রম করেছেন বহু নাটকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করে। ১৯৮৮-র স্বল্পকাল পর থেকে কৌশিক চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত একটার পর নাটকে অভিনয় করে গেছেন। প্রায় ৩২টি নাটকে বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেন 'শান্তিপুর সাংস্কৃতিক'-এর হয়ে। 'সায়ক' নাট্যগোষ্ঠী তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান প্রদান করে ২০০৩ সালে 'ডানা' নাটকে মায়ের ভূমিকায় অভিনয়সূত্রে। লাভ করেছেন স্বপ্নসন্ধানী-র পক্ষ থেকে শ্যামল সেন পুরস্কার। শুধু অভিনয় নয় রাত্রির বিশেষ আগ্রহ পোশাক পরিকল্পনা, রূপসজ্জা এবং ছোটদের থিয়েটার সম্পর্কে। কর্মশালাভিত্তিক প্রযোজনাগুলি গড়ে তুলেছেন কখনও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের, কখনও গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে, কখনও বা যৌনকর্মীদের নিয়ে। নিজস্ব নাট্যদলের প্রায় সমস্ত নাটকের পোশাক পরিকল্পনা করেছেন তিনি। লিখেছেন বেশ কিছু ছোটগল্প, ছোটদের নাটক, নাটক সম্পর্কিত রচনা। অস্কার ওয়াইল্ড-এর 'দ্য হ্যাপি প্রিন্স' অবলম্বনে তাঁর নাট্যরূপায়ণ 'সুখী রাজপুত্তুর' অভিনীত হয় শিশু শিল্পীদের দ্বারা। ছোটদের জন্য লেখা নাটক 'কুঁড়ে ময়ূর'। শিশুদের জন্য নাটক লেখা ও পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে রাত্রি চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যজীবনের আরেকটি দিক প্রতিভাত হয়েছে। 'শান্তিপুর সাংস্কৃতিক' ও বিভিন্ন স্কুলের হয়ে তিনি ছোটদের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।

তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে ‘রাজার পেটে প্রজার পিঠে’ (রচনা : মনোজ মিত্র, পরিবেশনা: ঊষা কে. জি ও নার্সারি স্কুল), ‘ছেলেটা’ (রচনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিবেশনা : তন্তুবায় সংঘ হাইস্কুল ও বোরাশ্রী গৌরাঙ্গ হাইস্কুল), সূর্যের সিঁড়ি (রচনা : দীপান্বিতা রায়, পরিবেশনা : তন্তুবায় সংঘ হাইস্কুল), ‘উল্টো পুরাণ’ (রচনা : কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশনা : রাধারানী নারীশিক্ষা মন্দির), ‘সুয়োরানীর সাধ’ (রচনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিবেশনা : শান্তিপুর সাংস্কৃতিক)।[১৪] ‘শান্তিপুর সাংস্কৃতিক’ থেকে নাট্যশিক্ষার সূচনা রাত্রি চট্টোপাধ্যায়ের। এরপর শিক্ষাগ্রহণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বিভিন্ন কর্মশালা থেকে এবং অশোক মুখোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, খালেদ চৌধুরী, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, জয় সেন, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে। নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে, নাট্যনির্মাণের মধ্য দিয়ে রাত্রি চট্টোপাধ্যায় এক বৃহত্তর সমাজ ও সামাজিক মানুষজনের অংশীদার হয়ে উঠতে চেয়েছেন।

কাঁচড়াপাড়া ‘ফিনিস্ক’-এর দীর্ঘদিনের নাট্যকর্মী ও পরিচালক কাবেরী মুখোপাধ্যায় (১৯৬৪) এই নাট্যদলে ১৯৮২ সালে যুক্ত হন এবং প্রায় ৪০টি নাটকে অভিনয় করেন। ‘পথসেনা’-র আয়োজনে বাদল সরকারের মতো নাট্যব্যক্তিত্বের কর্মশালায় অংশগ্রহণ ১৯৯২ সালে। ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় ও কনক মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অভিনয় তাঁর নাট্য-অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। ক্রমশ তিনি নাট্যপরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে ‘আলোর ঠিকানা’ (২০১২), ‘লালন ফকির’ (২০১২), ‘সে আমার ছোট বোন’ (২০১৩), ‘Talk Show@ প্রেতলোক’ (২০১৪), ‘এক প্রতারক পরিবারের কাহিনি’ (২০১৫), ‘৪ Dec.’ (২০১৫), ‘ঠিক রাস্তা’ (২০১৬), ‘পাঁজরের ইতিহাস’ (২০১৬), ‘সময়ের শিকার’ (২০১৬)।[১৫] অর্থাৎ ২০১২-র পর থেকে ফিনিস্ক নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। শুধু পরিচালনা ও অভিনয় নয়, তিনি রূপসজ্জা বিষয়েও আগ্রহী। কাবেরী মুখোপাধ্যায়ের কাছে নাটকই একমাত্র অবলম্বন। নাট্যপ্রশিক্ষণ, বিভিন্ন জায়গায় কর্মশালা পরিচালনা ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে ক্রমশ বিস্তারিত করে দিয়েছেন তিনি। নাটকের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন তাঁর জীবনদর্শনকে।

নদিয়ার ‘শান্তিপুর রঙ্গপীঠ’-এর সর্বক্ষণের নাট্যকর্মী নীলিমা বিশ্বাসের মূল কাজের জায়গাটা হল ছোটদের থিয়েটার। স্কুল-শিশুদের নিয়ে তাঁর নাট্যচর্চা ক্রমশ পরিণত হয়েছে। ১৯৮৮ সালে তিনি ‘শান্তিপুর সাংস্কৃতিক’-এ যোগ দিলে নাটকের সঙ্গে তাঁর বন্ধনটা দৃঢ় হয়ে ওঠে। যদিও এই নাটক-ভাবনার সলতে পাকানোটা শুরু হয়েছিল আরও আগে ‘সব পেয়েছির আসর’ থেকে। ছোটবেলায় সেখানেই শিখেছেন

নাচ, গান, নাটক, প্যারেড, ব্রতচারী, বাঁশি বাজানো অর্থাৎ 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' অর্থাৎ সমস্ত রকমের কাজ। পরবর্তী জীবনে নাট্যচর্চায় যা কাজে লাগে সর্বতোভাবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি কিন্তু ভিন্ন পেশার কথা ভাবেননি। থিয়েটারকেই গ্রহণ করেছেন।

১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির আয়োজনে কর্মশালা এবং ১৯৯০ সালে এন এস ডি-র আয়োজনে বহরমপুরে ৪০ দিনের একটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। শেষোক্ত কর্মশালায় রূপসজ্জা, অঙ্গসঞ্চালন, আলো, সংগীত, সমস্ত বিষয় সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা তৈরি হয় এবং নির্দেশনার জন্য যে টোটাল থিয়েটারের শিক্ষা প্রয়োজন তারই পূর্ব প্রস্তুতি গড়ে তোলে এই কর্মশালা। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন এন এস ডি-র তৎকালীন অধিকর্তা কীর্তি জৈন। তাঁকে দেখে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নীলিমা বিশ্বাস, 'ওঁকে দেখে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছিল। একজন মহিলা এত বড় একটা পোস্টে আছেন, এতজন মানুষকে নিয়ে কাজ করছেন এটা আমাকে উদ্দীপ্ত করেছিল।' একজন মহিলা নাট্যকর্মী হিসেবে এই উদ্দীপনাকে পুঁজি করেছিলেন তিনি। স্বামী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস (এন এস ডি-র প্রাক্তন ছাত্র) এবং আরও কয়েকজন মিলে গড়ে তোলেন তাঁদের নিজস্ব নাট্যদল 'শান্তিপুর রঙ্গপীঠ' ১৯৯৮-তে।

নীলিমা বিশ্বাসের নাট্যজীবনে আরও বড় একটা দরজা খুলে দেয় দিল্লিতে গিয়ে 'National School of Drama' পরিচালিত Theatre-in-Education (Actor-Teacher) কোর্স (১৯৯৮-২০০০)। শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন বি. ভি. করন্থ, ত্রিপুরারি শর্মা, ফৈজল আলকাজি, মোহন আগাসে প্রমুখের মতো জাতীয় স্তরের বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বদের। তাঁদের নির্দেশনায় অভিনয়ও করেছেন— 'ইয়ে ভী মঙ্গল ওহ ভী মঙ্গল' (ফৈজল আলকাজি), 'লাল লাল হাতি' (ত্রিপুরারি শর্মা), 'খুল যা সীম সীম' (বি. ভি. করন্থ), 'তুলসী তুলসী' (আবদুল লতিফ খাটানা) ইত্যাদি নাটকে। তিনি দিল্লিতে থেকে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারতেন হয়তো, উপার্জনের পথও সুগম ছিল। কিন্তু তিনি ফিরে আসেন শান্তিপুরে নিজের দলকে তাঁর অধীত শিক্ষা দিয়ে সমৃদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষায়।

'শান্তিপুর রঙ্গপীঠ'-এর বিশিষ্ট অভিনেত্রী নীলিমা বিশ্বাসের নাট্যজীবনের আরেকটি পর্বের সূচনা হয় যখন এই নাট্যদলের ছোটদের নাট্য বিভাগটি শুরু হয়। শান্তিপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু স্কুলে থিয়েটারকে শিক্ষার একটা মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপিত করে তিনি ও দলের সদস্যরা কাজ করতে থাকেন। 'রঙ্গপীঠ'-এর ছোটদের শাখা বিভাগটি খোলার পর থেকে একটির পর একটি নাটক পরিচালনা করে গেছেন

নীলিমা। শেকসপিয়রকে নিয়ে ছোটদের জন্য নির্মাণ করেছেন— 'ম্যাকবেথ', 'কিং লিয়র', 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'; রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে তৈরি করেছেন 'আরশিনগর' (মুসলমানির গল্প), 'ভুলস্বর্গ', 'সুয়োরানীর সাধ', 'বীরপুরুষ', 'বলাই', 'নতুন পুতুল', 'দেনা পাওনা', 'প্রথম চিঠি' ইত্যাদি। ছোটদের অভিনয়ের জন্য লিখেছেন 'আকাশের কাছাকাছি', 'গল্পের সাথে দেখা', 'রামধনু', 'চাঁদের বুড়ি', 'যাদুকর', 'লোভী জেলেনী' ইত্যাদি। ছোটদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যে পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেন, সেখানে বন্ধুত্ব, খেলা, ধৈর্য— এই তিনটি বিষয়কে তিনি গুরুত্ব দেন। নির্দেশক শব্দটি তিনি মানতে চান না। বন্ধুর মতো খেলার মধ্য দিয়ে ছোট ছোট গল্পভিত্তিক নাটক তৈরি করেন। নির্দেশ থাকলেও তা থাকে প্রচ্ছন্নভাবে। তিনি মনে করেন 'যদি বাচ্চাদের মধ্যে থিয়েটারটা বাঁচিয়ে রাখতে পারি তা হলেই ভবিষ্যতের থিয়েটারটা বাঁচবে। ২০০২ সালে যে বাচ্চারা এসেছিল তখন তাদের বয়স ছিল ৫-৬ বছর, আজ তারা রঙ্গপীঠের বড়দের সঙ্গে অভিনয় করছে। স্কুলে সেই বাচ্চাদের দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করাই যারা ভয়ে কথা বলতে পারে না, একটা মুভমেন্ট করতে সাহস পায় না। এখানেই আমার লড়াই। মনটাকে যদি ছোটদের মতো করে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তবেই বাচ্চাদের সঙ্গে কাজটা করে যেতে পারব। এটাই স্বপ্ন আমার। অর্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষা এ সব সেখানে তুচ্ছ।'[১৬] সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও নীলিমা বিশ্বাসের সক্রিয়তা লক্ষণীয়। ২০০২ থেকে তিনি নাট্যদলের সম্পাদক এবং পাশাপাশি হিসেব-সংক্রান্ত কাজও তাঁকে দেখতে হয়। প্রত্যেক বছর জাতীয়-আন্তর্জাতিক নাট্যদলের সমাগমে যে বৃহৎ নাট্যোৎসবের আয়োজন করেন তাঁরা, সেখানে শৃঙ্খলা আর সাংগঠনিক শক্তিটা-ই মূল কাঠামো। ১৯৯৮ থেকে নীলিমা বিশ্বাস সেই শক্তিটা-ই প্রবাহিত করে দিচ্ছেন নিজের দলে, দলের ছোট-বড় সকল সদস্যের মধ্যে।

সামগ্রিকভাবে দেখলে শহরতলির নাট্যকর্মীদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। (১) নাট্যকর্মকে তাঁরা একটা দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে গ্রহণ করেছেন। (২) নিজের দলের প্রতি তাঁরা কর্তব্যপরায়ণ। (৩) যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নাট্যচর্চা করছেন তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র অভিনেত্রী হয়ে থাকার প্রবণতা বা নিজেকে প্রচার করার চেয়েও দলগত উন্নয়ন বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। (৪) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁরা ছোটদের নিয়ে কর্মশালা ভিত্তিক নাটক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। (৫) দলের সাংগঠনিক কাজকর্মের সঙ্গে এঁরা সকলেই সচেতনভাবে যুক্ত। সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রমাণ করতে পেরেছেন। (৬) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের নাট্যজীবনে কোনও না কোনও পুরুষের সমর্থন তাঁরা লাভ করেছেন। হতে পারে তিনি স্বামী অথবা দলের পরিচালক, নতুবা আত্মজন। তাঁরা যাতে এগিয়ে যেতে পারেন সে ক্ষেত্রে পুরুষের বিরোধিতা নয়— সহযোগিতা একটা ইতিবাচক পথের সন্ধান দিয়েছে। (৭)

এরা প্রত্যেকেই ছোটদের নাট্যপ্রশিক্ষণ দেওয়া, ছোট বড় সকলের ক্ষেত্রেই কর্মশালা পরিচালনা করা, নাটক শেখার ক্লাস নেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন। (৮) অভিনয় ছাড়াও যাবতীয় কাজের ক্ষেত্রে (সংগীত, আলো, পোশাক, রূপসজ্জা ইত্যাদি) অর্থাৎ টোটাল থিয়েটার সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। (৯) সর্বোপরি এঁরা প্রত্যেকেই দৃঢ় মনোভাবাপন্ন। দৃঢ়তার সঙ্গে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নাট্যপথের যাত্রী।

তাই শহরতলির মেয়েরা নাট্যনির্মাণে ও নির্দেশনায় তাঁদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাংলা নাট্যের ভিন্ন দিক সূচিত করেছে।

# মঞ্চকন্যা উৎসব

## কিছু কথা

নারীকে অর্ধেক আকাশ অভিধায় কবিরা অবহিত করলেও তার অর্ধেক জীবনও সে পায়নি। পুরানের কাল থেকে আজকের বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও নারী জীবনের অর্ধেক না হয়ে পণ্য হিসেবেই থেকে গেছে। বেহুলাকে স্বামীর জীবনের বিনিময়ে সর্বসমক্ষে নাচতে হয়েছিল। এ যুগে জীবনধারণের জন্য ক্রিকেট মাঠে স্বল্পবসনা হয়ে নাচতে হয় নারীকে। মুনাফা লাভের জন্য তাদের নাচায় একদল বানিয়া। আজ থেকে দেড়শ বছরেরও কিছু আগে এই অবমাননার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন যিনি তিনি কোনও পুরুষ নন -নারী। বিনোদিনী তাই ফিনিক্স পাখির মতো হলেও বেঁচে থাকবেন আপামর বাঙালির হৃদয়ে। নটী বিনোদিনী নামে সমধিক পরিচিত এই মানুষটির অভিনয় জীবন মাত্র বারো বৎসরের হলেও সেই বারো বছর বাংলার সভ্যতা সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ডা: নীলরতন সরকার, ডি.এল.রায়, উপেন্দ্র কিশোর এর পাশাপাশি বাংলার সমাজ-সভ্যতা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে হাজির হয়েছেন কামিনী রায়, ডা: কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, বিনোদিনী দাসী, লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে এসেছেন গওহরজান- এর মতো দিগ্বিজয়ী নারীরা। এবং তাঁদের হাত ধরে একে একে বহু নারীর আগমন ঘটেছে বাংলার অর্ধেক আকাশে।

যাদের হাত ধরে সৃষ্টি-সভ্যতা-সংস্কৃতির সূত্রপাত তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য ইছাপুর আলেয়ার নারী নির্দেশিত নাট্যমেলা বা মঞ্চকন্যা উৎসব। অনেকদিন ধরেই সুপ্ত ছিল এই ইচ্ছা, সাধ আর সাধ্যের ফারাকে তা বাস্তবায়িত হয়নি। এ বছর বিনোদিনীর প্রয়াণের ৭৫ বছরকে স্মরণে রেখে মাভৈ: বলে ঝাঁপিয়ে পড়া গেল। চারদিনের এই নাট্যোৎসবের সূচনা করবেন বাংলার প্রবীণ অভিনেত্রী শ্রীমতী মন্দিরা সোম। ছয়টি নাটক দিয়ে সাজানো মঞ্চকন্যা উৎসবের সঙ্গে থাকছে বিনোদিনীকে নিয়ে একটি প্রদর্শনী আর সঙ্গে থাকছেন আপনারা যাদের আশ্রয় প্রশ্রয় না পেলে আলেয়া আলোকিত হতে পারতো না।

অতীতের মতো বর্তমান ও ভবিষ্যতেও আপনাদের সঙ্গ পেলে আলেয়ার নাট্য আলো বহু আলোকবর্ষ পথ অতিক্রম করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

**২৭ জুলাই বুধবার সন্ধে ৬টা**

মুখোমুখি প্রযোজনা

## ফেরা

নির্দেশনা পৌলোমী চট্টোপাধ্যায়

অভিনয়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

দেবশঙ্কর হালদার

**২৮ বৃহস্পতিবার সন্ধে ৬টা**

স্বাবাক প্রযোজনা

## অণুবীক্ষণ

নাটক চন্দন সেন

নির্দেশনা নীলিমা চক্রবর্তী

ফিনিক কাঁচরাপাড়া প্রযোজনা

## পাঁজরের ইতিহাস

নাটক মৈনাক সেনগুপ্ত

নির্দেশনা কাবেরী মুখার্জী

**২৯ শুক্রবার সন্ধে ৬টা**

গোবরডাঙ্গা নকসা প্রযোজনা

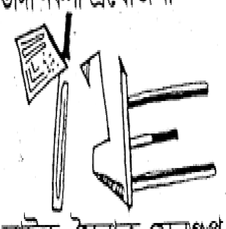

নাটক মৈনাক সেনগুপ্ত

নির্দেশনা দীপান্বিতা বনিক দাস

অঙ্গন বেলঘরিয়া প্রযোজনা

## টিয়া পাখির কথা

নাটক ও নির্দেশনা

বেবি সেনগুপ্ত

**৩০ শনিবার সন্ধে ৬টা**

ইছাপুর আলেয়ার নিবেদন

## আপন ঘরে পরের আমি

নাটক মৈনাক সেনগুপ্ত

নির্দেশনা সঙ্গীতা চৌধুরী

**২৭-৩০ জুলাই, ২০১৬, শ্যামনগর রবীন্দ্রভবনে 'ইছাপুর আলেয়া' আয়োজিত 'মঞ্চকন্যা উৎসব'**

## তথ্যসূত্র


১. ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, সাংগঠনিক প্রতিবেদন, পশ্চিমবঙ্গ ১৯৫২-১৯৫৪;

২. 'নটধা' নাট্যগোষ্ঠীর কর্মী সাধনা মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, মার্চ ২০১৬;

৩. তদেব

৪. উত্তর ২৪ পরগনার 'স্ববাক' নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার নীলিমা চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, মার্চ ২০১৬;

৫. শম্পা বিশ্বাস, 'বাংলা থিয়েটারে নন্দিনীরা', শেখর সমাদ্দার (সম্পা.), সময় নাট্যভাষ, নারীবিশ্ব ও থিয়েটার বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ ২০১৫, পৃ. ২৪৯;

৬. ওই, পৃ. ২৫০;

৭. 'রাধানগর দর্পণ'-এর কার্যালয়ে গৃহীত এই দলের সর্বক্ষণের কর্মী গার্গী দত্তর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, জানুয়ারি ২০১৬;

৮. তদেব

৯. 'রাধানগর দর্পণ'-এর কার্যালয়ে গৃহীত এই দলের সভাপতি অসীম দত্তর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, জানুয়ারি ২০১৬;

১০. বহরমপুর 'ঋত্বিক' নাট্যগোষ্ঠীর কর্মী শিপ্রা সেনের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, জানুয়ারি ২০১৬;

১১. 'ইচ্ছাপুর আলেয়া' নাট্যগোষ্ঠীর কর্মী সঙ্গীতা চৌধুরীর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, মার্চ ২০১৬;

১২. তদেব

১৩. শম্পা বিশ্বাস, 'বাংলা থিয়েটারে নন্দিনীরা', শেখর সমাদ্দার (সম্পা.), সময় নাট্যভাষ, নারীবিশ্ব ও থিয়েটার বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ, ২০১৫, পৃ. ২৫২;

১৪. 'শান্তিপুর সাংস্কৃতিক'র কর্মী অভিনেত্রী রাত্রি চট্টোপাধ্যায়ের গবেষককে প্রেরিত জীবনপঞ্জি; ১২.০৭.২০১৬

১৫. কাঁচড়াপাড়া 'ফিনিক্স' নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক কাবেরী মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, জীবনপঞ্জি; ১২.০৭.২০১৬

১৬. 'শান্তিপুর রঙ্গপীঠ'র নীলিমা বিশ্বাসের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, গ্রাহক গবেষক, জীবনপঞ্জি, ১৬.০৭.২০১৬

## নবম অধ্যায়

# বাংলা ও সর্বভারতীয় মহিলা নির্দেশকদের পারস্পরিক প্রভাব ও ভাবনার বিনিময়

দীর্ঘদিন ধরেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নাট্যনির্মাণ ও নির্দেশনায় অভিনেত্রীদের সক্রিয়তা লক্ষণীয়। বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে আছেন অসংখ্য নারী নির্দেশক এবং তাঁদের পরিসংখ্যানও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। বাংলা নাট্যে অভিনেত্রী, নির্মাণকর্ত্রী ও মহিলা নির্দেশকদের যে ধারাটি তৈরি হল তারই সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে মহিলা নাট্যনির্দেশকদের কর্মপ্রবাহ। সময়ান্তরে দুই ধারার সংযোগ ঘটেছে, ভাবনা ও মানসিকতার বিনিময় হয়েছে, নাট্যপ্রযোজনার মাধ্যমে পারস্পরিক আদান-প্রদানের পথও প্রশস্ত হয়েছে। মূলত জাতীয় নাট্যোৎসবগুলিকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় ও বাংলার মহিলা নির্দেশকরা কাছাকাছি এসেছেন, তাঁদের মধ্যে তৈরি হয়েছে পারস্পরিক সম্পর্কের সেতু। ফলত মূল নাট্যভাবনার স্রোত আরও বেগবান হয়েছে সন্দেহ নেই। এ কারণেই গবেষণাপত্রের একেবারে অন্তিম অধ্যায়ে এসে এই আলোচনা জরুরি হয়ে পড়ে।

‘ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা’ (National School of Drama)-র পূর্বতন অধিকর্তা নাট্যনির্দেশক কীর্তি জৈন কলকাতার সংবাদপত্রে একটি সাক্ষাৎকারে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন এইভাবে— ‘The rise of women directors has been a recent phenomenon. Just as women are coming up in different spheres, in theatre too they have been involved in a process of self-exploration.’[১] প্রায় দু’ দশক আগে কীর্তি জৈন যে বিষয়টি ‘recent phenomenon’ বলে উল্লেখ করেছিলেন তার ব্যাপক প্রসারণ ঘটে গেল সারা ভারত জুড়ে। আধুনিক মনস্কতায়, প্রযুক্তির কৌশলে, মেধা ও মননের সংমিশ্রণে নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নিরন্তর নাট্যের চর্চা করে চলেছেন। বিচিত্র ধরনের প্রযোজনার মাধ্যমে ভারতের মহিলা নাট্যনির্দেশকরা বিপ্লব ঘটালেন। দিল্লিতে এবং কলকাতায় শুধুমাত্র নারী নির্দেশকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত নাট্যোৎসবগুলির মধ্য দিয়ে যেমন প্রযোজনার মাধ্যমে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তেমনই সারা ভারতবর্ষে কী ধরনের কাজ হচ্ছে তার প্রমাণ পান নাট্যদর্শকরা। শুধু মহিলা নির্দেশকদের নাট্যোৎসব নয়, প্রত্যেক বছর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত জাতীয় আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবগুলিও তাঁদের মধ্যে মেলবন্ধনের একটা সেতু তৈরি করে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাঁরা কাজ করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিজয়া মেহতা, অমল আলানা, কীর্তি জৈন, বি. জয়শ্রী, নাদিরা জাহির বব্বর, নীলম মানসিং চৌধুরী, অনামিকা হাকসর, অনুরাধা কাপূর, ত্রিপুরারি শর্মা, আর নাগরথনাম্মা, মল্লিকা সারাভাই, সীমা বিশ্বাস, ভাগীরথী ইসলাম, পাকিজা বেগম, মায়াকৃষ্ণ রাও, মলশ্রী হাসমি প্রমুখ নারীনির্দেশক। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে গড়ে তুলেছেন নাট্যচর্চা কেন্দ্র বা নাট্যপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বাংলার বাইরের এমনই কয়েকজন নির্বাচিত নারী নির্দেশকের নাট্যক্ষেত্রে অবস্থান ও তাঁদের অবদান ও বাংলার নাট্যভাবনায় তাঁদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে এবং লক্ষ্য থাকবে তাঁদের সঙ্গে বাংলার মঞ্চের নারীনির্দেশকদের যোগাযোগ কোথায়।

বাংলা থিয়েটারের মতো মহারাষ্ট্রের থিয়েটারের ঐতিহ্যও দীর্ঘদিনের। দুই প্রদেশের থিয়েটারের মধ্যেও বিশেষ যোগাযোগ লক্ষণীয়। মারাঠি থিয়েটারে দু'জন 'বিজয়'-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। একজন— নাট্যকার বিজয় তেণ্ডুলকর, আরেকজন **বিজয়া মেহতা**, অভিনেত্রী ও নির্দেশক। বিজয়া মেহতা প্রায় তৃপ্তি মিত্রের সমসাময়িক। শুধু নাটক নয় ফিল্মের অভিনেত্রী হিসাবেও তাঁর প্রতিষ্ঠা। হিন্দি চলচ্চিত্রের দুই বিখ্যাত অভিনেত্রী তনুজা ও নূতনের মা বিজয়া মেহতা প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করেন নাট্যঅভিনেতা ফারুক মেহতাকে। নাটকের শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন ইব্রাহিম আলকাজি পরিচালিত মুম্বই-এর 'The School of Dramatic Arts'-এ। আর নিজের থিয়েটার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৬০-এ। এর আগেই ১৯৫৫ সালের ১২ ডিসেম্বর ওঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয় 'শ্রীমন্ত'। এটিই তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটকের পরিচালনা। বলা যেতেই পারে তৃপ্তি মিত্রের আগেই মহিলা নির্দেশক হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। একজন নারী হিসাবে প্রথম থেকেই তিনি চেয়েছেন অভিনব কিছু করে দেখাতে। তিনি experimental থিয়েটারে কাজ শুরু করেন 'রঙ্গালয়' স্থাপন করার পর থেকে। খুব অল্প বয়সেই ' রঙ্গালয়' থিয়েটার ল্যাবটি গড়ে তোলেন যেখানে একটি প্রযোজনা ছ' বারের বেশি অভিনীত হত না। কেননা এই থিয়েটারের লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যিক সাফল্য নয়, কোনও কিছুর আবিষ্কার করা। 'রঙ্গালয়'-এ অভিনয় করার জন্য তিনি নিজে বিশিষ্ট মারাঠি অভিনেতা শ্রীরাম লাগুকে আমন্ত্রণ জানান। অত্যন্ত শক্তিশালী ও নিজের কাজ সম্পর্কে কঠোর মনোভাবাপন্ন নির্দেশক বিজয়া মেহতা সম্পর্কে শ্রীরাম লাগুর অভিজ্ঞতাও ছিল অত্যন্ত সম্মানজনক। অমল আলানার নেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে শ্রীরাম লাগু এ কথা জানিয়েছিলেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা ছিল। 'She thought I was a fine actor, she approached me, saying, "I know it's very difficult. We are

in Bombay. You are in Pune. But if we can solve that problem, would you be interested in acting with us?" And I agreed because she was doing an excellent job and I was quite flattered that she had asked me.'[২] পুণাতে তখন তিনি ডাক্তারি করছেন। কিন্তু এতটাই আগ্রহী ছিলেন বিজয়া মেহতার সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে যে তিনি লিখছেন 'I went to Bombay every weekend, spent Saturday and Sunday with Vijayabai's theatre group, and travelled back to my dispensary on Monday morning.'[৩] বিজয়া মেহতার থিয়েটার সম্পর্কিত ভাবনা ছিল সুদূর প্রসারী। তাঁর ভাবনায় জারিত হয়েছেন জব্বর প্যাটেলের মতো নাট্যঅভিনেতা, নির্দেশক; আবার মহেশ এলকুঞ্চয়ারের মতো নবীন নাট্যকারদের আবিষ্কার করেছেন তাঁর প্রযোজনার মধ্য দিয়ে।

বাংলা নাট্যে বিজয়া মেহতা পরিচালিত ও মারাঠি নাট্যকার এলকুঞ্চয়ার রচিত 'ওয়াড়া চিরেবন্দি' নাটকটির বিশেষ প্রভাব রয়ে গেছে। 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীর আয়োজনে জাতীয় নাট্যোৎসবে যখন এই নাটকটি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল (গবেষকও প্রত্যক্ষ করেছিল এই প্রযোজনা) তখন দর্শকের কাছে ভিন্ন ধরনের একটা আবেদন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মহেশ এলকুঞ্চয়ার বাঙালি দর্শকের কাছে আদৃত হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ বিজয়া মেহতার প্রযোজনাটির কাঠামো মোটামুটি অপরিবর্তনীয় রেখে সোহাগ সেন উপস্থাপিত করেছিলেন এরই বাংলা রূপান্তর 'উত্তরাধিকার'। সোহাগ সেন পরিচালিত 'উত্তরাধিকার' নাটকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে সোহাগ সেন প্রসঙ্গে। বিজয়া মেহতার প্রযোজনায় এবং নাট্যকার হিসাবে মহেশ এলকুঞ্চয়ারের আবিষ্কারে উপকৃত হয়েছিলেন বাংলা নাট্যের দুই পরিচালক — সোহাগ সেন ও জয়তী বসু। সোহাগ সেন পরিচালনা করেছিলেন 'পার্টি', এবং জয়তী বসুর নাট্য নির্দেশনা শুরুই হয়েছিল মহেশ এলকুঞ্চয়ার রচিত 'প্রতিবিম্ব' নাটকের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে এঁরা দু' জনেই সোহাগ সেনের উত্তরাধিকার' নাটকের প্রযোজনায় অভিনয় করেছিলেন মেয়ের চরিত্রে। জয়তী ঘোষের পরে পরিচালক নিজেই এই চরিত্রে অভিনয় করেন।

মহিলা নির্দেশক সম্পর্কে একটা প্রশ্ন থাকেই যে, যখন তিনি নির্দেশনা দেন তখন কি নারীসত্তা প্রাধান্য পায়? বিজয়া মেহতার ক্ষেত্রে বলা যায় যে 'But she doesn't forget, and doesn't let you forget, that she is a woman director.'[৪] মূলত দশক থেকে দশকান্তরে নারীনির্দেশকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে গেছে। ভারতের যে সমস্ত নারী নির্দেশক হিসাবে কাজ শুরু করেছেন পঞ্চাশের দশকে সেখানে নিজেদের তাঁরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন পুরুষ নির্দেশকদের পাশাপাশি তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের নারী নির্দেশক যাঁরা কাজ করতে এলেন সত্তর-আশির দশকে,

তাঁরা কিন্তু প্রকাশ করবার চেষ্টা করলেন তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, নিজস্ব ভাবনাকে থিয়েটারের মধ্য দিয়ে। আর নব্বইয়ের দশক থেকে বহু নারী নির্দেশকের মধ্যে থিয়েটারের সার্বিক ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আনার প্রবণতা লক্ষ করা গেল।

হিন্দি থিয়েটারের নারী নির্দেশকদের মধ্যে সর্বাগ্রে উঠে আসে **অমল আলানা** ও কীর্তি জৈন-এর নাম। ইব্রাহিম আলকাজির কন্যা অমল আলানা (১৯৪৭)র সঙ্গে থিয়েটারের সম্পৃক্তি একেবারেই ছোটবেলা থেকে। থিয়েটার করার জন্য আলাদা করে কোনও লড়াই তাঁকে করতে হয়নি। কিন্তু নিরন্তর তিনি লড়াই চালিয়ে গেছেন তাঁর প্রযোজনাগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দেবার জন্য। ভাবনা-চিন্তার সাংঘাতিক একটা অনুশীলন পর্যায় তাঁকে নতুন নতুন কাজে প্রেরণা যুগিয়েছে। ১৯৬৮ সালে এন এস ডি থেকে নির্দেশনা নিয়ে পাশ করে ভারত ও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের থিয়েটার ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন এবং সেই বিচিত্রমুখী সংস্কৃতিকে নিজের নাট্যনির্মাণে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জার্মানির 'Ensemble', National Theatre Weimar' এবং জাপানের 'Noh' ও 'Kabuki' থিয়েটারের শিক্ষা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন ধারার সংস্কৃতি ও নাট্যচর্চাকে তিনি তাঁর কাজে সমন্বিত করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। প্রথম দিকে তাঁর প্রযোজনাগুলি প্রথাগত পথে চললেও যত দিন গেছে তিনি অনেক বেশি নিরীক্ষামূলক ভাবনার মোকাবিলা করেছেন— 'She seems less worried about consistency allowing actors to even explore different styles within the same production. As a result, her work has become much more exploratory and exciting than it used to be.'[৫] কীর্তি জৈন তাঁর সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার পরিণতিতে দর্শক অমল আলানার প্রযোজনাগুলিতে ক্রমশ লক্ষ করেছে অভিনবত্বের প্রকাশ। 'কিং লিয়র' প্রযোজনায় তিনি স্পেসকে ব্যবহার করেছেন সাব টেক্সট (subtext)-এর মতো। আবার যখন তিনি 'হিম্মত মাঈ' করছেন তখন মাদার কুরাজের ভূমিকায় নির্বাহন করেছেন পুরুষ অভিনেতা মনোহর সিং-কে। অমল আলানার নির্দেশনার মূল দুটি স্তম্ভ হল স্বামী নিসার আলানার মঞ্চ ও পোশাক পরিকল্পনার অত্যাধুনিক ভাবনা এবং মনোহর সিং-এর মতো অভিনেতার প্রতিভা। নারী চরিত্রে পুরুষ অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল এই নয় যে দেখানো নারী চরিত্রটি কতটা বলিষ্ঠ ও পুরুষালি বরং নির্দেশক দেখাতে চেয়েছেন নারী চরিত্র রূপদান করতে হলে একজন অভিনেতাকে কতটা নারীসত্তার গভীরে পৌঁছতে হয় অনুভবের দিক থেকে। অমল আলানার নির্দেশনায় এই পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছে বহুক্ষেত্রেই। তাঁর প্রযোজনাগুলি ছিল সৃজনশীল ভাবনা, অসাধারণ দক্ষ অভিনয় এবং নির্দেশনার

অভিনবত্বের সংযোগ। প্রায় ষাটটির বেশি প্রযোজনা তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়েছে। যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালের সময়ের প্রতিফলন। নির্দেশিত নাটকগুলির মধ্যে আছে 'আধে আধুরে' (১৯৭৬), 'মহাভোজ' (১৯৮২), 'রাজা যশোবন্ত সিং' (কিং লিয়ার প্রাণিত), ব্রেখট অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে 'ম্যান ইকুয়ালস ম্যান' (Exception and the Rule), 'থ্রি পেনি অপেরা', 'দ্য গুড পার্সন অব সেটজুয়ান' (১৯৭২), 'হিম্মত মাঈ' (১৯৯৩) ইত্যাদি। নারীকে কেন্দ্রে রেখে নির্মাণ করেছেন 'চার চৌঘি' (Four Ordinary Women, ১৯৯৯), নারীর একাকিত্ব নিয়ে 'দেবযানী কা কহনে হ্যায়,' 'বদলে টিব্বে' (১৯৭৭), 'হয়বদন' (১৯৭৩), 'খামোস আদালত জারি' (১৯৭৮), 'আষাঢ় কা এক দিন' (১৯৮১), 'বিজিস কোয়াদার কা কুম্বা' (The House of Barnada Alba অবলম্বনে ১৯৮০) ইত্যাদি। বাংলার দর্শকের মনে পড়ে যাবে সত্তরের দশকে 'নান্দীকার' এর প্রযোজনায় কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয়ে ব্রেখট অবলম্বনে 'মঞ্চস্থ' হয়, 'তিন পয়সার পালা'। অবশ্যই লক্ষণীয় যে ঊষা গাঙ্গুলি পশ্চিমবঙ্গে বসে হিন্দী ভাষায় নির্মাণ করেছেন তেমনই সাহসের সঙ্গে 'মহাভোজ', 'হিম্মতমাঈ'। শাশ্বতী বিশ্বাসের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়েছে 'বার্নাডা আলবার বাড়ি'। দীর্ঘদিন পর একেবারে সাম্প্রতিক কালে ঈশিতা মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলি মানসিক অবস্থান বদলে রূপায়িত করেছেন 'খেলা ভাঙার খেলা' (২০১৩) নাটকে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নারীচরিত্রে পুরুষ অভিনেতা ও পুরুষ চরিত্রে কোনও অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন। নারী পুরুষের লিঙ্গ বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক সত্তার প্রকাশকে জয়ী করতে চেয়েছেন ঈশিতা।

শুধু নির্দেশনার ক্ষেত্রে নয়, সাংগঠনিক জায়গাটা অত্যন্ত শক্তিশালী অমল আলানার। আট বছর তিনি এন এস ডি-র চেয়ার পার্সন হিসেবে কাজ করার সময় একই সঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছেন সংস্কৃতিচর্চা ও সাংগঠনিক শক্তির ওপর। মুম্বই ও দিল্লিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন থিয়েটার কোম্পানি 'The workshop এবং 'Studio 1'; প্রতিষ্ঠা করেছেন 'Theatre and Television Associates' (TTA) এবং নাট্যপ্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য 'The Dramatic Art and Design Academy', সংক্ষেপে DADA। থিয়েটার চর্চাকে তিনি প্রসারিত করে দিয়েছেন নাট্যনির্দেশনা ছাড়াও প্রদর্শনী, কর্মশালা, আলোচনাচক্র, বক্তৃতামালার মাধ্যমে। নির্দেশক হিসাবে তিনি লাভ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান। ১৯৯৮ সালে পান সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার। সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের নাট্যব্যক্তিত্ব অমল আলানার কর্মসংস্কৃতি এবং নাট্যসংস্কৃতি বাংলার নারী নির্দেশক ও সংগঠকদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ তাঁর সমকালে ও আগামী দিনেও।

দিল্লির আরও দুজন প্রভাবশালী নির্দেশক— **কীর্তি জৈন ও অনুরাধা কাপুর** - যাঁরা দুজনেই এন এস ডি প্রাক্তন এবং ভবিষ্যতে এন এস ডি-র অধিকর্তা হিসাবে কাজ করেছেন। দিল্লি ইউনিভারসিটির অধীনস্থ কলেজগুলিতে যখন ড্রামা ক্লাবগুলি তৈরি হচ্ছে তখন এক ঝাঁক তরুণ অভিনেতা উঠে এলেন। এদের মধ্যে ছিলেন মনোহর সিং, নাসিরুদ্দিন শাহ, কুলভূষণ খারবান্দা, দীনেশ ঠাকুর, ওমপুরী, পঙ্কজ কাপূর, সীমা বিশ্বাস প্রমুখ। তেমনই ভারতীয় থিয়েটারে আবির্ভাব ঘটল তরুণ নির্দেশকদেরও। এঁদের মধ্যে রয়েছেন— বি. ভি. করন্থ, রজিত কাপুর, অনুরাধা কাপুর, ত্রিপুরারি শর্মা, কীর্তি জৈন প্রমুখ। একটা ধারাবাহিক প্রবাহ চলল দিল্লির থিয়েটারে। আই পি টি এ র সূত্রে শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রর বন্ধুস্থানীয় নেমিচাঁদ জৈন ও রেখা জৈন-এর কন্যা কীর্তি জৈন (১৯৪৯), শাঁওলী মিত্রের (১৯৪৮) সমসাময়িক এবং তাঁদের মধ্যেও একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বর্তমান। কীর্তি জৈন, এন এস ডি -র প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা, শিক্ষক এবং নাট্যপরিচালক। তিনি মনে করেন নাট্যনির্দেশক যখন একজন নারী তখন পুরুষের অধিকার বোধ কিছুটা হলেও বাধাপ্রাপ্ত হয়। শুধু পুরুষ নয়, যে কোনও নির্দেশকেরই পুরো নেতৃত্বটাই কাম্য।

‘The authority lies on one person (the director) taking total control, not only of all aspects of production but also of what each actor has to do, how and when he has to move, when and how he is to render the text, etc. The director, according to this approach, is the master puppeteer who controls all the strings[৬]. -একজন নির্দেশক হিসাবে এই অধিকারবোধকে জাগ্রত রাখতে চাইবে। এইখানেই নারীনির্দেশক হলে পুরুষতন্ত্রের কোথাও যেন অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু সবাইকে এই নিয়ম মেনেই চলতে হয়।— আপাত দৃষ্টিতে কীর্তি জৈন-এর মধ্যেও এই দৃঢ়তা লক্ষণীয়। তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলি হল মহেশ এলকুঞ্চয়ার রচিত ‘হোলি’ (১৯৯১), মোহন রাকেশের ‘লহরোঁ কা রাজহংস’ (১৯৯৪), একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আশাপূর্ণা দেবী রচিত বিখ্যাত বাংলা উপন্যাসের নাট্যরূপায়ণ ‘সুবর্ণলতা’ (১৯৯৯), ঊর্বশী বুটালিয়ার ‘The Other Side of Silence’ অবলম্বনে ‘ঔর কিতনে টুকদে’ (২০০০) ইত্যাদি। কীর্তি জৈন-এর সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির এক বিশেষ যোগাযোগ আছে। বহু আলোচনাসভায় তাঁকে আসতে হয় বক্তৃতার জন্য, পদাধিকারের জন্য, আবার কখনও বা বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের কারণেই।

কীর্তি জৈন এবং অনুরাধা কাপূর (১৯৫১) শুধু এন এস ডি-র অধিকর্তা রূপে নয়, সমগ্র দিল্লির থিয়েটারে তাঁরা তাঁদের কর্মভাবনা, সৃজনশীল চিন্তাকে প্রতিফলিত করেছেন বার বার। শুধু থিয়েটার

নয়—সঙ্গীতকার, চিত্রকর, লেখকদের নিয়ে গঠন করেছেন ‘বিবাদি’ (Vivadi). এন এস ডি-তে ২০০৭-২০১৩ সময়কালের অধিকর্তা অনুরাধা কাপুর গবেষণা করেছেন ‘University of Leeds (U.K.)’ থেকে। থিয়েটার নিয়ে তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ্য ‘Actors’, ‘Pilgrims’, ‘Kings and Gods: The Ramlila at Ramnagar’। নির্দেশক অনুরাধা কাপুর কখনওই গতানুগতিক পথে হাঁটেননি— তাঁর প্রযোজনাগুলি সব সময়ই নতুন নতুন ভাবনার প্রকাশক। ১৯৯৭ সালে তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হওয়া ব্রেখট্ এর ‘জব’ (Job) সাড়া জাগিয়েছিল। একই নাটক নির্দেশনা দিয়েছিলেন মায়াকৃষ্ণা রাও। কিন্তু দু’জনের নির্মাণপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণই আলাদা। আবার যখন ছ’বছর পর আরও পরিণত মানসিকতায় করলেন ‘আন্তিগোনে প্রজেক্ট’ (২০০৩) তখন তাঁর ব্রেখটীয় ভাবনায় গ্রিক ট্রাজেডি রূপান্তরিত হয় গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত সময়ে ফ্যাসিবাদের প্রতিবাদে। তাঁর অসম্ভব চিন্তাশীল নির্দেশনার প্রকাশ ঘটল ‘উমরাও’ (১৯৯৪) এবং ‘সুন্দরী অ্যান অ্যাকটর প্রিপেয়ারস্’ (১৯৯৮) প্রযোজনায়। জয়শঙ্কর সুন্দরীর আত্মজীবনীকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নাটকটিতে খুব বড় করে একজন বাঈজির বিলাসবহুল জীবনকাহিনি বর্ণিত হয়নি বা আন্তরযন্ত্রণার দগ্ধতাকে প্রকাশ করা হয়নি। এক নারী নির্দেশক হিসাবে অনুরাধা কাপূর বিশ্লেষণ করেছেন এই পুরুষশাসিত পৃথিবীতে নারীর অবস্থান কোথায়? তাঁর এই প্রতিবাদ ও বিশ্লেষণ আরও তীব্র হয়ে উঠল যখন তিনি সুন্দরীর চরিত্রে নির্বাচন করলেন এক অভিনেতাকে। নারীর শরীরে মিলে যাচ্ছে পুরুষের সত্তা, অস্তিত্ব, সাইকি (Psyche) । বিষয়টিকে আরও গভীরতর করে তুললেন যখন তিনজন কুশীলবকে দিয়ে সুন্দরীর ভূমিকার অভিনয় করালেন এবং পিছনের পর্দায় (back drop) তখন ভূপেন খাখর এবং বিদ্যা রাও -এর আঁকা ছবিগুলো প্রতিফলিত হতে থাকে। যে পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি তাঁরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন, বাংলার থিয়েটারের নারী নির্দেশকরাও তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তিকে নিরন্তর কাজে লাগিয়ে চলেছেন এই সময়কালেই। শুধু নাট্যপরিচালনা নয়, থিয়েটার সম্পর্কিত নানাবিধ ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর লেখা ‘Actors’, ‘Pilgrims’, ‘Kings and Gods : The Ramlila at Ramnagar’ ইত্যাদি গ্রন্থে।

নাট্য নির্মাণের এক রূপকার **তিজন বাঈ** (১৯৫৪)। ছত্তিশগড়ের নাট্যপ্রযোজক নাট্যনির্দেশক হাবিব তনভীরের পাশাপাশি সারা পৃথিবীর মানুষ চিনে নিয়েছেন সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত অথচ অসাধারণ এক লোকশিল্পীকে। সাধারণত উন্মুক্ত কোনও স্থানে এককভাবে মহাভারতের কাহিনি বলতে থাকেন এই পাণ্ডবানির শিল্পীরা। সমস্ত চরিত্রে একাই অভিনয় করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে পরিবেশন করেন গান, নাচ এবং যাঁরা বাদ্যযন্ত্র বাজান তাঁরাও গলা মেলান মূল শিল্পীর সঙ্গে, কোনও বাধাধরা

নিয়মে নয়, ইচ্ছে মতো যখন যেভাবে প্রয়োজন। বর্তমানে বহু অভিনেত্রী ছত্তিশগড়ের এই লোকজ ফর্মটিকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু মেয়েদের মধ্যে কাজটা প্রথম শুরু করেছিলেন তিজন বাঈ। এক নারীর কথনে একক স্বাধীন প্রকাশভঙ্গিমায় তাঁর স্বাধীন সত্তারও বিকাশ ঘটে। তিজন বাঈ-এর কোনও প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। ঠাকুর্দা ব্রিজলাল পান্ধীর পাণ্ডবানি ছোটবেলা থেকে শুনতে শুনতে তিনি গ্রহণ করেছেন এই পরম্পরাকে। তিজন বাঈ-এর কাপালিক পাণ্ডবানি আরও বেশি নাটকীয় উপাদানে ভরা। যেমন নাচ গান অভিনয় সব কিছুই উপস্থাপক পরিবেশন করেন। সেখানে কোনও পোশাক, আলো, পর্দা কিছুরই প্রয়োজন হয় না। আহার্য বা প্রপ্‌স বলতে একটি লাঠি শুধু ব্যবহৃত হয় যার মাথাটি ময়ূরের পুচ্ছ দিয়ে তৈরি। এই দণ্ডটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডবানি উপস্থাপনার সময় কারণ এটিই কখনও অর্জুনের তীর, কখনও ভীমের গদা কখনও বা কৃষ্ণের বাঁশি বা আরও কিছু হয়ে ওঠে। তিজন বাঈ নিজেকে আরও বেশি করে প্রকাশ করেন যখন তিনি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে একই সঙ্গে অনেকগুলো অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। দ্রৌপদীর অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি কখনও ভীমের ক্রোধ, দুর্যোধনের দুনীর্তিপরায়ণতা, বিদুরের দ্বিধাভিন্নতা বা যুধিষ্ঠিরের অপরাধবোধ ইত্যাদি বিবিধ বিচিত্র ব্যঞ্জনাকে অভিব্যক্ত করতে থাকেন। একজন শিল্পী এতগুলো রসকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন ভাবলে বিস্ময় জাগে বইকী!

তিজন বাঈ এর পরিবেশনা বার বার বাংলার দর্শককে মুগ্ধ করেছে। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। পাণ্ডবানির আরেক রূপ যা লোকজ সংস্কৃতিকে নির্ভর করেও প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মাধ্যমে পরিশীলিত আধুনিক ভঙ্গিতে মঞ্চস্থ করেছেন শাঁওলী মিত্র। ১৯৮৩ সালে কথকতার এই ফর্মটি ব্যবহার করে তাঁর উপস্থাপনা 'নাথবতী অনাথবৎ' চমকে দিয়েছিল বাংলা তথা ভারতীয় দর্শককে। আরও কয়েক বছর পর তিনি একই ফর্ম ব্যবহার করে নির্মাণ করেন 'কথা অমৃতসমান'। মহাভারতের কাহিনিকে ব্যক্ত করেন শাঁওলী মিত্র, তাঁর সঙ্গে থাকে জুড়ির দল। তিনি বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিতে দিতে এগিয়ে নিয়ে চলেন তাঁর কথকতাকে। তিজন বাঈ তাঁর ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছেন বা আদৌ করেছেন কি না এ বিষয়ে মতদ্বৈধতা থাকলেও দুই প্রান্তের দুই শিল্পীর নিজেদের প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এক গভীর যোগসূত্র থেকে যায়। তিজন বাঈ -এর সরাসরি শিষ্যা কসবা 'অর্ঘ্য'-র সীমা ঘোষের উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে তাঁকে 'ছোটা তিজন' আখ্যা দিতে দ্বিধা করে না বাংলার দর্শক। বাংলা অভিনেত্রীদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ক্রমশ বিস্তারিত হয়েছে এবং বাংলার দর্শকের হৃদয়কে তিনি জয় করেছেন বহু আগেই।

কন্নড় থিয়েটারের এক অভিমুখ **বি. জয়শ্রী** (১৯৫০) তাঁর বিভিন্ন প্রযোজনা দিয়ে কলকাতা তথা বাংলার দর্শককে মুগ্ধ করেছেন বহুবার। তাঁর নির্দেশিত নাটক দেখার অভিজ্ঞতা গবেষকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। পিতামহ গুব্বি ভিরান্না ছিলেন কন্নড় থিয়েটারের প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব। পুরো পরিবার ছিল নাট্যের সঙ্গে যুক্ত। পিতামহের থিয়েটার কোম্পানির সঙ্গে একেবারে চার বছর বয়স থেকে বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করেছেন শিশুশিল্পী হিসাবে বি. জয়শ্রী। জন্ম থেকেই থিয়েটারের স্রোত তাঁর রক্তে প্রবাহিত। বাণিজ্যিক থিয়েটার ও অপেশাদার ধারার মধ্যে সংযোগ সাধন করেছিলেন বি.জয়শ্রী। যে নাট্যশিক্ষা তিনি পরিবার থেকে পেয়েছিলেন তা আরও পরিশীলিত হয়ে উঠল এন এস ডি-র প্রশিক্ষণে। '...at NSD, her exposure to the new influences and new techniques taught her how to polish the rough edges of melodrama, how to exploit the infinite range of the human body, and how to handle space and time.'[৭] এই শিক্ষা তিনি প্রয়োগ করলেন তাঁর নির্দেশনায় অভিনয়ে। প্রথম নির্দেশিত নাটক রঙ্গসম্পদ-এর প্রযোজনা 'ঘাসিরাম কোতয়াল'। কিন্তু যে প্রযোজনাটি তাঁকে বিশেষ পরিচিতি এনে দিল সেটি হল 'লক্ষপতি রাজন কথে' (১৯৮৬)। তখন তিনি 'Young Director Scheme'-এ এই কাজটি করেছিলেন এবং এই প্রযোজনাটির জন্য তাঁকে একবছর ধরে পরিশ্রম করতে হয়েছে। কারণ এ নাটকে ব্যবহৃত হয় যোগেরাতা— একটি লোকজ বর্ণনাত্মক রীতি। বেল্লারি জেলার কিন্নারা যোগীরা এই ফর্মটি ব্যবহার করেন এবং খোলা জায়গায় এর অভিনয় হয়। কিন্তু বি.জয়শ্রী সেই লোকজ ফর্মকে নিয়ে এলেন প্রসেনিয়াম থিয়েটারে। একেবারে শুরুর সময় থেকেই তিনি নিরীক্ষামূলক প্রযোজনা সম্পর্কে সচেতন। কলকাতার মঞ্চে এই নাটক প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা গবেষকের আছে। তাঁর বিশিষ্ট প্রযোজনা মহাভারতের পাঁচজন নারী অম্বা, গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে 'আত্মকথা'। শাঁওলী মিত্রের 'কথা অমৃতসমান' নাটকেও উঠে এসেছিল মহাভারতের নারীদের কথাই, তাদের বঞ্চনার আর যন্ত্রণার ছবি। কন্নড় থিয়েটার আর বাংলার থিয়েটারের দুই পরিচালকের নারীসত্তায় কোথায় যেন ছায়াপাত করেছিল মহাভারতের সেই নারীরা, যাঁরা সমাজবঞ্চিত।

বাংলা থিয়েটারের আরেক মহিলা পরিচালক জয়তী বসুকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেন মায়াকৃষ্ণ রাও (১৯৫৩)-এর প্রযোজনাগুলি। মূলত তাঁর প্রযোজনার ধরনটাই ছিল একেবারে আলাদা। জীবনের পথেও তিনি নানান বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। জন্ম নিউ ইয়র্কে। পাঁচ বছর বয়স থেকে ভারতে বসবাস, আট বছর বয়স থেকে শুরু করেন কথাকলি নৃত্যশিক্ষা, ১৯৭৭-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ., আবারও Leeds University (U.K) থেকে থিয়েটার ও আর্ট নিয়ে এম.এ., ২০১২ সালে

Drama-in-Education নিয়ে ডিপ্লোমা লাভ। শুরু করেছিলেন প্রসেনিয়াম থিয়েটার দিয়ে, তারপর পথনাটক। কিন্তু তিনি নিরন্তর খুঁজে চলছিলেন থিয়েটারের অন্য এক ভাষা। I had Kathakali, I had some street theatre, I had Badal Sircar, I don't know, I had all sorts of mixed things in my body. But they come together.'[৮] যা তিনি সাদাত হোসেন মান্টোর লেখা 'খোল দো' (১৯৯৩) প্রযোজনার পর খুঁজে পেলেন। সেখানে নাচ আর গানকে মিলিয়ে দিলেন। তাঁর পরবর্তী প্রযোজনাগুলি যা তিনি 'বিস্ময়' (Vismayah) নাট্যদল প্রতিষ্ঠার পর একে একে মঞ্চস্থ করলেন। আধুনিক প্রযুক্তি, ভিডিও-র ব্যবহার, জীবন্ত সংগীত— মিলেমিশে গেল প্রযোজনায়। ইংরেজি ভাষায় তিনি একা উপস্থাপিত করলেন— 'A deep Fried Jam' (২০০২)। এর পর নির্মাণ করেছেন 'Are you home 'Lady Macbeth?', 'Lady Macbeth Revisited' ইত্যাদি নাটক। ভারতীয় থিয়েটারে মায়াকৃষ্ণ রাও এক নতুন থিয়েটার-ভাবনার জন্ম দিলেন আর সেই আধুনিক চিন্তার ঢেউ স্পর্শ করল বাংলার এক নারী নির্দেশককে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে নারী নির্দেশকরা কাজ করে চলেছেন, তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে তাঁদের নিজস্ব উদ্ভাবনা, নিরীক্ষা, প্রতিভার প্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনই এক-একটি প্রদেশকে কেন্দ্র করে তাঁদের নাট্যচর্চার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। পঞ্জাবের থিয়েটারে **নীলম মানসিং চৌধুরী** (১৯৫১) তেমনই একটি নাম। নীলম হচ্ছেন মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিভূ। পঞ্জাবের পুরোহিত পরিবারে জন্ম, কনভেন্ট শিক্ষায় শিক্ষিত, এন এস ডি-র নাট্যশিক্ষা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশ করা, মুম্বইতে পেশাদারি থিয়েটারের সঙ্গে পরিচয়, আবার চণ্ডীগড়ের থিয়েটারের সঙ্গে সম্পৃক্তি— সব কিছু মিলিয়ে তিনি একই সঙ্গে স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক। যে সময় বাংলার মঞ্চে শাঁওলি মিত্র, সোহাগ সেনরা কাজ করছেন, সমকালে চণ্ডীগড়ে নীলম মানসিং উপস্থাপিত করছেন তাঁর প্রথম প্রযোজনা 'সাঁওন ভায়ে কোটয়াল' (১৯৮৪)। পরপর কাজ করলেন আশির দশকে কখনও শিবপূজারী ও ধাদিস (এক নির্দিষ্ট গোত্রের সঙ্গীতকার)-দের নিয়ে নির্মাণ করলেন 'হীর রনঝা' (১৯৮৬), কখনও কমল কাপুরের 'Chytemnestra'-র অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে 'হেত ভাগে দরওয়া' (১৯৮৭)। গিরিশ কারনাডের 'নাগমণ্ডলা' (১৯৮৯) প্রযোজনায় মিলিয়ে দেওয়া হল কথা ও অঙ্গচালনা। সর্বত্রই অভিনবত্বের খোঁজ দিলেন। 'নাগমণ্ডলা' বাংলার মঞ্চে অভিনীত হয়েছে কিন্তু প্রথম কোনও নারী যিনি বাংলার মঞ্চে এ নাটকের নির্দেশনা দিলেন তিনি অবন্তী চক্রবর্তী। পরিচালক হিসাবে নীলম মানসিং মূল টেক্সটটি খুবই সম্মান করেন কিন্তু ক্রমশ মুদ্রিত টেক্সটটি পরিণত হয়

পারফরমেন্স টেক্সট-এ। তিনি যে নাট্যক্রিয়াগুলি তৈরি করেন তা হয়ে ওঠে দৃশ্যমান মুহূর্ত— কবিতার মতো। ১৯৯১ সালে তাঁর পরিচালনায় 'ইয়ারমা' এমনই একটি প্রযোজনা। নির্মাণ করলেন 'সেহের মেরে দি পাগল ঔরত' (১৯৯৪), 'ফিদা' (১৯৯৬), 'কিচেন কথা' (১৯৯৮)। তাঁর পরিচালিত নাটকগুলির মধ্য থেকে দুটো জিনিস বেরিয়ে আসে (১) তিনি পঞ্জাবী (২) তিনি নারী। তাঁর প্রযোজনায় পোশাক, আচার, রং, শব্দ গন্ধ সব কিছুতেই তীব্র হয়ে থাকে তাঁর জন্মভূমি পাঞ্জাব।

নারী নির্দেশকদের নিজস্বতা, বলিষ্ঠতা এবং প্রযোজনার ক্রমপ্রসারতা যে জায়গায় তাঁদের পৌঁছে দিল, সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে তাকে আলাদাভাবে চিহ্নিতকরণের প্রয়োজন অনুভূত হল। শুধুমাত্র মহিলা নাট্যনির্দেশকের নিয়ে আয়োজিত হল আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে বেশ কিছু নাট্যোৎসব। এর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য 'পূর্বা'— Asian Women Directors Theatre Festivals & Conference' (২০০৩)।[৯] দিল্লির শ্রীরাম সেন্টার ও এন এস ডি-র বিভিন্ন মঞ্চে অভিনয়ে অংশ নিয়েছিল এশিয়া মহাদেশের কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, জাপান, দ্য ফিলিপিনস এবং ভারতের বিভিন্ন পরিচালকের কুড়িটি নাটক। ২০০৩ সালের ৩-১০ জানুয়ারি পর্যন্ত নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমরা লক্ষ করব এই নাট্যোৎসবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দু'জন পরিচালক শাঁওলী মিত্র ও ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় যথাক্রমে একটি বাংলা ও একটি হিন্দি নাটক নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এই নাট্যোৎসবের অন্যতম উদ্যোগী সংস্থা 'নাট্যরঙ্গ প্রতিষ্ঠান'-এর চেয়ারপার্সন নেমিচাঁদ জৈন যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন এই নাট্যোৎসব উপলক্ষে, সেখানে তিনি স্পষ্টই লিখলেন— 'We are happy to say that this fortnight long event is the first and largest event of its kind in India, and probably in Asia.

Emergence of Women in the realm of theatre is a new phenomenon not only in India but world over.[১০]

পশ্চিমবঙ্গে নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠী পরপর দু'বছর ২০০২ (নারীর ক্ষমতায়ন বর্ষ) ও ২০০৩ সালে 'National Womens' Theatre Festival'-এর আয়োজন করে। সেখানে নারী নির্দেশকদের নাটক শুধু অভিনীত হয়নি। তাঁরা মনস্থ করেছিলেন নারী সম্পর্কিত বা যে নাট্যের কেন্দ্রে রয়েছে নারী, সেই সমস্ত নাটকই প্রদর্শিত হবে। বাংলার নির্দেশকদের পাশাপাশি সারা ভারতের নাট্যনির্দেশকদের নাটক প্রদর্শিত হয়েছিল। মণিপুরের এইচ.কানহাইয়ালালের নির্দেশনায় সাবিত্রী হেইসনাম অভিনীত 'দ্রৌপদী' নাটকটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বাংলার দর্শক। বহুবার তিনি বাংলার মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন

এই সাহসী প্রযোজনাটি। নারী নির্দেশক হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা না করলেও দ্রৌপদীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বারবার তিনি প্রমাণ করেন সামাজিক ক্ষেত্রে এক নারীর নির্দেশনা। উল্লেখ্য এই নাটকের অবলম্বন বাংলার সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প 'দ্রৌপদী'।

পরের বছর ২০০৩ সালে তৃপ্তি মিত্র স্মরণে নান্দীকারের আয়োজনে 'Women Theatre Festival'-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন যে নির্দেশকরা, তাঁদের নাট্যের মূল বিষয় ছিল নারীই।

শুধু জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব নয় পশ্চিমবঙ্গের এক নাট্যদল 'নান্দীপট' (প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর) ২০১০ সাল থেকে শুধুমাত্র নারীনির্দেশকদের প্রযোজনা নিয়েই নাট্যোৎসবের সূচনা করে 'নারীর মঞ্চ'[১১] নাম দিয়ে। সেখানে শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতের এবং বাংলাদেশেও নারী নির্দেশকরা অংশগ্রহণ করেন— যা সত্যিই নির্দেশনার ক্ষেত্রে নারীর ক্রম প্রসারণের ছবিটিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

২০১০ সালে ৬-১২ মার্চ মধুসূদন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় এই 'নান্দীপট' আয়োজিত নারীর মঞ্চ নাট্যোৎসব। অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন—

- ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় (রুদালী : কাহিনী মহাশ্বেতা দেবী, নাট্যরূপ, সঙ্গীত, পরিকল্পনা ও পরিচালনা ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়)।
- সোহাগ সেন (সোনাটা। নাটক : মহেশ এলকুঞ্চয়ার, পরি: সোহাগ সেন)।
- সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত (কানন পিসির জপমালা। মঞ্চ, নাটক, সঙ্গীত ও পরিচালনা সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত)।
- অদ্রিজা দাশগুপ্ত (বিজলিবালার মুক্তি। কাহিনি : মতি নন্দী, পরিচালনা অদ্রিজা দাশগুপ্ত।
- অবন্তী চক্রবর্তী (রঞ্জাবতী সেন। রূপান্তর, নাট্যরূপায়ণ, পরিকল্পনা ও পরিচালনা অবন্তী চক্রবর্তী)।
- সীমা মুখোপাধ্যায় (জলছবি। মূল রচনা : মার্টিন ম্যাকডোনাফ, রূপান্তর: ডঃ তীর্থঙ্কর চন্দ, পরিচালনা সীমা মুখোপাধ্যায়)।
- স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত (মাধবী। নাটক : ভীষ্ম সাহানি, রূপান্তর, পোশাক, সঙ্গীত ও পরিচালনা স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, সঙ্গীত : ময়ূখ- মৈনাক এবং পোশাকে সোহিনী সেনগুপ্ত ছিলেন তাঁর সহযোগী)

দেখা যাচ্ছে প্রথমবার নাট্যোৎসবে শুধুমাত্র বাংলার বিশেষত কলকাতার নির্দেশকরাই অংশ

নিয়েছেন। কিন্তু এই নাট্যোৎসবের পরিধি বেড়েছে। পরবর্তী সময়ে কলকাতার আরও অনেক নারী নির্দেশকের নাটক যেমন এই নাট্যোৎসবে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনই জাতীয় স্তরের ও বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশকের সমাগমে 'নারীর মঞ্চ' ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

২০১১ সালে এই নাট্যোৎসবের নারী নির্দেশকদের মধ্যে স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত (তোমার নাম ও কানু। পরিচালনা স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত) ছাড়া আর যাঁদের নাটক মঞ্চস্থ হয় তাঁরা হলেন—

- অর্পিতা ঘোষ (ঘরে বাইরে। কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিচালনা অর্পিতা ঘোষ)।
- ত্রিপুরারি শর্মা (রূপ অরূপ। হিন্দি ভাষায় উপস্থাপিত, নিউ দিল্লি, পরিচালনা—ত্রিপুরারি শর্মা)
- ভদ্রা বসু (জান-এ কলকাতা। পরিচালনা ভদ্রা বসু)।
- তুলিকা দাস (বীর্যশুল্কা। বহুরূপী প্রযোজনা, নাটক অমিত মৈত্র, পরিচালনা তুলিকা দাস)।
- রোকেয়া রফিক বেবি (আমিনা সুন্দরী। থিয়েটার আর্ট ইউনিট, বাংলাদেশ, পরিচলনা রোকেয়া রফিক বেবি)।
- ভাগীরথী (ঐতিহ্য। সিগাল থিয়েটার, অসম, পরিচলনা ভাগীরথী)।

কলকাতার নাট্যদলগুলির পাশাপাশি মানুষ প্রত্যক্ষ করছে দিল্লির অত্যন্ত বলিষ্ঠ এক নাট্যপরিচালক ত্রিপুরারি শর্মাকে; বাংলাদেশের আমিনা সুন্দরীর কথা তুলে এনেছেন মঞ্চে রোকেয়া রফিক বেবি, অসমের সিগাল থিয়েটারের ভাগীরথী এর পর বহুবার কলকাতার মঞ্চে তাঁর নিত্যনতুন ভাবনার সঙ্গে নাট্য-দর্শকদের পরিচয় করিয়েছেন, হয়ে উঠেছেন বাংলা থিয়েটারের কাছের মানুষ।

২০১২ সালে সীমা মুখোপাধ্যায় (মায়ের মতো), সোহাগ সেন (লালবাক্স), অবন্তী চক্রবর্তী (ইচ্ছের অলিগলি), অর্পিতা ঘোষ (ঘরে বাইরে) প্রমুখ বাংলার নাট্যনির্দেশকদের সঙ্গে যুক্ত হলেন ভাগীরথী (জুলিয়াস সীজার), সীমা বিশ্বাস (হিন্দিতে স্ত্রীর পত্র), গীতা গুহ (হিন্দিতে পত্নী কা পত্র), নুনা আফরোজ-এর (স্বদেশি) মতো উজ্জ্বল তরুণ নাট্যপরিচালকেরা।

২০১৩ সালে 'নারীর মঞ্চে' কলকাতা এবং অন্যান্য প্রদেশ ও বাংলাদেশের পরিচালকরা উপস্থাপনা করলেন তাঁদের নির্দেশিত নাটক। এই মঞ্চের সর্বকনিষ্ঠ নির্দেশক সোহিনী হালদার (বেলাশেষে কোলাহল, স্ত্রীর পত্র)।

- রোকেয়া রফিক বেবি (ছায়াচক্র। থিয়েটার ইউনিট, ঢাকা),
- পাকিজা বেগম (মেনকা, অসম),

- ঈশিতা মুখোপাধ্যায় (খেলা ভাঙার খেলা),
- শিমুল ইউসুফ (ধাবমান। ঢাকা থিয়েটার, ঢাকা),
- উমা ঝুনঝুনওয়ালা (অল্‌কা। লিটল থেসপিয়ান),
- অবন্তী চক্রবর্তী (চৈতালি রাতের স্বপ্ন),

২০১৪ সালে 'নারীর মঞ্চ'র বিশেষত্ব এইখানে যে, এই নাট্যোৎসবে জেলা থেকে দু'জন নির্দেশক নিজেদের জায়গা করে নিলেন। তাঁরা হলেন

- শিপ্রা সেন (কঙ্কাল, ঋত্বিক, বহরমপুর প্রযোজনা)।
- সৌমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মণ্ডুক উপাখ্যান। কলকাতা ক্রিয়েটিভ আর্ট পারফর্মাস, মধ্যমগ্রাম)।

বাংলার বাইরে প্রাদেশিক নাট্যনির্দেশকরা ছিলেন—

- ত্রিপুরারি শর্মা (মে বি দিস সামার। ইউনিকর্ন অ্যাক্টরস' স্টুডিও, নিউ দিল্লি)
- ভাগীরথী (দ্য লেস্‌ন। সিগাল থিয়েটার, আসাম)।

এ ছাড়া কলকাতার নাট্যনির্দেশকদের মধ্যে রইলেন—

- ভদ্রা বসু (মেনী বিনোদিনী ও কলকাতার থিয়েটার)
- অবন্তী চক্রবর্তী (নাগমণ্ডলা)।
- ঈশিতা মুখোপাধ্যায় (কাল্লুমামা)।
- ঊষা গঙ্গোপাধ্যায় (হাম মুখতারা)।

'নারীর মঞ্চ'-র ষষ্ঠবর্ষ উদযাপিত হল ২০১৫ সালে। এ বছরে এমন চারজন নির্দেশক তাঁদের প্রযোজনা নিয়ে উপস্থিত, এর আগে যাঁদের নির্দেশিত নাটক এই মঞ্চে অভিনীত হয়নি। তাঁরা হলেন—

- পৌলমী চট্টোপাধ্যায় (কালমৃগয়া)।
- সুমনা চক্রবর্তী (এক নারী কাদম্বরী)।
- কিসমাত বানো (হেলেন, উইংস থিয়েটার, অসম)।
- সঙ্গীতা পাল (রস)।

এ ছাড়া রইলেন

- তুলিকা দাস (তোমারে স্মরণ করি রূপকার)।
- সোহিনী হালদার (বিপন্নতা)।
- সীমা মুখোপাধ্যায় (ছায়াপথ)।
- অবন্তী চক্রবর্তী (Lady ম্যাকবেথ)।

২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত 'নান্দীপট' যে নাট্যোৎসবের আয়োজন করল সেখান থেকে তারা এই বার্তা পৌঁছে দিল মানুষের কাছে যে, শুধুমাত্র নারী নির্দেশকদের নিয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নাট্যোৎসবের আয়োজন করা সম্ভব নানান সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে। যেখানে অর্থ, সময় ও স্থান এই তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ২০১৬ সালে 'নান্দীপট' আয়োজন না করলেও 'তপন থিয়েটার' কর্তৃপক্ষের আয়োজনে নারী দিবসের কাছাকাছি সময়ে (৮ মার্চ কে কেন্দ্র করে) শুধুমাত্র নারী নির্দেশকদের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

এই বছরেই পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল শহর সাহসের সঙ্গে জেলার নির্দেশকদের নিয়ে আয়োজন করেছে নাট্যোৎসবের। 'ইছাপুর আলেয়া'র উদ্যোগে আয়োজিত নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন—

- নীলিমা চক্রবর্তী (অনুবীক্ষণ। স্ববাক প্রযোজনা)।
- কাবেরী মুখার্জী (পাঁজরের ইতিহাস। ফিনিস্ক কাঁচরাপাড়া)।
- দীপান্বিতা বণিক দাস (পথ। গোবরডাঙা নকসা)।
- বেবি সেনগুপ্ত (টিয়া পাখির কথা। অঙ্গন বেলঘরিয়া)।
- সঙ্গীতা চৌধুরী (আপন ঘরে পরের আমি। ইছাপুর আলেয়া)।

২০০৩ সালের বহু পরে এই নাট্যোৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এ কারণেই এই নাট্যোৎসবগুলির আলোচনা করা হল যে কীভাবে নির্দেশনার বীজটি নারীমনে অঙ্কুরিত হয়ে আজ ক্রমপ্রসারিত বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে। 'ইছাপুর আলেয়া'-র উদ্যোগ থেকে সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নারীর নির্দেশনা কোনও বাধা মানেনি। পারস্পরিক ভাবনার বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছে এই উৎসবগুলি। একে অপরের প্রযোজনা প্রত্যক্ষ করে নিজেদের সচেতন করেছেন, সাহস অর্জন করেছেন। 'পূর্বা'র আয়োজনে যে 'Theatre Festival' শুরু হয়েছিল ২০০৩ সালে, শুধুমাত্র নারী নির্দেশকদের নিয়ে আজ তা বহুধারায় প্রবহমান এবং আরও স্রোতস্বিনী ও বেগবতী।

## তথ্যসূত্র


১. *The Telegraph*, Sunday, 14th July, 1996

২. Shreeram Lagoo: The Natsamrat (Dr. Shreeram Lagoo and Deepa Lagoo in Conversation with Amal Allana. This interview was conducted in 2012 in Pune.) Amal Allana (Editor), *The Act of Becoming Actors Talk*, National School of Drama & Niyogi Books, New Delhi, 2013; p. 162

৩. Ibid, p.

৪. Bhaskar Chandavarkar, 'A Life in Theatre: Vijaya Mehta', *Theatre India*, Rajinder Nath (Editor), National School of Drama, New Delhi, No: 3; May 2001, p. 108

৫. Kirti Jain, 'Women Director's Directions Different Concerns, Striking Similarities', *Theatre India*, Rajinder Nath (editor), National School of Drama, New Delhi, No. 3, May, 2001, p. 23

৬. Ibid, p. 26

৭. Chaman Ahuja, 'Kannada Theatre: committed to culture and creativity'. *Contemporary Theatre of India*, National Book Trust, New Delhi, 2012, p. 199

৮. Maya Krishna Rao, 'Engaged Theatricality', Amal Allana (ed.) *The Act of Becoming Actors Talk*, National school of Drama, Niyogi Books, New Dehli, 2013, p. 267-268;

৯. পূর্ব-এশিয়ার নারী নির্দেশকদের নিয়ে আয়োজিত নাট্যোৎসবের অভিনয়পত্রী;

১০. Message, Nemichandra Jain, Ibid.

১১. 'নান্দীপট' আয়োজিত 'নারীর মঞ্চ'-র অভিনয়পত্রী।

# উপসংহার

বাংলা নাটকের ঐতিহ্য-পরম্পরা-গতিমুখ নিয়ে নানান দিক থেকে নানা দৃষ্টিভঙ্গির আলোতে বহু আলোচনা ও গবেষণা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী এই মাধ্যমটি নিজের সপ্রাণতা ও সজীবতা প্রমাণ করেছে বারবার সামাজিক-রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক বিষয়ভাবনায়। প্রয়োগ-কৌশল ও নির্মাণশৈলীর পরিবর্তনের সাক্ষ্যে নাটক ও নাট্যের বিতর্কিত ঘূর্ণাবর্তে আটকে না থেকে গ্রহণ-বর্জন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলা নাটক বাঁক নিতে নিতে দিক পরিবর্তন করতে করতে এগিয়ে চলেছে। এই রকমই এক সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পালাবদলের কালে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের পাশাপাশি সমান্তরাল থিয়েটারের জন্ম। 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় থেকে যার সূচনা।

'নবান্ন'র সময়কাল থেকে যে অভিনেত্রীরা নাট্যকে গ্রহণ করলেন বিনোদন বা পেশা হিসাবে নয়, সমাজবদলের মাধ্যম হিসাবে, দায়বোধ করলেন থিয়েটারকে মাধ্যম করে বহু মানুষের কাছে একটা সুস্থ ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিতে, তাঁরাই আগামী দিনে নাট্যকর্মিণীদের সামনে খুলে দিলেন একটা দরজা— প্রগতির বাতায়ন। এই মানসিকতা সম্বল করে যাঁরা এলেন সমান্তরাল থিয়েটার বা গ্রুপ থিয়েটারে, তাঁরাই 'বাংলা নাট্য : নির্মাণ ও নির্দেশনায় মেয়েরা (১৯৪৩-২০০৩)' শীর্ষক গবেষণাপত্রের মুখ্য উপাদান, উপায় ও উপপাদ্য।

বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রীদের সক্রিয় ভূমিকা প্রথমাবধি লক্ষ করা গেছে যখন থেকে তাঁরা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের অধিকার নিয়েছেন। মঞ্চের উত্থান-পতনের সঙ্গে তাঁদের জীবনপথের চলনটাও জড়িয়ে গেছে। 'নবান্ন' ও পরবর্তী সময়ে এসে অভিনেত্রীরা আর শুধুমাত্র অভিনেত্রী নন। তাঁরা অভিনয়কে অতিক্রম করে নিজেদের অধিকারকে ব্যাপ্ত করলেন নাট্যনির্মাণের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক স্তরে। যার চূড়ান্ত পরিণতি একটি নাটকের স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নির্দেশনা দান। একটি দল প্রতিষ্ঠা করে, সংগঠনের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা। মেয়েদের সামাজিক ইতিহাসের পালাবদলে এ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সমাজে মেয়েদের অবস্থানগত পরিবর্তনের দিকটিও সূচিত করল এই ঘটনা। থিয়েটারের প্ল্যাটফর্ম থেকে স্বাধিকার অর্জনের প্রয়াস গতিপ্রাপ্ত হল।

গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে একটা ভিন্ন জগৎ। মূলত তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা যেতে পারে ভাবনার পরম্পরাকে। প্রথমত যে অভিনেত্রীরা

বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে থিয়েটারচর্চা করেছেন; দ্বিতীয়ত কলকাতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যাঁরা নাট্যচর্চা করছেন; তৃতীয়ত, শহরতলির নাট্যকর্মিণীরা যাঁরা সাংসারিক বাধা অতিক্রম করে মূলস্রোতের বাইরে দাঁড়িয়ে কাজটা করে চলেছেন।

'নির্দেশনা' বা 'নাট্যনির্মাণ' এই শব্দগুলি তখন কতকগুলি অক্ষরের অর্থপূর্ণ সমাবেশ নয়, যা নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার, দৃঢ়তার, একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বহিঃপ্রকাশ। শুধু পুরুষ অভিভাবক বা পরিচালকের পাশে জায়গা করে নেওয়ার সংগ্রাম নয়, নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীর অহংয়ের প্রচারসর্বস্বতা নয়। একজন সচেতন, চিন্তাশীল, মননশীল মানুষ হিসাবে নিজের কথাগুলোকে বহুস্তরের বহুস্বরে আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্কল্প তাঁদের।

বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় স্তরে যে মহিলা নির্দেশকরা কাজ করে চলেছিলেন, নাট্যনির্মাণ ও নির্দেশনা সংক্রান্ত কাজে তাঁদের অনেকেই শিক্ষা গ্রহণ এনএসডি হওয়ার কারণে তাঁদের প্রযোজনার ধরন, কৌশল, কোরিওগ্রাফি ইত্যাদির মধ্যে থাকে নিরীক্ষামূলক প্রবণতা। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে তাঁদের কাজের একটা স্বাধীনতা আছে। এ কারণেই তাঁরা তাঁদের প্রযোজনায় নিত্যনতুন চিন্তা, চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। দ্বিতীয়ত কলকাতা শহরকেন্দ্রিক নারীনির্দেশক ও নাট্যনির্মাণকারীদের মধ্যে কতরকম উদ্ভাবনী শক্তির উন্মোচন ঘটে তার প্রতিফলন ঘটতে তাঁদের প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে যেতেই হয় অর্থের জন্য, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য পাওয়ার জন্য, প্রতিষ্ঠানের পুরুষতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে, সামাজিক পারিবারিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। এত কিছুর সঙ্গে লড়াই করেও সুষ্ঠুভাবে নাট্য প্রযোজনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। কেউ হয়তো থেমে গেছেন অন্যের হাতে ব্যাটন-টি তুলে দিয়ে। আবার কেউ দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে চলেছেন। আর শহরতলির মেয়েদের নাট্যনির্মাণে মিশে থাকে অনেক স্বপ্ন আর আদর্শের উদ্‌যাপন। তাঁদের নাট্যচর্চায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা সাহচর্য পেয়েছেন সহযোগিতা পেয়েছেন কখনও স্বামী বা পরিবারের কাছ থেকে, কখনও বা পূর্বপরিচালকদের কাছ থেকে। লড়াই করে জায়গাটা অধিকার করে নেওয়ার চেয়ে তাঁদের এগিয়ে দিয়েছেন সেই পুরুষ সমাজ যাঁরা থিয়েটারটাকে জীবনে গ্রহণ করেছেন ধর্মের মতো। থিয়েটার তাঁদের ধারণ করে আছে। সেখানে প্রতিযোগিতার থেকে পারস্পরিক অন্তর্কলহের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সহানুভব ও শিক্ষকসুলভ আচরণ।

নারীদের মধ্যে এই ত্রি-স্তরীয় বিভাজনের বাইরে রয়ে গেলেন বহু নাট্যকর্মিণী। তাঁদের ভিন্ন

কণ্ঠস্বর হয়তো বা এঁদের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেল।

প্রথম থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত এই গবেষণাপত্রের অনুসন্ধান ও আলোচনা করতে করতে নিজে সমৃদ্ধ হয়েছি। থিয়েটার-কর্মিণীরা ভিন্ন এক ভাবনার জগতের আকর্ষণে বেঁচে থাকেন, সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায় খ্যাতি অর্থ যশ— তা অনুভূত হয়েছে বারবার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বহু অভিনেত্রী ও কর্মিণীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছি, তেমনই অজানা তথ্যের আলোয় আলোকিতও হতে পেরেছি। গবেষণা সেখানে হয়ে উঠেছে জীবন-ভাবনার— জীবনদর্শনের প্রতিরূপ। বঙ্গীয় এবং সর্বভারতীয় স্তরের অসংখ্য অগণিত নাট্যকর্মিণী যাঁরা এগিয়ে এলেন দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় নিয়ে, আগামী দিনের কর্মিণীদের কাছে তাঁরাই পথপ্রদর্শক। প্রতিস্পর্ধী হয়ে নয়, সহযোগিতার মাধ্যমে এই নাট্যচিত্রাঙ্গদারাই সৃষ্টি ও চারিত করে চলেছেন নাট্যপথের রূপরেখা।

# গ্রন্থপঞ্জি

## আকর গ্রন্থ

### (বাংলা)

১. উৎপল দত্ত, *এংকোর থিয়েটারের গল্প*, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, প্রথম দীপ সংস্করণ, আগস্ট ২০১৩;

২. উৎপল দত্ত, *শাহেনশা তোমার পুরস্কার তোমারই থাক*, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, প্রথম দীপ সংস্করণ, আগস্ট ২০১৩;

৩. উৎপল দত্ত, *কল্লোল*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., পৌষ ১৪১২;

৪. উৎপল দত্ত, *অঙ্গার*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., অগ্রহায়ণ ১৪১২;

৫. উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র* (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানু ১৯৯৭;

৬. তুলসী লাহিড়ী, *ছেঁড়াতার*, ডঃ সনাতন গোস্বামী (সম্পা.), ষষ্ঠ সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৬, কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৭;

৭. তৃপ্তি মিত্র, *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ*, তৃতীয় প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা, নাট্যচিন্তা, বইমেলা জানুয়ারি ২০০৭;

৮. তৃপ্তি মিত্র, *নাটক সমগ্র*, চতুর্থ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪২১, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭;

৯. দেবেশ রায় (ভূমিকা ও অনুবাদ), *ইউরিপিদেস : ট্রয়ের মেয়েরা*, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, পৌষ ১৪২২, জানুয়ারি ২০১৬;

১০. বিজন ভট্টাচার্য, *নবান্ন*, ষষ্ঠ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, মাঘ ১৪২০, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮;

১১. মানদা দেবী, *শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত*, দ্বিতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০১০, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন, প্রথম চিরায়ত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪;

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড গল্প, জন্মশতবর্ষিক সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮;

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা, চৈত্র ১৪১৬, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রথম প্রকাশ ১৩১৭;

১৪. রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, *নাটক সমগ্র-১*, শুভ্র মজুমদার (বিন্যাস), দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১০,

কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০০২;

১৫. রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, *নাটকসমগ্র* ২, কৌশিক রায়চৌধুরী (সম্পা.), ২য় মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১০, কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ অগস্ট ২০০৫;

১৬. শম্ভু মিত্র, *রচনা সমগ্র* ১, শাঁওলী মিত্র (সম্পা.), কলকাতা, আনন্দ, জানুয়ারি ২০১৪;

১৭. শাঁওলী মিত্র, *নাথবতী অনাথবৎ...কথা অমৃতসমান*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., কার্তিক ১৪১৯;

**সহায়ক গ্রন্থ**

১. অবনী লাহিড়ী, *তিরিশ চল্লিশের বাংলা*, রণজিৎ দাশগুপ্ত (সাক্ষাৎকার ও সম্পাদনা), প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ, জানু ২০১৫, কলকাতা, সেরিবান, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯;

২. অমিত মৈত্র, *রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী*, কলকাতা, আনন্দ, জানুয়ারি ২০০৪;

৩. অরূপ মুখোপাধ্যায়, *উৎপল মানস*, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, আগস্ট ২০১২;

৪. অরূপ মুখোপাধ্যায়, *উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি*, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ ২০১১, দিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, প্রথম প্রকাশ ২০১০;

৫. অরূপ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *এপিক থিয়েটার সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, জানু ২০১৪;

৬. অসীম সামন্ত, *কোনও এক নাট্যকর্মী অসীম চক্রবর্তী সম্পর্কে দু-একটি কথা*, কলকাতা, পরম্পরা, সেপ্টেম্বর ২০১২;

৭. আলোক দেব (সম্পা.), *শোভা সেন*, প্রতিকৃতি, কলকাতা; ১৯৯৩

৬. কনক মুখোপাধ্যায়, *নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, ২০০৫, কলকাতা, একসাথে, ১৯৯৩

৭. করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, *সর্বজয়া*, কলকাতা, থীমা, ১৯৯৯;

৮. কেতকী দত্ত, *নিজের কথায়, টুকরো লেখায়*, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (গ্রন্থিত), দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, কলকাতা, থীমা, জানু ২০০৬;

৯. চিন্মোহন সেহানবীশ, *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*; প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ, অক্টোবর ২০১৫, কলকাতা, সেরিবান, নভেম্বর ১৯৮৬;

১০. চিত্রা সেন, *থিয়েটার কর্মিণীর কথা*, দেবাশিস রায়চৌধুরী (লিখন ও সম্পা.), কলকাতা, নাট্যচিন্তা, বইমেলা জানুয়ারি ২০১২;

১১. ছন্দা চট্টোপাধ্যায়, *থিয়েটারের লড়াই*, দেবাশিস রায়চৌধুরী (লিখন ও সম্পা.), কলকাতা, নাট্যচিন্তা, জানুয়ারি ২০১৫;

১২. জয়তী ঘোষ, *বাংলা থিয়েটারের অভিনেত্রী সংগ্রাম ও সৃজনশীলতা*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বইমেলা ২০১২;

১৩. দর্শন চৌধুরী, *গণনাট্য আন্দোলন*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯, কলকাতা, অনুষ্টুপ, মে ১৯৮২;

১৪. দেবতোষ ঘোষ, *স্মৃতির পালক*, কলকাতা, আনন্দ, জানুয়ারি ২০১১;

১৫. দেবতোষ ঘোষ, *আত্মীয়স্বজন*, কলকাতা, প্রতিভাস, জুন ২০০৯;

১৬. দেবাশিস রায়চৌধুরী, *তৃপ্তি মিত্র শিল্পে ও জীবনে*, কলকাতা, রত্নাবলী, মার্চ ২০১০;

১৭. দেবাশিস মজুমদার (সম্পা.), *তৃপ্তি মিত্র*, দীপ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৫, কলকাতা, দীপ প্রকাশ, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯২;

১৮. দেবেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *কেয়া*, কলকাতা, সেতু, জানুয়ারি ২০১৫;

১৯. বনানী চক্রবর্তী (সম্পা.), *নাটক নিয়ে কথাবার্তা*, কলকাতা, রোহিনী নন্দন, ২ জুলাই, ২০১৫;

২০. ব্রাত্য বসু, *যে কথা বলোনি আগে এ বছর সেই কথা বলো*, কলকাতা, কালিন্দী ব্রাত্যজন, জানুয়ারি ২০১৪;

২১. মধুময় পাল (সম্পা.), *আগুনের খেয়া*, কলকাতা, সেতু, জানু ২০১৫;

২২. মণিকুন্তলা সেন, *জনজাগরণে নারী জাগরণে*, কলকাতা, থীমা, ২০১০;

২৩. মানস চক্রবর্তী (সম্পা.), *বরণীয় বাঙালির বউয়েরা*, আগস্ট ২০১২, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২;

২৪. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম নিয়োগী (সম্পা.), *ভারত ইতিহাসে নারী*, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৯; কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯;

২৫. রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা*, জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা, উর্বী প্রকাশন, জুন ২০০৮;

২৬. রুশতী সেন, *মায়া ঘোষ : মঞ্চই জীবন*, কলকাতা, থীমা, মার্চ, ২০১৩;

২৭. রুশতী সেন, *ফালতু লেখায় ফালতু কথা*, কলকাতা, মাঘ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১;

২৮. শম্ভু মিত্র, সন্মার্গ সপর্যা, কলকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., মাঘ ১৩৯৬;

২৯. শম্ভু মিত্র, *এক-বক্তার বৈঠক*, শঙ্খ ঘোষ (সংগ্রাহক), ৩য় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০০৯,

কলকাতা, তালপাতা, ৭ মার্চ ২০০৮;

৩০. শম্ভু মিত্র, *অভিনয় নাটক মঞ্চ*, তৃতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১১, কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, সপ্তর্ষি প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯;

৩১. শাঁওলী মিত্র, *মা-'মণি'*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি., কলকাতা, মাঘ ১৪১৩;

৩২. শাঁওলী মিত্র, *দিদৃক্ষা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., ডিসেম্বর, ১৯৯২;

৩৩. শাঁওলী মিত্র, *গণনাট্য নবনাট্য সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র*, কলকাতা, আনন্দ, জানু ২০১৫;

৩৪. শাঁওলী মিত্র, *শম্ভু মিত্র ১৯১৫-১৯৯৭ বিচিত্র জীবন পরিক্রমা*, ২০১১, নয়া দিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১০;

৩৫. শাঁওলী মিত্র, *মুকুরে মুখ না মুখোশ*, ২য় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৪;

৩৬. শাঁওলী মিত্র, *তর্পণ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৮, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., প্রথম সংস্করণ, জানু ১৯৯৮;

৩৭. শেখর সমাদ্দার, *বাংলা নাট্য সংস্কৃতির ইতিহাস*, কলকাতা, প্রয়াগ প্রকাশনী, বইমেলা, জানু ২০১০;

৩৮. শোভা সেন, *ওঁরা, আমরা, এরা*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, কলকাতা, থীমা, প্রথম সংস্করণ, ২০০০;

৩৯. শোভা সেন, *স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ*, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জানু ২০০৯, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম সংস্করণ ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩;

৪০. সন্ধ্যা দে, *বাংলা নাট্যকোষ (১৯৪৮-২০০০)*, কলকাতা, প্রতিভাস, ১৫ এপ্রিল, ২০১০;

৪১. সন্ধ্যা দে, *অন্যধারার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে*, কলকাতা, মৌহারি, বৈশাখ ১৪১৪;

৪২. সুরমা ঘটক, *ঋত্বিক পদ্মা থেকে তিতাস*, কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানু ১৯৯৫;

৪৩. সুস্নাত দাস, *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ২৯ এপ্রিল, ২০১২, কলকাতা, নক্ষত্র, ১ম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা, ২৬ জানুয়ারি ২০০২;

৪৪. সোমনাথ হোর, *তেভাগার ডায়েরি*, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১;

৪৫. স্বপন মজুমদার, *বহুরূপী ১৯৪৮-১৯৮৮*, কলকাতা, বহুরূপী, ১ মে ১৯৮৮;

## (ইংরাজি)

1. Amal Allana (ed.), *The Act of Becoming Actors Talk*, New Dehi, National School of Drama & Niogy Books, 2013;
2. Ananda Lal (Ed.), *The Oxford Companion to Indian Theatre*, New Delhi, Oxford University Press, 2004
3. B.H.Liddell Hart, *History of the Second World War*, 2011, London, Pan Books Pan Macmillan, 1st Publised by Cassell and Co. Ltd. 1970
4. Bishnupriya Dutt, Urmimala Sarkar Munsi, *Engenderign Performance Indian women Performers in search of An Identity*, New Delhi California UK Singapore, 2010
5. Chaman Ahuja, *Contemporary Theatre of India An Overview*, New Delhi, National Book Trust, 2012.
6. Irawati Karve, *Yuganta the end of an epoch*, Reprinted 2010, 2011, 2013, Hyderabad, Orient Black Swan, Deshmukh Prakashan 1969.
7. Nandini Bhatia, *Acts of Authority/Acts of Resistance, Theatre and Politics in Colonial and Postcolonial India*, Oxford University Press, New Delhi, First Published in 2004
8. Satyabrata Raichowdhuri, *Leftism in India 1917-1947*, Delhi, Macmillan Publishers India Ltd., Reprinted in India 2011, Delhi.

## পত্রপত্রিকা (বাংলা)

১. অরুণ কুণ্ডু (সম্পা.), একুশ শতক, একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, কলকাতা

২. অরুণ কুণ্ডু (সম্পা.), একুশ শতক, একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ ২০১৬, কলকাতা

৩. অরুণ কুণ্ডু (সম্পা.), একুশ শতক, একাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৬, কলকাতা

৪. অরুণ কুণ্ডু (সম্পা.), একুশ শতক, একাদশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, জুন ২০১৬, কলকাতা

৫. অরূপ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *এপিক থিয়েটার*-প্রাক সুবর্ণজয়ন্তী সমালোচনা ও বিতর্ক সংখ্যা, আগস্ট ২০১২, কলকাতা ;

৬. অরূপ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *এপিক থিয়েটার*, সেপ্টেম্বর ২০১১, কলকাতা;

৭. অয়ন্তিকা ঘোষ (সম্পা.), *অসময়ের নাট্যভাবনা*, বর্ষ ২০, সংখ্যা ১, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৩, হাওড়া

৮. অশোক সেন (সম্পা.), *বারোমাস*, এপ্রিল-মে ১৯৯২, চতুর্থ বর্ষ ৮-৯, কলকাতা;
৯. কুমার রায় (সম্পা.), *বহুরূপী*, বিশেষ বহুরূপী প্রযোজনা ১, সংখ্যা ৬৯, মে ১৯৮৮, কলকাতা;
১০. কুমার রায় (সম্পা.), *বহুরূপী*, বিশেষ বহুরূপী-প্রযোজনা ২, সংখ্যা ৭০; অক্টোবর ১৯৮৮, কলকাতা;
১১. কুমার রায় (সম্পা.), *বহুরূপী*, তৃপ্তি মিত্র স্মরণ ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী জন্মশতবর্ষ পূর্তি বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ, সংখ্যা ৭২, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯, কলকাতা;
১২. কুমার রায় (সম্পা.), *বহুরূপী*, বিশেষ 'রক্তকরবী' প্রযোজনা ১০২ সংখ্যার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১০৪ সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৫, কলকাতা;
১৩. চিত্তরঞ্জন ঘোষ (সম্পা.), *বহুরূপী*, নবান্ন-স্মারক সংখ্যা (দ্বিতীয় সংকলন), জুন ১৯৭০, কলকাতা
১৪. তাপস ভৌমিক (সম্পা.), *কোরক*, শারদ, ১৪২০, কলকাতা;
১৫. দীপক মিত্র ও সিদ্ধার্থ সেন (সম্পা.), *অন্যকথা*, দশম বার্ষিক সংখ্যা, ১৪২২, কলকাতা;
১৬. দেবাশিস মজুমদার (সম্পা.), *শূদ্রক*, শরৎ ১৪০০, সঙ্কলন ১০, কলকাতা;
১৭. প্রভাতকুমার দাস (সম্পা.), *বহুরূপী*, শম্ভু মিত্র জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, সংখ্যা ১২২, অক্টোবর ২০১৪, কলকাতা;
১৮. ব্রাত্য বসু (সম্পা.), *ব্রাত্যজন নাট্যপত্র*, চতুর্থ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১২;
১৯. ব্রাত্য বসু (সম্পা.), *ব্রাত্যজন নাট্যপত্র*, ষষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৪;
২০. ব্রাত্য বসু (সম্পা.), *ব্রাত্যজন নাট্যপত্র*, অষ্টম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৫;
২১. রঙ্গন দত্তগুপ্ত (সম্পা.), *অসময়ের নাট্যভাবনা*, জানু-মার্চ, ২০১৩, বর্ষ ২০, সংখ্যা-১, কলকাতা
২২. রথীন চক্রবর্তী (সম্পা.), *নাট্যচিন্তা*— নারীর অধিকার, নারীর নির্যাতন সংখ্যা, নভেম্বর ২০১১-এপ্রিল ২০১২, বর্ষ ৩১, সংখ্যা ১-৬; কলকাতা;
২৩. রথীন চক্রবর্তী (সম্পা.), *নাট্যচিন্তা*, বিজন ভট্টাচার্য শতবর্ষ সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৫-এপ্রিল ২০১৬, বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ১-৬, কলকাতা;
২৪. শেখর সমাদ্দার (সম্পা.), *সময় নাট্যভাষা নারী বিশ্ব ও থিয়েটার*, বিশেষ সংখ্যা, মার্চ ২০১৫, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা;
২৫. সত্য ভাদুড়ী (সম্পা.), *স্যাস সংকলন* ২১, ২০০৪, উত্তর ২৪ পরগণা;
২৬. সত্য ভাদুড়ী (সম্পা.), *স্যাস সংকলন*, সংখ্যা ২৬, ২০০৯, কলকাতা;
২৭. সুশীল সাহা (সম্পা.), *প্রাচ্য*, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০১৩, কলকাতা;

## পত্রপত্রিকা (ইংরাজি)

1. Rajinder Nath (ed.), Theatre India, National School of Drama's Theatre Journal, No. 3, May 2001, Delhi;
2. Souvik Kumar Dasgupta, Avantika, Vol. 1, Issue 8, August 2012, Kolkata

## পুস্তিকা

১. নারীর মঞ্চ, মহিলা নির্দেশকদের নাট্যউৎসব, আয়োজক নান্দীপট, ২০১০ (৬-১২ মার্চ); মধুসূদন মঞ্চ, কলকাতা;
২. নারীর মঞ্চ, মহিলা নির্দেশকদের নাট্যউৎসব, আয়োজক নান্দীপট, ২০১১ (৬-১২ মার্চ), মধুসূদন মঞ্চ, কলকাতা;
৩. নারীর মঞ্চ, মহিলা নির্দেশকদের নাট্যউৎসব, আয়োজক নান্দীপট, ২০১২ (৬-১৩ মার্চ), মিনার্ভা থিয়েটার, কলকাতা;
৪. নারীর মঞ্চ, মহিলা নির্দেশকদের নাট্যউৎসব, আয়োজক নান্দীপট, ২০১৩, (৮-১৪ মার্চ), মিনার্ভা থিয়েটার, কলকাতা;
৫. নারীর মঞ্চ, মহিলা নির্দেশকদের নাট্যউৎসব, আয়োজক নান্দীপট, ২০১৪, (৮-১৫ মার্চ), নজরুল শতবার্ষিকী সদন, মধ্যমগ্রাম;
৬. নারীর মঞ্চ, মহিলা নির্দেশকদের নাট্যউৎসব, আয়োজক নান্দীপট, ২০১৫ (৮-১৪ মার্চ), গিরিশ মঞ্চ, কলকাতা;
৭. পঞ্চম বৈদিক ২৮,...এবং দেবযানী বিশেষ ‘প্রযোজনা’ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১১, কলকাতা;
৮. পঞ্চম বৈদিক ৩০, আগস্ট ২০১৩, কলকাতা;
৯. প্রতি বৃহস্পতি নাট্যমুখপত্র, বর্ষ ২০, সংখ্যা ৯৫৬, ২৫-০৯-২০১৪, কলকাতা;
১০. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৬০বছর *সভ্যতার সংকট মুক্তির সংগ্রাম*, তৃতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৫, কলকাতা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, প্রথম প্রকাশ, ৯ই মে, ২০০৫;
১১. ব্রাত্য বসু, *কোম্পানী থিয়েটার : নতুন শতাব্দীর বঙ্গ থিয়েটার-বিষয়ক একটি প্রস্তাবনা বা ইস্তেহার*, সেপ্টেম্বর ২০১৩, কলকাতা

১২. রামেন্দু মজুমদার, *বিশ্বনাট্যের গতি প্রকৃতি*, সুধী প্রধান স্মারক বক্তৃতা ২, বেলঘরিয়া আনন্দসভা, কলকাতা, ২৫ মার্চ, ২০১৪

২৩. শঙ্খ ঘোষ, *জানার বোধ*, কুমার রায় স্মারক বক্তৃতা ২০১২, বহুরূপী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০ জুন ২০১৩, প্রথম প্রকাশ ২ মার্চ ২০১৩, কলকাতা,

১৪. শ্যামলী গুপ্ত, মালিনী ভট্টাচার্য, ঈশিতা মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *নারী ও বিশ্বায়ন*, চতুর্থ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০০৭, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৪, কলকাতা;

১৫. Poorva, Asian Women Directors : Theatre Festival & Conference, Jan 3-10, 2003, Delhi.


## অভিধান ও অ্যালবাম


১. *Bahurupee 60*, Swapan Majumdar (Ed.), Kolkata, Bohurupee Published : 1 May 2008.

২. *সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান*, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৪, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, কলকাতা;


## ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংগৃহীত রেকর্ডিং

১. অচিন্ত্য দত্ত
২. অর্পিতা ঘোষ
৩. অসীম দত্ত
৪. ঈশিতা মুখোপাধ্যায়
৫. কাবেরী মুখোপাধ্যায়
৬. কিশোর মৈত্র
৭. গার্গী দত্ত
৮. চণ্ডী লাহিড়ী
৯. জয়তী বসু
১০. জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায়
১১. ডলি বসু
১২. দেবতোষ ঘোষ
১৩. দেবাশিস রায়চৌধুরী
১৪. নীলিমা চক্রবর্তী
১৫. নীলিমা বিশ্বাস
১৬. পরিমল মুখোপাধ্যায়
১৭. বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত
১৮. রাত্রি চট্টোপাধ্যায়
১৯. শাশ্বতী বিশ্বাস
২০. শিপ্রা সেন
২১. শুভেন্দু মজুমদার
২২. শোভা সেন
২৩. সঙ্গীতা চৌধুরী
২৪ সাধনা মুখোপাধ্যায়
২৫. সুব্রত পাল
২৬. সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত
২৭. সোহাগ সেন
২৮. সৌমিত্র মিত্র
২৯. স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত
৩০. সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়